

লাল সন্ত্রাস

সিরাজ সিকদার ও সর্বহারা রাজনীতি

মহিউদ্দিন আহমদ

লাল সন্ত্রাস

সিরাজ সিকদার ও সর্বহারা রাজনীতি

লাল সন্ত্রাস

সিরাজ সিকদার ও সর্বহারা রাজনীতি

মহিউদ্দিন আহমদ



লাল সন্ত্রাস : সিরাজ সিকদার ও সর্বহারা রাজনীতি
মহিউদ্দিন আহমদ

প্রচ্ছদ : সব্যসাচী হাজরা

প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন ১৪২৭, ফেব্রুয়ারি ২০২১

প্রকাশক : বাতিঘর
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ভবন, ১৭ ময়মনসিংহ রোড, বাংলা মোটর, ঢাকা
ফোন : +৮৮ ০১৯৭৩ ৩০৪ ৩৪৪

বিক্রয়কেন্দ্র
বাতিঘর ঢাকা : বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ভবন, ১৭ ময়মনসিংহ রোড, বাংলা মোটর, ঢাকা
বাতিঘর চট্টগ্রাম : প্রেসক্লাব ভবন, ১৪৬/১৫১ জামাল খান রোড, চট্টগ্রাম
বাতিঘর সিলেট : গোল্ডেন সিটি কমপ্লেক্স, ৬৮২ পূর্ব জিন্দাবাজার, সিলেট
বাতিঘর বাংলাবাজার : রুমী মার্কেট, ৬৮-৬৯ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা

বাতিঘরের বই ও দেশি-বিদেশি যেকোনো বই অর্ডার করুন
www.baatighar.com

মুদ্রণ ব্যবস্থাপনা : বাতিঘর প্রকাশনা বিভাগ

মূল্য : ৮০০ টাকা

Lal Shontrash : Siraj Sikdar O Sharbohara Rajniti
by Mohiuddin Ahmad

Published by Baatighar
Bishwo Shahitto Kendro Bhavan
17 Mymensingh Road, Bangla Motor, Dhaka, Bangladesh
Email : baatighar.pub@gmail.com

Price : BDT 800.00 USD 40.00

ISBN : 978-984-95336-1-0

মুক্তির মন্দির সোপানতলে
কত প্রাণ হল বলিদান
লেখা আছে অশ্রুজলে

সূচি



জীবনের গল্প

চেদাক দারে সিধু হো
মায়ামতে দম নুমেন হো
চেদাক দারে কানু হো
হুল হুলেম মেমেন
জাত ভাইকো লাগিত
মায়ামতে দো নুমেন
বেপারিয়া কম্বরো হায়রে
দিশম দোকো হুল।

সিধু তুমি কোথায়
রক্তে করেছ স্নান
কাঁদো কেন কানু
লড়াই লড়াই
আমার ভাইদের জন্য
আমরা করেছি রক্তস্নান
তস্কর আর ব্যাপারীরা
আমাদের জমি নিয়েছে কেড়ে।
(অনুবাদ : লেখক)

সাঁওতালদের ঘরে ঘরে এখনো গাওয়া হয় এই গান। ১৮৫৭ সালে এ দেশে সিপাহিরা জ্বলে উঠেছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের বিরুদ্ধে। কিন্তু তারও দুই বছর আগে জেগে উঠেছিল সাঁওতালরা সিধু-কানু দুই ভাইয়ের

নেতৃত্বে। কে এই সিধু-কানু?

ঘটনার শুরু জঙ্গলাকীর্ণ দামিন-ই-কো অঞ্চলে। এখন এটি ভারতের ঝাড়খন্ড রাজ্যের ভেতরে। সাঁওতাল পরগনা এই রাজ্যের একটি বিভাগ। এখানে ছয়টি জেলা—গড্ডা, দেওঘর, দুমকা, জাসডারা, সাহেবগঞ্জ ও পাকুর। বিভিন্ন জায়গা থেকে সাঁওতালদের এখানে নিয়ে আসা হয়েছিল জমি দেওয়ার নাম করে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কথা রাখেনি। তারা জমিদার আর জোতদারদের ভূমিদাস হলো। এর বিরুদ্ধে ১৮৫৫-৫৬ সালে সংঘটিত হয় হুল বিদ্রোহ। নেতৃত্ব দেন দুই ভাই সিধু মুর্মু আর কানু মুর্মু। তাঁদের অস্ত্র তির-ধনুক। কোম্পানির সৈন্যদের হাতে মারণাস্ত্র, বন্দুক। বিদ্রোহ দমন করা হয় নিষ্ঠুরভাবে। আরও অনেকের সাথে শহীদ হন সিধু-কানু। তাঁরা এখন কিংবদন্তি।

সাঁওতাল আদিবাসীরা এখন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলায়। ১৯৪০-এর দশকের শেষ দিকে ফসলের ন্যায্য দাবিতে তারা অনেকেই শামিল হয়েছিল তেভাগা আন্দোলনে। পুলিশের বুটের তলায় থেঁতলে যায় সেই আন্দোলন। তারপর থেকেই সম্প্রদায়গতভাবে সাঁওতালরা ম্রিয়মাণ। একে তো সংখ্যালঘু, তার ওপর নেই নেতৃত্ব। ষাটের দশকে এসে তারা আবার জ্বলে ওঠে। এবার সাঁওতালরা একা নয়। তাদের সঙ্গে মুন্ডা, কোল, ভিল, এমনকি বাঙালিও।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি অনেক দিন ধরে পার্লামেন্টের ভেতরে ও বাইরে ইঁদুর-বিড়াল খেলছিল। ১৯৬৭ সালের একদিন হঠাৎ করেই একটি স্ফুলিঙ্গ থেকে দাবানল তৈরি হলো পশ্চিমবঙ্গের নকশালবাড়ির কয়েকটি গ্রামে। ভাগচাষিরা হতে চাইল স্বাধীন কৃষক, দাবি করল জমির মালিকানা। তারা জড়ো হলো নতুন নেতৃত্বে। এই পর্যায়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি আবারও ভাঙল। তৈরি হলো ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী)। এর তাত্ত্বিক নেতা চারু মজুমদার। তারা রাজনীতিতে নিয়ে এল নতুন ধারা। ক্রমে তা ছড়িয়ে পড়ল ভারত ও বাংলাদেশের (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) বিভিন্ন জেলায়।

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনেও নকশালবাড়ির ঝাপটা এসে লাগে। এখানে কয়েকটি গ্রুপ চারু মজুমদারের লাইনকে সঠিক রণনীতি হিসেবে গ্রহণ করে। এ সময় সিরাজ সিকদারের নেতৃত্বে তৈরি হয় পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন। দলটি অবশ্য চারু মজুমদারের রাজনৈতিক লাইন হুবহু অনুসরণ করেনি। তারা পূর্ব বাংলার স্বাধীনতার ডাক দেয়। একই সঙ্গে

গ্রহণ করে চারু মজুমদারের সশস্ত্র গেরিলাযুদ্ধের লাইন—গ্রামে ঘাঁটি বানিয়ে মুক্তাঞ্চল তৈরি করে শহর ঘেরাও, অতঃপর জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব। লেখা হলো থিসিস। বরিশালের পেয়ারাবাগানে গেরিলাযুদ্ধের প্রথম প্রয়োগ হলো। পাকিস্তানি সৈন্যদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ টেকেনি বেশিদিন।

একাত্তরের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী ঢাকায় আত্মসমর্পণ করে। দেখা দেয় নতুন বাস্তবতা। সিরাজ সিকদার হাজির করলেন নতুন তত্ত্ব—পূর্ব বাংলা ভারতের উপনিবেশ; এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ভারতের পুতুল সরকার। সশস্ত্র গেরিলাযুদ্ধের মাধ্যমে এই সরকারকে হটিয়ে কায়েম করতে হবে স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা।

১৯৭২ থেকে ১৯৭৪ বাংলাদেশ পার করেছে এক অস্থির সময়। এই পর্বে দুটি রাজনৈতিক স্রোতোধারা সবার নজর কেড়েছিল, যা তাদের বিশিষ্টতা দিয়েছিল। এর একটি জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ), অন্যটি পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি।

জাসদকে নিয়ে আমি একটি বই লিখেছি। এটি ছাপা হয় ২০১৪ সালের অক্টোবরে। জাসদ মরে গিয়েছিল। বইটিকে কেন্দ্র করে জাসদ আবারও ফিরে আসে জন-আলোচনায়। অতীত খুঁড়ে সময়ের ঘটনাপ্রবাহ ও চরিত্রগুলোকে বের করে পাদপ্রদীপের আলোয় তুলে ধরার দরকার আছে। কেননা আগে কোন ধারায় রাজনীতি হয়েছে তা ভবিষ্যতে অনেকেই জানতে চাইবে। একপর্যায়ে ভাবলাম সর্বহারা পার্টি নিয়েও লিখব। এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার পেছনে ব্যক্তিগত কারণও ছিল।

আমার স্কুলের বন্ধু এ বি এম বাদশা ফারুক হোসেন। ক্লাস ফাইভ থেকে পড়েছি একসঙ্গে। খুব হাসিখুশি থাকত। আজিমপুর নতুন পল্টন লাইনে ওদের বাসা। ভাটিয়ালি গান গাইত। আব্বাসউদ্দীনের 'ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে' গানটি গেয়ে সে প্রায়ই আনন্দ দিত আমাদের। এরকম একটি ফাঁদে পড়ে যে তার জীবনদীপ নিভে যাবে, কখনো ভাবিনি।

স্বাধীনতার পর ফারুক যোগ দিয়েছিল জাতীয় রক্ষীবাহিনীতে। মধ্যবিত্তের টানাপোড়েনের সংসারে তার একটি চাকরির দরকার ছিল। তখন কতই বা বয়স, বিশ কিংবা একুশ। রক্ষীবাহিনীর পঞ্চম ব্যাচে প্রশিক্ষণ নিয়ে সে হলো 'লিডার'। ১৯৭৪ সালের ১৫ ডিসেম্বর মুন্সিগঞ্জের একটি বাজারে সর্বহারা পার্টির লোকদের আক্রমণে সে নিহত হয়। জায়গাটা কোথায় তা নিশ্চিত

হতে পারিনি। এটা লৌহজং কিংবা সিরাজদিখান হবে। যতদূর শুনেছি, তাকে কেটে টুকরা টুকরা করে মাটিতে পুঁতে ফেলা হয়েছিল। তখন সর্বহারা পার্টির 'জনযুদ্ধ' চলছে। ফারুক হোসেনের গায়ে উর্দি। তাদের চোখে সে জাতীয় শত্রু। আমি ভাবি, রক্ষীবাহিনীর একজন কনিষ্ঠ কর্মকর্তাকে মেরে তাদের বিপ্লব কতটুকু এগোল? কোনো রাজনৈতিক দলের লোকদের হাতে নিহত হওয়া রক্ষীবাহিনীর একমাত্র কর্মকর্তা ছিল ফারুক। তার সহকর্মীরা তাকে মনে রাখেনি। মনে রাখেনি তার নিয়োগকর্তারাও।

স্কুল পেরিয়ে কলেজে ভর্তি হলাম। নতুন বন্ধু জুটে গেল অনেক। এদের দুজন আনিসুল ইসলাম ও শাহজাহান তালুকদার। দুজনই এসেছে মুন্সিগঞ্জের লৌহজং থেকে। গ্রামের স্কুল থেকে আসা সরল-সহজ তরুণ। আমরা একসঙ্গে হোস্টেলে থাকি। কলেজ ডিঙিয়ে ভর্তি হই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। আমরা তিনজন একই ডিপার্টমেন্টে, ইকোনমিকসে। তিনজনই মুহসীন হলের আবাসিক ছাত্র।

এর মধ্যে বেধে যায় যুদ্ধ। আমরা সবাই এদিক-সেদিক ছিটকে পড়ি। যুদ্ধ শেষে আমরা ফিরে আসি অনেকেই। শাহজাহান ফেরেনি। ততদিনে সে জড়িয়ে পড়েছে সর্বহারা পার্টির কাজে। দলের সার্বক্ষণিক কর্মী সে।

শাহজাহানের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম।

একসময় আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রত্ব শেষ হলো। আনিস ইকোনমিকস ডিপার্টমেন্টে যোগ দিল লেকচারার হিসেবে। পরে সে যুক্তরাষ্ট্রে থিতু হয়। এখন হিউস্টনে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতির অধ্যাপক। তার সঙ্গে কথা হয় মাঝেমধ্যে। তার কাছে জানতে পারি শাহজাহানের নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ার কথা।

শাহজাহান নিরুদ্দেশ হয়নি। সে এমন একটি দলে যোগ দিয়েছিল, যারা এক বিপজ্জনক খেলায় মেতেছিল। একপর্যায়ে আত্মঘাতী প্রবণতার বলি হলো সে। ১৯৭৫ সালের মাঝামাঝি দলের নির্দেশে তাকে 'খতম' করা হয়। নামটি শুনেই মনে হয়েছিল তাকে চিনি। কিন্তু দলের অবসরপ্রাপ্ত নেতারা কেউ এ ব্যাপারে নিশ্চিত তথ্য দিতে পারছিলেন না। পরে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল সর্বহারা পার্টির রফিককে দলের হাইকমান্ড মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে। রফিক হলো শাহজাহানের দলীয় নাম। আমি ভাবি, রফিক ওরফে শাহজাহানকে মেরে সর্বহারা পার্টির কী লাভ হলো?

ফারুক যে অপারেশনে নিহত হয়, তার নেতৃত্বে ছিল রফিক। অদৃষ্টের

কী পরিহাস! এক বছরের মাথায় নিজেদের লোকের হাতে খুন হলো রফিক (শাহজাহান)। আমি ফারুক আর রফিকের সূত্র ধরে এ দলটির ভেতরের খবর জানার চেষ্টা করলাম। খুনোখুনি তো শুধু একটি দিক। আরও দিক আছে। এই দলের আছে রূপকল্প, রাজনীতি, কর্মসূচি এবং একঝাঁক টগবগে মেধাবী তরুণের স্বপ্নযাত্রার গল্প। আমি চেয়েছি তার সবটুকু ছেঁকে তুলতে।

রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের অভিযোগ বেশ পুরনো। এস্টাবলিশমেন্টবিরোধী কমিউনিস্ট আন্দোলনে প্রতিবাদী তরুণদের একটি জনপ্রি স্লোগান ছিলো—শ্বেত সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লাল সন্ত্রাস ছড়িয়ে দাও। এই স্লোগানের একটি ইতিহাস আছে। ১৯১৭ সালেন নভেম্বরে রুশ বিপ্লবের সময় ১৯১৮ থেকে ১৯২২ সাল পর্যন্ত সোভিয়েত রাশিয়ায় গৃহযুদ্ধ চলেছিল। একদিকে ছিল বলশেভিক পর্টির নেতৃত্বে রেড আর্মি, অন্যদিকে ছিল কমিউনিস্ট বিরোধীদের হোয়াইট আর্মি। দুপক্ষের বিরুদ্ধেই উঠেছিল সন্ত্রাসের অভিযোগ। এই গৃহযুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স ও জাপান হোয়াইট আর্মির সমর্থনে সৈন্য পাঠিয়েছিল। গৃহযুদ্ধে অসংখ্য মানুষ নিহত হয়েছিল। কারও কারও মতে, সংখ্যাটি এক কোটিরও বেশি। কারও চোখে এটা বিপ্লব, কারও চোখে সন্ত্রাস। কমিউনিস্টরা মনে করেন, শ্বেত সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লাল সন্ত্রাস হলো 'প্রতিক্রিয়াশীলতা ও প্রতিবিপ্লবের' বিরুদ্ধে 'প্রগতি ও বিপ্লবের' লড়াই। বাংলাদেশে এ লড়াইয়ে সামনের কাতারে ছিল পূর্ব বাংলার সর্বহারা পর্টি।

প্রথমে ভেবেছিলাম, সর্বহারা পার্টির রাজনৈতিক ইতিহাস লিখব। যতই খোঁজখবর করি, দেখি যে রাজনীতি আর খুনোখুনি এমন আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে যে, একটিকে আরেকটি থেকে আলাদা করে দেখা যায় না। শুধু একটি দিক তুলে ধরে অন্যদিক আড়াল করলে ইতিহাসের ওপর সুবিচার হয় না।

দলের লোকেরা দলীয় রাজনীতি করবে, এটাই স্বাভাবিক। পৃথিবীর তাবৎ কমিউনিস্ট পার্টির দলিলে এক ধরনের কথা লেখা থাকে—চমৎকার বিপ্লবী পরিস্থিতি বিরাজমান, বিপ্লব আসন্ন। কিন্তু বিপ্লব আর ধরা দেয় না। বিপ্লবীরা ভেঙেচুরে খানখান হন। একে অপরকে প্রধান শত্রু মনে করে তাঁকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে চান। তাঁরা এর নাম দিয়েছেন আন্তঃপার্টি সংগ্রাম। দলের ইতিহাস লিখতে গেলে এসব কথা আসবেই। সর্বহারা পার্টির এক সাবেক নেতা আমাকে অনুরোধ করেছেন—'ভাই, পজিটিভ ব্যাপারগুলো হাইলাইট করেন। নেগেটিভ বিষয়গুলো বেশি নাড়াচাড়া কইরেন না। এটা

মানুষকে ভুল মেসেজ দেবে।' আমি বলেছি, পজিটিভ-নেগেটিভ মিলেই তো জীবন। একটিকে বাদ দিলে তো জীবনের গল্প হবে না। ইতিহাস হবে না, দলের ক্রোড়পত্র হবে।

শুরুতে এতটা আশাবাদী হতে পারিনি। কাজটি গোপন সংগঠনের রাজনীতি নিয়ে। এই দলের সঙ্গে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা মুখ খুলবেন কি না, এ নিয়ে দুশ্চিন্তা ছিল। এ ব্যাপারে আমার আগের অভিজ্ঞতা ভালো নয়। আমার সরল উপসংহার হলো, ষড়যন্ত্রকারীরাই তথ্য গোপন করে বা মিথ্যা তথ্য দেয়। সর্বহারা পার্টির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাই এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। এমনটি আমি আশা করিনি, বা আশার অতিরিক্ত পেয়েছি। ফলে আমার হাতে জড়ো হয়েছে তথ্যের বিপুল ভান্ডার।

তথ্য কম হলে মনে খেদ থাকে। প্রশ্ন জাগে, এটা লেখা হলো না কেন, ওটা কেন আরও বিস্তারিত বলা হলো না। আবার তথ্য বেশি হলে দেখা দেয় অন্য রকম সমস্যা—এগুলো সাজাব কীভাবে। সবই গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় আমার। কোনোটাই বাদ দিতে ইচ্ছে করে না।

প্রথমে আমার পুঁজি ছিল সর্বহারা পার্টির লিখিত দলিলপত্র। কিন্তু দলিলের ওপর নির্ভর করে তো ইতিহাস লেখা যাবে না। আমরা প্রচারপত্রে যা লিখি বা মঞ্চে দাঁড়িয়ে বক্তৃতায় যা বলি, বাস্তবে তার বাইরে অনেক কিছু করি। সেসব কথা লিখতে হলে ওই সময়ের চরিত্রগুলোর সঙ্গে কথা বলা দরকার। প্রয়োজন তাদের সাক্ষাৎকার নেওয়া। কাগজপত্রে বেশির ভাগই দেখি আত্মপ্রশংসা, বাগাড়ম্বর, আস্ফালন এবং প্রতিপক্ষকে গালাগাল। এখানে দলের কর্মীদের আনন্দবেদনা, ঝুঁকি নেওয়া আর পলাতক জীবনের খানাখন্দ কই? ভালোবাসা-ঘৃণার প্রকাশ কোথায়? দল তো কেবল স্লোগান, ইশতেহার আর কেন্দ্রীয় কমিটি নয়। দল মানে হাজার হাজার কর্মী ও সমর্থকের স্বপ্ন, আকাঙ্ক্ষা, লড়াই আর স্বপ্নভঙ্গের খতিয়ান। দলের নেতা মানে এই নয় যে তিনি অমুক সালের অমুক দিন একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম নিয়েছেন, কৃতিত্বের সঙ্গে বিএ-এমএ পাস করেছেন এবং অমুক সালের অমুক দিন হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা গেছেন। ফলে জাতির অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেছে। এভাবে তৈরি হয় গরুর রচনা। এরকম একটি রচনা আমি লিখতে চাইনি। আমি চেয়েছি এই দলের গল্প লিখতে, দলের মানুষদের জীবনের গল্প বলতে।

আমি প্রশ্নমালা তৈরি করে সাক্ষাৎকার নিই না। আমি কথা বলি, আড্ডা

দিই, কথা শুনি। কথা বলতে বলতেই জমে ওঠে আড্ডা আর আলাপচারিতা। আমি তাঁদের অনুমতি নিয়ে কথোপকথন রেকর্ড করি। টেলিভিশনের টক শোর সঞ্চালকেরা যেমন মাঝপথে কথা থামিয়ে নিজের পাণ্ডিত্য জাহির করেন, আমি তা করি না। আমি তো বলতে আসিনি, শুনতে এসেছি। মাঝেমধ্যে দু-একটা প্রশ্ন বা ক্লু ছুড়ে দেওয়া। ব্যস, এ পর্যন্তই।

এ ধরনের সাক্ষাৎকার অতীতে অনেক নিয়েছি। সব অভিজ্ঞতা সুখের ছিল না। তাঁরা অনেকে আমাকে সহজভাবে নেননি। কিছু জানতে চাইলে কেউ কেউ আমাকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করেছেন—আপনার উদ্দেশ্য কী; এটা কাদের প্রজেক্ট; আমি তো কিছু জানি না; আমি ওই সময় সেখানে উপস্থিত ছিলাম না; এটা আমার স্মরণ নেই; এসব কথা এখনো বলার সময় হয়নি; বলতে পারি, তবে আমাকে কোট করবেন না। এসব বাধা পেরিয়ে যেটুকু পাই তার মধ্যে অনেকটাই ব্যবহার করা যায় না। আমি বুঝতে পারি যে তাঁরা অবলীলায় মিথ্যা বলছেন, অতিরঞ্জন করছেন, অন্যকে খাটো করছেন, অনেক কিছু লুকাচ্ছেন। আমার মনে হয়েছে, তাঁরা অতীতে এমন কিছু করেছেন, যে জন্য এখন অপরাধবোধে ভুগছেন। সরল মনে একটি কাজ করে থাকলে অপরাধবোধ থাকার কথা না। বিশ বছর বয়সী তরুণ যে মন ও চোখ দিয়ে পৃথিবী দেখে, পঞ্চাশ বছর পর তাঁর দেখার চোখটা বদলে যেতে পারে। এটা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু পঞ্চাশ বছর আগে সে যা দেখেছিল তা তো মিথ্যা নয়। এখানে সমস্যা হলো বুড়ো মন দিয়ে তরুণ মনকে বিচার করতে যাওয়া। ওই সময়ে তিনি যে কাজটি করেছেন এখন হয়তো তিনি সেটি করবেন না। কিন্তু ওই বয়সে ঠিক মনে করেই তো তা করেছিলেন। আর তখন যদি তিনি জেনে-বুঝে খারাপ কাজটি করে থাকেন, তাহলে বলতে হয়, তিনি ষড়যন্ত্র করেছেন। এখন ধরা পড়ার ভয়ে সত্য লুকাচ্ছেন।

বলতে দ্বিধা নেই, এ বইটি লিখতে গিয়ে আমাকে সে রকম সমস্যায় পড়তে হয়নি। কাকতালীয়ভাবে এ দলের কয়েকজনের সঙ্গে আছে আমার পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা। এঁদের কেউ সমর্থক, কেউ সহানুভূতিশীল, কেউ শুরুর দিকের অ্যাকটিভিস্ট, কেউ পুরো সময় ধরে নেতৃত্বের শীর্ষ পর্যায়ে ছিলেন। আমি তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি, কথা বলেছি। এঁদের অনেকের সাক্ষাৎকার নিয়েছি। কারও কারও কাছ থেকে পেয়েছি লিখিত বয়ান। এঁদের একেকজনের অভিজ্ঞতা একেক রকম। বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা এবং তার

সবটাই গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে আমার কাছে। দলটিকে এবং যে সময়ে এই দলের বিস্তার হয়েছিল, সেই সময়কে বোঝার জন্য গল্পগুলো জানা দরকার।

তাঁরা মন খুলে কথা বলেছেন। তাঁরা অনেকেই অনেক কিছু জানেন না। গোপন সংগঠনে সবাই সবকিছু জানবে, এমন নয়। যা জানেন না, তা নিয়ে বাগাড়ম্বর করেননি। ফলে আমার কাজ সহজ হয়েছে। কয়েকজনের সঙ্গে টেলিফোনে কথা হয়েছে। কেউ কেউ তাঁদের ভাষ্য লিখে দিয়েছেন। এটাকে বলা যেতে পারে অংশগ্রহণমূলক গবেষণা। ইংরেজিতে আমরা বলি পার্টিসিপেটরি রিসার্চ। ১৯৭০ ও '৮০-এর দশকে এটি ছিল একটি জনপ্রিয় ধারা। এসব গবেষণায় অংশীজন বা স্টেকহোল্ডাররা তাঁদের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান দিয়ে নিজেরাই তথ্য-উপাত্ত তৈরি করেন। গবেষকের কাজ হলো সেগুলো সংকলন করে এক সূত্রে গাঁথা। এখানে আমি এ কাজটাই করেছি।

আমাদের সমাজজীবনে বীরত্ব আর ভীরুতা, আন্তরিকতা আর বিশ্বাসঘাতকতা, সরলতা আর শঠতা, ভালোবাসা আর ঘৃণা, প্রেম আর লাম্পট্য পাশাপাশি থাকে। এসব নিয়েই ব্যক্তি, সমাজ, রাজনীতি ও রাষ্ট্র। নিকট অতীতের কোনো ঘটনা অনাকাঙ্ক্ষিত মনে হলে আমরা তা সযত্নে এড়িয়ে যাই। সময় পেরিয়ে গেলে আমাদের শুচিবাই থাকে না।

আলেকজান্ডার বীর ছিলেন। তিনি অর্ধেক দুনিয়া জয় করেছিলেন। এটা আমরা বলি। আবার পররাজ্য জয় করতে গিয়ে তিনি লাখ লাখ মানুষকে খুন করেছেন, এ কথাও আমরা নির্ভয়ে বলতে পারি। কেননা, এটা বললে আলেকজান্ডারের সাঙ্গপাঙ্গরা আমাদের দিকে তেড়ে আসবে না। সম্রাট শাহজাহান প্রেমের সমাধিসৌধ তাজমহল বানিয়েছেন। আমরা এর নান্দনিকতার প্রশংসা করি, স্ত্রীর প্রতি তাঁর ভালোবাসার রূপ দেখে আপ্লুত হই। কিন্তু তিনি যে শত শত কারিগরের কবজি কেটে দিয়েছিলেন, যাতে তাঁরা আরেকটি তাজমহল বানাতে না পারেন, সেটি এখন বলা যায়। বললে বাদশাহ পেয়াদা পাঠিয়ে ধরে নিয়ে কতল করবেন সে ভয় নেই। নিকট অতীত কিংবা সাম্প্রতিক সময়ের চরিত্রগুলো নিয়ে আমাদের দেশে এরকম বলা বা লেখায় অনেক ঝুঁকি। তাঁরা কিংবা তাঁদের ভক্তকুল চোখের সামনেই হাঁটাচলা করছেন। কী বলতে কী বলে ফেলি আর ঘাড়ের ওপর খড়গ নেমে আসবে, সে ভয়ে আমরা হাত গুটিয়ে নিই। সমসাময়িক বিষয় ও চরিত্র নিয়ে ইতিহাস চর্চায় অনেক ঝুঁকি। সেজন্য অনেক কিছু লেখা যায় না, লেখা হয় না। না লেখার

পক্ষে যুক্তি দিয়ে কেউ কেউ বলেন, ইতিহাস তো লেখা হবে আরও অনেক পরে। দুই-তিনশ বছর পেরিয়ে গেলে নাকি নির্মোহ হওয়া যায়।

সমস্যা হলো, পরে লিখলে তথ্য পাব কোথায়? ধরুন, বাংলাদেশের জন্মকথা লিখতে হলে এর প্রধান চরিত্রদের বয়ান জানা জরুরি। তাঁরা তো নিজেরা কিছু লিখে যাননি। এখন তাঁদের উদ্ধৃত করে মনের মাধুরী মিশিয়ে নানাজনে গল্প ফাঁদছেন। ফলে তৈরি হচ্ছে অপ-ইতিহাস। বিষয়টি ভেবে দেখার মতো।

আমার লেখাটি সাজিয়েছি দুটি পর্বে। প্রথম পর্বে আছে ঘটনাক্রমের ন্যারেটিভ বা বিবরণ। এ পর্বে প্রকাশিত সূত্র ব্যবহৃত হয়েছে বেশি। এখানেই থেমে যাওয়া যেত। তাতে একটি নীরস রচনা তৈরি হতো। বাদ পড়ত জীবনের গল্প। তাই দ্বিতীয় পর্বটি আমি সাজিয়েছি তাঁদের কথা দিয়ে, যাঁরা নানাভাবে সর্বহারা পার্টির সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন। তাঁদের ভাষ্যে এই পার্টি সম্পর্কে এক ধরনের অন্তর্দৃষ্টি বা ইনসাইট পাওয়া যায়। দলটিকে বোঝার জন্য এটি খুব জরুরি। সিরাজ সিকদারের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের গোপন পরিক্রমার ভাঁজে ভাঁজে জমে উঠেছে অনেক জট। তাঁদের ভাষ্য ইতিহাসের এই জটগুলো খুলতে অনেকটা সাহায্য করে।

বইয়ে বেশ কিছু ছবি, দলিল ও চিঠি ব্যবহার করেছি। এগুলো দলের নানান সূত্র, ব্যক্তিগত সংগ্রহ এবং ইন্টারনেট থেকে নেওয়া। বিভিন্ন জায়গায় বানানে অসংগতি ছিল। এগুলো সমন্বয় করা হয়েছে। বইটি লিখতে গিয়ে অনেকের কাছ থেকে আশাতিরিক্ত সহযোগিতা ও সমর্থন পেয়েছি। এ ব্যাপারে সাংবাদিক সালিম সামাদ এবং অধ্যাপক নেহাল করিমের নাম উল্লেখ না করলেই নয়। আর যাঁরা সাক্ষাৎকার দিয়েছেন, তাঁরা তো এই চর্চার অংশীজন। তাঁদের ঋণ কখনোই শোধ হওয়ার নয়।

মহিউদ্দিন আহমদ
ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০২১
mohi2005@gmail.com

প্রথম পর্ব

পূ র্বা প র

জন্মকথা

ভারতের মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির শিলিগুড়ি কমিটি ১৯৬৫ থেকেই সশস্ত্র বিপ্লবের তত্ত্ব প্রচার করছিল। তারা কয়েকটি গ্রামে কৃষক কমিটি তৈরি করে। এখানকার কৃষকেরা প্রধানত আদিবাসী-সাঁওতাল। এদের বেশির ভাগই গরিব ভাগচাষি। জঙ্গল সাঁওতাল তাদের একজন নেতা।

১৯৬৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে বিধানসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। জঙ্গল সাঁওতাল নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি হেরে যান। তাঁর মনে হলো, স্থানীয় কৃষকদের সমস্যা ও দাবির পক্ষে যথেষ্ট সোচ্চার না হওয়ার কারণেই এ পরাজয়। তাঁর এই মত সমর্থন করেন সিপিআইএমের স্থানীয় নেতা চারু মজুমদার। চারু মজুমদার সংগঠন করতেন চা-শ্রমিকদের নিয়ে। তিনি বললেন, এভাবে হবে না। বেশির ভাগ কৃষক হলো বর্গাচাষি। বেশির ভাগ জমি জোতদারদের দখলে। তিনি প্রস্তাব দিলেন, জোতদারের জমি কেড়ে নিতে হবে। তাঁর সঙ্গে একমত হলেন সিপিআইএমের আরেক স্থানীয় নেতা কানু সান্যাল। এরপর দ্রুত পাল্টে যেতে থাকে পরিস্থিতি।

১৯৬৭ সালের ৩ মার্চ কয়েকজন বর্গাচাষি জোতদারদের কয়েকটি প্লটের জমি দখল করে ফসল কেটে নেয়। আশপাশের কয়েকটি গ্রামে কৃষক কমিটির নেতৃত্বে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। ১৮ মার্চ জোতদারদের লোকেরা ফসল কেটে নেওয়ার অপরাধে বিগুল কিষান নামের এক চাষিকে বেদম পেটায়। এর ফলে জোতদারদের সঙ্গে বর্গাচাষিদের সংঘর্ষ বেধে যায়।

পশ্চিমবঙ্গে তখন জোট সরকার। সিপিআইএম জোটের সঙ্গী। সিপিআইএমের নেতা জ্যোতি বসু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। সংঘর্ষ ততদিনে ছড়িয়ে পড়েছে শিলিগুড়ি জেলার তিনটি থানায়। সবচেয়ে উত্তপ্ত নকশালবাড়ি থানা।



চারু মজুমদার ও কানু সান্যাল

সাব-ইন্সপেক্টর সোনম ওয়াংদির নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল নকশালবাড়ি থানার ঝারগাঁও গ্রামে ঢুকে পড়ে। যারা জোর করে ফসল কাটছিল তাদের কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে। আশপাশের গ্রামের উত্তেজিত চাষিরা পুলিশের দলটিকে ঘিরে ফেলে, তির-ধনুক দিয়ে আক্রমণ করে। সাব-ইন্সপেক্টর ঘটনাস্থলেই নিহত হন। বাকিরা অস্ত্র ফেলে পালিয়ে যায়। চাষিরা অস্ত্রগুলো তুলে নেয় এবং পরে থানায় জমা দেয়।

পরে পুলিশের একটি বড় দল নকশালবাড়ি গেলে চাষিদের বাধার মুখে পড়ে। পুলিশ গুলি চালায়। দিনটি ছিল ২৫ মে ১৯৬৭। পুলিশের গুলিতে নয়জন নারী ও এক শিশু মারা যায়। নিহত নারীদের মধ্যে ছিলেন ধনেশ্বরী দেবী, সরুবালা বর্মণ, সোনামতি সিং, সীমাশ্বরী মল্লিক, নয়নেশ্বরী মল্লিক, সমশ্বরী সাইবানি, গয়দ্রু সাইবানি, ফুলমতি সিং ও খর সিং মল্লিক। তাঁদের নেত্রী ২৪ বছর বয়সী শান্তি মুন্ডা ১৫ দিনের শিশুকন্যাকে পিঠে বেঁধে লড়াইয়ে নেমেছিলেন। তিনি আত্মগোপনে চলে যান।

গ্রামের কৃষক কমিটির নেতৃত্বে চাষিরা নকশালবাড়ি, খড়িবাড়ি ও

ফাঁসিদেওয়া থানায় জোতদারদের ওপর হামলা করে তাদের জমি, ফসল ও অস্ত্রশস্ত্র দখল করে। তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসে দার্জিলিংয়ের চা-বাগানশ্রমিকরা। চারু মজুমদার সর্বাত্মক বিদ্রোহের আহ্বান জানান। ২৮ জুন চা-বাগানশ্রমিক ও সাঁওতালদের এক সমাবেশে তিনি সব জোতদারের জমি দখলের ডাক দেন। তিনি বলেন, জোতদাররা শ্রেণিশত্রু। তাদের রক্তে হাত না রাঙালে খাঁটি কমিউনিস্ট হওয়া যাবে না। জোতদার খতমের মাধ্যমে শ্রেণিসংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।

৫ জুলাই চিনের কমিউনিস্ট পার্টির পত্রিকা *পিপলস ডেইলি* একটি সম্পাদকীয় ছাপে। শিরোনাম, স্প্রিং থান্ডার ওভার ইন্ডিয়া—ভারতে বসন্তের বজ্রনির্ঘোষ। সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

> ভারতে বসন্তের বজ্রধ্বনি আছড়ে পড়েছে। দার্জিলিং এলাকার বিপ্লবী চাষিরা বিক্ষোভে ফেটে পড়েছে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির একটি বিপ্লবী গ্রুপের নেতৃত্বে সশস্ত্র গ্রামীণ বিপ্লবী লড়াইয়ের ফলে ভারতে একটি লাল এলাকা তৈরি হয়েছে। ভারতের জনগণের বিপ্লবী সংগ্রামের পথে এ এক বড় রকমের অগ্রগতি।

কমিউনিস্টদের শিলিগুড়ি গ্রুপ *পিপলস ডেইলির* এই সম্পাদকীয়কে একটি ইতিবাচক সমর্থন হিসেবে বিবেচনা করল। এর আগে চারু মজুমদার প্রকাশ করেছিলেন *আট দলিল*। এসব দলিলে রণনীতি ও রণকৌশল হিসেবে মাওবাদকে বোঝানো হয়েছিল। অষ্টম দলিলের শিরোনাম ছিল 'সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে কৃষকের লড়াই চালিয়ে যান।' এতে সংসদীয় রাজনীতি বর্জনের ডাক দেওয়া হয়েছিল। চারু মজুমদারের ভাষায়—ভারতের বিপ্লবের পর্যায় হলো জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব। চাষিদের স্বার্থে আমূল ভূমিসংস্কার করতে হবে। এটা হবে সশস্ত্র লড়াইয়ের মাধ্যমে। পার্লামেন্টের মাধ্যমে এটা করা যাবে না। কেননা, পার্লামেন্ট হলো শ্রেণিশত্রুর হাতে শোষণের একটি অস্ত্র।

উদ্ভূত পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে সিপিআইএমের কেন্দ্রীয় কমিটি একটি দলিল প্রকাশ করে। দলিলে মতাদর্শিক বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়। এ নিয়ে বেশ বিতর্ক হয়। দলের জম্মু-কাশ্মীর এবং অন্ধ্র রাজ্য কমিটি এটা গ্রহণ



শান্তি মুন্ডা

করতে অস্বীকার করে। কেন্দ্রীয় কমিটি শিলিগুড়ি জেলা কমিটি বাতিল করে দেয়। শিলিগুড়ি কমিটির ভিন্ন মতাবলম্বীরা সিপিআইএম নেতৃত্বকে নয়া-সংশোধনবাদী আখ্যা দিয়ে *দেশব্রতী* নামে একটি বাংলা সাপ্তাহিক বের করেন। তাঁরা ১৩ নভেম্বর ১৯৬৭ গঠন করেন বিপ্লবীদের সর্বভারতীয় সমন্বয় কমিটি—অল ইন্ডিয়া কো-অর্ডিনেশন কমিটি অব রেভল্যুশনারিজ (এআইসিসিআর)। আন্দোলন আরও জোরদার করেন তাঁরা। তৈরি করেন ছোট ছোট গেরিলা গ্রুপ। কিছুদিনের মধ্যেই জঙ্গল সাঁওতাল গ্রেপ্তার হন। আন্দোলনে ভাটা পড়ে। গেরিলারা অনেক জায়গায় আত্মসমর্পণ করেন।

সিপিআইএম নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করে যে সমন্বয় কমিটি তৈরি হয়েছিল, ছয় মাসের মাথায় সেখান থেকে তৈরি হয় নতুন দল। ১৯৬৮ সালের ১২ এপ্রিল সমন্বয় কমিটির সভায় নেওয়া এক প্রস্তাবে বলা হয়, ভারত হলো বড় জোতদার ও আমলা-মুৎসুদ্দি পুঁজিপতিদের রাষ্ট্র এবং সরকার মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের পা-চাটা। এর এক মাস পর, ১৪ মে, তাঁরা গঠন করেন সর্বভারতীয় কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের সমন্বয় কমিটি। আগে কমিটির যে নাম ছিল, এবার তাতে জুড়ে দেওয়া হলো



জঙ্গল সাঁওতাল

'কমিউনিস্ট' শব্দটি। দলের তাত্ত্বিক চারু মজুমদার শ্রেণিশত্রু খতমের ডাক দেন। তিনি বলেন, শ্রেণিসংগ্রাম ছাড়া, খতমের লড়াই ছাড়া গরিব চাষিদের মুক্তি আসবে না।

১৯৬৯ সালের পয়লা মে কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে এক সমাবেশে কানু সান্যাল দলের নতুন নাম ঘোষণা করেন, কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া (মার্ক্সিস্ট-লেনিনিস্ট)—ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী), সংক্ষেপে সিপিআইএমএল। ভারতের অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির নামের সঙ্গে মার্কসবাদী শব্দ যুক্ত করে ভারত-চিন যুদ্ধের পরে ১৯৬৪ সালে তৈরি হয়েছিল সিপিআইএম। ১৯৬৯ সালে দলের নামের সঙ্গে লেনিনবাদী শব্দ জুড়ে দিয়ে তৈরি হলো নতুন দল।

২

বাংলাদেশের কমিউনিস্টরা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অংশ ছিলেন। ১৯৪৭ সালে ভারত-ভাগের পর পূর্ববঙ্গ কমিউনিস্ট পার্টির আলাদা কমিটি হয়। তবে তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক দিক থেকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে তাঁদের ফারাক ছিল না। ভারতে কমিউনিস্ট পার্টির ভাঙন ধরলে এ দেশেও তার প্রভাব পড়ত এবং পার্টি ভাগ হতো।

বাংলাদেশে কমিউনিস্ট পার্টির সাংগঠনিক তৎপরতা ছিল অনেক বছর ধরে। ১৯৪৭ সালের ভারত-ভাগ নতুন বাস্তবতার জন্ম দেয়। ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চে কলকাতায় অনুষ্ঠিত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিআই) দ্বিতীয় কংগ্রেসে পূর্ববঙ্গ থেকে ১২৫ জন প্রতিনিধি অংশ নেন। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আসেন পাঁচজন। কলকাতা কংগ্রেসে যোগদানকারী পাকিস্তানি প্রতিনিধিরা আলাদা একটা বৈঠক করে সিদ্ধান্ত নেন, পাকিস্তানের জন্য আলাদা পার্টি তৈরি করবেন। তৈরি হলো পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি। পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে ভৌগোলিক দূরত্বের কারণে দলের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক করা কঠিন হয়ে পড়ে। স্বতন্ত্রভাবে কাজ করার জন্য পূর্ববঙ্গ প্রাদেশিক কমিটি তৈরি করা হয়। কমিটির নয়জন সদস্যের মধ্যে ছিলেন মণি সিংহ, খোকা রায়, নেপাল নাগ, বারীণ দত্ত প্রমুখ। সম্পাদক হন নেপাল নাগ।

১৯৫১ সালের মাঝামাঝি অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক কমিটির বর্ধিত সভায় মণি সিংহ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৫৬ সালে কলকাতায় পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির পূর্ব পাকিস্তান কমিটির প্রথম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। কংগ্রেসে সিদ্ধান্ত হয়, পূর্ব পাকিস্তান কমিটি পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির শাখা হিসেবে থাকবে না, আলাদাভাবে পূর্ব পাকিস্তানভিত্তিক কাজ করবে। এই কংগ্রেসে দুজন বিকল্প সদস্যসহ ১৫ জনের একটি কমিটি নির্বাচন করা হয়। কমিটিতে ছিলেন মণি সিংহ, খোকা রায়, অনিল মুখার্জি, বারীণ দত্ত, নেপাল নাগ, সুখেন্দু দস্তিদার, আলতাফ আলী, শহীদুল্লা কায়সার, মোহাম্মদ তোয়াহা, সরদার ফজলুল করিম, চৌধুরী হারুনুর রশিদ, আমজাদ আলী প্রমুখ। মণি সিংহ সম্পাদক হিসেবে বহাল থাকেন।

১৯৫৬ সালে মস্কোয় অনুষ্ঠিত সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২০তম কংগ্রেসের পর সোভিয়েত পার্টির সঙ্গে চিনের কমিউনিস্ট পার্টির দ্বন্দ্ব ও দূরত্ব তৈরি হয়। পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির দুজন সদস্য সুখেন্দু দস্তিদার ও মোহাম্মদ তোয়াহা চিনা পার্টির লাইন সমর্থন করেন। অন্যরা সোভিয়েত পার্টির লাইন আঁকড়ে থাকেন। এ নিয়ে দলের মধ্যে বিভেদ বাড়তে থাকে। ১৯৬৫ সালের এপ্রিল মাসে কমিউনিস্ট পার্টির ছাত্রসংগঠন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন দুভাগ হয়ে যায়। চিনপন্থীদের অংশটি রাশেদ খান মেননকে সভাপতি করে কমিটি তৈরি করে। সোভিয়েতপন্থী অংশটি মতিয়া চৌধুরীকে সভাপতি করে পাল্টা কমিটি বানায়। ছাত্র ইউনিয়নের দুই অংশ তখন থেকে মেনন গ্রুপ আর মতিয়া গ্রুপ নামে পরিচিত।

এর ধারাবাহিকতায় ১৯৬৬ সালের জুন মাসে কমিউনিস্ট পার্টিতে ভাঙন ধরে। সুখেন্দু দস্তিদার, মোহাম্মদ তোয়াহা, নজরুল ইসলাম, আবদুল হক, শরদিন্দু দস্তিদার ও দেলোয়ার হোসেনকে নিয়ে চিনপন্থীরা আলাদা কমিটি তৈরি করে। ১৯৬৭ সালের আগস্ট মাসে সিলেটে চিনপন্থী অংশের প্রথম জাতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। কংগ্রেসে 'জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য' শিরোনামে একটি দলিল নিয়ে আলোচনা হয়। দলিলটি গৃহীত হয়নি। চিনপন্থীরা নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি তৈরি করে। কমিটিতে থাকেন সুখেন্দু দস্তিদার, মোহাম্মদ তোয়াহা, আবদুল হক, অজয় ভট্টাচার্য, দেবেন সিকদার, আলাউদ্দিন আহমদ, হাবিবুর রহমান, নজরুল ইসলাম ও শরদিন্দু দস্তিদার। সম্পাদক হন সুখেন্দু দস্তিদার। কংগ্রেসে সশস্ত্র লড়াইয়ের মাধ্যমে বিপ্লবের ধারণাটি গ্রহণ করা হয়। আলাদাভাবে পরিচিতি দেওয়ার জন্য দলের নামের শেষে 'মার্কসবাদী' যোগ করা হয়। পরে মার্কসবাদীর সঙ্গে লেনিনবাদী শব্দটি জুড়ে দেওয়া হয়। এভাবেই যাত্রা শুরু করে ইপিসিপি (এমএল)। সবাই একমত হন, 'জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা' কায়েম করতে হবে।

চিনপন্থীদের মধ্যে এ সময় বেশ কয়েকটি উপদল মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ১৯৬৮ সালের এপ্রিল মাসে শামসুজ্জোহা মানিক, আমজাদ হোসেন, নুরুল হাসান, মাহবুব উল্লাহ এবং আবুল কাসেম ফজলুল হক তৈরি করেন 'পূর্ব বাংলার বিপ্লবী কমিউনিস্ট আন্দোলন।' নতুন এই দলের সম্পাদক হন আবুল কাসেম ফজলুল হক। তিনি একসময় চিনপন্থী ছাত্র ইউনিয়নের কোষাধ্যক্ষ

ছিলেন। তাঁরা স্বাধীন পূর্ব বাংলা রাষ্ট্র গঠনের কথা বলেন। তাঁদের মতে পূর্ব বাংলায় মৌলিক দ্বন্দ্ব হলো সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে পূর্ব বাংলার দ্বন্দ্ব, পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে পূর্ব বাংলায় দ্বন্দ্ব, কৃষকের সঙ্গে সামন্তবাদের দ্বন্দ্ব, পুঁজির সঙ্গে শ্রমের দ্বন্দ্ব, পুরুষের সঙ্গে নারীর দ্বন্দ্ব এবং ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের সঙ্গে জনগণের দ্বন্দ্ব।

আরেকটি উপদলের নেতৃত্বে ছিলেন দেবেন সিকদার এবং আবুল বাসার। তাঁরা পূর্ব বাংলাকে পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশ মনে করতেন। ১৯৬৮ সালের শেষের দিকে তাঁরা ইপিসিপির (এমএল) সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দেন।

অন্য একটি উপদলের নেতৃত্বে ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য আলাউদ্দিন আহমদ এবং পাবনা জেলা কমিটির নেতা আবদুল মতিন। তাঁদের মত হলো, কৃষিতে পুঁজিবাদী শোষণই প্রধান দ্বন্দ্ব। তাঁদের দুজনকে ১৯৬৮ সালের শেষ দিকে ইপিসিপি (এমএল) থেকে বহিষ্কার করা হয়। পরে দেবেন সিকদার ও আবুল বাসারের গ্রুপ এবং আলাউদ্দিন আহমদ ও আবদুল মতিনের গ্রুপ একসঙ্গে মিলে যায়। তাঁরা তৈরি করেন 'পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি'। এই দলের সম্পাদক হন দেবেন সিকদার।

কাজী জাফর আহমদ, হায়দার আকবর খান রনো, রাশেদ খান মেনন প্রমুখ আরেকটি উপদলের নেতৃত্বে ছিলেন। তাঁরা নিজেদের খাঁটি নকশালপন্থী মনে করতেন। নকশালপন্থীদের অনুকরণে ১৯৬৯ সালে তাঁরা তৈরি করেন 'কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি'। তাঁদের মতে, এটা পার্টি নয়, শ্রেণিসংগ্রামের মধ্য দিয়েই পার্টি গড়ে উঠবে।

দলের মধ্যে ভিন্ন একটি ধারার সূচনা করেন সিরাজুল হক সিকদার। তিনি ইপিসিপির (এমএল) নেতা ছিলেন না। ১৯৬৬-৬৭ সালে তিনি চিনপন্থী ছাত্র ইউনিয়নের ছয়জন সহসভাপতির একজন ছিলেন। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) কায়েদে আজম হল (এখন তিতুমীর হল) ছাত্রসংসদের সহসভাপতি হয়েছিলেন। তিনি তত্ত্ব দেন, দেশে কমিউনিস্ট পার্টি নামধারী সবাই 'সংশোধনবাদী'। তিনিই একমাত্র মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিপ্লবী। ১৯৬৮ সালে তিনি কয়েকজন সহযোগীকে নিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন 'পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন'।

নাফ নদীর পারে

সিরাজ সিকদারের জন্ম ১৯৪৪ সালে, শরীয়তপুর জেলার ভেদেরগঞ্জ উপজেলার লাকার্তা গ্রামে। শরীয়তপুর একসময় মাদারীপুরের অংশ ছিল। বরিশাল জিলা স্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং বরিশালের ব্রজমোহন কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাস করে তিনি ১৯৬৩ সালে ঢাকায় বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বুয়েট) ভর্তি হন। কলেজে থাকা অবস্থায়ই তিনি ছাত্রসংগঠনের কাজে কিছুটা জড়িয়ে ছিলেন। হয়েছিলেন কলেজ ছাত্রসংসদের সাংস্কৃতিক সম্পাদক। একই সংসদে ক্রীড়া সম্পাদক ছিলেন তোফায়েল আহমেদ, যিনি পরে গুরুত্বপূর্ণ রাজনীতিবিদ হয়ে ওঠেন।

বুয়েটে পড়ার সময় সিরাজ সিকদার পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের সংগঠক হন। ১৯৬৫ সালে সোভিয়েত ও চিনা লাইনে ছাত্র ইউনিয়ন বিভক্ত হলে তিনি চিনপন্থী অংশের সঙ্গে থাকেন। ওই সময় তাঁর মনোজগতে বড় রকমের বদল ঘটে। এ প্রসঙ্গে দুটি ঘটনার উল্লেখ করা যায়, যার মাধ্যমে তাঁর ব্যক্তিমানস ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মেলে।

সিকদারের উপলব্ধি হয়, মধ্যবিত্তসুলভ সনাতন ধ্যানধারণার খোলস থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। 'আমি' শব্দের অহংবোধ ছাড়তে হবে। জীবনে তিনি যত ছবি তুলেছিলেন, যেসব ছবি তাঁর সংগ্রহে ছিল, সব পুড়িয়ে ফেললেন। গোগ্রাসে গিলতে থাকলেন মাও সে তুংয়ের রচনা। সমাজের নানা অংশের মানুষের মধ্যে বৈষম্য তাঁকে পীড়িত করল।

সিকদার তখন পড়েন থার্ড ইয়ারে। ইদের ছুটিতে গেছেন গ্রামের বাড়ি। তাঁর মা ছিলেন সামন্ত পরিবারের মেয়ে। খুব দাপুটে। বাড়িতে অল্পবয়সী একটা কাজের মেয়ে। বয়স পনেরো-ষোলো হবে। নাম রওশন আরা। ওই গাঁয়েরই মেয়ে। আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে।



সিরাজ সিকদার

ঈদের দিন ভোরবেলা থেকে কাজ করছে মেয়েটি। দুপুর হয়ে গেছে। মেয়েটির কাজে বিরাম নেই। দেখে সিকদারের খারাপ লাগল। মাকে বললেন, মেয়েটাকে তুমি সারা দিন খাটাচ্ছ কেন? মা যে জবাব দিলেন, সিকদারের তা পছন্দ হলো না।

দুপুরের পর মেয়েটি আর নেই। তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। যেহেতু একই গ্রামে বাড়ি, সবাই ভাবল হয়তো বাড়িতে গেছে বা অন্য কারও বাড়িতে গিয়ে থাকতে পারে। কিন্তু তার ফিরতে এত দেরি হচ্ছে কেন? সিকদারের মা বেশ বিরক্ত। তিনি চিন্তায় পড়ে গেলেন।

বিকেল গড়িয়ে যায়। সূর্য ডুবুডুবু। পশ্চিমের আকাশ লাল হয়ে গেছে। ঠিক এ সময় মেয়েটিকে নিয়ে হাজির হলেন সিকদার, 'মা, এই যে তোমার পুত্রবধূকে নিয়া আসছি। এখন তাকে ইচ্ছামতো খাটাও।'

সিকদার আসলে কী করেছেন? তিনি মেয়েটাকে নিয়ে চলে গেছেন শহরে, কাজি অফিসে। সেখানে তাকে বিয়ে করেছেন। এখন সে আর কাজের মেয়ে নয়, বাড়ির বউ।

ঈদের ছুটি শেষ। রওশন আরাকে নিয়ে সিকদার চলে আসেন ঢাকায়।

তিনি ছিলেন কায়েদে আজম হলের (এখন তিতুমীর হল) আবাসিক ছাত্র। আজিমপুরে একটা বাসা ভাড়া নিলেন তিনি। স্ত্রীকে সেখানে রাখলেন। তিনি থাকতেন হলে। মাঝেমধ্যে বাসায় এসে থাকতেন।

১৯৬৫ সালের ১০ জুন কায়েদে আজম হল ছাত্রসংসদের নির্বাচনে ছাত্র ইউনিয়নের প্রার্থী হিসেবে সিরাজ সিকদার সহসভাপতি হন। ২-৩ জুন ১৯৬৬ ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সম্মেলনে তিনি সহসভাপতি নির্বাচিত হন।

১৯৬৭ সালে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে প্রথম বিভাগ পেয়ে পাস করেন সিরাজ সিকদার। ছাত্রজীবন শেষ। শুরু হয় আরেক জীবন।

২

সিরাজ সিকদার নতুন পথের সন্ধান করছেন। কিন্তু একা তো কিছু করা যায় না। দুনিয়ায় কোনো বড় কাজই কেউ একা করেননি। সঙ্গী দরকার। ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে তিনি বন্ধু ও সহযাত্রী খুঁজতে থাকলেন।

ছাত্র থাকাকালেই সিকদারের সঙ্গে সখ্য গড়ে ওঠে আকা মো. ফজলুল হকের। আকা নামটি নিয়ে অনেক সময় বিভ্রান্তি হয়। আকা শব্দটি এসেছে 'আগা' থেকে। আকা তাঁর মায়ের কাছে শুনেছেন, তাঁদের পূর্বপুরুষ এসেছেন ইরান থেকে। তাঁরা শিয়া মতাবলম্বীদের দলছুট। বাংলাদেশে এসে সুন্নি হয়ে গেছেন। ছিলেন ঢাকার নবাববাড়ির গৃহশিক্ষক। পরে চলে যান পাণ্ডববর্জিত গ্রামে। আকার মায়ের ভাষায়, এই গৃহশিক্ষক সম্ভবত ছাত্রীকে নিয়ে চম্পট দিয়েছিলেন।

আকা বুয়েটে পড়েন। তিনি সিকদারের দুই ব্যাচ জুনিয়র। থাকেন লিয়াকত হলে (এখন সোহরাওয়ার্দী হল)। চিনপন্থী ছাত্র ইউনিয়নের হল কমিটির সদস্য। দুজনের অন্তরঙ্গ আলাপে বেরিয়ে আসে তাঁরা পরস্পরের প্রতিবেশী এবং দূরসম্পর্কের আত্মীয়। সিকদারের গ্রামের বাড়ির এক গ্রাম দূরেই আকাদের গ্রাম। সিকদারের বাবা ছিলেন আকার বাবার ছাত্র। সিকদারের চাচাতো বোনকে বিয়ে করেছে আকার চাচাতো ভাই। সিকদারের বড় ভাই বাদশা আলম সিকদার আবার আকার মেজো ভাইয়ের সতীর্থ। একসঙ্গে বুয়েটে পড়েছেন।

সিকদার এবং আকা পরস্পরকে পছন্দ করেন। চিন্তার ক্ষেত্রেও তাঁদের মিল আছে। দুজনই মনে করেন, পূর্ব বাংলা হলো পাকিস্তানের উপনিবেশ।

সামিউল্লাহ আজমী পড়েন ঢাকার কায়েদে আজম কলেজে (এখন সোহরাওয়ার্দী কলেজ)। ইন্টারমিডিয়েট টেকনিক্যাল কলেজে পড়েন তাঁর ছোট ভাই রাজিউল্লাহ আজমী। তাঁরা অবাঙালি। উত্তরপ্রদেশ থেকে ঢাকায় এসেছেন ভারত ভাগের বলি হয়ে। সামিউল্লাহ এবং রাজিউল্লাহ চিনপন্থী ছাত্র ইউনিয়নের সংগঠক। ১৯৬৭ সালের পয়লা অক্টোবর কায়েদে আজম কলেজ শাখা ছাত্র ইউনিয়নের সম্মেলনে সামিউল্লাহ সাধারণ সম্পাদক হন। সভাপতি হয়েছিলেন নূর মোহাম্মদ খান। তাঁদের সঙ্গে সখ্য হলো সিরাজ সিকদারের। সিকদার তখন ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি।

সামিউল্লাহ-রাজিউল্লাহর বাবা চাকরি করেন রেল বিভাগে। তিনি ছিলেন স্টেশনমাস্টার। রাজিউল্লাহর সতীর্থ আনোয়ার হোসেন। ১৯৬৭ সালে উচ্চমাধ্যমিক পাস করে আনোয়ার ভর্তি হয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণরসায়ন বিভাগে। তাঁর বাবাও রেলের স্টেশনমাস্টার। আনোয়ারের সঙ্গে সিকদারের যোগাযোগ ও পরিচয় হলো।

সিকদারের সঙ্গে জুটে গেলেন ছাত্র ইউনিয়নের আরও কয়েকজন সদস্য। এঁদের একজন মুজিবুর রহমান। সবাই ডাকে কালো মুজিব। তিনি কায়েদে আজম কলেজে পড়েন। আরও পাওয়া গেল রাব্বী, মতিউর রহমান, আমানউল্লাহ ও এনায়েত হোসেনকে। এঁদের মধ্যে আমানউল্লাহ বুয়েটের ছাত্র। এনায়েত এসেছেন বরিশাল থেকে। তাঁরা সবাই ছটফট করছেন—কিছু একটা করতে হবে।

সিকদার চাকরি নিয়েছেন সিঅ্যান্ডবি ডিপার্টমেন্টে। এটি সরকারি প্রতিষ্ঠান। বিভিন্ন সরকারি ভবন নির্মাণের কাজ করে। মানুষ সিঅ্যান্ডবিকে মশকরা করে বলে 'চোর অ্যান্ড বাটপার'। চুরিচামারির নানা অভিযোগ এদের বিরুদ্ধে।

কিছুদিন কাজ করার পর সিঅ্যান্ডবি ছাড়লেন সিকদার। দ্য ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেড নামে একটা ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ছিল। এটি সরকারের নানা নির্মাণকাজে পরামর্শকের কাজ করত। এর মালিক মজিদ সাহেব। তখন অবকাঠামো তৈরির কাজ হচ্ছে অনেক। ইঞ্জিনিয়ারের চাহিদা বাড়ছে এসব প্রতিষ্ঠানে। তাদের লোভনীয় প্রস্তাব দিচ্ছে সবাই। প্রাইভেট ফার্মে সদ্য

পাস করা ইঞ্জিনিয়ারদের তখন বেশ দাম। তাঁদের বেতন-ভাতা ভালো। দ্য ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেডে যোগ দেন সিকদার। এই প্রতিষ্ঠান তখন কক্সবাজার-টেকনাফ রোডে কয়েকটি ব্রিজ-কালভার্ট তৈরির কাজ পেয়েছে। সিকদার সেখানে সাইট ইঞ্জিনিয়ারের দায়িত্ব পান। স্ত্রী রওশন আরাকে নিয়ে চলে যান কক্সবাজার। টেকনাফে তাঁর সাইট অফিস। সঙ্গে লাগোয়া থাকার জায়গা।

৩

সিকদারের সঙ্গীরা টেকনাফে যেতে চান। সিকদারও চান, তাঁরা আসুক। অনেক আলাপ-আলোচনা দরকার। প্রথমে গেলেন কালো মুজিব। সিকদারের সঙ্গে কথাবার্তা বলে ফিরে এলেন ঢাকায়। অন্যদের সঙ্গে বসে ঠিক করলেন, কবে যেতে হবে। নির্দিষ্ট দিনে সবাই একত্র হলেন। রওনা দেওয়ার ঠিক আগে আনোয়ার নিয়ে এলেন তাঁর বড় ভাই আবু সাঈদকে। বললেন, সাঈদও যাবেন। আজমী ভাইদের পরিচিত সাঈদ। আনোয়ার আর সাঈদের বড় ভাই আবু তাহের পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন। কথায় কথায় জানা গেল, আবু তাহেরও চান পূর্ব বাংলা স্বাধীন হোক।

সাঈদকে নিয়ে কারও কোনো সমস্যা থাকল না। ১৯৬৮ সালের মার্চ মাসের শেষের দিকে একটা নির্দিষ্ট দিনে তাঁরা পৌঁছে গেলেন টেকনাফ।

সিকদার তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে থাকেন গিলাতলি নামের একটা জায়গায়। অফিস আর বাসা একই কম্পাউন্ডে। স্ত্রী রওশন আরা সন্তানসম্ভবা। ঠিক হলো, সবাই যাবেন আরাকানে, নাফ নদী পেরিয়ে। ওখানে কমিউনিস্ট পার্টির ঘাঁটি আছে। তাদের সঙ্গে সলাপরামর্শ করতে হবে।

সিকদার আর মুজিব থেকে গেলেন গিলাতলি। বাকি নয়জন রওনা হলেন। তাঁরা হলেন সামিউল্লাহ আজমী, রাজিউল্লাহ আজমী, আনোয়ার হোসেন, আবু সাঈদ, আকা ফজলুল হক, আমানউল্লাহ, মতিউর রহমান, এনায়েত হোসেন ও রাব্বী।

আরাকানে তখন দুটি কমিউনিস্ট পার্টি। একটি হলো রেড ফ্ল্যাগ। এরা ট্রটস্কিবাদী। অন্যটি হোয়াইট ফ্ল্যাগ। এরা মাওবাদী। নয়জনের দলের সঙ্গে একজন গাইড। গাইড তাঁদের এক জায়গায় রেখে হোয়াইট ফ্ল্যাগের লোকদের

খুঁজতে বেরোলেন। যে ক্যাম্পে তাঁরা ছিলেন, সেখানে খাওয়াদাওয়ার ভালো ব্যবস্থা ছিল। রোজই বনমোরগের মাংস-ঝোল দিয়ে ভাত খেতেন।

এক সপ্তাহ পেরিয়ে গেছে। গাইডের দেখা নেই। বিরক্ত হয়ে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেন তাঁরা। স্থানীয় ভলান্টিয়াররা তাঁদের নাফ নদী পার করিয়ে দেন। তাঁরা ফিরে আসেন টেকনাফে। ততদিনে রওশনের একটি মেয়ে হয়েছে। সিকদার তার নাম রাখলেন শিখা।

রাব্বীর বাবা জেলা জজ। ছেলেকে কয়েক দিন না দেখে বাড়িতে হুলুস্থুল। টেকনাফে যাওয়ার আগে সিকদার, সামিউল্লাহ আর আকা ছাত্র ইউনিয়নের কয়েকজন নেতার সঙ্গে আলাপ করেছেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন মাহবুব উল্লাহ, মাহফুজ উল্লাহ, নুরুল হাসান (শিল্পী কামরুল হাসানের ভাই) এবং আবুল কাসেম ফজলুল হক। রাব্বীকে না পেয়ে তাঁর বাবা ছাত্র ইউনিয়নের নেতাদের শরণাপন্ন হন। মাহফুজ উল্লাহ জানতেন, তাঁরা টেকনাফে সিরাজ সিকদারের সঙ্গে আছেন। তিনি টেকনাফে গিয়ে রাব্বীকে ঢাকায় ফিরে যেতে বললেন। মাহফুজ উল্লাহ একাই ফিরলেন ঢাকায়। রাব্বী ফিরলেন দুদিন পর। অন্যরা সড়কপথে চট্টগ্রাম যান। সেখান থেকে ট্রেনে ঢাকায় ফিরে আসেন।

৪

শুরুটা হয়েছিল তাত্ত্বিক ভিত্তির খোঁজে একটি থিসিস লেখার মধ্য দিয়ে। 'মাও সে তুংয়ের দ্বন্দ্ব প্রসঙ্গে' (অন কনট্রাডিকশন) পুস্তিকাটি এ ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। থিসিসে তুলে ধরা হয়, কে শত্রু কে মিত্র। মূল বিষয় হলো, কৃষকদের সংগঠিত করে গেরিলাযুদ্ধের মাধ্যমে গ্রাম দখল করতে করতে একপর্যায়ে শহর ঘেরাও করে পূর্ব বাংলার জনগণের মুক্তি আনতে হবে।

দলে তখন সাকল্যে দশ-বারোজন। এদের একজন রাজিউল্লাহ আজমী। বিপ্লবের পথে তাঁদের প্রথম অভিযান টেকনাফ। রাজিউল্লাহর বয়ানে উঠে এসেছে তাঁদের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার কথা :

> দক্ষিণ ভিয়েতনামের গেরিলাযুদ্ধ এবং ভিয়েতকংদের বীরত্বের কথা শুনে আমরা মুগ্ধ। পাকিস্তানের সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করার

জন্য জঙ্গল আর পাহাড় দরকার। পিকিং থেকে প্রকাশিত *চায়না পিকটোরিয়ালের* পাতায় গেরিলাযুদ্ধ, জঙ্গলের মধ্যে ক্যাম্প আর সুড়ঙ্গ দেখে আমরা বিমোহিত। আমাদের নজরে তখন মাওয়ের নেতৃত্বে লং মার্চের স্মৃতি।

পূর্ব পাকিস্তানের (এখন বাংলাদেশ) দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের পরিবেশ গেরিলাযুদ্ধের জন্য যথাযথ। সিরাজ সিকদার একটা প্রাইভেট কোম্পানির চাকরি নিলেন সেখানে। কাজ হলো টেকনাফের কাছে সেতু বানানো। এর ভালো দিক হলো, সিকদারের জন্য নিয়মিত রোজগারের একটা পথ খুলে যাওয়া। সেখানে জঙ্গল এবং পাহাড় দুটোই আছে। এ ছাড়া খুব কাছেই বার্মা (মিয়ানমার)। সাপ্তাহিক *পিকিং রিভিউ* ম্যাগাজিনের তথ্য অনুযায়ী সেখানে কমিউনিস্টরা গড়ে তুলেছে বিশাল মুক্তাঞ্চল। আমরা তো এসব কথা অক্ষরে অক্ষরে বিশ্বাস করি।

সিকদারকে জানিয়ে আনোয়ার ও আমি বিস্ফোরকের ওপর জ্ঞানার্জনের সিদ্ধান্ত নিলাম। এ নিয়ে কিছু পড়াশোনা করে গেলাম পুরান ঢাকায়। সেখান থেকে কিছু সালফার, ফিউজ আর এক মিটার লম্বা লোহার একটা ব্যারেল কিনলাম। ওয়েল্ডিং করে ব্যারেলের মুখ বন্ধ করে তাতে ড্রিল করে একটা ছিদ্র তৈরি করলাম। তারপর আমরা সিকদারের রামপুরার দোতলা বাসার একতলায় আমাদের অস্ত্র পরীক্ষায় বসলাম। দোতলায় সিকদারের পরিবার থাকত। তিনি ইতিমধ্যে টেকনাফে চলে গেছেন। তাঁর স্ত্রী রওশন আরা তখনো রয়ে গেছেন এ বাসায়। তিনি শিগগিরই যাবেন। তিনি জানেন আমরা এখন কী কাজে ব্যস্ত।

আমরা একতলায় বসে রাসায়নিকের নানান মিশ্রণ দিয়ে কয়েকবার বিস্ফোরণ ঘটাই। ধীরে ধীরে আওয়াজ বাড়ে। আমরা মিশ্রণের অনুপাত এবং তার ফলাফল একটা খাতায় লিখি। আওয়াজ শুনে দোতলা থেকে সিকদারের পরিবারের লোকেরা জানতে চায়, এত শব্দ কিসের। রওশন আরা বলেন, ও কিছু না।

কয়েক দিন পর কমরেড মুজিব রওশন আরাকে নিয়ে টেকনাফে পৌঁছে দেন। সিকদার তাঁকে প্রথমে তাঁর স্ত্রীর ভাই হিসেবে আমাদের

সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। আমাদের সন্দেহ হয়। মুজিবের গায়ের রং কালো। রওশন আরা ফরসা। মুজিবকে পরে কালো মুজিব হিসেবে ডাকা হতো।

দুসপ্তাহ পর আমরা বসন্তের এক দিনে মুজিবের সঙ্গে টেকনাফে যাই। সিকদারের অফিসের গেস্ট হাউসে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়। তাঁর সহকর্মীদের জানানো হয়, আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জুওলোজি আর সমাজসেবা বিভাগের ছাত্র। একটা জরিপের কাজে টেকনাফে এসেছি।

আমরা আশপাশের ধানক্ষেত দেখতে বের হই। কৃষকদের সঙ্গে কথা বলি। তাদের শোষণের তত্ত্ব বোঝাই। উৎপাদন সম্পর্ক আর উদ্বৃত্ত মূল্য ব্যাখ্যা করি। তারা অবাক বিস্ময়ে শোনে। তারা কিছু বুঝেছে বলে মনে হয় না। এটা ছিল একটা হতাশাজনক অভিজ্ঞতা। মা ডেকেছেন বলে প্রথমেই দল ছেড়ে পালাল রফিক। আমরা তখনো বিপ্লবী চেতনায় টগবগ করছি।

কয়েক দিন পর ঠিক হলো, পাহাড়ে সুড়ঙ্গ কাটতে হবে। সিকদার নিজেই রাতে আমাদের নিয়ে রওনা হলেন। পাহাড়-জঙ্গল-খাল পেরিয়ে আমরা একটা উপত্যকার কাছে পৌঁছালাম। তিন দিকে পাহাড়। সামিউল্লাহ আজমীকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে সিকদার ফিরে গেল টেকনাফ।

আমরা ক্যাম্প তৈরি করলাম। সঙ্গে আনা রুটি-বিস্কুট খেয়ে একটু চাঙা হলাম। তারপর শুরু করলাম সুড়ঙ্গ খননের কাজ। এটা যে কত কঠিন, তা আগে আন্দাজ করতে পারিনি। পাহাড়ের শক্ত পাথুরে মাটি কাটতে গিয়ে কয়েক ঘণ্টা পর আমাদের হাতের তালু ফুলে গেল। মাংসপেশিতে জ্বলুনি শুরু হলো। আমরা বুঝলাম, এটি অবাস্তব কাজ, করা যাবে না।

অন্ধকার রাত। তুমুল বৃষ্টি হলো। আমরা সবাই ভিজে জবজবে। প্রচণ্ড ঠান্ডা। আমরা বিভ্রান্ত। কয়েকটা কুড়াল, কোদাল আর রান্নাঘরের ছুরি সম্বল করে শুধু বিপ্লবী জোশ দিয়ে যে এসব করা যাবে না, এর একটা পরীক্ষা হয়ে গেল।

আমরা গেস্ট হাউসে ফিরে এলাম। পরদিন সিকদারকে বললাম

আমাদের অভিজ্ঞতার কথা। আমাদের রণকৌশল নিয়ে ভাবতে হবে। সিকদার আর সামিউল্লাহ এটা ঠিক করবে। আমরা আছি বিপ্লবের সঙ্গে।

আমরা নজর দিলাম পূর্ব দিকে, বার্মার দিকে। সেখানে কমিউনিস্ট পার্টি আছে। নাফ নদীর ওপারে যুদ্ধরত কমরেডদের সাহায্য দরকার আমাদের।

টেকনাফের পাহাড়ে টানেল ওয়ারফেয়ারের স্বপ্ন মিলিয়ে যেতে না-যেতেই উদ্যোগ নেওয়া হলো আরেক রোমাঞ্চকর মিশনের। এবার নজর নাফ নদীর পূর্ব দিকে, আরাকানে। রাজিউল্লাহ আজমীর ভাষ্যে উঠে এসেছে তার চমকপ্রদ বিবরণ :

টেকনাফের গেস্ট হাউসে আমরা একটা সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করছি। দেখলাম আমাদের অপরিচিত এক ব্যক্তির সঙ্গে সিরাজ সিকদার আর সামিউল্লাহ আজমীর সলাপরামর্শ চলছে। লোকটি আরাকানের রোহিঙ্গা নৃ-গোষ্ঠীর। বার্মার কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে তার নাকি যোগাযোগ আছে। সে আমাদের বার্মিজ কমরেডদের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিতে রাজি হলো।

রাতে দু-তিন কিলোমিটার চওড়া বিপজ্জনক নাফ নদী পেরিয়ে ওপারে যাওয়ার প্রস্তুতি নেওয়া হলো। দুটি সাম্পানে করে আমরা রওনা দিলাম। জায়গাটা সিকদারের বাসার কাছে এবং মোহনা থেকে দূরে নয়। আমি এবং আমার ভাই সামিউল্লাহ সাঁতার জানি না। এ ছাড়া যেকোনো মুহূর্তে সীমান্তরক্ষীদের হাতে ধরা পড়ার আশঙ্কা।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পর আমরা ওপারে পৌঁছলাম। খুব খিদে পেয়েছিল। সঙ্গে ছিল শুকনো খাবার। চাপাতি, গুড় আর চা। সিকদারের স্ত্রী রওশন আরা এসব গুছিয়ে দিয়েছিল। আমাদের নিয়ে যেতে কয়েকজন এসেছিল। তারা এই খাবারে ভাগ বসিয়ে উদরপূর্তি করে চলে গেল। কিছুক্ষণ পরেই তারা ফিরে এসে আমাদের নিয়ে গেল এক শ মিটার দূরে একটা উপত্যকায়। তারপর তারা হাওয়া।

দুপুরে কয়েকজন গ্রামবাসী আমাদের জন্য বাড়িতে রান্না করা ভাত

আর সুস্বাদু মুরগির মাংস নিয়ে হাজির। তারা আমাদের দেখে চোখ চাওয়াচাওয়ি করছিল। তারা আমাদের রাতের খাবারও খাওয়াল। কোনো কথাবার্তা নেই। তৃতীয় দিন তারা মুখ খুলল। তারা জানতে চায়, আমরা এমন খারাপ লোকের পাল্লায় কীভাবে পড়লাম! তাদের কথায় বুঝলাম, আমরা আসলে বার্মিজ কমিউনিস্ট মনে করে ডাকাত দলের হাতে পড়েছি।

যারা আমাদের নিয়ে এসেছিল, তাদের চলাফেরা ছিল সন্দেহজনক। অন্ধকারে কেউ এলেই তারা জিজ্ঞেস করত, ইক খন (তুমি কে)? সঠিক জবাব হতো, যদি বলত, ইক রশিদ (আমি রশিদ)। দ্বিতীয় বা তৃতীয় সন্ধ্যায় গ্রামবাসীরা এসে বলল, ডাকাতরা আমাদের ওই রাতেই অন্য কোথাও নিয়ে যাবে। তারা আমাদের নিরাপদে টেকনাফে ফিরে যেতে সাহায্য করতে চায়। তাদের বেশ সাহসী মনে হলো, যদিও লাঠি ছাড়া অন্য কোনো অস্ত্র নেই তাদের। তারা আমাদের তাদের গ্রামে যেতে বলল। গ্রামের মহিলারা আমাদের আশীর্বাদ করতে চায়, যাতে আমরা নিরাপদে ফিরে যেতে পারি। আবু সাঈদ ওরফে জামান তাদের সঙ্গে গ্রামে গেল। ফিরে এসে সে বলল, আমাদের আসন্ন বিপদের কথা বুঝতে পেরে মহিলারা কান্নাকাটি করছিল।

রাতেই আমরা রওনা দিলাম। নাফ নদীর পারে নৌকা ভেড়ানো। একজন মাঝিকে জাগানো হলো, আমরা নৌকায় উঠে নদী পার হলাম। এপারে না পৌঁছা পর্যন্ত গ্রামের লোকেরা ওপারে ঠায় দাঁড়িয়ে ছিল। দুকিলোমিটার হেঁটে পৌঁছলাম সিকদারের ডেরায়। তাকে জানালাম মিশন ব্যর্থ হয়েছে।

আমরা আলোচনায় বসলাম। ঠিক হলো, আমাদের শ্রেণিচেতনা আরও শাণিত করতে হবে। এ জন্য আমাদের কারখানার শ্রমিকদের সঙ্গে থাকতে ও কাজ করতে হবে। তারাই প্রকৃত সর্বহারা। চট্টগ্রামেই এটা সম্ভব।

সামিউল্লাহর নেতৃত্বে আমরা চট্টগ্রামে একটা সস্তা হোটেলে উঠলাম। পরদিন সকালে দেখি কমরেড মতিউর রহমানের বিছানা শূন্য। সে একটা চিরকুট লিখে রেখে গেছে, 'যথেষ্ট হয়েছে'। এরপর

দলত্যাগীর সংখ্যা বাড়তে থাকল। আমরা একজন দোকানদারের শূন্য দোকানে গিয়ে উঠলাম। আমাদের পরিচয় হলো ঢাকা থেকে আসা শ্রমিক।

আমাদের চালচলন দেখে দোকানদারের সন্দেহ হলো। সে দেখল তাকের মধ্যে রাখা আছে মার্কস, লেনিন আর মাওয়ের বই। পরে শ্রমিক কলোনিতে গিয়ে তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বললাম। শ্রেণিসংগ্রামের কথাবার্তায় তারা খুব একটা উদ্দীপ্ত হলো না। আমাদের কোনো চাকরি নেই, রুটি-রুজির ব্যবস্থা নেই। কয়েক দিন পর মনে হলো ঢাকায় ফিরে যাওয়া উচিত। সিকদারের সঙ্গে পরামর্শের জন্য আমি টেকনাফে গেলাম। সিকদারের সঙ্গে কথাবার্তা বলে ঠিক হলো, আমরা ঢাকায় ফিরে যাব। এভাবেই আমাদের বিপ্লবের স্বপ্নযাত্রা থেমে গেল।

চেয়ারম্যান মাও কি বলেননি, হাজার মাইলের লং মার্চ তো শুরু হয় এক কদম ফেলে? বিপ্লবে বিশ্বাস আর সিকদারের নেতৃত্বে আস্থা রেখে নিশ্চয়ই আমরা একদিন সফল হব।

ওই সময় মনে হলো, বিপ্লবের দীর্ঘ যাত্রাপথ থেকে কিছুদিনের জন্য বিরাম নেওয়া যায়। আমি পরিবারের কাছে ফিরে যাওয়া এবং লেখাপড়া শুরু করার কথা ভাবলাম।

তবে সবাই টেকনাফ ছেড়ে চট্টগ্রাম যাননি। সাঈদ থেকে যান। কয়েকদিন পর তিনি একাই রওনা দেন আরাকানের উদ্দেশে। তাঁর কৌতূহল বেশি। আরাকানে কয়েকদিন থেকে তিনি হোয়াইট ফ্ল্যাগের সঙ্গে যোগাযোগ করতে সক্ষম হন। তাদের কাছ থেকে তিনি একটা চিঠি সংগ্রহ করেন। ফিরে এসে চিঠিটা সিকদারকে না দিয়ে নিজের কাছে রেখে দেন। তাঁর উদ্দেশ্য চিঠিটা দেবেন তাঁর বড় ভাই আবু তাহেরকে।

আবু সাঈদ ইতিমধ্যে দুবার গেছেন আরাকানে। সাঈদকে তাঁর বড় ভাই আবু তাহের আবারও আরাকানে পাঠান একটা ঘাঁটি তৈরির সম্ভাব্যতা যাচাই করে দেখতে। সাঈদ আরাকানে গিয়ে মাস তিনেক ঘোরাফেরা করেন। সেখান থেকে চলে যান কলকাতায়। তিনি নকশালবাড়ি যাওয়ার পরিকল্পনা করেন। কিন্তু কোনো নির্ভরযোগ্য সঙ্গী না পেয়ে দেশে ফেরার সিদ্ধান্ত নেন।

ফেরার পথে তিনি ভারতীয় নিরাপত্তাবাহিনীর হাতে গ্রেপ্তার হয়ে তিন মাস বন্দি ছিলেন আলীপুর জেলে।

সিরাজ সিকদারের সঙ্গীদের আরাকান মিশন সফল হয়নি। তিনি চেয়েছিলেন, পারস্পরিক যোগাযোগের ভিত্তিতে ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টির সঙ্গে সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তুলতে। এ নিয়ে তিনি একটি কবিতা লিখেছিলেন। পরে এটা নিয়ে গানও তৈরি করেছিলেন।

ওপারে বার্মা
আরাকানের সবুজ পাহাড়ের সারি
উঁচু হাতে মিশে গেছে আকাশে।
ওই পাহাড় আর জনপদে
লড়ছে বার্মার ভ্রাতৃপ্রতিম কমরেডরা।
কবে হবে যোগাযোগ তাদেরই সাথে। ...
এপারে টেকনাফ হ্নীলা-গিলাতলি
পাহাড়-ঝরনা বন-হাতি-সাপ।
আর সমুদ্রতট ছোট্ট সমভূমি
নিপীড়িত কৃষক সুদখোর মহাজন
কালোবাজারি-জমিদার।
আমরাও কাজ করছি এপারে অনভিজ্ঞ নতুন।

৫

ঠিকাদারি ফার্মের কাজ ছেড়ে দেন সিরাজ সিকদার। আবার নেন সরকারি চাকরি। পেশা শিক্ষকতা। যোগ দেন টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজের ইন্সট্রাক্টর হিসেবে। কলেজটি ঢাকার তেজগাঁওয়ে। দেশে কয়েকটি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট আছে। সেখানে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা কোর্স পড়ানো হয়। ডিপ্লোমা কোর্সের হবু শিক্ষকরা হলেন সিকদারের ছাত্র। ছাত্রদের মধ্যে তিনি সহযাত্রী খোঁজেন। পেয়ে যান দুজনকে, নাজির এবং কাদের।

আকা তখনো বুয়েটের ছাত্র। থাকেন লিয়াকত হলে। সিকদার সেখানে যান

মাঝেমধ্যে। সিকদারের বাবা সপরিবার থাকেন ঢাকার খিলগাঁওয়ে। সেখানে সিকদার, সামিউল্লাহ, রাজিউল্লাহ আর আকা প্রায়ই বসেন, কথাবার্তা বলেন। আলাপের বিষয় একটাই—কিছু একটা করতে হবে।

টেকনাফে যাওয়ার আগে আবুল কাসেম ফজলুল হক, মাহবুব উল্লাহ আর নুরুল হাসানের সঙ্গে কথা হয়েছিল, নতুন কিছু করলে তাঁরা সমর্থন দেবেন, সঙ্গে থাকবেন। টেকনাফে যাওয়ার পর সিকদারদের নিয়ে ছাত্র ইউনিয়নের মধ্যে কানাঘুষা হয়। নানা ধরনের কথাবার্তা হয়। ছাত্র ইউনিয়নের মধ্যে তৈরি হয় অস্বস্তি, টানাপোড়েন। আবুল কাসেম ফজলুল হক আর মাহবুব উল্লাহ সিকদারের সঙ্গে আর থাকেননি।

সিকদারকে ঘিরে তৈরি হওয়া ছোট গ্রুপটি খিলগাঁওয়ের বাসায় একত্র হয় মাঝেমধ্যে। ১৯৬৮ সালের মে মাসের দিকে তাঁরা সিদ্ধান্ত নেন, নতুন দল বানাবেন। দলের নামও ঠিক হয়—'পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন'। নামটিতে অভিনবত্ব আছে। দেশে তখন অনেক রাজনৈতিক দল—আওয়ামী লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলাম, কমিউনিস্ট পার্টি। সব দলের নামে উর্দু-আরবি-ইংরেজি মেশানো। প্রথমবারের মতো সম্পূর্ণ বাংলা ভাষায় একটি রাজনৈতিক দলের নাম রাখলেন সিরাজ সিকদার ও তাঁর সহযোগীরা।

তাঁরা দল তৈরির চিন্তা করছিলেন ১৯৬৮ সালের শুরু থেকেই। টেকনাফ থেকে ফিরে এসে সিকদার এ ব্যাপারে আরও উদ্যোগী হন। আরাকান মিশন সফল হয়নি। কিন্তু কমিউনিস্ট ধাঁচের একটি দল তৈরি করার ক্ষুধা থেকেই যায়। এটি মোটামুটি দানা বাঁধে ১৯৬৮ সালের মাঝামাঝি। তার ফলে জন্ম নিল পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন। এ নিয়ে পরে দলের পক্ষ থেকে যে প্রচারপত্র ও দলিল প্রকাশ করা হয়েছে, সেখানে দলের জন্মতারিখটি এগিয়ে এনে ৮ জানুয়ারি রাখা হয়।

সবাই একমত হন, এটি হবে গোপন সংগঠন। দলে যাঁরা থাকবেন, ছদ্মনাম ব্যবহার করবেন। এভাবেই সিরাজ সিকদার হলেন রুহুল আলম। সামিউল্লাহ আজমী হয়ে গেলেন রুহুল আমিন। রাজিউল্লাহ আজমীর নতুন নাম হলো রুহুল কুদ্দুস। আকা ফজলুল হকের নাম হলো রানা। এঁরাই নতুন দলের নিউক্লিয়াস। নেতা সিরাজ সিকদার। তাঁর পদবি সম্পাদক। সামিউল্লাহ আজমী তাঁর প্রধান সহকারী।

দল থাকলে দলের একটি বক্তব্য থাকতে হয়। সব দলেই একটি ঘোষণাপত্র বা ম্যানিফেস্টো থাকে। পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের জন্য লেখা হলো একটা 'থিসিস'। সিরাজ সিকদার এটি লিখলেন ইংরেজিতে। বাংলা তরজমা করলেন সামিউল্লাহ। সিকদার এটি সম্পাদনা করলেন। দলের গঠনতন্ত্র বানানোর দায়িত্ব নিলেন সিকদার। এ দুটি দলিল ছাপানোর দায়িত্ব পড়ল রানার ওপর।

অধ্যাপক আবদুর রশিদ তখন বুয়েটের ভাইস চ্যান্সেলর। তাঁর অফিসে একটি সাইক্লোস্টাইল মেশিন ছিল। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ও অন্যান্য বিজ্ঞপ্তি টাইপ করে বা হাতে লিখে এই মেশিনে কপি করা হতো। দলের দলিল প্রকাশ করার জন্য রানা ওই মেশিন ব্যবহার করলেন। কাজটি হলো গোপনে। অধ্যাপক রশিদের অনুমতি নিয়েই এটা করা হয়েছিল। তিনি আপত্তি করেননি।

৬

বুয়েটের লিয়াকত হলের পশ্চিম ব্লকের ৪০৬ নম্বর কামরা। এই কামরায় তিনটি সিট। রানা থাকেন এই কামরায়। তিনি পড়েন থার্ড ইয়ারে। তাঁর কামরাটি হয়ে ওঠে যোগাযোগের কেন্দ্র। কিন্তু এত ছাত্রের ভিড়ে গোপনীয়তা রক্ষা করে কাজ করা, কথা বলা কঠিন হয়ে পড়ে। কে আসছে. কে যাচ্ছে, সহজেই অন্যের নজরে পড়ে।

সিদ্ধান্ত হলো, আলাদা একটা অফিস নেওয়া হবে। মালিবাগের মোড়ে, রেললাইনের কাছাকাছি একটা বাসা ভাড়া নিলেন রানা। একতলা ছোট বাসা। ইটের দেয়াল, টিনের চাল। অফিসের নাম দেওয়া হলো মাও সে তুং চিন্তাধারা গবেষণাকেন্দ্র। একটা বুকশেলফে মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন আর মাওয়ের কিছু বই রাখা হলো। দলের সদস্য, কর্মী ও সহানুভূতিশীলরা সেখানে যান, বৈঠক করেন। ওখানে পাঠচক্র বসে। এটা হলো ১৯৬৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসের কথা।

গবেষণাকেন্দ্র নাম শুনে ছাত্র ইউনিয়নের কেউ কেউ ভুরু কোঁচকান। গবেষণা আবার কী? অ, ওরা বুঝি ল্যাবরেটরি বানিয়েছে! ল্যাবরেটরিতে

তো টেস্টটিউব ব্যবহার করে গবেষণা-টবেষণা হয়। ওরা তাহলে টেস্টটিউব পার্টি! বিদ্রূপ করে তারা এসব বলে। একসময় চাউর হয়ে যায়—টেস্টটিউব পার্টি।

১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ পাকিস্তানে জারি হয় সামরিক শাসন। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানকে হটিয়ে ক্ষমতায় আসেন জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান। গবেষণাকেন্দ্রটি গুটিয়ে ফেলা হয়।

স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র

টেকনাফ যাওয়ার আগে থেকেই পূর্ব বাংলার চালচিত্র এবং কমিউনিস্টদের লক্ষ্য ও কাজ কী হবে, এ নিয়ে একটি দলিল তৈরির কথা ভাবছিলেন সিরাজ সিকদার। কাজ চলল ১৯৬৮ সালের নভেম্বর পর্যন্ত। পয়লা ডিসেম্বর তারিখ বসিয়ে তিনি উপস্থাপন করলেন 'পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের থিসিস'। চার প্যারাগ্রাফের ভূমিকায় মাও সে তুংকে উদ্ধৃত করে লিখলেন—অতীতের ভুলগুলো অবশ্যই জানিয়ে দিতে হবে। যা কিছু ভুল, তাকে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা ও সমালোচনা করা দরকার, যাতে ভবিষ্যতে আরও ভালোভাবে কাজ করা যায়। অতীতের ভুল থেকে শিখে এড়াতে হবে ভবিষ্যতের ভুল। বিরাজমান পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে ভূমিকায় বলা হলো :

> স্বাধীনতা-উত্তরকালে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি কেন ব্যর্থ হলো উপনিবেশবাদ ও সামন্তবাদবিরোধী সংগ্রাম পরিচালনা করে সমাজতন্ত্রের পথ তৈরি করতে? এ ব্যর্থতার কারণগুলো ক্ষমাহীনভাবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে উদ্‌ঘাটন করতে হবে, যাতে একই ভুল ভবিষ্যতে না হয় এবং মার্কসবাদী, লেনিনবাদী, মাও সে তুং চিন্তানুসারীরা সক্ষম হন তাঁদের ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনে।

থিসিসে ১৯৪৭-পরবর্তী সময়ে সমাজে চারটি দ্বন্দ্বের কথা উল্লেখ করা হয়। দ্বন্দ্বগুলো হলো, ১. পূর্ব বাংলার জনগণের সঙ্গে পাকিস্তানি উপনিবেশবাদের জাতীয় দ্বন্দ্ব; ২. পূর্ব বাংলার কৃষকের সঙ্গে সামন্তবাদের দ্বন্দ্ব; ৩. পূর্ব বাংলার জনগণের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদ, বিশেষ করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের, সংশোধনবাদ, বিশেষ করে সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের এবং ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের



মাও সে তুং

জাতীয় দ্বন্দ্ব; ৪. পূর্ব বাংলার বুর্জোয়া শ্রেণির সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণির দ্বন্দ্ব।

মাওকে উদ্ধৃত করে বলা হলো, কোনো সমাজে যদি একাধিক দ্বন্দ্ব থাকে, তাহলে একটি হবে প্রধান দ্বন্দ্ব, যা হলো মুখ্য। অন্য দ্বন্দ্বগুলো তখন গৌণ। প্রধান দ্বন্দ্বকে বিবেচনায় নিলে সব সমস্যার সহজ সমাধান হয়ে যায়। থিসিসে উল্লেখ করা চারটি দ্বন্দ্বের মধ্যে প্রথমটিকেই প্রধান দ্বন্দ্ব হিসেবে দেখতে হবে। 'বর্তমান সামাজিক প্রক্রিয়ায় পূর্ব বাংলার জনগণের সঙ্গে পাকিস্তানি উপনিবেশবাদের জাতীয় দ্বন্দ্ব প্রধান দ্বন্দ্ব। ... এই প্রধান দ্বন্দ্বের ভিত্তিতে নতুন করে ঐক্যফ্রন্ট প্রতিষ্ঠা করে জনগণকে সঠিক মুক্তি সংগ্রামের পথে পরিচালনা করতে হবে।' পূর্ব বাংলার বিপ্লব ও তার চরিত্র সম্বন্ধে থিসিসে বলা হলো, সামন্তবাদের অবসান সম্ভব জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে। কাজেই পূর্ব বাংলার বিপ্লব হবে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব।

থিসিসে দুটি বিষয় তুলে ধরা হয়, যা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ :

১. জাতীয় পতাকা উর্ধ্বে তুলে ধরে জাতীয় সংগ্রামের ভিত্তিতে ঐক্যফ্রন্ট তৈরি করতে হবে;

২. শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর ভিত্তিতে সর্বহারা শ্রেণির নেতৃত্বে পাকিস্তান উপনিবেশবাদবিরোধী সব দেশপ্রেমিক শ্রেণিকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে।

থিসিসে বেশ কয়েকটি বিষয়ে নতুনত্ব ছিল। পাকিস্তান তৈরি হওয়ার পর এ ভূখণ্ডে যত রাজনৈতিক দল ও তাদের অঙ্গসংগঠনের জন্ম হয়েছে, তাদের নামের সঙ্গে পাকিস্তান বা পূর্ব পাকিস্তান শব্দটি বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। পূর্ববঙ্গ প্রদেশ আনুষ্ঠানিকভাবে পূর্ব পাকিস্তান হয় ১৯৫৬ সালের সংবিধানের ভিত্তিতে। এর আগে পূর্ব পাকিস্তান শব্দটির আইনগত ভিত্তি ছিল না। তখন অনেকেই পাকিস্তানি ভাবধারায় আচ্ছন্ন ছিলেন। এই ভাবধারায় ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসে তৈরি হয় পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ, ১৯৪৯ সালের জুনে তৈরি হয় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পর এপ্রিলে তৈরি হয় পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন। অথচ তখনো প্রাদেশিক আইনসভা বা পার্লামেন্ট পূর্ববঙ্গ আইনসভা (ইস্ট বেঙ্গল লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি) নামে বহাল ছিল। ডান-বামনির্বিশেষে সবাই পূর্ববঙ্গ শব্দের বদলে পূর্ব পাকিস্তান শব্দটি ব্যবহার করতেন পরম আদরে। এ দেশে পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন প্রথম রাজনৈতিক সংগঠন, যেখানে পূর্ব বাংলা নামটি ব্যবহার করা হয়।

থিসিসের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো, পূর্ব বাংলাকে সরাসরি পাকিস্তানের উপনিবেশ বলা এবং উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের আহ্বান জানানো। এর আগে এ দেশের কোনো রাজনৈতিক দলের দলিলে সরাসরি স্বাধীনতার কথা বলা হয়নি। শুধু স্বায়ত্তশাসনের কথা বলা হয়েছে। এদিক দিয়ে বিবেচনা করলে পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনকে এ দেশের স্বাধীনতার প্রথম প্রকাশ্য প্রবক্তা বলা যায়।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্যটি অন্যান্য কমিউনিস্ট পার্টি ও গ্রুপের বক্তব্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ—সর্বহারা শ্রেণির নেতৃত্বে সব দেশপ্রেমিক শ্রেণির ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের আহ্বান। প্রশ্ন হলো, অন্যান্য শ্রেণি, বিশেষ করে যাদের বুর্জোয়া বলা হচ্ছে, তারা কেন সর্বহারা শ্রেণির নেতৃত্ব মেনে নেবে? স্লোগান হিসেবে এটা শ্রমিকদের উৎসাহিত করে। কিন্তু তাতে কাজের কাজ হয় কি?

চিনে জাপানি আক্রমণ ও দখলদারির বিরুদ্ধে মাও সে তুং জাতীয়

বুর্জোয়াদের সঙ্গে ঐক্যের ডাক দিয়েছিলেন। এটা কার্যকর হয়েছিল। কিন্তু তার আগে চিনের কমিউনিস্ট পার্টি দেশের একটা বড় অংশে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ রেখে নিজস্ব প্রশাসন চালানোর সক্ষমতা অর্জন করেছিল।

জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায় দলের এই থিসিসে। দাবি ও কর্মসূচি উল্লেখ করে বলা হয় :

১. প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি যেখানে দুর্বল এবং গেরিলাযুদ্ধের জন্য যে এলাকা সুবিধাজনক, এমন জায়গায়, অর্থাৎ জঙ্গলাকীর্ণ পার্বত্য এলাকায় যেতে হবে।
২. গ্রামের মজুর, গরিব ও মাঝারি চাষিকে উদ্বুদ্ধ করে সামন্তবাদ ও উপনিবেশবাদবিরোধী গেরিলাযুদ্ধ চালাতে হবে।
৩. জমিদার ও ধনী কৃষকের জমি দখল করে তা ক্ষেতমজুর ও গরিব চাষিদের মধ্যে বিলিয়ে দিতে হবে।
৪. গেরিলা বাহিনী থেকে নিয়মিত বাহিনী ও ঘাঁটি এলাকা তৈরি করতে হবে।
৫. ঐক্যফ্রন্ট প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
৬. গ্রাম দখল করে শহর ঘেরাও ও দখল করতে হবে।
৭. পাকিস্তানি উপনিবেশবাদ ও তার দালালদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে হবে।
৮. দখলকৃত এলাকায় জাতীয় গণতান্ত্রিক সরকার গঠন করতে হবে।
৯. বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকারসহ বিভিন্ন সংখ্যালঘু জাতিকে স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হবে।
১০. অবাঙালি দেশপ্রেমিক জনগণের সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত বিকাশের পূর্ণ সুযোগ দেওয়া হবে।
১১. জনগণের ধর্মীয় অধিকার নিশ্চিত করা হবে।

জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের লক্ষ্যে সশস্ত্র লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুতি দরকার। দরকার ঘাঁটি এলাকা। এ কাজে পার্বত্য চট্টগ্রামকে উপযুক্ত মনে করলেন সিরাজ সিকদার। টেকনাফে থাকাকালে তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামে যোগাযোগের সূত্র খুঁজতে থাকেন।

২

দলের থিসিস তৈরি হতে না হতেই সারা দেশে আইয়ুববিরোধী আন্দোলনের পরিস্থিতি তৈরি হয়ে যায়। মওলানা ভাসানীর ডাকে ১৯৬৮ সালের ৭ ও ৮ ডিসেম্বর স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল পালিত হয়। সব জায়গায় একই আওয়াজ—আজ হরতাল, আজ চাকাবন্দ। ১৯৬৯ সালের জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে তৈরি হয় চার দলের কেন্দ্রীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ। তাদের উদ্যোগে এগারো দফা দাবির ভিত্তিতে আন্দোলন গড়ে ওঠে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় ছাত্রদের সমাবেশ ও বিক্ষোভ হয় পরপর তিন দিন। ১৪৪ ধারা ভেঙে ছাত্ররা পথে বেরিয়ে আসে। মৃদু কণ্ঠে স্বাধীনতার স্লোগানও শোনা যায়।

পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের থিসিসে জাতীয় পতাকার প্রসঙ্গ আছে। এ নিয়ে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের মধ্যে আলোচনা হয়। আলোচনায় অংশ নেন সিরাজ সিকদার, সামিউল্লাহ আজমী, আজমীর স্ত্রী খালেদা এবং রানা। সামিউল্লাহ ও খালেদার প্রস্তাব ছিল সবুজ জমিনের ওপর লাল বৃত্ত বসিয়ে পতাকা বানাতে হবে। এরকম সিদ্ধান্ত হলেও কোনো পতাকা তখন বানানো হয়নি।

পূর্ব বাংলার পতাকার একটি নকশা এর আগে ১৯৬৬ সালের জুনে করা হয়েছিল। এই নকশা তৈরি করেছিলেন পাকিস্তান নৌবাহিনীর বাঙালি কর্মকর্তা লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন। পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে তাঁকেসহ সশস্ত্র বাহিনীর বেশ কয়েকজন সদস্য এবং অসামরিক ব্যক্তিকে ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বরে গ্রেপ্তার করা হয়। মোয়াজ্জেম হোসেনকে প্রধান আসামি করে একটি রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা রুজু করে পাকিস্তান সরকার। পরে এ অভিযোগে কারাবন্দি আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে জড়ানো হয় এবং শেখ মুজিবকে করা হয় এক নম্বর আসামি। মোয়াজ্জেম হোসেন দুই নম্বর আসামি হিসেবে থেকে যান। এটি 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' নামে ব্যাপক পরিচিতি পায়। মামলার আনুষ্ঠানিক নাম ছিল 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য আসামি'। মামলার ৪৮ ও ৫০ নম্বর ধারায় উঠে এসেছে জাতীয় পতাকার প্রসঙ্গ :

৪৮। ১৯৬৬ সালের জুন মাসে দুই নম্বর আসামি মোয়াজ্জেম তাঁর চট্টগ্রামের নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটির বাসায় ১২ নম্বর সাক্ষী রমিজকে একটি ডায়েরি, একটি নোটবুক এবং একটি ফোল্ডার দিয়ে সেগুলো পড়তে বলেন। এসব প্রমাণপত্রে প্রস্তাবিত স্বাধীন রাষ্ট্রের সরকারের রূপ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা ছিল। এতে বলা হয়, সব সম্পত্তি রাষ্ট্রের হাতে নিয়ে নেওয়া হবে। শিল্পকারখানা জাতীয়করণ করা হবে এবং মুদ্রার পরিবর্তে কুপনপদ্ধতি চালু করা হবে। দুই নম্বর আসামি মোয়াজ্জেম তাঁকে (রমিজকে) নতুন রাষ্ট্রের সবুজ ও সোনালি রঙের পতাকাও দেখিয়েছেন। ...

৫০। ওই মাসের শেষ দিকে (জুন ১৯৬৬) দুই নম্বর আসামি মোয়াজ্জেম তাঁর বাসা নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটি, চট্টগ্রামে একটি সভা আহ্বান করেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন :

১. লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন—২ নং আসামি
২. স্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান—৩ নং আসামি
৩. সুলতান উদ্দিন আহমেদ—৪ নং আসামি
৪. সুবেদার আব্দুর রাজ্জাক—১৪ নং আসামি
৫. সার্জেন্ট জহুরুল হক—১৭ নং আসামি
৬. মো. খুরশীদ—১৯ নং আসামি
৭. রিসালদার শামসুল হক—২০ নং আসামি
৮. নায়েক সুবেদার আশরাফ আলী খান—৯ নং সাক্ষী
৯. এ বি এম ইউসুফ—১০ নং সাক্ষী

এই সভায় আরও একজন উপস্থিত ছিলেন, যাঁর নাম দেওয়া হয়েছিল সার্জেন্ট শাফি। কিন্তু তাঁর পরিচয় উদ্ঘাটন করা যায়নি।

দুই নম্বর আসামি মোয়াজ্জেম সবাইকে তাঁর ডায়েরি এবং নোটবুক দেখান, যাতে 'বাংলাদেশ' নামে প্রস্তাবিত নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রধান দিকগুলো লেখা ছিল। প্রস্তাবিত জাতীয় পতাকাও সেখানে দেখানো হয়।

লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেমের প্রস্তাবিত পতাকার নকশাটি খুঁজে পাওয়া যায়নি। পতাকায় সবুজ ও সোনালি রঙের কথা বলা হয়েছে। পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের পতাকায় বলা হয়েছে সবুজ ও লাল রঙের কথা। পূর্ব

বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের অন্যতম নেতা রানা জানিয়েছেন, ১৯৭১ সালের ৮ জানুয়ারি তাঁদের ডিজাইন করা পতাকা বরিশালের ঝালকাঠি ও নলছিটি এবং মুন্সিগঞ্জের লৌহজংয়ে তোলা হয়; *দৈনিক পূর্বদেশ* পত্রিকায় ১০ জানুয়ারি ১৯৭১ সংখ্যায় এ বিষয়ে একটি সংবাদ ছাপা হয়েছিল।

৩

থিসিসে অন্যান্য কমিউনিস্ট পার্টি ও গ্রুপের কড়া সমালোচনা করা হয়। মস্কোপন্থী কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে বলা হয়, এই পার্টি মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সব মূল তত্ত্বকে সংশোধন করে প্রকৃতপক্ষে শোষক শ্রেণির দালাল হয়ে শ্রমিক-কৃষকদের বিপথে পরিচালনা করছে। মস্কোপন্থীরা শ্রমিক, কৃষক, জনগণের জাতীয় শত্রু। অন্য চিনপন্থী গ্রুপের ব্যাপারে থিসিসে মূল্যায়ন করা হয় এভাবে :

> এরা কথায় ও কাজে মার্কসবাদী, লেনিনবাদী, মাও সে তুং চিন্তাধারার অনুসারী ও অনুশীলনে সংশোধনবাদী। অর্থাৎ এরা লাল পতাকা ওড়ায় লাল পতাকার বিরোধিতা করার জন্য। এরা পূর্ব বাংলার ওপর পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শোষণ স্বীকার করে না এবং জাতীয় সংগ্রাম না করায় এরা পূর্ব বাংলার জনগণের কাছে ঔপনিবেশিক সরকারের দালাল হিসেবে পরিচিত। জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য সশস্ত্র প্রস্তুতি না নিয়ে তারা একদিকে ঔপনিবেশিক শাসক শ্রেণির হাত শক্ত করছে, অন্যদিকে ব্যাপক জনগণকে ঔপনিবেশিক শোষণবিরোধী সংগ্রামে লিপ্ত মার্কিনের দালাল বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে ঠেলে দিচ্ছে। 'পিকিংপন্থী' নাম ধরে তারা বিশ্ববিপ্লবের কেন্দ্রকে অবমাননা করছে। এরা নয়া সংশোধনবাদী।

পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনকে এই থিসিসে একটি বিপ্লবী পার্টি হিসেবে দাবি করা হয়নি। বরং এটিকে সর্বহারা শ্রেণির রাজনৈতিক পার্টি প্রতিষ্ঠার জন্য 'একটি সক্রিয় সংগঠন' হিসেবে দাবি করা হয়েছে। তবে দল সম্পর্কে ধারণাটি স্পষ্ট করা হয়নি।

‘ক্ষুদে বুর্জোয়া শ্রেণি-উদ্ভূত কর্মীদের মতাদর্শগত পুনর্গঠন সম্পর্কে’ নামে প্রকাশিত অন্য একটি দলিলে পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনকে ‘সর্বহারা ও তাদের অগ্রগামী সংগঠন’ হিসেবে উল্লেখ করা হয়। এই দলিল পড়লে মনে হতে পারে, দলের সদস্যদের মধ্যে নানান শ্রেণির মিশেল আছে। কেউ কেউ পেটিবুর্জোয়া শ্রেণি স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে এই সংগঠনে যোগ দিয়েছেন। তাঁরা মার্কসবাদী শিক্ষার মাধ্যমে বিপ্লবী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পোড় খেয়ে মতাদর্শিকভাবে সর্বহারা হতে পারেন। দলিলে সতর্ক করে বলা হয়, ‘সর্বহারাকরণ হয়নি এরূপ ক্ষুদে বুর্জোয়াদের বিপ্লবী চরিত্র সর্বহারার বিপ্লবী চরিত্র থেকে মূলগতভাবে পৃথক এবং এ পার্থক্য বৈরীরূপ গ্রহণ করতে পারে।’

৪

১৯৬৯ সালের ৫ মে ঢাকায় একটি ঘটনা ঘটে, যা ছিল অভূতপূর্ব। তোপখানা রোডে মার্কিন তথ্যকেন্দ্র এবং পাকিস্তান কাউন্সিলের সামনে বোমা ও ককটেল ফাটানো হয়। এ ধরনের বোমা এর আগে রাশিয়ার সৈন্যদের বিরুদ্ধে চেকোস্লোভাকিয়ায় ব্যবহার করা হয়েছিল। ঢাকায় প্রকাশ্যে এ ধরনের বিস্ফোরণ এটাই প্রথম। এ নিয়ে বেশ হইচই হয়েছিল।

ইয়াহিয়া খানের সামরিক শাসনের সময় ১৯৬৯ সালে সিরাজ সিকদারের গ্রুপের সঙ্গে আনোয়ার হোসেন ও আবু সাঈদের বড় ভাই ক্যাপ্টেন আবু তাহেরের (পরে লে. কর্নেল) সরাসরি যোগাযোগ হয়। পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের উপনিবেশ এবং সশস্ত্র জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের মাধ্যমে পূর্ব বাংলাকে স্বাধীন করতে হবে, এই তত্ত্বের সঙ্গে তাহের একমত হন। তিনি ওই সময় চট্টগ্রামে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর দ্বিতীয় কমান্ডো ব্যাটালিয়নে যুক্ত ছিলেন। চট্টগ্রাম সেনানিবাসের পাশে সায়েন্স ল্যাবরেটরির কর্মকর্তা হুমায়ুন আবদুল হাইয়ের বাসায় তাহেরের সঙ্গে সিরাজ সিকদারের বৈঠক হয়। এরপর তাহের ছুটি নিয়ে ঢাকায় এসে তাঁর বড় ভাই আবু ইউসুফের কলাবাগানের বাসায় শ্রমিক আন্দোলনের কর্মীদের রাজনৈতিক-সামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু করেন। প্রতিদিন তিনটি ব্যাচে প্রশিক্ষণ হতো। একপর্যায়ে সিকদারের সঙ্গে তাহেরের দ্বন্দ্ব তৈরি হয়। আনোয়ারের ভাষ্যে জানা যায় :



ক্যাপ্টেন আবু তাহের

আমাদের সে প্রশিক্ষণ কিন্তু বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। যৌথ নেতৃত্বের বদলে নিরঙ্কুশ ব্যক্তি প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করার প্রবণতা সিরাজ সিকদারের মধ্যে কাজ করল। তিনি চিনা বিপ্লবের দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত ছিলেন। অথচ মাও সে তুং যেভাবে মার্শাল চু তে ও চৌ এন লাইয়ের সঙ্গে কিংবা হো চি মিন যেভাবে জেনারেল গিয়াপের সঙ্গে আস্থা ও বিশ্বাস নিয়ে কাজ করেছেন, সিরাজ সিকদার তা করতে ব্যর্থ হলেন। এক মাসও অতিক্রম হয়নি, সিরাজ সিকদার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বন্ধ করে দিলেন। তিনি এই হাস্যকর তত্ত্ব দিলেন যে, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একজন পেটিবুর্জোয়া অফিসারের কাছ থেকে প্রশিক্ষণ নেওয়া নীতিগতভাবে ঠিক নয়। প্রশিক্ষণ বন্ধ হয়ে গেল। সিরাজ সিকদারের সিদ্ধান্ত তাহেরকে অত্যন্ত ব্যথিত করেছিল। পূর্ব বাংলাকে স্বাধীন করার জন্য আমাদের প্রস্তুতির একপর্যায়ে তাহের পরিকল্পনা করেছিলেন তার অধীন বাঙালি সেনাদের নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুক্তাঞ্চল ঘোষণা করবেন। তাহেরের সে স্বপ্ন ফলবতী হলো না।

এই ভাষ্যটি আনোয়ারের একান্তই ব্যক্তিগত এবং এই মূল্যায়ন তিনি করেছেন প্রায় চল্লিশ বছর পরে। এ ব্যাপারে আবু তাহেরের প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি। তবে এটুকু জানা গেছে, সিরাজ সিকদারের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ও সম্পর্ক ছিল সিকদারের মৃত্যুর আগ পর্যন্ত। যৌথ নেতৃত্ব বিষয়ে আনোয়ার তাঁর মূল্যায়নে মাওয়ের সঙ্গে চু তে কিংবা চৌ এন লাইয়ের এবং হো চি মিনের সঙ্গে গিয়াপের সম্পর্কের যে প্রসঙ্গ তুলেছেন, তার পেছনে তেমন যুক্তি নেই। চু তে, চৌ কিংবা গিয়াপ কেউই ওই দেশের সরকারের চাকরিতে ছিলেন না। তাঁরা সবাই ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির সার্বক্ষণিক সদস্য।

যতদূর জানা যায়, সিকদার ওই সময় তাহেরকে চাকরি ছেড়ে দলের সদস্য হওয়ার অনুরোধ করেছিলেন। তাহের এ প্রস্তাবে রাজি হননি। চাকরি ছেড়ে একটি রাজনৈতিক দলের সার্বক্ষণিক সদস্য হয়ে বিপ্লবের বিপদসংকুল পথে পা বাড়ানোর মতো মানসিক দৃঢ়তা এবং ইচ্ছা তাঁর ছিল না। তিনি বিপ্লব চেয়েছেন। একই সঙ্গে তিনি চেয়েছেন একটি নিরাপদ চাকরি। তাঁর এই 'পেটিবুর্জোয়া সুবিধাবাদী মানসিকতা' সিকদারের পছন্দ হয়নি। তিনি কোনো 'অতিথি বিপ্লবী' চাননি। তবে তাঁদের ব্যক্তি সম্পর্কে ফাটল ধরেনি।

৫

১৯৬৯ সালের পয়লা মে কলকাতায় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী) আনুষ্ঠানিকভাবে জন্ম নেয়। পূর্ব বাংলায় এর প্রভাব পড়ে। ১৯৭০ সালের গোড়ার দিকে পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের পক্ষ থেকে একটি বিবৃতি প্রচার করা হয়। এর শিরোনাম ছিল পুরো প্যারাগ্রাফজুড়ে—পূর্ব বংলার সামাজিক বিকাশের বর্তমান পর্যায়ে প্রধান দ্বন্দ্ব নির্ণয়ের প্রশ্নে নয়া সংশোধনবাদী হক-তোয়াহা, ট্রটস্কি-চেবাদী দেবেন-মতিন ও ষড়যন্ত্রকারী কাজী-রনো বিশ্বাসঘাতক চক্রের সঙ্গে পূর্ব বাংলার মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মাও সে তুং চিন্তানুসারী সর্বহারা বিপ্লবীদের পার্থক্য। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির (মা-লে) অনুসারীদের নকশাল নামে ডাকা হতো। নকশালবাড়ি অভ্যুত্থানের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার কারণে এই নাম। পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের বিবৃতিতে বলা হয় :

> ভারতের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী কমিউনিস্ট পার্টি ভারতের বিশেষ সামাজিক অবস্থার বিশ্লেষণ করে সর্বহারার রাজনৈতিক লাইন নির্ণয় করার পর্যায়ে প্রধান দ্বন্দ্ব হিসেবে সামন্তবাদের সঙ্গে কৃষক-জনতার দ্বন্দ্বকে উল্লেখ করেছে এবং এই দ্বন্দ্ব সমাধানের জন্য কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। কিন্তু পূর্ব বাংলার নয়া-সংশোধনবাদী হক-তোয়াহা, ট্রটস্কি-চেবাদী দেবেন-মতিন, কাজী-রনো ষড়যন্ত্রকারী বিশ্বাসঘাতক চক্র নিজেদের 'নকশালপন্থী' হিসেবে প্রচার করতে গিয়ে কোনোরূপ আত্মসমালোচনা ছাড়াই রাতারাতি তাদের বক্তব্য পাল্টিয়ে ভারতের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টির রাজনৈতিক লাইন গ্রহণ করেছে। তারা পূর্ব বাংলাকে জাতীয় বিপ্লবের মাধ্যমে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করে স্বাধীন জাতীয় রাষ্ট্র গঠন করাকে প্রতিনিয়ত বিরোধিতা করছে।

এই বিবৃতিতে এটা স্পষ্ট যে শ্রমিক আন্দোলন নকশালদের রাজনৈতিক লাইন ভারতের জন্য সঠিক মনে করলেও পূর্ব বাংলায় তার হুবহু প্রয়োগের বিরোধী। কারণ, পূর্ব বাংলার প্রধান দ্বন্দ্ব হচ্ছে পাকিস্তানি উপনিবেশবাদ।

বিবৃতিতে চিনপন্থী অন্যান্য কমিউনিস্ট গ্রুপকে নয়া-সংশোধনবাদী আখ্যা দিয়ে তীব্র আক্রমণ করা হয়েছে, ট্রটস্কি এবং চে গুয়েভারার ব্যাপারে শ্রমিক আন্দোলনের জোরদার আপত্তি। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরীণ নেতৃত্বের লড়াইয়ে স্ট্যালিন জয়ী হন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ট্রটস্কি দেশ থেকে বহিষ্কৃত হন এবং পরে নির্বাসিত অবস্থায় মেক্সিকোতে আততায়ীর হাতে নিহত হন। স্ট্যালিনপন্থীরা ট্রটস্কিকে শত্রু মনে করতেন। কিউবায় বিপ্লবের পর কিউবার বিপ্লবীরা সোভিয়েত ও চিনা পার্টির কোনোটিরই আনুগত্য গ্রহণ না করায় উভয়েই তাদের বিপ্লবী হিসেবে গ্রাহ্য করত না এবং তাদের ট্রটস্কিবাদী বলে গাল দিত। সোভিয়েত ও চিনপন্থী দলগুলো ভারতে এবং পূর্ব বাংলায় নিজ নিজ মুরব্বি পার্টির অনুকরণে তাদের কথাগুলো কোনো রকম ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ছাড়াই হুবহু উগরে দিত। তারা লাতিন আমেরিকার বিশেষ পরিস্থিতি কখনোই বিবেচনায় নেয়নি। সোভিয়েত এবং চিনা মডেলের বাইরে গিয়েও যে বিপ্লবের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা যায়, এ ধারণা তাঁদের মনোজগতে কখনোই ঠাঁই দেননি। ট্রটস্কির অপরাধ কী, কিউবার বিপ্লবীরা কেন স্বতন্ত্র ধারায় এগোলেন,

এ নিয়ে অনুসন্ধানের কোনো চেষ্টা তাঁদের মধ্যে ছিল না। বিশেষ একটি রাজনৈতিক লাইন বা মতাদর্শ অন্ধভাবে অনুসরণ করার ফলে তাঁদের মধ্যে ক্রিটিক্যাল ধ্যানধারণার চর্চা ও বিকাশ হয়নি। মাও সে তুং তাঁদের কাছে পয়গম্বরতুল্য, তিনি তো ভুল করতে পারেন না—এই ছিল বিশ্বাস। দলের প্রচারপত্র সেভাবেই লেখা হতো এবং তা মুখস্থ করে তাঁরা কারও পক্ষে জিন্দাবাদ এবং কারও বিরুদ্ধে মুর্দাবাদ ধ্বনি দিতেন। মজার কথা হলো, পূর্ব বাংলার চিনপন্থী কোনো নেতার সঙ্গে চিনের কমিউনিস্ট পার্টির কোনো নেতার সরাসরি কথা বলা তো দূরে থাকুক, কখনো দেখাও হয়নি। এ ছিল একতরফা প্রেম।

শ্রমিক আন্দোলনের এই বিবৃতিতে পরিষ্কারভাবে বলা হয়, আত্মনিয়ন্ত্রণ, অর্থাৎ জাতীয় বিপ্লবের মাধ্যমে পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করে পূর্ব বাংলায় জাতিভিত্তিক রাষ্ট্র গঠন এবং সামন্তবাদ উৎখাত করতে হবে। বিবৃতির শেষে ছিল তিনটি স্লোগান :

মার্কসবাদ লেনিনবাদ মাও সে তুং চিন্তাধারা—জিন্দাবাদ।
পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন—জিন্দাবাদ।
পূর্ব বাংলার গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র—জিন্দাবাদ।

১৯৭০ সালের গোড়ার দিকে প্রচারিত এই বিবৃতিটি ছিল নতুন একটি রাষ্ট্রের প্রথম লিখিত ঘোষণাপত্র, যার জন্ম হয়েছিল এক বছরের মধ্যেই।

গণযুদ্ধ

আত্মপ্রচার পছন্দ করেন এমন মানুষ অনেক। কেউ কেউ নিজেই নিজের ঢোল পেটান। আমিই সবকিছু করেছি, এ ধরনের অহং কাজ করে তাঁদের মধ্যে। এ ধরনের লোকদের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে বলেছেন সিরাজ সিকদার। একই সঙ্গে ভিন্নমতাবলম্বীদের বিরুদ্ধে বিষোদগার করেছেন। ১৯৭০ সালে 'বিভেদপন্থীবাদ' শিরোনামে প্রকাশিত একটি দলিলে এসব কথা বলা হয়। দলিলটি লেখা হয় মাওয়ের 'পার্টির কর্মপদ্ধতির শুদ্ধিকরণ করো' নামে একটি রচনার ভিত্তিতে। নিজেদের যারা অন্যদের চেয়ে আলাদা বা স্বতন্ত্র বলে প্রচার করে, এই দলিলে তাদের বিভেদপন্থী হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এদের মাধ্যমেই একটি সংগঠনে উপদলীয় কোন্দল শুরু হয় বলে দলিলে উল্লেখ করা হয়। এ সম্পর্কে বলা হয় :

> স্বতন্ত্রতার ধান্দায় ঘুরছেন এমন লোক সর্বদাই 'আমি প্রথম' নীতির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য এবং তারা ব্যক্তিবিশেষ ও পার্টির মধ্যকার সম্পর্কের প্রশ্নে প্রায়ই ভুল করে থাকেন। তারা যদিও বুলিতে পার্টিকে সম্মান করেন, কিন্তু কার্যত নিজেদেরই প্রথম স্থান দেন এবং পার্টিকে দেন দ্বিতীয় স্থান। এ ধরনের লোক কিসের ধান্দায় ঘুরছেন? তারা খ্যাতি, পদ ও আত্মপ্রচারের জন্য ঘুরছেন। কাজের কোনো এক অংশের দায়িত্ব তাদের দিলে তারা নিজেদের স্বতন্ত্রতার ধান্দায় থাকেন। এই উদ্দেশ্যে তারা কিছু লোককে পক্ষে টেনে আনেন, আর কিছু লোককে ঠেলে সরিয়ে রাখেন এবং কমরেডদের মধ্যে পরস্পরকে তোষামোদ ও টানাটানি করেন। তারা বুর্জোয়া শ্রেণির রাজনৈতিক পার্টির ইতর রীতিকে কমিউনিস্ট পার্টির ভেতরে নিয়ে আসেন। তাদের অসততাই

তাদের ক্ষতিগ্রস্ত করে। তাই আমাদের সৎভাবে কাজ করা উচিত। কারণ, পৃথিবীতে কোনো কাজ সম্পন্ন করতে হলে অসৎ মনোভাব দ্বারা তা করা একেবারে অসম্ভব।

সৎ লোক কারা? মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, স্ট্যালিন, মাও সে তুং হলেন সৎ লোক। বৈজ্ঞানিক মনোভাবাপন্ন লোকই সৎ। অসৎ লোক কারা? ট্রটস্কি, বুখারিন, চেনতাও শিও, ক্রুশ্চেভ, ব্রেজনেভ, লিউ শাউ চি, জ্যোতি বসু, নম্বোদ্রিপাদ, মণি সিংহ, মোজাফফর, আবদুল হক-তোয়াহা, মতিন-আলাউদ্দিন, দেবেন-বাসার, কাজী-রনো প্রভৃতি হলো অসৎ লোক। এরা ব্যক্তি বা চক্রের স্বার্থের 'স্বতন্ত্রতা' দাবি করে। সব খারাপ লোক, যাদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নেই, নিজেদের যারা বুদ্ধিমান ও চালু বলে জাহির করে, আসলে কিন্তু এরা সবাই অতিশয় বোকা এবং তারা কোনো ভালো কাজই করতে পারবে না। আমরা অবশ্যই কেন্দ্রীয়ভাবে একটি ঐক্যবদ্ধ পার্টি গঠন করব এবং সকল প্রকার নীতিহীন উপদলীয় সংগ্রামকে সম্পূর্ণরূপে দূর করব, যাতে আমাদের সংগঠন একযোগে এগোতে পারে এবং লক্ষ্যের জন্য সংগ্রাম করতে পারে।

দলিলের শেষ স্তবকে ভুল সংশোধনের জন্য চরমপন্থা গ্রহণের ব্যাপারে সাবধান করে দিয়ে বলা হয়, 'মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক ব্যাধির চিকিৎসায় কখনো রুক্ষ ও বেপরোয়া মনোভাব গ্রহণ করা উচিত নয়, বরং "রোগ সারিয়ে রোগীকে বাঁচানো", এই মনোভাব অবশ্যই গ্রহণ করা উচিত।' দলটি শেষ পর্যন্ত এই আপ্তবাক্যে স্থির থাকতে পারেনি। পরে দলে অনেক কোন্দল হয়েছে এবং উপদলীয় চক্রান্তের অভিযোগে 'রোগ' না সারিয়ে তাদের খতম করে দেওয়া হয়েছে।

২

১৯৭০ সালের শুরু থেকেই দেশে নির্বাচনী হাওয়া বইতে থাকে। রাজনীতির মাঠে আওয়ামী লীগ তরতরিয়ে এগোতে থাকে এবং অন্য সব দলকে

ছাড়িয়ে যায়। আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে আওয়ামী লীগ ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) বরাবরই সোচ্চার ছিল। কিন্তু চালচিত্র বদলে দেয় একটি স্লোগান—জয়বাংলা। আওয়ামী লীগের রক্ষণশীল নেতারা এই স্লোগানের বিরোধিতা করেছিলেন। এর মধ্যে তাঁরা পাকিস্তান ভাঙা এবং 'হিন্দু ভারতের' স্লোগান 'জয় হিন্দ'-এর ছায়া দেখেছিলেন। ১৯৭০ সালের ৭ জুন ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (এখন সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যান) আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান নিজ কণ্ঠে প্রথমবারের মতো প্রকাশ্যে এই স্লোগানটি দিলে তা আওয়ামী লীগের কাছে বৈধতা পেয়ে যায়। অন্য দলগুলো এর বিরোধিতা করে। ইসলামপন্থী হিসেবে পরিচিত দলগুলো এই স্লোগানের মধ্যে আবিষ্কার করে ভারতীয় জুজু। তারা বিদ্রূপ করে বলতে থাকে—জয়বাংলা, জয় হিন্দ, লুঙ্গি খুলে ধুতি পিন্দ।

জয়বাংলা স্লোগানের জন্ম দিয়েছিলেন ছাত্রলীগের অ্যাকটিভিস্টরা। তাঁরা স্বাধীনতা চাইতেন। তাঁদের বিরুদ্ধে ইসলামপসন্দ ও চিনপন্থী দলগুলোর অভিযোগ : এই স্লোগানে যুক্ত বাংলার গন্ধ আছে। তারা এটি রটাতে থাকে।

এ দেশের রাজনীতিতে একে অন্যের বিরুদ্ধে কাদা-ছোড়াছুড়ি নতুন নয়। জয়বাংলা স্লোগান নিয়েও জল ঘোলা কম হয়নি। ১৯৭০ সালের ৭ জুন ঢাকার পল্টন ময়দানে ছাত্রলীগের একটি র‍্যালিতে একটি পতাকা ব্যবহার করা হয়। পতাকাটি তৈরি করা হয় গাঢ় সবুজ কাপড়ের মাঝখানে রক্তলাল একটি বৃত্ত বসিয়ে। যুক্ত বাংলার স্ক্যান্ডাল ঠেকাতে লাল বৃত্তের মাঝখানে সোনালি রং দিয়ে পূর্ব বাংলার মানচিত্র আঁকা হয়েছিল। এটা ছিল একটা রূপকল্প, যেখানে পূর্ব বাংলাকে একটি সত্তা হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছিল। কিন্তু অপপ্রচার থামেনি। একপর্যায়ে এই অপপ্রচারে শামিল হয় পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন। ১৯৭১ সালের জানুয়ারিতে 'কয়েকটি স্লোগান প্রসঙ্গে' শিরোনামে প্রচারিত পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের একটি দলিলে অন্য দলগুলোর সব স্লোগানের বিরোধিতা করা হয়। জয়বাংলা স্লোগান সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ধর্মান্ধ ও রক্ষণশীল কমিউনিস্টদের প্রচার করা স্ক্যান্ডালকেই সমর্থন করা হয়। দলিলে বলা হয় :

> বর্তমান সামাজিক অবস্থায় জয়বাংলা স্লোগান ব্যাপক জনসাধারণের কণ্ঠে শোনা যায়। এটা একটা জনপ্রিয় স্লোগান।

জয়বাংলা স্লোগান দ্বারা ৬ দফা (পন্থী) আওয়ামী লীগ বৃহত্তর বাংলা অর্থাৎ পূর্ব বাংলার সাথে পশ্চিম বাংলাকেও সংযুক্ত করে বৃহত্তর বাংলা জয়ের সুখ কল্পনা প্রকাশ করছে। এই কল্পনা কখনো বাস্তবায়িত হবে না। এটা একটা অলীক কল্পনামাত্র।

পূর্ব বাংলার সাধারণ মানুষ এই স্লোগান প্রদানের সময় পূর্ব বাংলার নিপীড়িত লাঞ্ছিত জনগণের শোষকদের ওপর বিজয় কামনা করে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের স্বপ্ন দেখে।

আমরা পূর্ব বাংলার জনসাধারণের সংগ্রামকে সমর্থন, তাকে নেতৃত্ব প্রদান করি ও পরিচালনা করি শেষ পর্যন্ত। কিন্তু বৃহত্তর বাংলার স্বপ্নকে আমরা দৃঢ়ভাবে বিরোধিতা করি। আরও বিরোধিতা করি স্বাধীন পূর্ব বাংলায় ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের অনুপ্রবেশ।

পক্ষান্তরে আমরা ব্যাপক জনতার সাথে সমর্থন করি পূর্ব বাংলার জাতীয় বিজয়, তার স্বাধীনতা এবং বিশ্বের জাতিসমূহের মাঝে সগৌরবে মাথা তুলে দাঁড়াবার অধিকার। আমরা সাধারণ মানুষের জাতীয়তাবোধ, স্বদেশপ্রেমকে সমর্থন করি। কিন্তু তাকে বুর্জোয়াদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যবহারের বিরোধিতা করি।

কাজেই আমরা উত্থাপন করতে পারি 'জয় পূর্ব বাংলা' স্লোগান। এটা পূর্ব বাংলার স্বপ্ন তথা ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের অনুপ্রবেশকে যথেষ্টভাবে বিরোধিতা করে এবং পূর্ব বাংলার জনগণের জাতীয়তাবোধ, দেশপ্রেম এবং বিজয়কে প্রকাশ করে। এ কারণে এ স্লোগান যেকোনো প্রকার দ্বিধার অবসান করে। এটা পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তির প্রশ্নের সমাধান, জাতীয় দ্বন্দ্বের সমাধান। আমাদের রাজনীতির সাথে এটা সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ কারণে এটা সঠিক।

'জয়' শব্দটিতে শ্রমিক আন্দোলনের আপত্তি নেই। আপত্তি শুধু 'বাংলা' শব্দটিতে। বাংলার বদলে পূর্ব বাংলা বললেই স্লোগানটি গ্রহণযোগ্য হবে। বাংলা শব্দের মধ্যে যুক্ত বাংলার 'স্বপ্ন' আছে কি না এবং যাঁরা এই স্লোগান দেন, তাঁরা যুক্ত বাংলা চান কি না, শ্রমিক আন্দোলনের নেতারা কখনো তা জানার চেষ্টা করেননি। তাঁদের ধারণা অনুমানভিত্তিক। অনুমানের ওপর নির্ভর করে নীতি ও কৌশল নির্ধারণের ঝুঁকি অনেক।

৩

১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রাদেশিক পরিষদে একচেটিয়া এবং জাতীয় পরিষদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে জয়ী হয় এবং সরকার গঠনের ম্যান্ডেট পায়। দেশের মানুষ তখন এই দলটির দিকে তাকিয়ে। আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান তখন দেশের অবিসংবাদী নেতা।

আওয়ামী লীগের সহযোগী সংগঠন ছাত্রলীগের তরুণরা তখন স্লোগান দিচ্ছে 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো'। স্বাধীনতার দাবি দিন দিন জোরালো হচ্ছে। পাকিস্তানের সামরিক সরকার জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে টালবাহানা করবে বলে অনেকেই আশঙ্কা করছেন। এই পরিস্থিতিতে ১৯৭১ সালের ৩ জানুয়ারি ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে এক সমাবেশে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামী লীগের টিকিটে নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে একটি শপথ অনুষ্ঠান হয়। শেখ মুজিব নিজেই শপথ পরিচালনা করেন। তিনি বলেন, ছয় দফার ব্যাপারে তাঁর দল আপস করবে না।

৮ জানুয়ারি পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের সম্পাদক সিরাজ সিকদার স্বাধীনতা ঘোষণার আহ্বান জানিয়ে একটি বিবৃতি দেন। বিবৃতির শিরোনাম ছিল বেশ লম্বা। এর শেষ অংশটি ছিল—৮ জানুয়ারি ১৯৭১ সালে পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের তৃতীয় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে কমরেড সিরাজ সিকদার কর্তৃক পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের কর্মী, গেরিলা, সহানুভূতিশীল, সমর্থক ও বিপ্লবী জনগণ এবং অন্য দেশপ্রেমিকদের উদ্দেশে প্রদত্ত আহ্বান। বিবৃতিতে বলা হয় :

> পাকিস্তানি অবাঙালি শাসকগোষ্ঠীর সাথে পূর্ব বাংলার জনগণের দ্বন্দ্ব প্রতিদিনই তীব্রতর হচ্ছে। স্মরণাতীতকালের প্রচণ্ডতম ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের তাণ্ডবলীলায় লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণ বলিদান প্রমাণ করেছে পূর্ব বাংলার পরাধীনতার চরিত্রকে। পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক সামরিক শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলার জনগণের জাতীয় স্বাধীনতা, মুক্তি ও বিচ্ছিন্নতার সংগ্রামকে নিয়মতান্ত্রিক, শান্তিপূর্ণ সংগ্রামের কানাগলিপথে

শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের উদ্দেশ্যে পূর্ব্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের খোলা চিঠি

পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের বিপ্লবী পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত।

তারিখ : ২রা মার্চ, ১৯৭১

আপনার ও আপনার পার্টির ছয়-দফা সংগ্রামের রক্তাক্ত ইতিহাস স্পষ্টভাবে প্রমাণ করেছে যে ছয় দফার অর্থনৈতিক দাবী সমূহ বাস্তবায়ন সম্ভব সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে, পূর্ব-বাংলাকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন, মুক্ত ও স্বাধীন করে।

আপনাকে ও আপনার পার্টিকে পূর্ব-বাংলার সাত কোটি জনসাধারণ ভোটপ্রদান করেছে পূর্ব-বাংলার উপরস্থ পাকিস্তানের অবাঙালী শাসকগোষ্ঠির ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের অবসান করে স্বাধীন ও সার্বভৌম পূর্ব-বাংলার প্রজাতন্ত্র কায়েমের জন্য।

পূর্ব-বাংলার জনগণের এ আশা-আকাঙ্খা বাস্তবায়নের জন্য **পূর্ব-বাংলা শ্রমিক আন্দোলন আপনার** প্রতি ও আওয়ামী লীগের প্রতি নিম্নলিখিত **প্রস্তাবলী** পেশ করেছে :

(১) **পূর্ব-বাংলার জনগণের** নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে এবং সংখ্যাগুরু **জাতীয় পরিষদের নেতা** হিসেবে স্বাধীন, গণতান্ত্রিক শান্তিপূর্ণ, নিরপেক্ষ, প্রগতিশীল পূর্ব-বাংলার গণতান্ত্রিক **প্রজাতন্ত্র** প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করুন।

(২) পূর্ব-বাংলার কৃষক-শ্রমিক প্রকাশ্য ও গোপনে কার্যরত পূর্ব-বাংলার দেশ-প্রেমিক রাজনৈতিক পার্টি ও ব্যক্তিদের প্রতিনিধি সম্বলিত স্বাধীন, গণতান্ত্রিক শান্তিপূর্ণ, নিরপেক্ষ, প্রগতিশীল পূর্ব-বাংলার প্রজাতন্ত্রের অস্থায়ী সরকার কায়েম করুন।

প্রয়োজন বোধে এ সরকারের কেন্দ্রীয় দফতর নিরপেক্ষ দেশে স্থানান্তরিত করুন।

(৩) পূর্ব-বাংলা ব্যাপী এ সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শাসক-গোষ্ঠির বিরুদ্ধে সশস্ত্র জাতীয় মুক্তি যুদ্ধের সূচনার আহ্বান জানান।

এ উদ্দেশ্যে পূর্ব-বাংলার জাতীয় মুক্তি বাহিনী গঠন এবং শহর ও গ্রামে জাতীয় শত্রু খতম ও তাঁদের প্রতিষ্ঠান ধ্বংসের আহ্বান জানান।

(৪) পূর্ব-বাংলার জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম পরিচালনার জন্য শ্রমিক-কৃষক এবং প্রকাশ্য ও গোপনে কার্যরত পূর্ব-বাংলার দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক পার্টি ও ব্যক্তিদের প্রতিনিধি সমন্বয়ে "জাতীয় মুক্তি পরিষদ" বা "জাতীয় মুক্তি ফ্রন্ট" গঠন করুন।

(৫) প্রকাশ্য ও গোপন, শান্তিপূর্ণ ও সশস্ত্র, সংস্কারবাদী ও বিপ্লবী পদ্ধতিতে **সংগ্রাম** করার জন্য পূর্ব-বাংলার জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

(৬) পূর্ব-বাংলার প্রজাতন্ত্র নিম্নলিখিত কর্মসূচী বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি **প্রদান** করবে :

(ক) পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠিকে পরিপূর্ণভাবে উৎখাত করা এবং পূর্ব-বাংলায় তাদের সকল সম্পত্তি রাষ্ট্রীয়করন করা। ঔপনিবেশিক সরকারের সকল প্রকার শোষন ও অসম চুক্তির অবসান করা। এদের দালালদের সম্পত্তি রাষ্ট্রীয়করন করা। এদের মধ্যে দুষ্কৃতকারীদের চরম শাস্তির ব্যবস্থা করা।

শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের উদ্দেশে খোলা চিঠি

পরিচালনার ষড়যন্ত্র করছে এবং এ উদ্দেশ্যে সামরিক শাসনের ছত্রচ্ছায়ায় এবং আইনগত কাঠামোর আওতায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত করেছে।

আওয়ামী লীগ জনতাকে এর বিরুদ্ধে পরিচালিত না করে এ ষড়যন্ত্রে হাত মিলিয়েছে এবং পূর্ব বাংলার ওপর শোষণ নিপীড়ন সমাধানের জন্য শান্তিপূর্ণ ও সংস্কারবাদী পথ এবং গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের কথা বলছে।

পাকিস্তানের অবাঙালি শাসকগোষ্ঠীর ক্ষমতার প্রধান উপাদান হলো সামরিক বাহিনী। পূর্ব বাংলার জনগণের কোনো উপকারই করা সম্ভব নয় সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার গণবিরোধী এই সশস্ত্র বাহিনীকে পরাজিত ও ধ্বংস করা ব্যতীত। শান্তিপূর্ণ, নিয়মতান্ত্রিক, সংস্কারবাদী সকল প্রচেষ্টার চূড়ান্ত পরিণতি হলো আপস ও আঁতাত এবং জনগণের স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। কাজেই আওয়ামী লীগের সামনে সশস্ত্র সংগ্রাম ও আপসের দুটি পথ খোলা রয়েছে। আওয়ামী লীগের শ্রেণিভিত্তি প্রমাণ করে, তারা শেষোক্ত পথ অনুসরণ করছে, যার পরিণতি হলো জনগণের স্বার্থের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা। ...

ইতিহাস সকল ভাঁড় ও ভাঁওতাবাজদের, আগে হোক পরে হোক, চূড়ান্তভাবে কবরস্থ করবেই। পূর্ব বাংলার বিপ্লবী জনতার পরিচালিত ইতিহাসের চাকা শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগকে উচ্চশিখরে উত্তোলিত করেছে। এটা নিজস্ব গতিপথে অনিবার্যভাবেই তাদের গুঁড়িয়ে চূর্ণবিচূর্ণ করে চূড়ান্তভাবে কবরস্থ করবে। ...

পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলার জনগণের সশস্ত্র সংগ্রাম কিছুতেই দাবিয়ে রাখতে পারবে না। ১৯৭০-এ পূর্ব বাংলার জনগণের যে গণযুদ্ধ শুরু হয়েছে, তা দাবানলে রূপ নেবে ১৯৭১-এ। পূর্ব বাংলার গ্রামে গ্রামে দাউ দাউ করে জ্বলবে গণযুদ্ধের দাবাগ্নি। আর তাতে পুড়ে মরবে পূর্ব বাংলার স্বাধীনতার শত্রুরা, তাদের দালাল, বিভিন্ন আকৃতির সংশোধনবাদীরা। এই প্রবল ঝড় তরঙ্গে থরথর করে কাঁপবে পুরো দুনিয়া, গড়ে উঠবে জনগণের গেরিলা বাহিনী, সমাপ্ত হবে পূর্ব বাংলার শ্রমিক শ্রেণির রাজনৈতিক পার্টি প্রতিষ্ঠার প্রস্তুতি সংগঠন হিসেবে পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের ঐতিহাসিক ভূমিকা, প্রতিষ্ঠিত হবে পূর্ব বাংলার শ্রমিক শ্রেণির রাজনৈতিক পার্টি।

বিবৃতিটি রাজনৈতিক ভিন্নমতাবলম্বীদের বিরুদ্ধে বিষোদগারে ঠাসা এবং শেষে আবেগাশ্রয়ী আশাবাদ। এই বিবৃতি প্রচার করা হয়েছে দলের সদস্য ও সমর্থকদের মধ্যে। কতজন এটি পড়েছেন, তা বলা মুশকিল। আওয়ামী লীগের কোনো নেতা এটি পড়েছেন এবং এ নিয়ে সিরাজ সিকদারের পরামর্শ নেওয়ার তাগিদ অনুভব করেছেন, এমনটি মনে হয় না। বিবৃতির ভাষায় এটা স্পষ্ট, তারা আওয়ামী লীগকে 'জনগণের স্বার্থের সঙ্গে বেইমানি' না করতে সতর্ক করে দিচ্ছে।

আওয়ামী লীগের হাতে এটা পৌঁছাল কি না, কিংবা আওয়ামী লীগের কোনো নেতার সঙ্গে আলোচনা বা বিতর্কের চেষ্টা হয়েছে কি না, তা জানার উপায় নেই। বোঝা যায়, এ ধরনের দ্বিপক্ষীয় আলোচনার সুযোগ ছিল না। আলোচনার আগ্রহ থাকলে এরকম আক্রমণাত্মক ভাষায় কেউ বিবৃতি দেয় না। শ্রমিক আন্দোলনের নেতারা কি ভেবেছিলেন, তাঁদের এত শক্তি যে, তাঁদের ডাকে সাড়া দিয়ে জনতা গণযুদ্ধ শুরু করে দেবে?

তবে শ্রমিক আন্দোলন যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছিল তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী। একাত্তরের জানুয়ারিতে তাদের গেরিলারা একটি 'অ্যাকশনে' যায়। দেশে পাকিস্তানবাদ প্রচারের দায়িত্বে ছিল সরকারি প্রতিষ্ঠান ব্যুরো অব ন্যাশনাল রিকনস্ট্রাকশন (বিএনআর)। এর মাধ্যমে দেশের অগ্রগণ্য বুদ্ধিজীবীদের পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়া হতো। বিএনআরের অফিস ছিল তোপখানা রোডে। পাশেই ছিল ইউনাইটেড স্টেটস ইনফরমেশন সেন্টারের (ইউএসআইএস) অফিস।

এই দুটি অফিসের সামনে রাস্তায় বোমা ফাটায় শ্রমিক আন্দোলনের কর্মীরা। এরপর তারা 'অ্যাকশনে' যায় আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে।

৪

১৯৭০ সালে আওয়ামী লীগের উত্থান ঘটে নাটকীয়ভাবে। বাঙালি জাতীয়তাবাদের জোয়ারে দেশ তখন ভাসছে। জনমনে ধারণা তৈরি হয় যে এই দলটি শিগগিরই ক্ষমতায় যাবে। অনেক জায়গায় স্থানীয় দুর্বৃত্তরা আওয়ামী লীগের সঙ্গে ভিড়ে যায়।

এ সময় আওয়ামী লীগের কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে অন্য দলের কর্মী-সমর্থকদের কিছু সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। চিনপন্থী গ্রুপগুলো এ ধরনের সংঘর্ষে জড়ায়। এতে আওয়ামী লীগের কিছু নেতা কর্মী নিহত হন। কমিউনিস্টদের কারও কারও চোখে আওয়ামী লীগের লোককে খুন করা বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের সমার্থক হয়ে দাঁড়ায়। তাদের চোখে আওয়ামী লীগ হলো 'জাতীয় শত্রু'।

আওয়ামী লীগ বরাবরই কমিউনিস্টবিরোধী। কমিউনিস্ট শিবিরে নানা দল-উপদলের মধ্যে যে তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব, তা নিয়ে আওয়ামী লীগের মাথাব্যথা ছিল না। তাদের কাছে সব কমিউনিস্টই সমান। তাদের সম্পর্কে আওয়ামী লীগের সাধারণ ধারণা বা পারসেপশন হলো—এরা গণতন্ত্রবিরোধী, সন্ত্রাসবাদী, মানুষ মেরে বিপ্লব করতে চায়। একাত্তরের ৮ জানুয়ারি প্রচারিত পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের বিবৃতির একটি অংশ ছিল এরকম :

> পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের গেরিলারা সাফল্যজনকভাবে পূর্ব বাংলার বুকে সর্বপ্রথম সূর্যসেনের দেশ চট্টলায় এবং সন্ন্যাস বিদ্রোহের দেশ ময়মনসিংহে জাতীয় শত্রু খতমের মাধ্যমে গেরিলাযুদ্ধের সূচনা করেছে এবং বিপ্লবী সংগ্রামের ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায়ের জন্ম দিয়েছে। ১৯৭০-এ পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন তার বিকাশে সশস্ত্র সংগ্রামের ঐতিহাসিক স্তরে প্রবেশ করেছে।

একটি হত্যাকাণ্ড আরেকটি হত্যাকাণ্ড ডেকে আনে। আওয়ামী লীগের লোকেরাও ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নয়। তাদের পাল্টা হামলায় কয়েকটি জায়গায় চিনপন্থীরা আক্রান্ত হয়। খুনখারাবি ঘটতেই থাকে। বিষয়টি উঠে এসেছে একটি মার্কিন দলিলে।

১৯৭১ সালের জানুয়ারি মাসে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এবং পশ্চিম পাকিস্তানের প্রধান রাজনৈতিক দল পাকিস্তান পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভুট্টোর সঙ্গে ঢাকায় শেখ মুজিবের কয়েক দফা বৈঠক হয়। ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া, সংবিধান এবং ক্ষমতা ভাগাভাগি নিয়ে তাঁরা একমত হননি। পরিস্থিতি ক্রমেই ঘোলাটে হয়ে উঠছিল। শেখ মুজিব একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণার কথা ভাবছিলেন। তবে তিনি এর ঝুঁকি সম্পর্কে জানতেন। এ ব্যাপারে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতা চেয়েছিলেন। এ নিয়ে তাঁর

সঙ্গে ঢাকায় যুক্তরাষ্ট্রের কনসাল জেনারেল আর্চার ব্লাডের কথা হয়। আর্চার ব্লাড শেখ মুজিবকে বলেন যে, যুক্তরাষ্ট্র এই সংকটের সমাধান চায়। তবে পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ বিচ্ছিন্ন হলে যুক্তরাষ্ট্র তাকে সমর্থন করবে না।

একাত্তরের ২৮ ফেব্রুয়ারি মার্কিন রাষ্ট্রদূত জোসেফ ফারল্যান্ড শেখ মুজিবের সঙ্গে তাঁর ধানমন্ডির বাসায় দেখা করেন। মুজিব ফারল্যান্ডকে বলেন :

> বাংলাদেশের মানুষ তাঁর পেছনে এককাট্টা। তবে কিছু চরমপন্থী কমিউনিস্ট আছে। তারা ইতিমধ্যে তাঁর দলের তিনজন নেতাকে হত্যা করেছে। তিনি এর বদলা নিতে বলেছেন। তাঁর দলের একজনকে মারলে তিনজন কমিউনিস্টকে হত্যা করা হবে এবং এটা বাস্তবায়ন করা হয়েছে। তিনি অনেক বছর পাকিস্তানের জেলে বন্দি ছিলেন। যদি দেশের ঐক্য ধরে রাখা না যায়, তাহলে তিনি গুলির মুখোমুখি হতে পিছপা হবেন না। তাঁকে যদি আবারও জেলে নেওয়া হয় কিংবা যদি কেটে টুকরা টুকরা করে ফেলা হয়, তবু তিনি জনগণের দেওয়া ম্যান্ডেট থেকে সরে আসবেন না। তিনি বিচ্ছিন্নতা চান না। তিনি চান একটা কনফেডারেশন, যেখানে বাংলাদেশ তার ন্যায্য হিস্যা পাবে।

শেখ মুজিব আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে একটা শান্তিপূর্ণ মীমাংসা চেয়েছিলেন। ফরাসি বার্তা সংস্থা এএফপিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন :

> পশ্চিম পাকিস্তানিরা কি জানে না যে কেবল আমিই পূর্ব পাকিস্তানকে কমিউনিজমের হাত থেকে বাঁচাতে পারি? তারা (পাকিস্তানিরা) যদি যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে আমি ক্ষমতা হারাব এবং মাওবাদী নকশালপন্থীরা আমার নামে ঢুকে পড়বে। আমি যদি বেশি ছাড় দিই, আমার কর্তৃত্ব হারাব। আমি একটা কঠিন সংকটে পড়েছি।

চিনপন্থী কমিউনিস্টরা ছিল কট্টর আওয়ামী লীগবিরোধী। আওয়ামী লীগাররা ছিল কট্টর কমিউনিস্টবিরোধী। রাজনীতির মাঠে সংঘাতের একটা জমি তৈরি হয়েই ছিল। এই সংঘাত পরের বছরগুলোতে ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি করেছিল।

৫

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করেছিলেন, একাত্তরের ৩ মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসবে। পরিষদের কাজ হলো, ১২০ দিনের মধ্যে একটি সংবিধান তৈরি করা। কিন্তু ভুট্টো পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিতে অস্বীকার করেন। ফলে তৈরি হয় অচলাবস্থা। পয়লা মার্চ এক বেতার ঘোষণার মাধ্যমে ৩ মার্চ অনুষ্ঠেয় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করা হয়। এর তীব্র প্রতিক্রিয়া হয় ঢাকায়। জনতা রাস্তায় নেমে পাকিস্তানের পতাকা পুড়িয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করে দেয়। ২ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন প্রাঙ্গণে ছাত্রলীগের এক সমাবেশে স্বাধীন বাংলার পতাকা তোলা হয়।

ওই সময় সব আলোচনার কেন্দ্রে শেখ মুজিব। সবাই তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে—তিনি কী বলেন, কী করেন, কী নির্দেশনা দেন। ২ মার্চ পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের পক্ষ থেকে একটি প্রচারপত্র বিলি করা হয়। এর শিরোনাম ছিল—শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের উদ্দেশে পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের খোলা চিঠি। প্রচারপত্রে বলা হয়, সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন ও মুক্ত করেই ছয় দফার অর্থনৈতিক দাবিগুলো বাস্তবায়ন করা সম্ভব। পূর্ব বাংলার ওপর পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের অবসান ঘটিয়ে 'স্বাধীন ও সার্বভৌম পূর্ব বাংলার প্রজাতন্ত্র' কায়েমের জন্যই সাত কোটি মানুষ শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়েছে। প্রচারপত্রে শেখ মুজিবের কাছে কয়েকটি প্রস্তাব তুলে ধরা হয় :

১. পূর্ব বাংলার জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে এবং জাতীয় পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের নেতা হিসেবে স্বাধীন গণতান্ত্রিক শান্তিপূর্ণ, নিরপেক্ষ, প্রগতিশীল পূর্ব বাংলার গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিন।
২. কৃষক-শ্রমিক, প্রকাশ্য ও গোপন, সকল দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক দল ও ব্যক্তির প্রতিনিধি নিয়ে পূর্ব বাংলার প্রজাতন্ত্রের অস্থায়ী সরকার কায়েম করুন। প্রয়োজনে সরকারের কেন্দ্রীয় দপ্তর নিরপেক্ষ কোনো দেশে নিয়ে যান।

স্বাধীন গণতান্ত্রিক, শান্তিপূর্ণ, নিরপেক্ষ,
প্রগতিশীল পূর্ববাংলার গণতান্ত্রিক
প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কর্মসূচী

পূর্ববাংলার শ্রমিক শ্রেণীর একটি বিপ্লবী রাজনৈতিক
পার্টি প্রতিষ্ঠার একটি সংগঠন 'পূর্ববাংলার
শ্রমিক আন্দোলন' কর্তৃক প্রকাশিত।

স্বাধীন প্রজাতন্ত্র
প্রতিষ্ঠার কর্মসূচি

৩. এ সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য সশস্ত্র জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের আহ্বান জানান। এ উদ্দেশ্যে জাতীয় মুক্তিবাহিনী গঠন এবং শহরে ও গ্রামে জাতীয় শত্রু খতম ও তাদের প্রতিষ্ঠান ধ্বংসের আহ্বান জানান।
৪. সকল দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক দল ও ব্যক্তির প্রতিনিধিদের নিয়ে জাতীয় মুক্তি পরিষদ বা জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট গঠন করুন।
৫. প্রকাশ্য ও গোপন, শান্তিপূর্ণ ও সশস্ত্র, সংস্কারবাদী ও বিপ্লবী পদ্ধতিতে লড়াই করার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

এই আহ্বানের সঙ্গে যুক্ত হয় ১৩ দফা কর্মসূচি, যা ছিল একটি রাজনৈতিক দল বা সরকারের ম্যানিফেস্টোর মতো। যেমন, জাতীয় বিশ্বাসঘাতকদের নাগরিক অধিকার বাতিল করা, গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রীয় মালিকানায় নিয়ে আসা, সংখ্যালঘুর সম-অধিকার প্রতিষ্ঠা করা, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পররাষ্ট্রনীতি বাস্তবায়ন করা, ছাত্র-শিক্ষক-বুদ্ধিজীবীদের ন্যায্য দাবিদাওয়া মেনে নেওয়া ইত্যাদি। প্রচারপত্রের শেষে সতর্ক করে দিয়ে বলা হয়, 'আপনি ও আপনার পার্টি অবশ্যই উপরোক্ত প্রস্তাবের ভিত্তিতে জনতার এই

আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন করবেন। অন্যথায় পূর্ব বাংলার জনগণ কখনোই আপনাকে ও আওয়ামী লীগকে ক্ষমা করবে না।'

এটি ছিল একটি প্রচারপত্র, যাকে প্রচলিত অর্থে খোলা চিঠি বলা হয়ে থাকে। এটি আওয়ামী লীগের কাছে পৌঁছানো হয়েছিল বলে জানা যায় না। কতজন কত কিছুই তো বলেন। বক্তব্যে সারবস্তু থাকলে তা গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়ার একটা চেষ্টা থাকতে হয়। এ দেশের রাজনীতিতে দলগুলোর মধ্যে দ্বিপক্ষীয় বা বহুপক্ষীয় বৈঠক ও সমঝোতার অনেক নজির আছে। শ্রমিক আন্দোলন কখনেই আওয়ামী লীগের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকের কথা ভাবেনি। প্রচারপত্র দিয়েই তারা কাজ সেরেছে। নিজ দলের কাছে এই প্রচারপত্রের দালিলিক মূল্য হয়তো আছে। কেননা, এর মাধ্যমে এই দলের ওই সময়ের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যায়। কিন্তু সবাইকে নিয়ে জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট গড়তে হলে তো একসঙ্গে বসতে হবে।

এখানে আরেকটি বিষয় তাৎপর্যপূর্ণ। শ্রমিক আন্দোলন সব দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক দলকে নিয়ে একটি অস্থায়ী সরকার ও জাতীয় মুক্তি পরিষদ গঠনের প্রস্তাব দিয়েছে। অথচ তারা এ যাবৎ অন্য সব দলকে সংশোধনবাদী, নয়া-সংশোধনবাদী, চক্রান্তকারী ও জাতীয় শত্রু হিসেবে গণ্য করেছে। প্রশ্ন জাগে, এসব কি শুধুই কথার কথা, নাকি তারা তাদের আগের অবস্থান থেকে সরে এসেছে?

৬

২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তান সামরিক বাহিনী শুরু করে 'অপারেশন সার্চলাইট'। এটাই পরে 'ক্র্যাকডাউন' নামে পরিচিতি পায়। অতর্কিত হামলায় অনেকেই হতাহত হয়। শেখ মুজিব তাঁর বাসা থেকে গ্রেপ্তার হন রাত ১টা ৩০ মিনিটে। শুরু হয় বাঙালির প্রতিরোধযুদ্ধ। রাজনৈতিক নেতারা অনেকেই সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে আশ্রয় নেন।

১০ এপ্রিল শিলিগুড়ির একটি বেতার কেন্দ্র থেকে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদের ভাষণ প্রচার করা হয়। ঘোষণায় বলা হয়, তাঁকে প্রধানমন্ত্রী করে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠন করা হয়েছে। ১৭

এপ্রিল কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুরের সীমান্তবর্তী অখ্যাত বৈদ্যনাথতলা গ্রামে বাংলাদেশের একটি ঘোষণাপত্র পাঠ করা হয়। শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপরাষ্ট্রপতি তথা অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি এবং তাজউদ্দীন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়া হয়। বৈদ্যনাথতলার নাম হয় মুজিবনগর। পরে বাংলাদেশ সরকারের সদর দপ্তর স্থানান্তরিত হয় কলকাতায় ৮ নম্বর থিয়েটার রোডের একটি বাড়িতে। এই সরকার পরিচিত হয় নানান নামে—মুজিবনগর সরকার, প্রবাসী সরকার, অস্থায়ী সরকার।

২৫ মার্চের পর পরিস্থিতি আমূল পাল্টে যায়। বাংলাদেশ সরকার গঠনের ফলে তৈরি হয় নতুন বাস্তবতা। পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন ২০ এপ্রিল একটি বিবৃতি প্রকাশ করে। পরিস্থিতির মূল্যায়ন করে ও প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বিবৃতিতে বলা হয় :

> পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী জনসাধারণের ওপর পূর্ণ সামরিক শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং হত্যা ও ধ্বংসলীলা শুরু করে। লক্ষ লক্ষ নিরস্ত্র নিরপরাধ জনসাধারণ নিহত হয়, আহত হয় ও প্রাণভয়ে সর্বস্ব পরিত্যাগ করে গ্রামে যেতে বাধ্য হয়। তবুও তারা অসীম আত্মত্যাগ ও বীরত্বের সাথে প্রায় নিরস্ত্রভাবে প্রতিরোধ সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। রক্তের ঋণ তারা তুলবেই।
>
> এ পর্যায়ে শেখ মুজিব ও তাজউদ্দীনের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের একক সরকার গঠনের কথা ভারতের বেতারে শোনা যায়।
>
> পূর্ব বাংলার জনগণ ও পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন মনে করে, পূর্ব বাংলার জনগণের স্বার্থের সত্যিকার প্রতিনিধিত্বকরী সরকারের নিম্নলিখিত সর্বনিম্ন সুনির্দিষ্ট নীতিসমূহ পালন করতে হবে :
>
> - এই সরকার অবশ্যই একটি কোয়ালিশন সরকার হবে, যেখানে সংগ্রামরত প্রকাশ্যে ও গোপনে কর্মরত দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক পার্টি, গোষ্ঠী, ব্যক্তি, ধর্মীয় ভাষাগত উপজাতীয় সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্ব থাকবে।
> - এ সরকারের উচিত সর্বস্তরের জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে সংগ্রাম পরিচালনা ও নেতৃত্ব প্রদানের জন্য পারস্পরিক স্বাধীনতা ও স্বতন্ত্রতার ভিত্তিতে একটি জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট স্থাপন করা।

- মুক্তিফ্রন্ট কর্তৃক পূর্ব বাংলার পরিপূর্ণ মুক্তির জন্য গণযুদ্ধের পথ গ্রহণ করা ও তাতে শেষ পর্যন্ত লেগে থাকা।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, এই নীতিগুলো গ্রহণ না করলে জনগণের সত্যিকার মুক্তি আসবে না এবং এসব বাদ দিলে মুক্তিসংগ্রাম হবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের ষড়যন্ত্রে পরিচালিত প্রতিবিপ্লবী সংগ্রাম। এর ফলে পূর্ব বাংলা হবে সাম্রাজ্যবাদ, সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদের উপনিবেশ এবং এ সরকার হবে এদের পুতুল সরকার। পূর্ব বাংলার জনগণ এক ঔপনিবেশিক শাসনের পরিবর্তে আরেক ঔপনিবেশিক শোষণের জালে আবদ্ধ হতে চায় না। এ শর্তগুলো না মানলে শ্রমিক আন্দোলন এই সরকারকে সমর্থন ও সহযোগিতা করবে না।

'পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের কর্মীরা সাহসী হোন, দৃঢ়ভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করুন, জাতীয় শত্রু খতম করুন, জাতীয় মুক্তিবাহিনী গড়ে তুলুন, কর্মসূচি বাস্তবায়ন করুন' শিরোনামে আরেকটি প্রচারপত্রে বিরাজমান পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে বলা হয়, আওয়ামী লীগ ধ্বংসের দিকে যাচ্ছে। তাদের নেতারা নিষ্ক্রিয় হয়েছে বা পালিয়ে গেছে। তারা রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করার সুযোগ পেয়েও কাজে লাগায়নি। তাদের ব্যর্থতা ও দেউলিয়াপনা এখন স্পষ্ট।

প্রচারপত্রে দলের অবস্থান ব্যাখ্যা করে বলা হয়, এ অবস্থায় বিস্তীর্ণ গ্রাম এলাকায় পূর্ব বাংলা প্রজাতন্ত্রের সরকার কায়েম করা, জাতীয় শত্রু খতম করা এবং জাতীয় মুক্তিবাহিনী গড়ে তোলা সম্ভব। গ্রামের জনসাধারণের মধ্য থেকে জাতীয় মুক্তিবাহিনীর সদস্য সংগ্রহ করে তাদের সশস্ত্র করতে হবে। এই বাহিনী গ্রাম ও ছোট শহর দখল করে রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করবে।

গ্রাম দখল করে জনগণের মধ্য থেকে মুক্তিবাহিনী গড়ে তোলা এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগ করার নীতির সঙ্গে ১৯৩০ ও ৪০-এর দশকে চিনা কমিউনিস্ট পার্টির রণনীতির সঙ্গে মিলে যায়। কিন্তু এ দেশে গ্রাম দখল করে শত্রুর আক্রমণের বিরুদ্ধে নিজেকে রক্ষা করে টিকে থাকা সম্ভব কি না, এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। চিনের বিশাল ভূখণ্ডের বিচ্ছিন্ন অঞ্চলগুলোর পক্ষে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে প্রকৃতিগতভাবে টিকে থাকার যে অনুকূল পরিবেশ ছিল, পূর্ব বাংলায় তা আদৌ সম্ভব কি না, তা বিবেচনায় নেওয়া হয়নি।

৭

যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে সিরাজ সিকদার ঢাকা ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেন। প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ শহর ছেড়ে আশ্রয়ের জন্য গ্রামের দিকে ছুটছে। অনেকেই যাচ্ছে সীমান্তের দিকে। সিকদার মাদারীপুর হয়ে বরিশাল পৌঁছান ১৮ এপ্রিল। সঙ্গে গাইড কালো মুজিব।

বরিশাল অঞ্চলে পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের অনেক কর্মী-সমর্থক ছিল। এই জেলার সাংগঠনিক দায়িত্বে ছিলেন রামকৃষ্ণ পাল। দলের মধ্যে তিনি মাহতাব নামে পরিচিত। আরেকজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা হলেন সেলিম শাহনেওয়াজ। তাঁর দলীয় নাম ফজলু। মাহতাব, ফজলু ও মুজিবকে নিয়ে সিকদার যান ঝালকাঠি। এখানকার বিস্তীর্ণ পেয়ারাবাগান দেখে তিনি উৎসাহী হন। মনে হলো, এ এলাকা গেরিলাযুদ্ধের জন্য আদর্শ ঘাঁটি হতে পারে। তিনি যথেষ্ট পরিমাণ চাল ডাল তেল লবণ ইত্যাদি নিয়ে অনেকগুলো নৌকাসহ পেয়ারাবাগানে ঘাঁটি গাড়েন। ৩০ এপ্রিল পেয়ারাবাগানে জন্ম হলো শ্রমিক আন্দোলনের 'জাতীয় মুক্তিবাহিনী'।

পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের ২৩ এপ্রিলের প্রচারপত্রে জাতীয় মুক্তিবাহিনী গঠনের আহ্বান ছিল। এবার তা বাস্তবায়ন হলো। মুক্তিবাহিনীর একটি কাঠামো তৈরি হলো—সাত বা নয়জনকে নিয়ে একটি সেকশন, তিনটি সেকশন নিয়ে একটি স্কোয়াড, তিনটি স্কোয়াড নিয়ে একটি প্লাটুন। গঠন করা হলো একটি কেন্দ্রীয় কমান্ড। সিকদার নিজেই এর প্রধান। সহকারী মাহতাব ও ফজলু।

ঝালকাঠি, বানারীপাড়া, স্বরূপকাঠি ও কাউখালী থানার ৬২টি গ্রাম নিয়ে এই পেয়ারাবাগান। ভিমরুলীতে স্থাপন করা হলো সদর দপ্তর। সেখানে সামরিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা হলো। সিকদার নিজেই প্রশিক্ষণের তত্ত্বাবধান করেন। গেরিলাদের জন্য তৈরি হয় আচরণবিধি। মাওয়ের 'যুদ্ধ ও রণনীতির সমস্যা' নিবন্ধ থেকে হুবহু তুলে দেওয়া হয় আচরণবিধি, যা ছিল এরকম :

১. সকল কাজে আদেশ মেনে চলুন।

২. জনগণের কাছ থেকে একটি সুচ-সুতোও নেবেন না।

৩. দখল করা সব জিনিস ফেরত দিতে হবে।

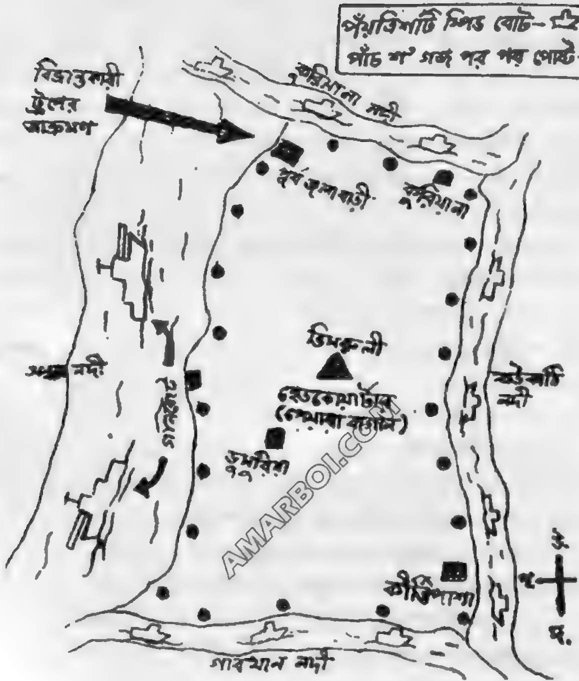
মনোযোগ দেওয়ার আটটি ধারা :

১. ভদ্রভাবে কথা বলুন।
২. ন্যায্যমূল্যে কেনাবেচা করুন।
৩. ধার করা প্রতিটি জিনিস ফেরত দিন।
৪. কোনো জিনিস নষ্ট করলে তার ক্ষতিপূরণ দিন।
৫. মানুষকে মারবেন না, গালমন্দ করবেন না।
৬. ফসল নষ্ট করবেন না।
৭. নারীর সঙ্গে অশোভন আচরণ করবেন না।
৮. যুদ্ধবন্দির সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করবেন না।

পেয়ারাবাগানের ঘাঁটিকে ঘিরে এলাকাটি আটটি সেক্টরে ভাগ করা হয় বলে মুনীর মোরশেদের দেওয়া বিবরণে জানা যায়। সেক্টরগুলোর আলাদা নাম। প্রত্যেক সেক্টরে একজন রাজনৈতিক কমিসার এবং একজন কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পান। তাঁরা হলেন :

১. কীর্তিপাশা : রাজনৈতিক কমিসার পণ্ডিত ওরফে নুরুল ইসলাম: কমান্ডার ভবরঞ্জন।
২. শতদশকাঠি : রাজনৈতিক কমিসার আলিম ওরফে হিরু: কমান্ডার মনসুর।
৩. আটঘর : রাজনৈতিক কমিসার আতাউর ওরফে খোরশেদ আলম; কমান্ডার আনিস।
৪. বাউকাঠি : রাজনৈতিক কমিসার আসাদ; কমান্ডার আনিস।
৫. পশ্চিম জলবাড়ি : রাজনৈতিক কমিসার ফুকু চৌধুরী; কমান্ডার শ্যামল।
৬. কুড়িয়ানা : রাজনৈতিক কমিসার রেজাউল, কমান্ডার মানিক।
৭. আতা : রাজনৈতিক কমিসার ফিরোজ কবির; কমান্ডার মিলু।
৮. পূর্ব জলবাড়ি : রাজনৈতিক কমিসার মান্নান; কমান্ডার শাহজাহান।

পাকিস্তানি সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য অপেক্ষা করতে হয় আরও একটি সপ্তাহ। ৭ মে কীর্তিপাশা নদী দিয়ে পাকিস্তানিদের একটি দল লঞ্চযোগে



পেয়ারাবাগান। পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টির আঁতুড়ঘর

প্রবেশ করে। সারাদিন আগুন দিয়ে গ্রাম জ্বালিয়ে আর লুটপাট করে ফেরার পথে শতদশকাঠি এলাকায় সিকদারের নেতৃত্বে সবগুলো সেক্টরের গেরিলারা তাদের ওপর একযোগে হামলা চালায়। অতর্কিত আক্রমণে ২৪ জন পাকিস্তানি সৈন্য নিহত এবং অনেক সৈন্য আহত হয়। তাদের অনেক অস্ত্র গেরিলাদের দখলে আসে।

২ জুন পাকিস্তানি বাহিনী পেয়ারাবাগান ঘেরাও করে। ৩ জুন পেয়ারাবাগানে এক সভায় পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন অবলুপ্ত হয়। 'পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি' নামে নতুন দলের আত্মপ্রকাশ ঘটে। পেয়ারাবাগানে সমবেত নেতা-কর্মীদের মধ্য থেকে জরুরি ভিত্তিতে একটি আহ্বায়ক কমিটি বানানো হয়। সিরাজ সিকদার আহ্বায়ক হন। কমিটির সদস্যদের মধ্যে ছিলেন সামিউল্লাহ আজমী ওরফে তাহের, সেলিম শাহনেওয়াজ ওরফে ফজলু, রামকৃষ্ণ পাল ওরফে মাহতাব, জাহানারা হাকিম ওরফে রাহেলা এবং ঝালকাঠির মুজিব।

পেয়ারাবাগান নিয়ে সিরাজ সিকদারের আবেগ ছিল অপরিসীম। এটা ছিল পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টির আঁতুড়ঘর। এখানেই শুরু হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধে তাঁদের প্রথম প্রতিরোধ। এই স্মৃতি নিয়ে সিকদার লিখলেন 'পেয়ারাবাগান, মহান পেয়ারাবাগান' নামে একটি দীর্ঘ কবিতা, যার পঙ্‌ক্তিগুলো ছিল এরকম :

> তোমরা কি দেখেছো পেয়ারাবাগান?
> শুনেছো ভিমরুলী, ডুমুরিয়া
> আটঘর, কুড়িয়ানার নাম?
> রাতের অন্ধকারে খাল বেয়ে
> গেরিলাদের নৌকা নিঃশব্দে চলে যায়। ...
> শত্রুর অপেক্ষায় আমরা অ্যামবুশ পাতি।
> পেয়ারা গাছের ঝোপে ঢাকা
> খালগুলো চমৎকার ট্রেঞ্চ।
> এর মাঝে আমাদের গোপন আস্তানা।
> যুদ্ধরত গেরিলারা
> সন্ধ্যায় হাজির হয় ক্যাডার স্কুলে।
> যুদ্ধ আর সংগঠন, পার্টির ক্লাস
> মনে হয় বাংলার ইয়েনান এই পেয়ারাবাগান। ...
> পেয়ারাবাগান
> গণযুদ্ধের মহান উপাখ্যান
> আমাদের ড্রেস রিহার্সেল।

৮

সশস্ত্র প্রতিরোধ এবং বিপ্লব তখন তরুণমনের ক্রেজ। এঁদের একজন আলমতাজ বেগম। ডাক নাম ছবি। মুক্তিযুদ্ধ যখন শুরু হয় ছবির বয়স তখন ষোলো। পড়েন ক্লাস নাইনে। তাঁর বড় ভাই ফিরোজ কবির পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের সংগঠক। দলে তাঁর নাম তারেক। ভাই ও তাঁর বন্ধুদের কাছে মুক্তিযুদ্ধের গল্প শুনে ছবি যুদ্ধ করার আগ্রহ দেখান। তিনি শুনেছেন, পাকিস্তানি সৈন্যরা মেয়েদের জোর করে ধরে নিয়ে যায়। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, পালিয়ে বেড়ানোর চেয়ে যুদ্ধ করাই উত্তম। এভাবেই ছবি হয়ে গেলেন একজন মুক্তিযোদ্ধা।

ফিরোজ কবিরের বন্ধুদের একজন সেলিম শাহনেওয়াজ। দুজন সহপাঠী। একই দল করেন। দলে তার নাম ফজলু। এই দলে ভিড়ে গেলেন ছবি। নাম হলো মিনু। ফজলুর সঙ্গে মিনুর প্রেম-ভালোবাসা হলো। রণাঙ্গনেই বিয়ে হলো তাঁদের। ছবির কথায় জানা যায়, 'একাত্তরের ২৮ মে ক্যাম্পে গুলির শব্দ আর বারুদের গন্ধের মধ্যেই বিয়ে হলো আমার। বর সহযোদ্ধা সেলিম শাহনেওয়াজ। সহযোদ্ধারা বেশ আনন্দফুর্তি করে ফুল দিয়ে বুঝিয়ে দিল, আমাদের বিয়ে হয়েছে।'

একাত্তরের ৩ জুন পেয়ারাবাগানের কুড়িয়ানায় পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এল পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি। পার্টির গেরিলারা পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধযুদ্ধ করছেন। যুদ্ধের প্রধান নেতা সিরাজ সিকদার। দ্বিতীয় প্রধান নেতা হলেন মুজিবুর রহমান। তাঁকে অনেকেই ডাকেন কালো মুজিব নামে। তৃতীয় ব্যক্তিটি হলেন ফিরোজ কবির। যুদ্ধে সরাসরি অংশ নেন ছবি। এই উপাখ্যান উঠে এসেছে শওকত হোসেন মাসুমের ব্লগে। তাঁকে দেওয়া ছবির বিবরণে জানা যায় :

> সিরাজ সিকদারের সঙ্গে আমিও একটা অপারেশনে গিয়েছিলাম। সেটি ছিল স্বরূপকাঠির সন্ধ্যা নদীতে। পাকিস্তানি বাহিনীর সঙ্গে আমাদের গেরিলাযুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে সেলিম শাহনেওয়াজ ছিলেন। আমিই প্রথম পাকিস্তানিদের গানবোটে গ্রেনেড ছুড়ে মারি। আমি



আলমতাজ বেগম
ডাক নাম ছবি

যখন গ্রেনেডের পিনটা খুলি, তখন বুক ধড়ফড় করছিল। কি জানি, গ্রেনেডটা যদি আমার হাতেই বিস্ফোরিত হয়! হামলায় গানবোটের সব পাকিস্তানি সৈন্য ও তাদের দোসররা মারা যায়।

আমার নেতৃত্বেও গেরিলাযুদ্ধ হয়েছিল। ঝালকাঠির গাবখান চ্যানেল দিয়ে পাকিস্তানি বাহিনীর একটা স্পিডবোট যাচ্ছিল। খবরটা আমরা আগেই পেয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, ছয়-সাতজন মিলে হামলা চালাব। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধ করার মতো অস্ত্র আমাদের ছিল না। সিরাজ সিকদারের নির্দেশে আমি গেরিলা কায়দায় পাকিস্তানি গানবোটে গ্রেনেড আর হাতবোমা ছুড়ে মারি। এ হামলায় গানবোটটি নদীতে ডুবে যায়। সব পাকিস্তানি সৈন্য মারা যায়।

ঢাকার জগন্নাথ কলেজে পড়তেন গৌরাঙ্গ লাল আইচ। যুদ্ধ শুরু হলে তিনি বরিশালে গ্রামের বাড়িতে চলে যান। তিনি পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। দলে তাঁর নাম কমরেড জাহিদ। পেয়ারাবাগানের প্রতিরোধযুদ্ধে তিনি অংশ নিয়েছিলেন। পরে কলকাতায় চলে যান। নিজের নাম ছোট

করে লিখতেন জি এল আইচ। এটি পরে জুয়েল আইচে রূপান্তরিত হয়। ম্যাজিশিয়ান হিসেবে খ্যাতি পান তিনি। রাজু আলাউদ্দিনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে উঠে এসেছে তাঁর মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি :

আমাকে সাতজনের একটা গ্রুপের লিডার করে দেওয়া হলো। প্রথমে যে যুদ্ধটা হলো, কাপড়কাঠি বলে একটা জায়গা ছিল, স্বরূপকাঠি, বানারীপাড়া এবং ঝালকাঠি এই তিন এলাকা নিয়ে একটা বিশাল পেয়ারাবাগান। ওই পেয়ারাবাগানের মধ্য দিয়ে বয়ে গেছে একটা ছোট নদী। একটা গ্রামের নাম ছিল কাপড়কাঠি। ওই সময় নদীটাকে কাপড়কাঠি নদী বলতাম। ওইখানে ৫০০ গজের মতো জায়গায় ছয়-সাতটা ইউনিট একত্রিত হলাম। একজন সিনিয়র লিডারের হাতে সংকেত দেওয়ার জন্য রইল বাঁশি। আমাদের প্রত্যেকের হাতে কিন্তু প্রাচীন থ্রি নট থ্রি রাইফেল। আর ওদের হাতে মেশিনগান, শেল। যুদ্ধ যে কী ভয়াবহ হতে পারে আমরা জানতাম। ওই ৫০০ গজের মধ্যে আমরা আলাদা আলাদা ইউনিট নিয়ে অবস্থান করলাম।

আমাদের প্ল্যান ছিল যে, আমাদের ঘর পুড়তে, মানুষ মারতে ওরা আসত সকালে। সকালে আমরা ওদেরকে আক্রমণ করব না। যেহেতু আমরা গেরিলাযুদ্ধ করছি। তাই ওরা যখন দুর্বল তখন ওদেরকে আঘাত করার আমাদের আসল টাইম। আমরা অ্যামবুশ করে রেখেছি। ওরা আসত কাঠের লঞ্চে। আমরা ওটাকে বলতাম ঘরপোড়া লঞ্চ। যখন ওরা জাহাজ থেকে নেমে গেল, তখন আমরা পজিশন নিয়ে বসে থাকলাম। কারণ, ঘরটর পুড়িয়ে মানুষ মেরে ঠিক বিকেলে ওরা ঠিকই আসছে, যখন সূর্য ডুবে যাবে। তার আগে ওরা থানায় যাচ্ছে। থানায় ওদের ঘাঁটি। গানবোটসহ অনেক কিছুই আছে। আমরা যেহেতু গানবোটের সঙ্গে পারব না, তাই আমরা টার্গেট করলাম ওই কাঠের লঞ্চ, যেটাতে করে ওরা আসত। আমরা আমাদের সিনিয়র লিডারের (সিরাজ সিকদার) হুইসেলের অপেক্ষায় আছি।

কথা ছিল যে, লঞ্চটি যখন আমাদের রেঞ্জের মাঝখানে পড়বে তখন আমরা গুলি করব সারেংকে। তারপর এলোপাতাড়ি গুলি করব লঞ্চটির গায়ে যাতে ডুবে যায়। লঞ্চটি আমাদের রেঞ্জের কাছাকাছি আসার

আগেই আমাদের কারও একজনের বন্দুক থেকে গুলি বেরিয়ে গেছে। ওরা তখন কোনোদিকে না তাকিয়েই মেশিনগান থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি করতে থাকল। আমরা তো ঘাবড়ে গেছি। লঞ্চটি যাচ্ছিল ভাটির দিকে। ইতিমধ্যে লঞ্চ আমাদের ঠিক সেন্টারে এসে পড়েছে। আমরা ধমাধম গুলি করলাম। সারেং পড়ে গেছে, লঞ্চ ঘুরে গেছে। এবার লঞ্চে যখন আমরা গুলি করেছি, তখন লঞ্চটি ফেটে উল্টে গেছে। আর ওরা সাঁতার না জানা কুকুরের মতো হাবুডুবু খেতে থাকল।

তারপর ওরা কেউ কেউ কাঠ-ফাট ধরে ওপরে গিয়ে উঠল। উঠেই মেশিনগান সেট করে শাঁ শাঁ গুলি করতে থাকে। তখন গোধূলি, তখনো অন্ধকার হয়নি। ওরা কল্পনাই করতে পারেনি যে একটা পেয়ারাবাগানের মধ্যে একদল গ্রাম্য মানুষ এমন করবে। ওরা প্যানিকের চোটে মেশিনগান চালাচ্ছে তো চালাচ্ছেই। এরপর রাত বারোটা কি সাড়ে বারোটার পর ওদের গুলির শব্দ আর পাওয়া যায়নি।

ওরা ঝোপের মধ্যে আশ্রয় নিল। আমাদের পরিকল্পনা হলো সকালের আলো যখন ফুটবে তখন নৌকা নিয়ে ওপারে যাব। ওদিকে গ্রামের শত শত লোক মারতে মারতে ওদের চারটাকে ধরে নিয়ে আসছে। তাদের এমন পিটিয়েছে যে তারা সোজা হয়ে দাঁড়াতেও পারছে না। ওদেরকে নিয়ে আমরা গরুর মতো করে রশি বেঁধে গলায় জুতো ঝুলিয়ে হাটে হাটে ঘোরাব। আবার এটা জানি, এটা আমরা বেশিদিন করতে পারব না, কারণ পাকবাহিনী প্রতি আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হবে। তবে ওরা এত ভয় পেয়ে গেল যে পরবর্তী সাত দিন আর আমাদের এলাকায় আসে নাই।

একসময় কী হলো, ওই যে শর্ষিনার পীর ছিল না, সে কুৎসিত কুৎসিত ফতোয়া দিতে শুরু করল। যেমন বলতে শুরু করল, যারা স্বাধীনতা চায় তাদের সমস্ত সম্পত্তি এবং বউ-মেয়ে এরা হচ্ছে গণিমতের মাল। ওই পীরের মাদ্রাসার ছাত্র এবং তার হাজার হাজার মুরিদকে ডেকে আনা হলো, হাজার হাজার দা দিয়ে পেয়ারাবাগান কাটার জন্য। পুলিশ তো তাদের পক্ষেই ছিল। চৌকিদার আগে থেকেই কাজ করছিল আর ওই সমস্ত দালালগুলো।

এরা আমাদের পুরো পেয়ারাবাগান সাফ করে ফেলল। আমরা

মুক্তিবাহিনী ওখানে আছি জেনে আশপাশে যত বন্দর আছে সেখান থেকে লোকজন এসে বাঁচার জন্য ওখানে থাকত। এই মুহূর্তে আমি একটা কথা বললে লোকজন বিশ্বাস করবে না। কিন্তু সত্যটা আমি জানি যেহেতু, আমাকে বলতেই হবে। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বধ্যভূমি হলো আটঘর-কুড়িয়ানার এই এলাকাগুলো। কারণ, ওই এলাকার পাঁচ হাজার মানুষকে মেরে ফেলেছে ওরা। মাইন্ড ইট, নট ফাইভ হান্ড্রেড, ফাইভ থাউজেন্ড।

পেয়ারাবাগান সাফ করে ফেলল। তখন আমরা যে যার মতো নিজের আশ্রয় খোঁজার চেষ্টা করলাম। আমি চলে গেলাম সোহাগ্গল। একদিন এক ভদ্রলোক, নাম খলিল হাজরা, হুলারহাট থেকে এসেছেন। উনি ইন্ডিয়াতে গিয়েছিলেন। আমাদের তখনকার যিনি এমএনএ ছিলেন, ওনার নাম এনায়েত হোসেন খান। উনি ওই ভদ্রলোককে পাঠিয়েছেন দেশ থেকে মুক্তিকামী যুবকদের রিক্রুট করার জন্য।

সোহাগ্গল থেকে কাউকে পায়নি, আমাকে পেয়েছিল। আমি তো যাওয়ার জন্য রেডি। হাঁটতে হাঁটতে গেলাম হুলারহাট, কচুয়া। এরকম করে আশাশুনি, তালা, কালিগঞ্জ। পরে হিঙ্গোলগঞ্জে গিয়ে পৌঁছলাম। হিঙ্গোলগঞ্জ থেকে গেলাম হাসনাবাদ। হাসনাবাদে একটা লঞ্চ ছিল। আমাদেরকে নিতে পাঠিয়েছিলেন এনায়েত হোসেন খান। তাঁর কোনো লঞ্চ-টঞ্চ ছিল না। মঞ্জু সাহেবের লঞ্চ ছিল। আওয়ামী লীগের এমএনএ ছিলেন তিনি। লঞ্চে ধারণক্ষমতার চেয়ে তিন গুণ লোক ওখানে গিয়ে হাজির হয়েছে। ওইখানে আমাদের রিক্রুট করবে।

যুদ্ধের সময় একপর্যায়ে সিরাজ সিকদারের সঙ্গে সেলিম শাহনেওয়াজ ও ফিরোজ কবিরের মতভেদ হয়। তাঁরা চেয়েছিলেন, সিকদার পেয়ারাবাগান থেকে সরে যাক। সিকদার চাচ্ছেন সেখানে থাকতে। কিন্তু বিরোধিতার মুখে তিনি নিজেকে প্রত্যাহার করে নেন।

সেলিম-ছবি অর্থাৎ ফজলু-মিনুর সম্পর্ক মেনে নিতে পারেননি সিরাজ সিকদার। তিনি এই সম্পর্কের মধ্যে ভালোবাসা দেখেননি। দেখেছেন মধ্যবিত্তের আবেগ ও যৌনতা। অথচ সিকদার ছাত্র থাকাকালে বিয়ে করেছিলেন গ্রামের অপ্রাপ্তবয়স্ক গরিব কৃষকের মেয়ে রওশন আরাকে। পরে



ফিরোজ কবির

তিনি রওশনকে তালাক দিয়ে বিয়ে করেন জাহানারা হাকিমকে। বিয়ের আগে তাঁরা দুজন একসঙ্গে থাকতেন। তিনি নিজে এ ধরনের জীবনযাপন করলেও দলের অন্যদের বেলায় এটি অনুমোদন করেননি। ফজলু-মিনুর সম্পর্ক তিনি গ্রহণ করেননি।

যুদ্ধ চলাকালেই সিকদারের সঙ্গে ফিরোজ কবিরের দ্বন্দ্ব তীব্রতর হয়। বরিশাল অঞ্চলে ফজলু এবং ফিরোজ কবির ওরফে তারেকের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। ফিরোজ তাঁর বহিষ্কারাদেশ মেনে নেননি। যুদ্ধ চলাকালেই তিনি পাকিস্তানিদের হাতে বন্দি হন। বরিশালের ব্যাপটিস্ট মিশনের লাগোয়া খালের ধারে দাঁড় করিয়ে পাকিস্তানিরা তাঁকে হত্যা করে। দিনটি ছিল ১৮ আগস্ট। মুক্তিযোদ্ধা ফিরোজ কবির নিজের দলের কাছে শহীদের মর্যাদা পাননি। তাঁকে দলের লোক হিসেবে স্বীকার করা হয়নি।

৯

সর্বহারা পার্টির অনেকের অভিযোগ, 'জাতীয় ঐক্যে'র ডাক দেওয়া সত্ত্বেও মুক্তিযুদ্ধের সময় তাদের অনেক সদস্যকে আওয়ামী লীগের লোকেরা হত্যা করেছে। এ ব্যাপারে সর্বহারা পার্টির দ্বিতীয় প্রধান নেতা সামিউল্লাহ আজমীকে হত্যার সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আছে। মুক্তিযুদ্ধের সময় সবার শত্রু ছিল পাকিস্তানি দখলদার বাহিনী এবং তাদের সহযোগীরা। দুঃখজনক হলেও এটা সত্য যে কমিউনিস্টদের কোনো কোনো গ্রুপ এই যুদ্ধকে দুই কুকুরের লড়াই বলে প্রচার করেছে এবং তাদের হাতে মুক্তিযোদ্ধাদের হয়রানি ও খুনের অভিযোগ আছে। কোথাও কোথাও মুক্তিযুদ্ধের নামে রাজনৈতিক ভিন্নমতাবলম্বীদের ওপর হামলা হয়েছে, তাদের অস্ত্র কেড়ে নেওয়া হয়েছে এবং খুনও করা হয়েছে।

সর্বহারা পার্টির সূত্রে জানা যায়, ঢাকার সাভার এলাকায় এরকম একটি হত্যাকাণ্ড ঘটে। সেখানে সর্বহারা পার্টির একটি গ্রুপ সক্রিয় ছিল। আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতা কাশিমপুর ইউনিয়নের গিয়াসউদ্দিন ওরফে গেসু চেয়ারম্যান আলোচনার আহ্বান জানালে সর্বহারা পার্টির কয়েকজন গেরিলা তাঁর কাছে যান। এঁদের নেতা ছিলেন সামিউল্লাহ আজমী। সামিউল্লাহ মুক্তিযুদ্ধের প্রথম দিকে ছিলেন বরিশালে। পরে তিনি ঢাকায় চলে আসেন। দলে তাঁর নাম তাহের। তিনি সাঈদ, পলাশ, খোকন, এনায়েত, মণীন্দ্রসহ কয়েকজনকে নিয়ে চেয়ারম্যানের কাছে যান। অভিযোগ আছে, খাবারের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে তাঁদের হত্যা করা হয়। তাঁদের সন্ধানে পার্টি থেকে পরপর দুজন কুরিয়ার পাঠানো হলে তাঁদেরও হত্যা করা হয়। ঘটনাটি ঘটে একাত্তরের আগস্ট মাসে।

আরেকটি হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল টাঙ্গাইলে। টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুরের নজরুল ইসলাম পাবনা-টাঙ্গাইল অঞ্চলের সক্রিয় কর্মী ছিলেন। একাত্তরের শেষ দিকে তিনি পাকিস্তানি সৈন্যদের হাতে ধরা পড়েন। তাঁকে নির্যাতন করে টাঙ্গাইল জেলে পাঠানো হয়। ১৬ ডিসেম্বরের পর তিনি ছাড়া পান। কিন্তু কাদেরিয়া বাহিনীর লোকেরা তাঁকে টাঙ্গাইল শহরে আটক করে। বিন্দুবাসিনী স্কুলের মাঠে অনেক লোকের সামনে 'নকশাল' অভিযোগে কাদের সিদ্দিকী



সামিউল্লাহ আজমী

তাঁকে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করেন বলে সর্বহারা পার্টিসূত্রে জানা গেছে।

তাহের ওরফে সামিউল্লাহ আজমী শুরু থেকেই ছিলেন সিরাজ সিকদারের রাজনৈতিক সহযাত্রী। তাঁর নিহত হওয়ার সংবাদ পেয়ে সিকদার বিচলিত হন। সামিউল্লাহকে নিয়ে 'সাভারের মাটি লাল' নামে সিকদার একটি দীর্ঘ কবিতা লিখেছিলেন। সিকদার পরে কবিতাটিতে সুর দিয়ে গান তৈরি করেছিলেন। তার কয়েকটি লাইন ছিল এরকম :

বারবার ঘুরে ফিরে
মনে পড়ে তোমাদের কথা
এক সাথে বা একলা।
সাভারের লালমাটি
ছোট ছোট টিলা
শাল-কাঁঠালের বন

এখানে ছড়িয়েছিলে
প্রতিরোধের বহ্নিশিখা;
লাল হয়ে উঠেছিল দিগন্ত
সূর্যের প্রতীক্ষায়।
কিন্তু কালো মেঘে
ঢেকে গেল আকাশ।
সাভারের লাল মাটি
আরো লাল হলো
তোমাদের পবিত্র রক্তে।
কমরেড তাহের
উত্তরপ্রদেশ থেকে এসে
তুমি হলে বাংলার নরম্যান বেথুন।

১০

একাত্তরে এ দেশের ওপর দিয়ে একটা প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গেছে। লাখ লাখ মানুষ নিহত হয়েছেন। নির্যাতিত হয়েছেন অগুনতি মানুষ। স্বজন হারিয়েছে অনেক পরিবার। সিরাজ সিকদারের পরিবার তার মধ্যে একটি।

সিরাজ সিকদারের বড় ভাই বাদশা আলম সিকদার বুয়েট থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে সিঅ্যান্ডবি ডিপার্টমেন্টে চাকরি নিয়েছিলেন। তিনি রংপুরে ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজ করছিলেন। একাত্তরের ২৫ এপ্রিল পাকিস্তানি সৈন্যরা তাঁকে বাসা থেকে চোখ বেঁধে ধরে নিয়ে যায়। তিনি আর ফিরে আসেননি। তাঁর মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া যায়নি।

বাদশা আলম সিকদারকে যেদিন ধরে নিয়ে যায়, সিরাজ সিকদার সেদিন মুক্তিযুদ্ধের ঘাঁটি বানাতে বরিশালের পেয়ারাবাগানে ঢোকেন। মুক্তিযুদ্ধের বলি বাদশা আলমের কথা খুব কম লোকই মনে রেখেছে। শহীদ বুদ্ধিজীবীদের তালিকায় তিনি থেকে গেছেন অপাঙ্‌ক্তেয়।

প্রধান দ্বন্দ্ব ভারত

একাত্তরের সেপ্টেম্বরে তৈরি হয় পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টির খসড়া সংবিধান। সংবিধানের শুরুতেই 'পূর্ব বাংলার সর্বহারা শ্রেণির রাজনৈতিক পার্টি' হিসেবে দাবি করে বলা হয়, এই পার্টি সর্বহারা শ্রেণির অগ্রগামী ব্যক্তিদের নিয়ে তৈরি একটি অগ্রগামী সংগঠনও, যা জাতীয় ও শ্রেণিশত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাও সে তুংয়ের চিন্তাধারাকে তাত্ত্বিক ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়। এ সময় চিনের কমিউনিস্ট পার্টিতে মাওয়ের পর দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ নেতা হিসেবে লিন পিয়াওয়ের উত্থান ঘটেছে। সর্বহারা পার্টির খসড়া সংবিধানে লিন পিয়াও সম্পর্কে উচ্ছ্বাস ও মুগ্ধতা প্রকাশ করে বলা হয় :

> কমরেড লিন পিয়াও সর্বদাই মাও সে তুং চিন্তাধারার মহান লাল পতাকাকে ঊর্ধ্বে ধারণ করে আসছেন, সবচেয়ে বিশ্বস্ত ও অটলভাবে কমরেড মাও সে তুংয়ের সর্বহারা শ্রেণির বিপ্লবী লাইনকে কার্যকর ও রক্ষা করছেন। কমরেড লিন পিয়াও হচ্ছেন কমরেড মাও সে তুংয়ের ঘনিষ্ঠ সহযোদ্ধা ও উত্তরাধিকারী।

১৯৬৫ সালে লিন পিয়াওয়ের একটি বক্তৃতা অবলম্বনে প্রকাশিত হয় তাঁর বই *লং লিভ দ্য ভিক্টরি অব পিপলস ওয়ার*। বইটি চিনপন্থীদের মধ্যে বেশ জনপ্রিয় হয়। ১৯৬৬-৬৭ সালে চিনজুড়ে বয়ে যায় 'সাংস্কৃতিক বিপ্লবে'র ঝোড়ো হাওয়া। রক্ষণশীলতার অভিযোগে প্রেসিডেন্ট লিও শাও চিসহ অনেকেই চিনা পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হন। ছাত্ররা ক্যাম্পাস ছেড়ে বেরিয়ে আসে। তাদের হাতে মাওয়ের উদ্ধৃতি-সংবলিত লাল জ্যাকেটে মোড়া পকেট

বই। এরা পরিচিত হয় রেড গার্ড নামে। চিনজুড়ে পার্টিতে এবং সরকারে চলে শুদ্ধি অভিযান। এর নেতৃত্বে লিন পিয়াও। ১৯৬৯ সালে অনুষ্ঠিত চিনের কমিউনিস্ট পার্টির নবম কংগ্রেসে লিন পিয়াওকে মাওয়ের উত্তরাধিকারী হিসেবে ঘোষণা করা হয়। মাওয়ের নামের সঙ্গে তাঁর নামও সব জায়গায় উচ্চারিত হতে থাকে—চেয়ারম্যান মাও সে তুং এবং তাঁর ক্লোজ কমরেড-ইন-আর্মস ভাইস চেয়ারম্যান কমরেড লিন পিয়াও।

চিনের পার্টিতে ক্ষমতার লড়াই নতুন নয়। ১৯৭২ সালে মাওয়ের বরাত দিয়ে প্রচার করা হয়, একটি অভ্যুত্থান ঘটানোর চেষ্টা ব্যর্থ হলে লিন পিয়াও পালিয়ে যাওয়ার সময় ১৯৭১ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর মঙ্গোলিয়ায় এক বিমান দুর্ঘটনায় মারা যান। এই সংবাদ প্রচার হওয়ার পরপরই বিভিন্ন দেশে চিনা পার্টির অনুগতরা লিন পিয়াওয়ের সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠেন। পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টির সব দলিল ও প্রচারপত্র থেকে লিন পিয়াও প্রসঙ্গ মুছে ফেলা হয়।

পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের থিসিসে সমাজে বিরাজমান দ্বন্দ্বগুলো যেভাবে চিহ্নিত ও ব্যাখ্যা করা হয়েছিল, সর্বহারা পার্টির খসড়া সংবিধানে সেটি হুবহু বজায় থাকে। শ্রমিক আন্দোলনের কাজের মূল্যায়ন করে বলা হয়, এই সংগঠন মাত্র সাড়ে তিন বছরের মধ্যে মার্কসবাদ, লেনিনবাদ, মাও সে তুং চিন্তাধারার সর্বজনীন সত্যকে পূর্ব বাংলার বিপ্লবের অনুশীলনে সাফল্যের সঙ্গে সমন্বয় করতে পেরেছে এবং সংশোধনবাদীদের বিরুদ্ধে তত্ত্ব ও অনুশীলনে বিরাট বিজয় অর্জন করেছে। ফলে সর্বহারা শ্রেণির রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠার পরিবেশ তৈরি হয়েছে। খসড়া সংবিধানে বারোটি নিয়মের কথা বলা হয় :

১. ১৮ বছর বয়স হলেই যে কেউ দলের সংবিধান মেনে সদস্য হতে পারবেন।
২. সদস্য হওয়ার জন্য আবেদন করতে হবে এবং যাচাই-বাছাই করে তা অনুমোদন করা হবে।
৩. মার্কসবাদ, লেনিনবাদ, মাও সে তুং চিন্তাধারার অধ্যয়ন ও প্রয়োগ এবং পূর্ব বাংলা ও বিশ্বের সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের স্বার্থে কাজ করা।
৪. পার্টির নিয়ম-শৃঙ্খলা না মানলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বিশেষ করে 'অকাট্য' প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ বিশ্বাসঘাতক, গুপ্তচর,

একেবারে অনুশোচনাবিহীন পুঁজিবাদের পথগামী কর্তৃত্বস্থানীয় ব্যক্তি, অধঃপতিত ব্যক্তি, শ্রেণিগতভাবে বৈরী ব্যক্তিদের পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হবে এবং পুনরায় তাদের যোগ দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না।

৫. পার্টির সাংগঠনিক নীতি হচ্ছে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা।

৬. পার্টির সর্বোচ্চ ফোরাম হলো জাতীয় কংগ্রেস ও এর দ্বারা নির্বাচিত কেন্দ্রীয় কমিটি।

৭. পার্টির বিভিন্ন স্তরের কমিটিগুলো তাদের প্রতিনিধি মনোনীত করবে।

৮. তিন বছর পরপর জাতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হবে।

৯. কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে স্থায়ী কমিটি, সভাপতি ও সহসভাপতি নির্বাচিত হবে।

১০. স্থানীয় শাখার কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হবে দেড় বছর পরপর।

১১. বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক ইউনিটে ৯ থেকে ১৯ জন থাকবে। যেখানে সদস্য কম সেখানে গ্রুপ গঠন করা যাবে। সদস্য না থাকলে প্রতিনিধি নিয়োগ করবে পার্টি।

১২. সর্বহারা শ্রেণির রাজনীতিকে ঊর্ধ্বে স্থান দিতে হবে এবং যোগাযোগ, সমালোচনা ও আত্মসমালোচনার রীতিকে বিকশিত করতে হবে।

২

২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি বাহিনীর আক্রমণ শুরু হলে পিলখানায় ইপিআর এবং রাজারবাগে পুলিশের প্রতিরোধযুদ্ধ বেশিক্ষণ টেকেনি। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি সদস্যরা বিভিন্ন সেনানিবাস ও নানা জায়গা থেকে পাকিস্তানের পক্ষ ত্যাগ করে স্বাধীনতাযুদ্ধে শামিল হন। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া সব রাজনৈতিক দল ও ছাত্রসংগঠনের তরুণরা যাঁর যাঁর সুযোগ ও সুবিধামতো মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন।

প্রতিবেশী ভারত সীমান্ত খুলে দিয়েছিল। সেখানে কয়েকটি জায়গায়

তরুণদের জন্য খোলা হয় প্রশিক্ষণ ক্যাম্প। ক্যাম্পগুলোতে প্রশিক্ষণ নিয়ে অস্ত্র হাতে অনেকেই দেশে ফিরে আসেন। ওই সময় দরকার ছিল পাকিস্তানি দখলদারদের বিরুদ্ধে সবার ঐক্যবদ্ধ হওয়া।

ঐক্যের ঘোষণা থাকলেও বাস্তবে এর ব্যত্যয় ঘটেছিল। আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব নিয়ে নেয়। সেনাবাহিনী, ইপিআর ও পুলিশের স্বাধীনতাকামী বাঙালি সদস্যদের নিয়ে তৈরি হয় মুক্তিবাহিনী। কর্নেল (অব.) আতাউল গণি ওসমানীকে প্রধান করে মুক্তিবাহিনীর কমান্ড কাঠামো সাজানো হয়। এই যুদ্ধে কমিউনিস্টদের অংশগ্রহণ ভালোভাবে নেয়নি আওয়ামী লীগ। অনেক জায়গায় কমিউনিস্টদের প্রশিক্ষণ নিতে বাধা দেওয়া হয়। রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও ঈর্ষার একটা বাজে দৃষ্টান্ত তৈরি হয়ে যায় ওই সময়।

সিরাজ সিকদারের লোকেরা বরিশালের পেয়ারাবাগানে সমবেত হয়ে এপ্রিলের শেষে তৈরি করেছিলেন তাঁদের নিজস্ব মুক্তিবাহিনী। তাঁরা চেয়েছিলেন, তাঁদের দলের নেতৃত্বে হবে জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট। অথচ তাঁরা অন্য সব দলের বিরুদ্ধে বিষোদগার করেছেন এবং সবাইকে শত্রুর কাতারে ঠেলে দিয়েছেন।

একদিকে ঐক্যফ্রন্টের স্লোগান, অন্যদিকে ভিন্নমতের মানুষকে শত্রু মনে করে এবং তাঁদের আন্তরিকতা ও দেশপ্রেম নিয়ে কটাক্ষ করে কীভাবে ঐক্যফ্রন্ট হবে এটা বোঝা মুশকিল। তাঁরা ভেবেছিলেন, তাঁরাই একমাত্র খাঁটি বিপ্লবী এবং সমগ্র জাতি কেবল তাঁদের নেতৃত্বেই ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাবে। এটা ছিল বাড়াবাড়ি রকমের কল্পনাবিলাস। অন্য সব দলকে তাঁরা প্রতিক্রিয়াশীল ও 'ছয় পাহাড়ের দালাল' মনে করতেন। পরবর্তী সময়ে তাঁদের সব দলিলে 'ছয় পাহাড়ের দালাল' কথাটি বারবার এসেছে। 'ছয় পাহাড়' শব্দবন্ধটি সিরাজ সিকদারের আবিষ্কার।

ছয় পাহাড় যেন সর্বহারা পার্টির লোগো হয়ে গেছে। পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগের লোগো যেমন ছিল মুজিববাদ, জাসদের ছিল বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র, তেমনি সর্বহারা পার্টির প্রধান স্লোগান হয়ে দাঁড়ায়—ছয় পাহাড়ের দালালদের খতম করুন। পাহাড়গুলো কী এবং কেনই বা এদের পাহাড় বলা হচ্ছে, সর্বহারা পার্টির কোনো দলিলে এ নিয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যা নেই। তবে পাহাড়গুলো চিহ্নিত করা গেছে। এ পাহাড় হচ্ছে শোষণের ভিত্তি,

যেমন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ, ভারতের আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ, ভারতের সামন্তবাদ, পূর্ব বাংলার আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ এবং পূর্ব বাংলার সামন্তবাদ। সর্বহারা পার্টির রণনীতি হলো, পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী এবং ছয় পাহাড়ের দালালদের বিরুদ্ধে যুগপৎ লড়াই করতে হবে।

১৯৭১ সালের অক্টোবরে সর্বহারা পার্টি 'দেশপ্রেমিকের বেশে ছয় পাহাড়ের দালাল' শিরোনামে একটি দলিল প্রকাশ করে। দলিলের শুরুতে 'পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক সামরিক ফ্যাসিস্ট খুনিদের' উৎখাত করার লক্ষ্যে 'সমগ্র জাতির ঐক্য' চেয়ে বলা হয়, 'সর্বহারা পার্টি এ উদ্দেশ্যে আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।' কিন্তু বাস্তবে ঐক্যের আহ্বানের আড়ালে ছিল অন্যদের কঠোর সমালোচনা। দলিলে বলা হয় :

> চট্টগ্রামে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইপিআর, পুলিশ, ছাত্র, ভারতীয় সৈন্যসমেত হাজার হাজার যোদ্ধা প্রতিরোধ তৈরি করে। টেলিফোন বসায়। অস্ত্র, সৈন্য আনার জন্য ভারতের সঙ্গে ট্রাক যোগাযোগ স্থাপন করে। তারা কামান, মর্টার, মেশিনগান, স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র অর্থাৎ বিমান ও ট্যাংক ব্যতীত সবকিছু ব্যবহার করে। কিন্তু সম্মুখযুদ্ধে তারা শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয় এবং ভারতে বিতাড়িত হয়।
>
> মেজর জিয়া দম্ভভরে চট্টগ্রামে ঘোষণা করেছিল কয়েকদিনের মধ্যে ঢাকা দখল করবে। মেজর জলিল ঘোষণা করেছিল বরিশাল আর পরাধীন হবে না। এরাসহ আরও অনেক মেজর, ক্যাপ্টেন, লেফটেন্যান্টের মাথা শেষ পর্যন্ত দেয়ালে ঠেকে। তারা ভারতে বিতাড়িত হয় বা প্রাণ হারায়। এদের ভুলের জন্য লক্ষ লক্ষ লোক প্রাণ হারায়, তাদের ধনসম্পত্তি বিনষ্ট হয় এবং তারা ভারতে যেতে বাধ্য হয়।
>
> ভারত ও তার মাধ্যমে সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদ যদি তাদের আশ্রয় না দিত, পুনরায় সশস্ত্র না করত, তবে তাদের এই বিদ্রোহ জুন-জুলাই মাসেই শেষ হয়ে যেত।
>
> ভারত থেকে সশস্ত্র হয়ে পুনরায় তারা পূর্ব বাংলায় অনুপ্রবেশ

করার প্রক্রিয়ায় তাদের চরিত্রের বিরাট পরিবর্তন হয়। অতীতে তাদের যতটুকু স্বাধীন ভূমিকা ছিল, তা-ও তারা ভারত ও সাম্রাজ্যবাদ প্রদত্ত আশ্রয়, অর্থ, অস্ত্র ও সমর্থনের বিনিময়ে বিসর্জন দেয়। তারা ছয় পাহাড়ের দালালে পরিণত হয় এবং পূর্ব বাংলাকে ভারত ও সাম্রাজ্যবাদের নিকট বন্ধক দেয়।

এভাবে তাদের নেতৃত্বে পরিচালিত যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে প্রগতিবিরোধী যুদ্ধে রূপান্তরিত হয়। জাতীয় মুক্তির যুদ্ধ জাতীয় পরাধীনতার যুদ্ধে পরিণত হয়। ...

সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এবং ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ দ্রুত পূর্ব বাংলা দখল করার আরেকটি পথ অবলম্বন করতে পারে। অর্থাৎ ভারতীয় সৈন্যবাহিনী দ্বারা পূর্ব বাংলা বা গোটা পাকিস্তান আক্রমণ করা এবং তাদের তাঁবেদার মুক্তিবাহিনী দ্বারা পূর্ব বাংলার অভ্যন্তরে অভ্যুত্থান ঘটানো। অর্থাৎ সীমান্ত অঞ্চল আক্রমণ করে পাক দস্যুদের সেখানে ব্যাপৃত রাখা ও তাদের ধ্বংস করা এবং তাঁবেদার বাহিনী কর্তৃক পূর্ব বাংলার ভেতর থেকে দখলের সুযোগ করে দেওয়া। ...

এতে পাক-ভারত যুদ্ধ বেধে যাবে। চিনসহ বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শক্তিসমূহ ভারতের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদসৃষ্ট পূর্ব বাংলা দখলের এ আগ্রাসী যুদ্ধকে বিরোধিতা করবে। পূর্ব বাংলার জনগণেরও একটা বিরাট অংশ এ যুদ্ধের বিরোধিতা করবে। ভারত নিজেও অধিকতর দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংকটে পড়বে।

ভারতের আগ্রাসী বাহিনী এবং পূর্ব বাংলার অভ্যন্তরে তাঁবেদার মুক্তিবাহিনীর একযোগে আক্রমণের ফলে কয়েকটি পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে।

একটি পরিস্থিতি হতে পারে—পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর সম্পূর্ণ পরাজয়, পূর্ব বাংলার ভারত ও সাম্রাজ্যবাদীদের কলোনিতে রূপান্তর, মুজিববাহিনীর ফ্যাসিস্টদের নেতৃত্বে পূর্ব বাংলায় একটি পুতুল সরকার গঠন। ...

ভারত যুদ্ধ বাধিয়ে পূর্ব বাংলাকে তার কলোনিতে রূপান্তরিত করবে, এ সম্ভাবনা কম। ভারতের পক্ষে সীমান্তে উসকানি সৃষ্টির

> সম্ভাবনাই অধিক। এর কারণ, ভারতের এই আগ্রাসী যুদ্ধ চিনসহ বিশ্বের প্রগতিশীল সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শক্তিসমূহ বিরোধিতা করবে। এ যুদ্ধে ভারতের রাষ্ট্রযন্ত্র দুর্বল হয়ে পড়বে। এশিয়ান সাম্রাজ্যবাদ দুর্বল হয়ে পড়বে। ভারতের জনগণের বিপ্লবী যুদ্ধ তীব্রতর হয়ে উঠবে। প্রথম মহাযুদ্ধে জন্মলাভ করেছে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জন্মলাভ করেছে চিনসহ আরও বহু সমাজতান্ত্রিক দেশ। কাজেই পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধের ফলে পাকিস্তান, ভারত, পূর্ব বাংলা যেকোনো স্থানেই সর্বহারা শ্রেণির দ্রুত ক্ষমতা দখলের সম্ভাবনা দেখা দেবে। সাম্রাজ্যবাদীরা এ জন্য প্রচেষ্টা চালাবে যুদ্ধকে রোধ করতে।

দলিলের শেষে যে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে, বাস্তবে সে রকম ঘটেনি। কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় সর্বহারা পার্টির লোকদের সঙ্গে আওয়ামী লীগ কিংবা মুক্তিবাহিনীর সদস্যদের সংঘর্ষ হয়েছে বলে সর্বহারা পার্টির সূত্রে জানা গেছে। উভয় পক্ষেই হতাহতের ঘটনা ঘটেছে। সর্বহারা পার্টি এ জন্য দোষ চাপিয়েছে আওয়ামী লীগের ঘাড়ে। দলিলে বলা হয় :

> ভারত থেকে সশস্ত্র হয়ে আওয়ামী লীগ মুক্তিবাহিনী পূর্ব বাংলায় ফিরে এলে সর্বহারা পার্টির কর্মীরা ঐক্যের প্রচেষ্টা চালায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আওয়ামী লীগ ও তার মুক্তিবাহিনীর নেতৃত্বে আমাদের আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আমাদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ করার পরিবর্তে আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, আমাদের রক্তে হাত কলঙ্কিত করেছে এবং আমাদের ধ্বংস করার ঘৃণ্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।
>
> তারা এই জঘন্য অন্তর্ঘাতী কাজ করার জন্য সাধারণ দেশপ্রেমিক সৈনিক ও কর্মীদের বাধ্য করেছে। তবু প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে অনেক কর্মী এদের নৈতিক স্বরূপ উপলব্ধি করে আমাদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করে। এরূপ ঐক্যের ফলে ঢাকায় সর্বপ্রথম জাতীয় শত্রু ব্যারিস্টার মান্নানকে খতম করা হয়। ...
>
> ছয় পাহাড়ের দালাল ভারত ও সাম্রাজ্যবাদীদের তাঁবেদার

মুক্তিবাহিনী বরিশালের স্বরূপকাঠিতে আমাদের চারজন কর্মী ও গেরিলাকে হত্যা করে। অন্যদের খুঁজে বেড়ায়। মাদারীপুরে তাদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কার্যরত আমাদের সমর্থকদের খতমের ষড়যন্ত্র করলে তারা বেরিয়ে আসে। এই তাঁবেদার বাহিনী আমাদের কর্মীর বাড়িতে হানা দেয় এবং নারীদের নির্যাতন করে, বাড়ি লুট করে।

সম্প্রতি টাঙ্গাইলে তারা আলোচনার কথা বলে আমাদের দুজন কর্মীর সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হয় এবং সেখানে বিশ্বাসঘাতকতা করে তাদেরকে গ্রেপ্তার করে। তারা গ্রেপ্তারকৃত কর্মীদের বন্দুকের ডগায় সমস্ত গেরিলাদের নিকট থেকে অস্ত্র নিয়ে আসার জন্য পাঠায়। আমাদের গেরিলারা এ ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেয়। একজন নিজেকে মুক্ত করতে সমর্থ হয়। কিন্তু অপরজনকে তারা বন্দি করতে সক্ষম হয়। এ এলাকার এক জাতীয় নেতার নির্দেশে তারা আমাদের দুজন গেরিলাকে কেটে লবণ দিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে।

তারা বরিশাল জেলার ঝালকাঠি, কাউখালী, স্বরূপকাঠি অঞ্চলে আমাদের তিনটি গেরিলা ইউনিটকে ঘেরাও ও নিরস্ত্র করে এবং গেরিলাদের বন্দি করে। আমাদের গেরিলাদের কেউ কেউ পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়। বাকিদের খোঁজ পাওয়া যায়নি। ধারণা করা হচ্ছে, মুক্তিবাহিনীর ফ্যাসিস্ট খুনিরা তাদের হত্যা করেছে।

এ এলাকায় তারা আমাদের হেডকোয়ার্টার আক্রমণ করে এবং আমাদের দ্বারা মুক্ত বিরাট অঞ্চল দখল করে নেয়।

তারা আমাদের নারী গেরিলা শিখাকে বন্দি করে। তার পরিবারের সকলকে নির্দয়ভাবে নির্যাতন করে। শিখার ওপর নির্মম পাশবিক অত্যাচার চালায়, তাকে ধর্ষণ করে। তার খোঁজ আজও পাওয়া যায়নি। তারা আরও কয়েকজন নারী গেরিলা ও কর্মীকে খতমের জন্য খোঁজ করে। তাদের এই ঘৃণ্য, বর্বর, ফ্যাসিবাদী তৎপরতায় অংশগ্রহণ করে ভারতীয় শিখ, গুর্খা সৈন্য ও অফিসাররা।

তারা ফরিদপুরের কালকিনি অঞ্চলে আলোচনার কথা বলে বিশ্বাসঘাতকতা করে আমাদের দুজন গেরিলাকে বন্দি ও নিরস্ত্র করে মৃত্যুদণ্ড দেয়। জনগণের হস্তক্ষেপে তারা আমাদের কর্মীদের ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

> কুখ্যাত ডাকাত-নারী নির্যাতনকারী কুদ্দুস মোল্লার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ মুক্তিবাহিনীর ফ্যাসিস্ট দস্যুরা মেহেন্দিগঞ্জে আমাদের একাধিক গেরিলা ইউনিটকে নিরস্ত্র করে, মূল্যবান দ্রব্যাদি লুট করে এবং গেরিলাদের গ্রেপ্তার করে। তাদের ওপর অশেষ নির্যাতন চালায়।
>
> মঠবাড়িয়া অঞ্চলে এই ফ্যাসিস্ট দস্যুরা আমাদের মুক্ত অঞ্চল আক্রমণ করে ও দখল করে নেয়। গেরিলাদের সামনাসামনি ধ্বংস করতে না পেরে বিশ্বাসঘাতকতা ও অন্তর্ঘাতের পথ গ্রহণ করে। একসঙ্গে কাজ করার ভাঁওতা দিয়ে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং যৌথ আক্রমণের সময় পেছন দিক থেকে গুলি করে প্রতিভাবান কর্মী হাসানকে হত্যা করে। এর সাথে শহীদ হয় হিমু নামের অপর এক কর্মী।
>
> বরিশালের পাদ্রিশিবপুর অঞ্চলে আমাদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার ভান করে তারা নেতৃস্থানীয় কর্মীদের খতম করার জন্য সুযোগ খোঁজে। শেষ পর্যন্ত রাতের অন্ধকারে ডেকে নিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করে মাসুম ও অপর এক গেরিলাকে তারা হত্যা করে।
>
> পঁচিশে মার্চের পূর্বে ক্ষমতার দম্ভে এই প্রতিক্রিয়াশীল ফ্যাসিস্টরা কমিউনিস্টদের জ্যান্ত কবর দেওয়া, নকশাল ধ্বংস করার জন্য গ্রামে গ্রামে সভা করে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করে প্রথমেই বামপন্থীদের খতম করবে। কিন্তু তারও ধৈর্য তাদের ছিল না। অনেক স্থানেই দেশপ্রেমিকদের তারা খতম শুরু করে। অহিংস অসহযোগ আন্দোলন এবং পরবর্তীকালে তাদের দখলকৃত এলাকার জেলাখানায় আমাদের মুক্তি দিতে তারা অস্বীকৃতি জানায়। ...

এই দলিলের ভাষা দেখে মনে হতে পারে, সর্বহারা পার্টির গেরিলারাই মুক্তিযুদ্ধ করেছে এবং ভারত থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে আসা মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা শুধু খুনখারাবি করে বেড়িয়েছে। কিছু এলাকায় বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটতে পারে। এটি যুদ্ধের আগেই শুরু হয়েছিল। এখানে অনেক সময় স্থানীয় দ্বন্দ্ব এবং রেষারেষি কাজ করেছে। শুধু সর্বহারা পার্টি নয়, চিনাপন্থী অন্য গ্রুপগুলোর সঙ্গেও কোথাও কোথাও মুক্তিবাহিনীর সংঘর্ষ হয়েছে। যশোর-খুলনা অঞ্চলে পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির (মা-লে) প্রভাব ছিল।

সেখানে তারা মুক্তিবাহিনীর লোকদের নানাভাবে হয়রানি করেছে। তাদের অস্ত্র কেড়ে নিয়েছে। অনেক জায়গায় এর বিপরীতও ঘটেছে। স্থানীয় পর্যায়ে যার যত জোর, তার প্রতিফলন ঘটেছে এসব ঘটনায়।

সর্বহারা পার্টির কিছু বক্তব্য শুধু অতিরঞ্জিত নয়, হাস্যকরও। ওই সময় তারা বরিশালের গ্রামে শিখ-গুর্খা সৈন্যও আবিষ্কার করেছে।

৩

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনীর আনুষ্ঠানিক আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে ইতিহাসের একটি পর্ব শেষ হয়। ২২ ডিসেম্বর প্রবাসী সরকারের নেতারা কলকাতা থেকে উড়াল দেন ঢাকার পথে। সর্বত্র বিশৃঙ্খলা। সবার হাতে অস্ত্র। ঢাকায় সবকিছু তদারকি করছে ভারতীয় সেনাবাহিনী। পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দিরা তাদের নিয়ন্ত্রণে।

একাত্তর সালজুড়ে বাংলাদেশ সরকারের বিরুদ্ধে যতই বিষোদগার করুক না কেন, বাহাত্তরের জানুয়ারিতে সর্বহারা পার্টির মূল্যায়ন হঠাৎ করেই বদলে যায়। প্রথমবারের মতো দলটি 'বাংলাদেশ সরকার' উচ্চারণ করে। এ সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সরকারকে নানা রকম প্রস্তাব দিচ্ছিল। একাত্তরের ২১ ডিসেম্বর ন্যাপ (মোজাফফর) সর্বদলীয় অন্তর্বর্তী জাতীয় সরকারের দাবি জানায়। এই দাবির বিরোধিতা করে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ ২৫ ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে যে সরকার গঠন করা হয়েছে, সেটি একটি জাতীয় সরকার।

সর্বহারা পার্টি আগে সর্বদলীয় জাতীয় সরকারের দাবি জানালেও এবার তা এড়িয়ে যায়। জানুয়ারির পয়লা সপ্তাহে দলটি বাংলাদেশ সরকারকে হিসাবের মধ্যে নিয়ে একটি দাবিনামা উত্থাপন করে। 'বাংলাদেশ সরকারের উদ্দেশে পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টির খোলা চিঠি' শিরোনামে একটি প্রচারপত্রে ২৭টি দাবির উল্লেখ করা হয়। দাবিগুলোর মধ্যে পুনরাবৃত্তি ছিল। 'বাংলাদেশ সরকারের' কাছে দাবি জানালেও দলটি দেশের নাম 'পূর্ব বাংলা' বলা অব্যাহত রাখে। দাবিগুলো হলো :

১. পূর্ব বাংলার ভূমি থেকে অনতিবিলম্বে শর্তহীনভাবে সকল ভারতীয় সৈন্য, সামরিক ও বেসামরিক উপদেষ্টাদের ভারতে ফেরত পাঠানো।
২. স্থিতিশীলতা আনা, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা এবং পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন কাজের জন্য দেশপ্রেমিক জনগণের ওপর নির্ভর করা।
৩. প্রতিরক্ষার জন্য জনগণের মধ্য থেকে নিয়মিত স্থল, নৌ ও বিমানবাহিনী গড়ে তোলা এবং জনগণকে সামরিক শিক্ষা দেওয়ার মাধ্যমে স্থানীয় বাহিনী গড়ে তোলা। ভারত বা অন্য কোনো দেশের সঙ্গে কোনো প্রকার সামরিক চুক্তি না করা।
৪. জামায়াত, পিডিবি, মুসলিম লীগ (তিন অংশ), নেজামে ইসলাম এবং পাক সামরিক ফ্যাসিস্টদের সহযোগী অন্যান্য রাজনৈতিক দল ও ব্যক্তিদের নির্বাচন, ভোটাধিকার, মিটিং, মিছিলসহ রাজনৈতিক কার্যকলাপ পরিচালনার অধিকার বাতিল করা। গোঁড়া গণবিরোধীদের বিচার ও শাস্তি দেওয়া।
৫. অবাঙালিদের সব শিল্পকারখানা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিনা ক্ষতিপূরণে রাষ্ট্রীয়করণ করা। ব্যক্তিমালিকানাধীন জাতীয় পুঁজিকে রক্ষা ও তার বিকাশে সাহায্য করা।
৬. সামরিক ফ্যাসিস্টদের সহযোগিতা করেনি এমন সামন্ত-জমিদার জোতদারের জমি ক্ষতিপূরণসহ ভূমিহীন কৃষকের মাঝে বিনা মূল্যে বিতরণ করা।
৭. ভারতে আশ্রয় নেওয়া শরণার্থীদের ফিরিয়ে এনে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।
৮. ভারত বা অন্য কোনো দেশের সঙ্গে কোনো অসম বাণিজ্য চুক্তি না করা।
৯. শিল্প, বাণিজ্য, ব্যাংকিং, কৃষি, প্রাকৃতিক সম্পদ, পরিবহন ও যোগাযোগ এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে অন্য কোনো দেশের পুঁজির অনুপ্রবেশ, নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাব প্রতিরোধ করা।
১০. ভারি, হালকা ও কুটির শিল্পের বিকাশ এবং বিদেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতা থেকে এদের রক্ষা করা।
১১. পাকিস্তানিদের দ্বারা ছাঁটাইকৃতদের কাজে বহাল করা।

বেকারদের চাকরির ব্যবস্থা করা।

১২. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চালু করে ধর্মনিরপেক্ষ, দেশগঠনমূলক, গণতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা।

১৩. দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ শিল্পকলা, চলচ্চিত্র, সাহিত্যসহ সংস্কৃতির অন্যান্য ক্ষেত্রে অবাধ বিকাশের ব্যবস্থা করা।

১৪. বেতার, চলচ্চিত্র ও সংবাদপত্রকে একক পার্টির প্রচারযন্ত্র হিসেবে ব্যবহার না করা।

১৫. ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের স্বাধীনতা দেওয়া, ধর্মীয় স্থাপনা রক্ষা ও ধর্মীয় সমতার ব্যবস্থা করা।

১৬. রাজনৈতিক তৎপরতা ও নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করা। সংবাদপত্র ও প্রকাশনার স্বাধীনতা দেওয়া। বিনা বিচারে গ্রেপ্তার, আটক ও হত্যা না করা।

১৭. পারস্পরিক সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতার প্রতি সম্মান, পরস্পরের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা, সমতা, পারস্পরিক সহায়তা এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পঞ্চশীলা নীতির ভিত্তিতে বৈদেশিক সম্পর্ক করা। অন্য দেশের সামরিক তৎপরতায় শরিক না হয়ে নিরপেক্ষ, প্রগতিশীল ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করা।

১৮. ভারত ও অন্যান্য দেশের জনগণের পক্ষ থেকে পূর্ব বাংলার উদ্বাস্তুদের জন্য দেওয়া সাহায্যের জন্য কৃতজ্ঞতা জানানো। তাদের সব সাহায্য সুদসহ ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা।

১৯. বিদেশে যাওয়া বা বিদেশিদের আসার জন্য প্রচলিত আন্তর্জাতিক নিয়ম চালু করা। অবাধ চলাচল প্রতিহত করা।

২০. মার্কিন ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক পাকিস্তানের স্বাক্ষরিত সকল চুক্তি অগ্রাহ্য করা। পাকিস্তানের অংশ হিসেবে তাদের দেওয়া ঋণের অংশ ফেরত না দেওয়া।

২১. সকল ক্ষেত্রে নারীর সম-অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। পাক ফ্যাসিস্টদের হাতে ক্ষতিগ্রস্ত নারীদের পুনর্বাসন ও কাজের সুযোগ দেওয়া।

২২. শ্রমিকদের কাজের আট ঘণ্টা শ্রম-সময় নির্ধারণ করা এবং

প্রগতিশীল শ্রম আইন তৈরি করা।

২৩. যুদ্ধে আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা এবং অক্ষম ও তাদের ওপর নির্ভরশীলদের জীবনধারণের ব্যবস্থা করা।

২৪. আত্মসমর্পণকারী পাকিস্তানিদের অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য জিনিস পূর্ব বাংলার সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলার জন্য ব্যবহার করা।

২৫. পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থানরত বাঙালিদের ফিরিয়ে এনে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।

২৬. চালু মুদ্রার মান কমানো প্রতিরোধ করা এবং বাজারে ভারতীয় মুদ্রার ব্যবহার বন্ধ করা।

২৭. ফারাক্কা বাঁধজনিত সমস্যার ন্যায়সংগত সমাধান করা।

প্রচারপত্রে বলা হয়, এই দাবিগুলোর বাস্তবায়ন না হলে সত্যিকারের স্বাধীনতা কায়েম হবে না। বরং 'স্বাধীনতার আবরণে প্রতিষ্ঠিত হবে পরাধীনতার শিকল'। বাংলাদেশ সরকার দাবিগুলো বাস্তবায়ন করে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদের প্রমাণ দেবে বলে আশা করা হয়। তা না হলে, 'এ সরকার হবে ভারতের পুতুল সরকার এবং পূর্ব বাংলা হবে ভারতের উপনিবেশ।'

কোনো রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের নতুন সরকারের কাছে আহ্বান জানিয়ে এরকম বিস্তারিত দাবিনামা প্রস্তাবাকারে দেওয়ার উদাহরণ এটাই প্রথম। প্রস্তাবগুলোর মধ্যে মোটামুটি পরিমিতিবোধ লক্ষ করা যায়। একটি গণতান্ত্রিক সমাজে এ ধরনের প্রস্তাব একটি দল দিতেই পারে। কয়েকটি প্রস্তাব আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে ছিল এবং অনেকগুলো প্রস্তাব একাত্তরের পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং প্রাসঙ্গিক। এই 'খোলা চিঠি' এটাই প্রমাণ করে যে সর্বহারা পার্টি বাহাত্তরের জানুয়ারিতে বাংলাদেশ সরকারকে বৈরী মনে করেনি।

এই প্রচারপত্রে উল্লেখিত প্রস্তাবগুলোর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক ও কূটনৈতিক গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। বোঝা যায়, যথেষ্ট হোমওয়ার্ক করেই প্রস্তাবগুলো তৈরি করা হয়েছে। এসবের অনেকগুলোই সরকার বাস্তবায়ন করেছে। যুদ্ধ-পরবর্তী পরিস্থিতির যেকোনো সরকারকেই এসব কাজ করতে হয়। সর্বহারা পার্টির প্রস্তাবে জন-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেছিল, এটা বলা যায়।

৪

মুক্তিযুদ্ধের সময় সর্বহারা পার্টির একটি আহ্বায়ক কমিটি তৈরি হয়েছিল। ওই সময় যাঁরা পেয়ারাবাগানে ছিলেন, তাঁদের মধ্য থেকেই কয়েকজনকে নিয়ে একটি আহ্বায়ক কমিটি বানানো হয়। যুদ্ধ শেষে একটি পূর্ণাঙ্গ কমিটির দরকার অনুভব করেন সিরাজ সিকদার।

১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় সর্বহারা পার্টির প্রথম জাতীয় কংগ্রেস। ১২ জানুয়ারি শুরু হয়, চলে ১৬ জানুয়ারি পর্যন্ত। আগের চার বছরের কাজের একটি প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন সিরাজ সিকদার।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, শ্রমিক আন্দোলনের শুরুর দিকের কয়েকজন পেয়ারাবাগানে ছিলেন না। আনোয়ার হোসেন এবং আবু সাঈদ সিরাজ সিকদারের সঙ্গে যোগ না দিয়ে ভারতে চলে যান। পরে তাঁদের বড় ভাই আবু তাহের পাকিস্তান থেকে এসে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়ে ১১ নম্বর সেক্টরের দায়িত্ব পান। আনোয়ার এবং সাঈদ ওই সেক্টরেই থেকে যান। দলের কংগ্রেসে তাঁরা যোগ দেননি।

শুরুর দিকের অন্যতম সংগঠক ফজলুল হক রানা বেশ কিছুদিন অনুপস্থিত ছিলেন। ১৯৭০ সালের মে মাসে তিনি বুয়েটের হল ছাড়েন। তাঁর যাওয়ার কথা ভোলা। যাওয়ার পথে তিনি বরিশাল শহরে একটি শেল্টারে ওঠেন। ৬ সেপ্টেম্বর পুলিশ সেখান থেকে রানাসহ দুজনকে গ্রেপ্তার করে বরিশাল জেলে পাঠিয়ে দেয়। একাত্তরের ২৫ মার্চ পাকিস্তানি বাহিনী আক্রমণ করার পর বরিশাল বেশ কিছুদিন মুক্ত ছিল। একাত্তরের ১০ এপ্রিল রানা জেল থেকে বেরিয়ে আসেন।

রানা পেয়ারাবাগানের যুদ্ধে অংশ নেননি। পরে তাঁকে বিশেষ দায়িত্ব দিয়ে ময়মনসিংহে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে তিনি সাংগঠনিক কাজে ছিলেন। বাহাত্তরের জানুয়ারির কংগ্রেসে তিনি হাজির হন।

রানার ভাষ্যে জানা যায়, নুরুল হাসান, আবুল কাসেম ফজলুল হক এবং মাহবুব উল্লাহ দলের সঙ্গেই ছিলেন, সদস্য না হলেও সহানুভূতিশীল হিসেবে। এ তিনজনকে বুদ্ধিজীবী ফ্রন্টে কাজ করতে বলেছিলেন সিকদার। তাঁরা সিকদারের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করেননি। সর্বহারা পার্টির প্রথম জাতীয়

কংগ্রেসে সিকদার যে প্রতিবেদন দেন, সেখানে তাঁদের কড়া সমালোচনা করা হয়। প্রতিবেদনে বলা হয় :

> বামপন্থী ছাত্র ও অন্যান্যদের মধ্যে কাজ করার জন্য কিছুসংখ্যক ক্ষুদে বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীকে শহরে রাখা হয়। এদের একাংশ নেতৃত্বের লোভে শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে। এর ফলে শ্রমিক আন্দোলন বুদ্ধিজীবীদের গণসংগঠনের নেতৃত্ব হারায়। এই বিশ্বাসঘাতকদের প্রতিনিধি নুরুল হাসান, আ. কা. ম. ফজলুল হক. মাহবুব উল্লাহ শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন আকৃতির সংশোধনবাদী ও সুবিধাবাদীতে পরিণত হয়।

আবুল কাসেম ফজলুল হক এ প্রসঙ্গে বলেছেন :

> সিকদারের সঙ্গে একসময় তাঁর যোগাযোগ ছিল। সিকদার তাঁর এক ব্যাচ জুনিয়র। সিকদার ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটিতে ছয়জন ভাইস প্রেসিডেন্টের একজন ছিলেন। আমি ছিলাম ট্রেজারার। লিন পিয়াওয়ের *লং লিভ দ্য ভিক্টরি অব পিপলস ওয়ার* বইটি পড়ে সিকদার খুবই অনুপ্রাণিত হন এবং মাও সে তুংয়ের ভক্ত হয়ে যান। কিন্তু মাওয়ের মাসলাইনের গুরুত্ব তিনি বোঝেননি বা এর চর্চা করেননি। সিকদার ছিলেন কট্টর সমরবাদী। এ নিয়ে তাঁর সঙ্গে মতভেদ হওয়ায় আমি তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করি। মাও সে তুং চিন্তাধারা গবেষণাকেন্দ্রের সঙ্গে আমি সম্পৃক্ত ছিলাম না।

ইংরেজিতে একটা কথা আছে, 'টু কিল আ ডগ, গিভ ইট আ ব্যাড নেম।' রাজনীতিবিদদের মধ্যে এই মনস্তত্ত্ব কাজ করে। সিরাজ সিকদারও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। যার সঙ্গে তাঁর মতান্তর হয়েছে, তাকেই তিনি অবলীলায় সংশোধনবাদী, ট্রটস্কিবাদী, ষড়যন্ত্রকারী বা বিশ্বাসঘাতক বলতেন। কথায় কথায় ঐক্যের ডাক দিলেও কাজের ক্ষেত্রে তাঁর আচরণ ছিল বিপরীত। তাঁর ব্যাপারটা ছিল অনেকটা এরকম : শতভাগ একমত হও, মেনে নাও, অথবা জাহান্নামে যাও। ইংরেজিতে কথাটা এভাবেও বলা

হয়—'গিভ ডগ অ্যান ইল নেম অ্যান্ড হ্যাংগ হিম।' অর্থাৎ একটা অভিযোগ দাঁড় করিয়ে তাকে খারাপ বানাও এবং মেরে ফেল। পরে সর্বহারা পার্টিতে এই প্রবণতা ব্যাধি হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

কংগ্রেসে ছয় সদস্যের কেন্দ্রীয় কমিটি নির্বাচন করা হয়। তাঁরা হলেন সিরাজ সিকদার (সভাপতি); মাহবুব ওরফে শহীদ এবং সেলিম শাহনেওয়াজ ওরফে ফজলু (পূর্ণ সদস্য); আকা ফজলুল হক ওরফে রানা, নাসির ওরফে মজিদ এবং সুলতান ওরফে মাহবুব (বিকল্প সদস্য)। ২৫-২৬ মার্চে কেন্দ্রীয় কমিটির দ্বিতীয় বৈঠকে মাহবুব (শহীদ) চট্টগ্রামের অঞ্চল পরিচালক নিযুক্ত হন। ফজলু পান খুলনায় অঞ্চল পরিচালকের দায়িত্ব। রানা অঞ্চল পরিচালকের দায়িত্ব নিয়ে চলে যান ময়মনসিংহ।

৫

১৯৭২ সালের ১২ মার্চ ঢাকায় অবস্থানরত ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিদায়ী দলটি ঢাকা স্টেডিয়ামে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানকে গার্ড অব অনার দেয়। ১৫ মার্চ ভারতীয় সৈন্যদের সর্বশেষ দলটি দেশে ফিরে যায়। বাংলাদেশ সরকারের অনুরোধে ভারতীয় সৈন্যদের ছোট একটি দল পার্বত্য চট্টগ্রামে মিজো বিদ্রোহীদের দমন করার জন্য থেকে যায়।

১৭ মার্চ ঢাকায় আসেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। তাঁকে বিপুল সংবর্ধনা দেওয়া হয়। ১৯ মার্চ বঙ্গভবনে বাংলাদেশ ও ভারত সরকারের মধ্যে ২৫ বছর মেয়াদি 'শান্তি, মৈত্রী ও সহযোগিতা চুক্তি' স্বাক্ষর করেন দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী। কয়েকটি রাজনৈতিক দল এই চুক্তির কঠোর সমালোচনা করে। ভারতের সৈন্যরা যে দেশ ছেড়ে চলে গেছে, এটাও অনেকে বিশ্বাস করতে চায়নি। একাত্তরের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানের খপ্পর থেকে বেরিয়ে এসে বাংলাদেশ আবার ভারতের উপনিবেশ হয়ে গেছে—এরকম একটা প্রচার হয় বেশ জোরেশোরে। প্রচারণার শীর্ষে ছিল সর্বহারা পার্টি।

বাহাত্তরের মার্চেই 'ইন্দিরা গান্ধী জবাব দেবেন কি' শিরোনামে সর্বহারা পার্টি একটি প্রচারপত্র প্রকাশ করে। প্রচারপত্রে ইন্দিরা গান্ধী ও ভারতের কঠোর সমালোচনা ও নিন্দা জানিয়ে বলা হয় :

আপনার সেনাবাহিনী মিত্রবাহিনী। কিন্তু মিত্রবাহিনী কীভাবে পাক সামরিক ফ্যাসিস্টদের কয়েকশ কোটি টাকার অস্ত্র, যুদ্ধ সরঞ্জাম ভারতে নিয়ে গেল, পূর্ব বাংলার বহু কলকারখানা, তার খুচরো অংশ, গাড়ি, উৎপাদিত পণ্য পাট, চা, চামড়া, স্বর্ণ, রৌপ্য ভারতে পাচার করল?

আপনি আপনার দখলদার বাহিনী প্রত্যাহার করার কথা বলে জনগণকে ভাঁওতা দিচ্ছেন। আপনার প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো বাঙালিদের দ্বারা আপনার উপনিবেশ পাহারা দেওয়া, বাঙালিদের দমন করা। এছাড়া অসংখ্য ভারতীয় দখলদার সৈন্য আপনি সাদাপোশাকে এবং বাংলাদেশ বাহিনী ও বাংলাদেশ রাইফেলস-এর ইউনিফর্মে পূর্ব বাংলায় রেখেছেন। আপনার সৈন্য প্রত্যাহারের কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

আপনি নিজেকে মুক্তিসংগ্রামের বন্ধু বলে জাহির করেন। কিন্তু নাগা, মিজো, কাশ্মীরি, শিখদের মুক্তিসংগ্রামকে কেন ফ্যাসিবাদী উপায়ে দমন করছেন?

এটা কি প্রমাণ করে না, আপনি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে পূর্ব বাংলার মুক্তিসংগ্রামের সহায়তার বেশ ধরেছেন? এর উদ্দেশ্য হলো পূর্ব বাংলায় আপনার উপনিবেশ স্থাপন, আপনার হারানো পশ্চাৎভূমি পুনরুদ্ধার, পূর্ব বাংলা শোষণ ও লুণ্ঠন করে আপনার আর্থিক ও রাজনৈতিক সংকট হ্রাস করা, চিন ও কমিউনিজম প্রতিহত করার ঘাঁটি স্থাপন করা। ...

এ উপনিবেশ কায়েমের জন্য আপনি পূর্ব বাংলার দেশপ্রেমিকদের খোরাক হিসেবে ব্যবহার করেছেন। যে সকল দেশপ্রেমিক, বিশেষ করে পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টির কর্মী যারা আপনার গোলাম হতে রাজি হয়নি, তাদের 'নকশাল' অভিহিত করে আপনি খতম করিয়েছেন। এভাবে পূর্ব বাংলার দেশপ্রেমিকদের রক্তে আপনি হাত কলঙ্কিত করেছেন।

এতদিন আপনি এ শোষণ ও লুণ্ঠন গোপন চুক্তির মাধ্যমে করেছেন। বর্তমানে ২৫ বছরের শান্তি, মৈত্রী ও সহযোগিতা চুক্তির নামে আপনার তাঁবেদার বাংলাদেশ পুতুল সরকার প্রকাশ্যে আপনাকে বাঙালি জাতির দাসখত লিখে দিয়েছে এবং আপনার শোষণ লুণ্ঠনকে ন্যায়সংগত করেছে। ...

সর্বহারা পার্টির
হাতে লেখা প্রচারপত্র

পূর্ব বাংলার জাতীয় সমস্যার সুযোগ গ্রহণ করে পূর্ব বাংলায় ছয় পাহাড়ের দালাল মীরজাফরদের সহায়তায় পূর্ব বাংলা দখল করে এখানে উপনিবেশ কায়েম করেছেন। মীরজাফরদের দিয়ে পুতুল সরকার কায়েম করেছেন। ...

আপনার ও আপনার তাঁবেদারদের প্রকৃত উদ্দেশ্য জনগণ ব্যাপকভাবে উপলব্ধি করছে। পূর্ব বাংলার বীর জনগণ ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ, সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, পূর্ব বাংলায় ছয় পাহাড়ের দালাল মীরজাফরদের চূড়ান্তভাবে কবরস্থ করে সত্যিকার স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের থিসিস প্রচারিত হয়েছিল ১৯৬৮ সালে। এটাই ছিল সিরাজ সিকদারের লেখা প্রথম প্রচারিত

দলিল। থিসিসের নিচে দুটি স্লোগান ছিল—চেয়ারম্যান মাও দীর্ঘজীবী হোন: মার্কসবাদ, লেনিনবাদ, মাও সে তুং চিন্তাধারা জিন্দাবাদ। চার বছর পর ইন্দিরা গান্ধীর উদ্দেশে লেখা প্রচারপত্রের শেষে দুটি নতুন স্লোগান যোগ হয়—পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি জিন্দাবাদ; কমরেড সিরাজ সিকদার জিন্দাবাদ।

এরপর সর্বহারা পার্টির নামে যত দলিল বা বিবৃতি প্রচার করা হয়েছে, তাতে মাও সে তুং চিন্তাধারার উল্লেখ থাকলেও মাওয়ের নামে জিন্দাবাদ স্লোগান বেশি দেওয়া হয়নি। এর বদলে কমরেড সিরাজ সিকদার জিন্দাবাদ, কমরেড সিরাজ সিকদার দীর্ঘজীবী হোন, এ ধরনের স্লোগানই বারবার প্রচার করা হয়েছে। তার মানে, সিরাজ সিকদার নিজেকে একক নেতা হিসেবে তাঁর দলে প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং তাঁর সহকর্মী ও অনুসারীরা এটা মেনে নিয়েছেন। অনেক প্রচারপত্র তিনি নিজেই লিখতেন। যেগুলো অন্যদের দিয়ে লেখাতেন, সেগুলো তাঁর অনুমোদন ছাড়া প্রচার করা হতো না। তিনি সবকিছুতেই তাঁর নিজের নাম বসিয়ে দিতেন।

৬

দৃশ্যপট থেকে পাকিস্তানের সরে যাওয়া এবং ভারতের ঢুকে পড়ার ফলে সিরাজ সিকদারের তাত্ত্বিক অবস্থানে পরিবর্তন আসে। শ্রমিক আন্দোলনের থিসিসে এবং সর্বহারা পার্টির শুরুর দিকের নানা বক্তব্য-বিবৃতিতে পাকিস্তানি উপনিবেশবাদের সঙ্গে পূর্ব বাংলার জাতীয় দ্বন্দ্বকেই মুখ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছিল। অবস্থা এখন পাল্টেছে।

১৯৭২ সালের মার্চ মাসে লেখা এবং মে মাসে সংশোধিত একটি দলিলে সর্বহারা পার্টির পরিবর্তিত অবস্থান তুলে ধরা হয়। এই দলিলের শিরোনাম ছিল 'পূর্ব বাংলার বীর জনগণ, আমাদের সংগ্রাম এখনো শেষ হয়নি, পূর্ব বাংলার অসমাপ্ত জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করার মহান সংগ্রাম চালিয়ে যান।' দলিলে বলা হয়, পূর্ব বাংলায় ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের দখল কায়েম হওয়ার ফলে পাকিস্তানের সঙ্গে পূর্ব বাংলার জনগণের জাতীয় দ্বন্দ্বের অবসান হয়েছে। বর্তমানে এক নম্বর মৌলিক দ্বন্দ্ব হলো 'ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের সঙ্গে পূর্ব বাংলার জনগণের জাতীয় দ্বন্দ্ব।' অন্যান্য মৌলিক

দ্বন্দ্ব আগের মতোই আছে, যা শ্রমিক আন্দোলনের থিসিসে উল্লেখ করা হয়েছে। বিরাজমান পরিস্থিতির সারসংক্ষেপ করে দলিলে বলা হয় :

> ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীরা তার সেনাবাহিনীর সাহায্যে আগ্রাসী যুদ্ধ চালিয়ে পূর্ব বাংলায় তার উপনিবেশ কায়েম করেছে, এ কারণে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের সঙ্গে পূর্ব বাংলার জনগণের জাতীয় দ্বন্দ্ব উপরোক্ত দ্বন্দ্বসমূহের মাঝে প্রধান দ্বন্দ্ব।
>
> এ দ্বন্দ্ব সমাধানের পথ হচ্ছে সশস্ত্র জাতীয় বিপ্লবের মাধ্যমে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ ও তার পদলেহী কুকুর ছয় পাহাড়ের দালাল জাতীয় শত্রুদের খতম ও উৎখাত করা, বাংলাদেশ পুতুল সরকারকে উৎখাত করা, পূর্ব বাংলাকে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের ঔপনিবেশিক শৃঙ্খল থেকে মুক্ত ও স্বাধীন করা।

এ সময় গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদ—এ চার নীতিকে আওয়ামী লীগ 'মুজিববাদ' নামে প্রচার করছিল। সর্বহারা পার্টির এই দলিলে বলা হয়, 'মুজিববাদ হচ্ছে জাতীয় বিশ্বাসঘাতকতা ও ফ্যাসিবাদ' এবং জনগণ 'সাপের মুখ থেকে বাঘের মুখে পড়েছে।'

ঠিক এ সময় আওয়ামী লীগের সহযোগী সংগঠন ছাত্রলীগের একটি অংশ মুজিববাদের স্লোগান দেওয়া বন্ধ করে শ্রেণিসংগ্রাম ও সামাজিক বিপ্লবের স্লোগান দেওয়া শুরু করে। ছাত্রলীগের সাবেক নেতা ও ডাকসুর সহসভাপতি আ স ম আবদুর রব ছিলেন এই অংশের শীর্ষ নেতা। ছাত্রলীগের এই গ্রুপটি 'রব গ্রুপ' নামে পরিচিতি পায়। এই গ্রুপকে ইঙ্গিত করে দলিলে বলা হয় :

> আওয়ামী লীগ ফ্যাসিস্টদের জনপ্রিয়তাহীনতা এবং সমাজতন্ত্রের জনপ্রিয়তার সুযোগ গ্রহণ করে এককালের মুজিববাদের প্রণেতা রব গ্রুপ তথাকথিত শ্রেণিসংগ্রাম ও সামাজিক বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র কায়েমের কথা বলে পূর্ব বাংলায় ক্ষমতা দখল করে মার্কিনের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদীদের উপনিবেশ স্থাপনের চক্রান্ত করছে। আওয়ামী লীগ ফ্যাসিস্টদের মতো তাদের পতনও অনিবার্য।

গৃহদাহ

সর্বহারা পার্টির ঘোষিত নীতি হলো 'গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা'। এটি দুনিয়ার সব দেশের কমিউনিস্ট পার্টির নীতিবাক্য। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই গণতন্ত্র আর কেন্দ্রিকতার মধ্যে ভারসাম্য থাকে না। ফলে দলের মধ্যে তৈরি হয় কোন্দল এবং উপদল। জন্মলগ্ন থেকেই সর্বহারা পার্টির মধ্যে এই প্রবণতা ছিল।

বাহাত্তরের জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত দলের প্রথম কংগ্রেসের পরপরই শুরু হয় নতুন নাটক। দলের মধ্যে মতান্তর ও বিভেদ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তৈরি হয় টানাপোড়েন।

সিরাজ সিকদারের বেশির ভাগ লেখাই মাওয়ের লেখার অনুবাদ। মাওয়ের 'পার্টি ইতিহাসের প্রশ্নে প্রস্তাব' প্রবন্ধের আলোকে ১৯৭০ সালে সিকদার লিখেছিলেন 'ক্ষুদে বুর্জোয়াদের মতাদর্শের প্রকাশ সম্পর্কে'। তাঁর মতে, 'পেটিবুর্জোয়া মানসিকতার কারণেই বিচ্যুতি ঘটে এবং তৈরি হয় "আমিত্ব"। আমলাতন্ত্র, পিতৃতন্ত্র, দমননীতি, হুকুমবাদ, ব্যক্তিবিশেষের বীরত্ববাদ, আধা-নৈরাজ্যবাদ, উদারতাবাদ, উগ্র গণতন্ত্র, স্বাতন্ত্র্য দাবি করা, শক্তিশালী দুর্গের মনোভাব, নিজ এলাকা কিংবা সহপাঠীর জন্য পক্ষপাত, উপদলীয় গোলমাল এবং বদমাইশি কৌশল'—এসব প্রবণতা দলের মধ্যে সংহতি নষ্ট করে।

একই বছর 'বিভেদপন্থীবাদ' নামে প্রচারিত শ্রমিক আন্দোলনের আরেকটি বিবৃতিতে বলা হয়, 'কমিউনিস্ট পার্টির যে শুধু গণতন্ত্রই প্রয়োজন, তা নয়। কেন্দ্রিকতার প্রয়োজন আরও বেশি।' বিবৃতিতে সবাইকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়—গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার অর্থ হলো সংখ্যালঘু সংখ্যাগুরুর অধীন, নিম্নস্তর উচ্চস্তরের অধীন, অংশ সমগ্রের অধীন এবং সব সদস্য কেন্দ্রীয় কমিটির অধীন। এ বিবৃতিটি তৈরি হয়েছিল মাওয়ের 'পার্টির কর্মপদ্ধতির শুদ্ধিকরণ করো' রচনার ভিত্তিতে। এই বিবৃতিতে বিভেদপন্থীদের সম্পর্কে

খোলাখুলিভাবে বলা হয়—দলে কিছু লোক থাকে যারা সব সময় 'আমিই প্রথম' বলে দলের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক গুলিয়ে ফেলে। তারা দলের ওপর নিজেদের স্থান দেয়। তারা পদ, খ্যাতি এবং আত্মপ্রচারের ধান্দায় থাকে। এই উদ্দেশ্যে তারা ঘোঁট পাকায়, কিছু লোককে কাছে টানে, কিছু লোককে দূরে সরিয়ে দেয় এবং দলের মধ্যে পরস্পরকে তোষামোদ ও টানাটানি করে। ফলে তারা 'বুর্জোয়া শ্রেণির রাজনৈতিক পার্টির ইতর রীতিকে কমিউনিস্ট পার্টির ভেতরে নিয়ে আসে।'

বাংলাদেশে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে, এমনকি অরাজনৈতিক সংগঠনেও এ ধরনের উপদলবাদ দেখা যায়। এটা 'গ্রুপিং' নামে পরিচিত। দলের মধ্যে অমুক এ গ্রুপের তমুক ওই গ্রুপের, এরকম কথাবার্তার সঙ্গে সবাই কমবেশি পরিচিত। ফলে দলের মধ্যে দলাদলি হয়, দল ভাঙে এবং ভাঙা দল তার গ্রুপের শীর্ষ নেতার নাম ব্র্যাকেটবন্দি করে পরিচিতি পায়। এ ধরনের উদাহরণ আছে অনেক, যেমন মেনন গ্রুপ, মতিয়া গ্রুপ, ন্যাপ (মোজাফফর), ন্যাপ (ভাসানী), হকের পার্টি, রব গ্রুপ ইত্যাদি।

১৯৭২ সালের ৩০ এপ্রিল সর্বহারা পার্টি থেকে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। বিজ্ঞপ্তিতে লেখা ছিল 'সার্কুলার নম্বর পাঁচ'। কেন্দ্রীয় কমিটির ছয়জন সদস্যের দুজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল এই বিজ্ঞপ্তিতে। সর্বহারা পার্টির কোনো দলিল বা বিজ্ঞপ্তিতে সচরাচর 'কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে' শব্দগুলো উল্লেখ করা হয় না। কিন্তু এই বিজ্ঞপ্তিতে এটা উল্লেখ করা হয়। এর মাধ্যমে সিরাজ সিকদার দেখাতে চেয়েছেন যে এটা দলেরই বক্তব্য।

এই বিজ্ঞপ্তির শিরোনাম—পার্টি, বিপ্লব ও জনগণবিরোধী কার্যকলাপকে দৃঢ়ভাবে বিরোধিতা করুন। বিজ্ঞপ্তিতে দলের কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণ সদস্য সেলিম শাহনেওয়াজ ওরফে ফজলু এবং বিকল্প সদস্য মাহবুব ওরফে সুলতানের বিরুদ্ধে উপদলীয় চক্রান্তের অভিযোগ আনা হয়। অভিযোগগুলো ছিল :

- ফজলু-সুলতান পার্টির মধ্যে একটি চক্র তৈরি করে পার্টি ও বিপ্লববিরোধী ষড়যন্ত্র চালিয়েছে।
- ফজলু পার্টির সভাপতি বা কেন্দ্রীয় কমিটির অনুমতি ছাড়া দুই হাজার টাকা পার্টির ফান্ড থেকে চুরি করেছে। পার্টির অস্ত্র গোপনে চক্রান্তমূলক উদ্দেশ্যে সরিয়ে রেখেছে।

- ফজলু পার্টির নেতৃত্বের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ ও গুজব রটিয়েছে এবং কেন্দ্রীয় কমিটি ও সভাপতির প্রতি অনাস্থা জানিয়ে কর্মীদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছে।

এই বিজ্ঞপ্তিতে ফজলুর বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকলেও সুলতানের অপরাধের কোনো বর্ণনা নেই। তাঁদের আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনো সুযোগ দেওয়া হয়েছিল কি না, তাঁদের এ ব্যাপারে কোনো বক্তব্য আছে কি না, তা বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়নি। এটুকু বোঝা যায় যে ফজলু এবং সুলতান সিকদারের নেতৃত্বের সমালোচনা করেছেন এবং এটা সিকদার হজম করতে পারেননি। দলের সবার প্রতি আহ্বান জানিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, 'পার্টির প্রতি আস্থা রাখার অর্থ হচ্ছে কেন্দ্রীয় কমিটি ও তার সভাপতি কমরেড সিরাজ সিকদারের প্রতি আস্থা রাখা।' বিজ্ঞপ্তিতে 'ফজলু-সুলতান চক্র'কে পার্টি থেকে বহিষ্কারের ঘোষণা দিয়ে বলা হয়, ফজলু-সুলতান চক্র যেন জামালপুরের সাদেক-বেবী চক্র এবং বরিশালের আবুল হাসান-শান্তিলাল চক্রের পরিণাম থেকে শিক্ষা নেয় এবং নিজেদের অপরাধের আত্মসমালোচনা ও শাস্তি প্রার্থনা করে নিজেদের সংশোধনের সুযোগ চায়।

বিজ্ঞপ্তির এই অংশে এটা বোঝা যায়, দলের মধ্যে কোন্দল নতুন নয়। এর আগে সাদেক-বেবী চক্র এবং আবুল হাসান-শান্তিলাল চক্র নিয়ে দলে সমস্যা তৈরি হয়েছিল। পেয়ারাবাগানে দল গঠনের সময়ই ভাঙনের চিহ্নগুলো লুকিয়ে ছিল। কয়েক মাসের মধ্যে চাপা পড়া ক্ষতগুলো আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে।

বাহাত্তরের ৬-৭ মে সর্বহারা পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় ৩০ এপ্রিলের বিজ্ঞপ্তিটি অনুমোদন করা হয়। এ সভায় দলের চারজনকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করা হয়। বহিষ্কৃতরা হলেন ফজলু ওরফে আহাদ (পৈতৃক নাম সেলিম শাহনেওয়াজ), সুলতান ওরফে মাহমুদ ওরফে আকবর (পৈতৃক নাম মাহবুব), জাফর ওরফে কামাল (পৈতৃক নাম আজম) এবং হামিদ (পৈতৃক নাম মহসিন)। ১৯ মে সর্বহারা পার্টির প্রচারিত এক 'জরুরি বিবৃতি'তে ফজলু-সুলতান চক্র সম্পর্কে বলা হয়, তারা আত্মীয়তার সম্পর্ক ও পার্টির সুনামের সুযোগ নিয়ে খুলনায় একটি 'প্রতিক্রিয়াশীল দুর্গ' তৈরির চেষ্টা করেছে। বিবৃতিতে বলা হয় :

> অতীতে মাহবুব উল্লাহ ও আবুল কাসেম ফজলুল হক পূর্ব বাংলার বিপ্লবী কমিউনিস্ট আন্দোলন নাম দিয়ে একটি সংগঠন করেছিল, যার বক্তব্য ছিল পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের চুরি করা থিসিস। তারা এ বক্তব্য নিয়ে কিছুদিন কাজও করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিপ্লবের প্রক্রিয়ায় উত্থাপিত সমস্যার সমাধান দিতে ব্যর্থ হয়ে দেবেন-মতিনদের সঙ্গে যোগ দেয়। ফজলু-সুলতান চক্রেরও একই পরিণতি হবে। তাদেরও শেষ পর্যন্ত কাজী (জাফর) বা অন্য কোনো সংগঠনে যোগ দিতে হবে।

একই মাসে প্রচারিত সর্বহারা পার্টির আরেকটি বিবৃতিতে ফজলু-সুলতান চক্রের বিরুদ্ধে কয়েকটি নালিশ সুনির্দিষ্ট করা হয়। আগে যারা 'উপদলীয় চক্রান্ত' করেছে, তাদের প্রসঙ্গও উঠে আসে এই বিবৃতিতে। যেমন :

> হাজিপুরের সাদেক একটি চক্র তৈরি করে হঠকারী কার্যকলাপ চালায়।
>
> আবুল হাসান যৌন স্বার্থকে বিপ্লবী স্বার্থের অধীন না করে বিপ্লবী স্বার্থকে যৌন স্বার্থের অধীন করে।
>
> সুলতান যৌন স্বার্থকে বিপ্লবী স্বার্থের অধীন করতে ব্যর্থ হয় এবং পদের জন্য কাজ করে।
>
> ফজলু যৌন স্বার্থের কাছে আত্মসমর্পণকারী, সুবিধাবাদী ও অধঃপতিত সুলতানের সঙ্গে যোগ দেয় ও চক্রান্ত করে।

বাহাত্তরের মে মাসে প্রচারিত সর্বহারা পার্টির মুখপত্র *লালঝান্ডায়* উল্লেখ করা হয়, ফজলু-সুলতান চক্র 'চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়েছে এবং লজ্জাজনক পরাজয় বরণ করেছে'।

সর্বহারা পার্টির বিভিন্ন বিবৃতিতে ফজলু-সুলতান চক্রের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ আছে। কিন্তু এ থেকে পুরো বিষয়টি বোঝা যায় না। কেননা এটা হলো এক পক্ষের প্রচারণা। মুনীর মোরশেদের বই এবং অন্যান্য সূত্র থেকে এ ব্যাপারে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। ঘটনার সূত্রপাত পেয়ারাবাগানে। দলের কেউ কেউ চেয়েছিলেন, সিরাজ সিকদার সেখান থেকে সরে যান। যুদ্ধকৌশল নিয়ে সেখানে মতভেদ হয়েছিল। সিকদার সরে আসতে না চাইলেও পরে

নিজেকে প্রত্যাহার করে নেন। যুদ্ধে নিহত ফিরোজ কবিরকে শহীদের মর্যাদা দিতে অস্বীকার করেন সিরাজ সিকদার। এটি অনেকেই পছন্দ করেননি। তাঁর বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগ উঠেছিল তখনই। বাহাত্তরের জানুয়ারির পার্টি কংগ্রেসের পর বিভেদের দেয়ালটা আরও উঁচু হতে থাকে।

কেন্দ্রীয় কমিটিতে সদস্যদের ক্রম অনুযায়ী ফজলুর অবস্থান তিন নম্বরে। সিকদারসহ কমিটির তিন পূর্ণ সদস্যের একজন হলেন ফজলু। অঞ্চল পরিচালকের দায়িত্ব নিয়ে তিনি খুলনায় যান। তাঁর প্রেমিকার নাম মিনু ওরফে ছবি। ফজলুর সঙ্গে ছবির বিয়ে হয় একাত্তরের রণাঙ্গনে, পেয়ারাবাগানে। ছবির ভাই ফিরোজ কবির দলের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। একাত্তরে পেয়ারাবাগানকে ঘিরে যে আটটি সেক্টর তৈরি হয়েছিল, ফিরোজ কবির ছিলেন তার একটির রাজনৈতিক প্রধান বা কমিসার। তাঁদের বড় ভাই হুমায়ুন কবিরও এই দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। তিনি একজন কবি।

সর্বহারা পার্টিতে নেতা-কর্মীদের বিয়ে করতে হলে পার্টির অনুমতির দরকার হয়। পার্টির অনুমতি মানে সিরাজ সিকদারের রাজি হওয়া। ফজলু ছবিকে বিয়ে করতে চাইলে সিকদার আপত্তি করেন। সিকদারের যুক্তি হলো, ফজলু এবং ছবির মধ্যে তাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক মানের আকাশপাতাল ফারাক। একই অবস্থা সুলতানের। তাঁর প্রেমিকা সালমা দলের একজন কর্মী। সালমাকে বিয়ে করতে চান সুলতান। সালমার তাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক মান নিচু বলে সাব্যস্ত করলেন সিকদার। দুজনের আবেদনই নাকচ হয়ে যায়। একপর্যায়ে সিকদার খুলনায় গিয়ে ফজলুকে বোঝানোর চেষ্টা করেন।

সিকদারের যুক্তি হলো, তাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক মান গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে না আসা পর্যন্ত এ ধরনের বিয়ে প্রকৃতপক্ষে পেটিবুর্জোয়া মানসিকতার প্রতিফলন। এখানে ব্যক্তিস্বার্থ এবং যৌনতাকেই প্রশ্রয় দেওয়া হয়। এটা একধরনের বিচ্যুতি। 'শুধু যৌন কারণে অপরিবর্তিত বুদ্ধিজীবী মেয়েদের বিয়ে করা যৌনতার কাছে আত্মসমর্পণ' করা। এটা হলো যৌনস্বার্থের কাছে বিপ্লব, জনগণ ও পার্টি স্বার্থকে অধীন করা।

ফজলু এবং সুলতানকে কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে বাদ দেন সিকদার। ফজলুকে খুলনার অঞ্চল পরিচালকের পদ থেকে সরিয়ে চট্টগ্রামে বদলি করা হয়। চট্টগ্রামের অঞ্চল পরিচালক ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির দুই নম্বর সদস্য শহীদ ওরফে মাহবুব। ফজলুকে শহীদের অধীনে ন্যস্ত করা হয়। কেন্দ্রীয়



সেলিম শাহনেওয়াজ

কমিটির বিকল্প সদস্য মজিদ ওরফে নাসিরকে অঞ্চল পরিচালকের দায়িত্ব দিয়ে খুলনায় পাঠানো হয়।

ব্যাংক থেকে টাকা তুলতে সিকদার ও ফজলুর যৌথ স্বাক্ষরের দরকার হতো। ফজলুর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি সিকদারের সই নকল করে ব্যাংক থেকে দুই হাজার টাকা তোলেন এবং আরও ৫০ হাজার টাকা তুলে পালানোর ফন্দি আঁটেন। তাঁকে শেষবারের মতো সতর্ক করতে সিকদার চট্টগ্রামে যান। ফজলু গোপনে চট্টগ্রাম থেকে খুলনায় চলে আসেন। এর মধ্যে একটি দুর্ঘটনা ঘটে। চট্টগ্রামের অঞ্চল পরিচালক শহীদ তাঁর শেল্টার থেকে গ্রেপ্তার হয়ে যান।

ফজলুকে নিয়ে পরে যে কাহিনিটি প্রচার করা হয়, তা হলো খুলনায় গিয়ে তিনি চুপচাপ বসে ছিলেন না। তিনি তাঁর অনুগত মনসুর, জাফর, ইলিয়াস ও রিজভীকে নিয়ে পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি (এমএল) নামে একটি দল তৈরি করেন। এখানেই তিনি থেমে থাকেননি। নতুন অঞ্চল পরিচালক মজিদ ওরফে নাসিরকে তিনি আটক করে হত্যার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু অন্যরা তাঁর এ সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত না হওয়ায় মজিদকে হত্যা করা হয়নি। তাঁকে অস্ত্রের মুখে খুলনা থেকে চলে যেতে বাধ্য করা হয়।

ফজলু তাঁর স্ত্রী ছবিকে নিয়ে খুলনার টুটপাড়ায় একটা ভাড়া বাড়িতে থাকতেন। এক রাতে সে বাসায় আসেন ফজলুর ছেলেবেলার বন্ধু ও সর্বহারা পার্টির কর্মী রিজভী ও নুরু। তাঁরা একসঙ্গে রাতের খাবার খান। রিজভী পকেট থেকে একটা চিঠি বের করে ফজলুকে দেন। চিঠির প্রেরক শিখা। তিনি সংবাদ পাঠিয়েছেন, ঝালকাঠিতে তাঁর পরিচিত একজনের বাসায় অনেক অস্ত্র আছে, যা সহজেই নিয়ে নেওয়া যাবে।

দলে তখন অস্ত্রের সংকট। এতগুলো অস্ত্র এত সহজে পাওয়া যাবে, এটা জেনে ফজলু প্রলুব্ধ হন। রিজভী, নুরু এবং বিক্রমপুরের দেলোয়ারকে সঙ্গে নিয়ে পয়লা জুন ফজলু খুলনা থেকে ঝালকাঠির পথে রওনা হন। ৩ জুন সকালে গ্রামবাসী দেখল, সুগন্ধা নদীতে ভেসে যাচ্ছে ফজলুর লাশ। ছুরির আঘাতে তাঁর শরীর ক্ষতবিক্ষত। রিজভী সব সময় তিন ইঞ্চি ফলার একটা ছুরি গলায় ঝুলিয়ে রাখত।

ফজলু-সুলতান চক্রের বিরুদ্ধে অভিযোগনামা এবং পরিণামে ফজলুর খুন হওয়ার বয়ানটি সিরাজ সিকদার ও তাঁর অনুগতদের কাছ থেকে পাওয়া। এ ব্যাপারে ফজলু বা তাঁর কোনো সমর্থকের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। ভেতরের সত্যটি কী, তা হয়তো কোনোদিন জানা যাবে না।

তবে ফজলুর রাজনৈতিক অবস্থার সামান্য আভাস মেলে বাহাত্তরের জুনে প্রচারিত সর্বহারা পার্টির একটি বিবৃতিতে। 'বিশ্বাসঘাতক ফজলু চক্র কর্তৃক প্রচারিত পুস্তিকা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় কমিটির বিবৃতি' শিরোনামে প্রচারিত এই বিবৃতি থেকে জানা যায়, 'পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টির বিপ্লবী কমরেড ও সহানুভূতিশীল সিরাজ সিকদারের কাছ থেকে জবাব নিন' শিরোনামে ফজলু ও তাঁর সহযোগীরা বাহাত্তরের মে মাসে একটি পুস্তিকা বিলি করেছিলেন। বাহাত্তরের জুনে প্রচার করা সিরাজ সিকদারের বিবৃতিতে ওই পুস্তিকা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয় :

> সুতরাং কমরেডগণ, আসুন আমরা সিকদারের সুবিধাবাদী, ষড়যন্ত্রকারী, আমলাতান্ত্রিক, কুক্ষিগত নেতৃত্ব ও তার লেজুড় সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করি। ঘোষণা করি, পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টির লাইনের প্রতি আমরা অনুগত। কিন্তু তথাকথিত পার্টিপ্রধান সিরাজ সিকদারের নেতৃত্ব আমরা মানি না।

বোঝা যায়, ফজলুরা সিরাজ সিকদারের নেতৃত্বের সমালোচনা করেছিলেন, কিন্তু দলের নয়। অর্থাৎ তাঁরা নেতৃত্বের পরিবর্তন চেয়েছিলেন। দলের মধ্যে অনুসৃত 'গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা'র বেড়া ডিঙিয়ে এটি সম্ভব ছিল না। সিকদারের তুলনায় ফজলু যে কর্মীদের কাছে বেশি গ্রহণযোগ্য, এটা দেখাতে পারেননি। ফজলু নিহত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওই উপদলের মৃত্যু হয়। কিন্তু এর জের থেকে যায়।

ইতিমধ্যে সর্বহারা পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি আরও ছোট হয়ে আসে। ফজলু-সুলতান নেই। শহীদ গ্রেপ্তার হয়ে গেছেন। বাকি থাকলেন তিনজন, সিরাজ সিকদার, রানা ওরফে আকা ফজলুল হক এবং মজিদ ওরফে নাসির। এই তিনজনের কমিটি নিয়েই ভেসে চলল সর্বহারা পার্টির ডিঙি। হাল ধরে থাকলেন সিরাজ সিকদার।

হুমায়ুনবধ

হুমায়ুন কবিরের বাড়ি ঝালকাঠি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে বিএ অনার্সে ভর্তি হন ১৯৬৫ সালে। কবিতা লিখতেন। চিনপন্থী ছাত্র ইউনিয়নের সংগঠক ছিলেন। ১৯৬৬ সালের জুন মাসে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হয়েছিলেন। একই কমিটিতে ছিলেন সিরাজ সিকদার।

পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে কিছুটা জড়িয়ে পড়েছিলেন হুমায়ুন। তবে দলের ক্যাডার ছিলেন না। ছিলেন সহানুভূতিশীল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় প্রেমে পড়েন সহপাঠী সুলতানা বেগম রেবুর। তাঁরা বিয়ে করেছিলেন। রেবু রাজনৈতিক পরিবারের মেয়ে। তাঁর বড় ভাই জহিরুল রেভল্যুশনারি সোশ্যালিস্ট পার্টির (আরএসপি) সদস্য ছিলেন। ১৯৬৯ সালের ২৯ আগস্ট এই দলের নাম বদলে রাখা হয় শ্রমিক-কৃষক সমাজবাদী দল। রেবু ছাত্র ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৬৭ সালের ৫ নভেম্বর ছাত্র ইউনিয়ন ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে *আলোর পথযাত্রী* নামে একটি নাটিকায় অন্যান্যের মধ্যে অভিনয় করেন কামাল লোহানী, আতাউর রহমান, স্নিগ্ধা চক্রবর্তী, সাঈদা নার্গিস ও সুলতানা রেবু।

শ্রমিক আন্দোলন থেকে জন্ম নিল সর্বহারা পার্টি। হুমায়ুন কবিরের ছোট ভাই ফিরোজ কবির ছিলেন সর্বহারা পার্টির সার্বক্ষণিক কর্মী। ছোট বোন ছবির সঙ্গে প্রেম ও বিয়ে হয় সর্বহারা পার্টির আরেক নেতা সেলিম শাহনেওয়াজের। পার্টিতে সেলিমের নাম ফজলু আর ছবির নাম মিনু। ফজলু, মিনু এবং ফিরোজ তিনজনই বরিশালের পেয়ারাবাগানে পাকিস্তানি সৈন্যদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধযুদ্ধে অংশ নেন। একপর্যায়ে সিরাজ সিকদারের সঙ্গে ফিরোজের মতভেদ হয়। সিকদার ফিরোজকে দল থেকে বের করে দেন।



অমর একুশে অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করছেন হুমায়ুন কবির। পাশে কবীর চৌধুরী ও সুফিয়া কামাল। বাংলা একাডেমি, ফেব্রুয়ারি ১৯৭২

এর কিছুদিন পরেই ফিরোজ পাকিস্তানি সৈন্যদের হাতে ধরা পড়েন এবং নিহত হন।

পেয়ারাবাগানে কুড়িয়ানার যুদ্ধে সর্বহারা পার্টির অনেকেই বীরের মতো লড়াই করেছেন। তাঁদের অন্যতম ছিলেন ফিরোজ। কুড়িয়ানার শহীদদের উদ্দেশে 'সাহস সাহস' নামে একটি কবিতা লেখেন হুমায়ুন কবির। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *কুসুমিত ইস্পাত*-এ কবিতাটি স্থান পেয়েছে। এই কবিতার কয়েকটি পঙ্‌ক্তি এরকম :

> পাটাতনে বজ্র পড়ে পৈশাচিক তাইফুন ঝড়ে
> পাল ছেড়ে হাল ভাঙ্গে খানখান বিশাল জাহাজ
> তবুও ঝড়ের যুবা তুলে নেয় দীর্ঘ তলোয়ার
> হা হা হাসে পাঞ্জা লড়ে সারারাত শয়তানের সাথে
> রক্তের গভীর থেকে আঁচ দেয় কুড়িয়ানা, দীপ্ত কুড়িয়ানা
> বিলের গভীর জল, শার্পশট, ফিরোজের দেহ।

ফিরোজের মৃত্যু হুমায়ুনকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছিল। তখন থেকেই তিনি সিরাজ সিকদারের সন্দেহের তালিকায়। দল থেকে বহিষ্কৃত একজন ক্যাডারের জন্য হুমায়ুনের এই ভালোবাসাকে সিকদার পেটিবুর্জোয়া বিচ্যুতি হিসেবে দেখলেন।

হুমায়ুনের ছোট বোন ছবির স্বামী সেলিম শাহনেওয়াজ ওরফে ফজলুকে দলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে বহিষ্কার করা হয়। হুমায়ুন তখন ঢাকায় ইন্দিরা রোডের একটি ভাড়া বাসায় থাকেন। টিনশেড একতলা বাড়ি। ভাড়া মাসে পাঁচশ টাকা। দল থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার পর ফজলু এই বাসায় এসেছিলেন ছবিকে নিয়ে। এক রাত থেকে তিনি চলে যান বরিশাল। দুদিন পর তিনি খুন হন। ঢাকায় ফজলুকে আশ্রয় দেওয়ার কারণে হুমায়ুনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনে সর্বহারা পার্টি। সিরাজ সিকদারের কাছে 'ষড়যন্ত্রকারী'র ক্ষমা নেই। তিনি হুমায়ুনকে মৃত্যুদণ্ড দেন। দলের দুজন কর্মী বাহাত্তরের ৬ জুন রাতে সাইকেল চালিয়ে ইন্দিরা রোডে হুমায়ুনের বাসায় যান। তাঁকে বাসা থেকে ডেকে এনে সামনের মাঠে দাঁড় করিয়ে গুলি করে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়।

হুমায়ুন কবির বাংলা একাডেমিতে গবেষণার কাজ করতেন। বাহাত্তরের মার্চে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে লেকচারার হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। তিন মাস না পেরোতেই তাঁর শিক্ষকতায় যবনিকা পড়ল। ওই রাতের কথা কখনো ভুলতে পারবেন না সুলতানা রেবু। তাঁর অভিজ্ঞতার বিবরণ দিয়েছেন এভাবে :

> জুন মাসের অসহ্য গরম। রাত তখন দশটা। আমার দুই শিশুসন্তান পাশের বাড়িতে টেলিভিশন দেখছে। আমি ঘুমিয়ে পড়েছি। দরজা ধাক্কা দিয়ে পাশের বাড়ির একজন আমার ঘুম ভাঙালেন। বললেন, আমার সঙ্গে আসেন। তিনি দেখেছেন, দুজন লোক সাইকেলে চড়ে এ বাসায় এসেছিল। হুমায়ুন তাদের সঙ্গে বেরিয়ে যান। প্রতিবেশী বললেন, হুমায়ুন মাঠে শুয়ে আছেন। ব্যাপারটা কী? প্রথমে ভেবেছিলাম, অসহ্য গরমের কারণে বোধ হয় বাসা থেকে বের হয়ে মাঠে শুয়ে আছে। আমি হুমায়ুনের নাম ধরে ডাকলাম। কোনো নড়াচড়া নেই। মাথায় হাত রাখতেই হাত ভিজে গেল রক্তে। প্রতিবেশী আর আমি ধরাধরি

করে তাকে তুললাম একটা বেবিট্যাক্সিতে। সোজা নিয়ে গেলাম ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে।

হাসপাতাল থেকে ফোন করলাম আমাদের পারিবারিক বন্ধু আহমদ ছফাকে। ছফা ভাই জানালেন আহমদ শরীফ স্যারকে। ছফা ভাই খবরটা শুনেই হাসপাতালে এলেন। আমি ডাক্তারদের ডিউটি রুমের পাশে বসে ছিলাম। হুমায়ুনকে যেখানে রাখা হয়েছিল, আমাকে সেখানে যেতে দেওয়া হয়নি। ওর কানের পাশ দিয়ে গুলি ঢুকেছিল। অনেক রক্তক্ষরণ হয়েছিল। একসময় সে ঢলে পড়ল।

হুমায়ুন কবির সর্বহারা পার্টি করুন আর না-ই করুন, এই দলের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ছিল। বৃহত্তর বরিশাল জেলায় এই দলের প্রভাব ছিল লক্ষণীয়। এদের অনেককেই তিনি জানতেন। তিনি কি কখনো ভেবেছিলেন তাঁকে এমনভাবে চলে যেতে হবে? নাকি যে ভয়ংকর পথের যাত্রীদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িয়ে পড়েছিলেন, তার অনিবার্য পরিণতি সম্পর্কে অবচেতনেও উঁকি দিয়েছিল শঙ্কা? তাই তিনি লিখেছিলেন :

সবুজ গর্বিত শির উঠেছে আকাশে
জননীর ভালোবাসা শিরস্ত্রাণ সঙ্গে নিয়ে আছো
গোলরক্ষকের মতো সাবলীল লুফছো মৃত্যুকে
প্রসন্ন ভোরের হাসি তুলে নাও ঠোঁটে
ফুসফুস বিদ্ধ করে আততায়ী বুলেট যখন।

২

খুন করার আগে হুমায়ুনকে বাসা থেকে ডেকে নেওয়া হয়েছিল। একজন অপেক্ষা করছিল সামনের মাঠে। অন্যজন কড়া নেড়ে ডেকেছিল তাঁকে। সর্বহারা পার্টির সংস্কৃতির সঙ্গে হুমায়ুনের চেনাজানা আছে। রাত দশটায় হুট করে অচেনা কেউ ডাকলে তিনি বের হবেন কেন? যে এসেছিল, হুমায়ুন তার সঙ্গে মাঠে যান। বোঝা যায়, আগন্তুক তাঁর চেনা এবং তাকে অবিশ্বাস

করার কোনো কারণ ঘটেনি। একজন বিশ্বস্ত লোককে পাঠিয়ে তাঁকে যে একটা ফাঁদে ফেলা হচ্ছে, এটা তিনি বুঝতে পারেননি। সুকৌশলে ফাঁদটি পাতা হয়েছিল।

প্রথমে মনে হয়েছিল, এটি একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা। সর্বহারা পার্টির মধ্যেও কানাঘুষা ছিল, দলের অতি-উৎসাহী কেউ কাণ্ডটি ঘটিয়ে থাকতে পারে। অবশেষে সব জল্পনাকল্পনার অবসান হয় ১০ জুন। সর্বহারা পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির নামে প্রচারিত একটি লিফলেটে হুমায়ুন কবির হত্যার দায় নিয়ে নেয় সর্বহারা পার্টি। 'হুমায়ুন কবির প্রসঙ্গে বক্তব্য' শিরোনামে এক বিবৃতিতে তাঁর মৃত্যুদণ্ডের প্রেক্ষাপট ও তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের ফিরিস্তি তুলে ধরা হয় এভাবে :

> হুমায়ুন কবির পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিল। পরবর্তীকালে সুবিধাবাদ, ব্যক্তিস্বার্থ (স্ত্রী, পরিবার), চাকরি ও পদের স্বার্থে সে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। বহুদিন তার সঙ্গে যোগাযোগও বিচ্ছিন্ন থাকে।
>
> বরিশালে সে একবার ধরা পড়ে। কিন্তু জেল থেকে সে বন্ড দিয়ে বেরিয়ে আসে। অর্থাৎ পাক সামরিক দস্যুদের কাছে সে আত্মসমর্পণ করে।
>
> ২৬ মার্চ-পরবর্তী সময়ে সে দীর্ঘদিন পালিয়ে থাকে। পার্টি তার সঙ্গে যোগাযোগ করে বারবার জাতি ও জনগণের এই সংকটজনক অবস্থায় বিপ্লবে যোগদানের আহ্বান জানায়। শেষ পর্যন্ত সে এর শর্ত হিসেবে বিরাট অঙ্কের ভাগ চায়। পার্টি বারবার বোঝানোর ফলে সে কিছুটা তৎপরতায় অংশগ্রহণ করে। এটা সে করে আত্মপ্রচার ও দুঃসাহসী বীর হিসেবে নিজেকে জাহির করার জন্য।
>
> ইতিমধ্যে তার ভাই ফিরোজ কবির ওরফে তারেক চক্রান্ত করে একজন কমরেডকে হত্যা, সমরবাদী নীতি, বন্দুকের ডগায় নারীদের নিয়ে স্বেচ্ছাচার করার জন্য পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি কর্তৃক বহিষ্কৃত হয়। হুমায়ুন কবির এই বহিষ্কারকে শুধু যে মেনে নিতে পারেনি তা-ই নয়, পার্টির মতামতকে উপেক্ষা করে সে তার ভাই ও সামন্তবাদী বংশকে বীর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য পত্রিকায় এবং বাংলা একাডেমিতে

তার ভাইয়ের জীবনী (সত্যকে লুকিয়ে রেখে) ছাপানোর ব্যবস্থা করে।

সাহিত্যিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ, নাম যশ করার পুরোপুরি বুর্জোয়া দৃষ্টিকোণসম্পন্ন হওয়ায় স্বভাবতই হুমায়ুন কবিরের মধ্যে ব্যক্তিস্বার্থের প্রাধান্য ছিল। তার ইচ্ছা ছিল আরএসপির নির্মল সেন ও প্রফেসর সিদ্দিকের মতো চাকরি ও বুর্জোয়া জীবনযাপন করে সর্বহারা পার্টির নেতা হওয়া এবং লেখক হিসেবে নিজেকে জাহির করা। তার এই মনোভাব এবং তার ভাই ফিরোজ কবির-সংক্রান্ত পার্টির সিদ্ধান্ত তাকে প্ররোচিত করে ফজলু-সুলতান চক্রের সঙ্গে যুক্ত হতে।

ফজলু চক্রের উদ্ভব ও বিকাশের একটা সময় পর্যন্ত হুমায়ুন কবির পার্টি ও কমরেডদের ভাঁওতা দেয় যে সে এর সঙ্গে যুক্ত না। ফজলু চক্র-সংক্রান্ত প্রথম সার্কুলার পড়ে সে বলে, 'পার্টি যখনই ভালো অবস্থায় আসে, তখনই কিছু লোক পার্টিকে ধ্বংস করতে আসে। ফজলু-সুলতান চক্রকে খতম করা উচিত। আমার বোনটা (ফজলুর স্ত্রী) একটা খারাপ লোকের হাতে পড়েছে। তাকে (বোনকে) পেলে আমার কাছে ফেরত দিয়ে যাবেন। আপনারা কী করছেন? এখনো তাদের খুঁজে বের করে খতম করছেন না কেন?'

একদিকে সে এ ধরনের কথা বলছে, অন্যদিকে ফজলু চক্র ও নিজের বোনকে আশ্রয় দিয়েছে। পার্টি ও নেতৃত্ববিরোধী অপপ্রচার ও জঘন্য ব্যক্তিগত কুৎসা-সংবলিত দলিলাদি লিখেছে, ছাপিয়েছে এবং বিতরণ করেছে, চক্রের প্রধান প্রতিক্রিয়াশীল বুদ্ধিজীবী হিসেবে কাজ করেছে। তার উদ্দেশ্য ছিল চক্রান্তকারীদের চর হিসেবে গোপনে পার্টির মধ্যে অবস্থান করা, যাতে ফজলু চক্রের পতন হলেও সে পার্টির মাঝে লুকিয়ে থাকতে পারে এবং পার্টির বিরাট আকারে ক্ষতি সাধন করতে পারে। সে পার্টির প্রতি বিশ্বস্ততা দেখিয়েছে আর গোপনে ঢাকায় ফজলু চক্রের গুপ্তঘাতক দলের পরিচালক হিসেবে কাজ করেছে। এভাবে দীর্ঘদিন সে পার্টির মাঝে গুপ্ত বিশ্বাসঘাতক হিসেবে বিরাজ করে। সে পুরোপুরি পার্টির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। ...

তার মৃত্যুর পর বাংলাদেশ পুতুল সরকার যে সকল পদক্ষেপ নিয়েছে, আজ পর্যন্ত কোনো নিহত বুদ্ধিজীবীর ক্ষেত্রে তা করা

হয়নি। উপরন্তু বাংলা একাডেমি ও অন্যান্য স্থানে সকলেই জানে, সে বামপন্থী দল সর্বহারা পার্টির সঙ্গে যুক্ত। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, সর্বহারা পার্টির একজন সাধারণ কর্মী লিফলেট বিতরণ করতে যেয়ে ধরা পড়লে তার হাত ভাঙা হয় এবং চরম নির্যাতন চালানো হয়। বর্তমানে তাকে ক্যান্টনমেন্টে বন্দি করা হয়েছে। অতীতে আমাদের কর্মী এমনকি সহানুভূতিশীলদের পেলেও খতম করা হয়েছে। বর্তমানেও এরূপ নির্দেশ রয়েছে। এমতাবস্থায় বাংলাদেশ পুতুল সরকার ও ছয় পাহাড়ের দালালদের হুমায়ুন কবিরের প্রতি এই বিশেষ দরদের তাৎপর্য কী?

এই বিবৃতিতে হুমায়ুন কবিরের বিরুদ্ধে অভিযোগের অন্ত নেই। এতদিন ধরে একজন ব্যক্তি পার্টির সঙ্গে আছেন, বুদ্ধিজীবী ফ্রন্টে কাজ করছেন, চমৎকার সব কবিতা লিখছেন। বলা নেই কওয়া নেই, কোনো সতর্কবাণী নেই, ভুল হয়ে থাকলে তা শোধরানোর কোনো সময়সীমা নেই, দল থেকে বহিষ্কারের আয়োজন নেই, এক লাফে চরম দণ্ড দিয়ে দেওয়া হলো!

হুমায়ুন কবির হত্যাকাণ্ডে ঢাকার বিদ্বজ্জনের মধ্যে তোলপাড় হয়েছিল। দলের মধ্যে 'শুদ্ধিকরণের' নামে এরকম হত্যাকাণ্ড ঘটানো হবে, এটা অনেকেই কল্পনা করতে পারেননি। অনেকের মনে প্রশ্ন ছিল, দলবিরোধী কাজে যুক্ত হওয়ার অভিযোগ থাকলে বিবৃতি দিয়ে দল থেকে বের করে দিলেই তো হতো। মেরে ফেলতে হবে কেন?

৩

হুমায়ুন কবিরকে কারা এসেছিল খুন করতে? অনুসন্ধানে জানা যায়, দুজন আততায়ী এসেছিল তাঁর কাছে। হুমায়ুনের কাছে একটা এসএমজি এবং দুটি পিস্তল ছিল। তাঁকে হত্যা করার আগে অস্ত্রগুলো তাঁর কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া হয়। একটি পিস্তল ছিল জনৈক ইকবালের কাছে। হুমায়ুন হত্যায় ওই পিস্তলটি ব্যবহার করা হয়। খুন করার আগে আগন্তুক তাঁকে বাড়ি থেকে ডেকে আনে। তারপর তাঁকে মাঠে নিয়ে যায়। মাঠে অপেক্ষা করছিল আরেকজন। যে ডেকে



আহমদ ছফা

নিয়েছিল, সে হুমায়ুনের পূর্বপরিচিত এবং আস্থাভাজন।

হুমায়ুনকে আগেই নিরস্ত্র করা হয়েছিল। অর্থাৎ তাঁর সংগ্রহে থাকা অস্ত্র নিয়ে নেওয়া হয়েছিল। এর মানে হলো, তাঁকে হত্যার পরিকল্পনা নেওয়া হয় কয়েকদিন আগে। ফজলু খুন হওয়ার তিনদিন পর হুমায়ুন খুন হন। ধারণা করা যেতে পারে, দুজনকে একই সময় হত্যার ছক কষা হয়েছিল। ফজলুকেও একই প্রক্রিয়ায় খুন করা হয়। তাঁকে বরিশালে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। হুমায়ুনের বোন, ফজলুর স্ত্রী ছবিকে পেলে তাঁকেও হত্যা করা হতো।

হুমায়ুনের বিরুদ্ধে পার্টির পক্ষ থেকে অভিযোগের যে ফিরিস্তি দেওয়া হয়, তা দাঁড় করানো হয় খুনের পরে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগগুলো বেশ কড়া—পার্টির বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা, ছোট ভাই ফিরোজ কবিরের বহিষ্কারকে মেনে না নেওয়া, বোনের স্বামী ফজলুকে সমর্থন দেওয়া, বোনকে

আশ্রয় দেওয়া। এখানেই শেষ নয়। হুমায়ুনের পরিবারকে চিহ্নিত করা হয় 'সামন্তবাদী' হিসেবে। চাকরি করা এবং স্ত্রী-সন্তান নিয়ে সংসার করাকে গর্হিত অপরাধ হিসেবে দেখা হয়।

হুমায়ুন কবিরের খুব কাছের বন্ধু ফরহাদ মজহার। ফরহাদ পার্টির সার্বক্ষণিক কর্মী ছিলেন না। তাঁদের আরেক বন্ধু আহমদ ছফা ছিলেন পার্টির প্রতি 'সহানুভূতিশীল'। তাঁরা আরও কয়েকজনকে নিয়ে প্রথাবিরোধী ও প্রগতিবাদী লেখকদের একটি প্ল্যাটফর্ম গড়ে তুলেছিলেন। নাম দিয়েছিলেন 'বাংলাদেশ লেখক শিবির'। এ সময় একটা স্ক্যান্ডাল রটানো হয়, হুমায়ুন হত্যার সঙ্গে ফরহাদ জড়িত। তিলকে তাল বানানোর স্বভাব আছে অনেকের। এতে তারা বিকৃত আনন্দ পায়।

হুমায়ুন কবির খুন হওয়ার পর ফরহাদ মজহারকে নিয়ে পুলিশ টানাটানি করেছিল। আহমদ ছফাকে নিয়েও টানাহেঁচড়া হয়। হুমায়ুন হত্যার সঙ্গে এঁরা জড়িত, এটা হুমায়ুনের পরিবারে কেউ বিশ্বাস করেন না। পার্টির লোকেরাও এ প্রচারণাকে আমল দেয়নি। হুমায়ুন খুন হয়েছিল সিরাজ সিকদারের নেওয়া সিদ্ধান্তে, পার্টির লোকদের হাতে।

হুমায়ুন কবিরের মৃত্যুর পর আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ সম্পাদিত *কণ্ঠস্বর* পত্রিকার একটি বিশেষ সংখ্যা তাঁর নামে উৎসর্গ করা হয়। সেখানে ফরহাদ মজহারের একটি কবিতা ছিল। তিনি লিখেছিলেন :

> আমিও বলতে পারতুম যেমন বন্ধুরা আমাকে বলে
> আমি বন্ধুর মতোন গ্রীবা উঁচিয়ে বলতে পারতুম
> হুমায়ুনের কাঁধে হাত রেখে বলতে পারতুম, 'হুমায়ুন
> আয় আমার সঙ্গে বোস, আমরা কিছু না-ছুঁয়ে বসে থাকব।'
> জানিয়ে দিতে পারতুম ইস্পাতের সঙ্গে কুসুমের ভালোবাসা ভালো না।
> ভালো নয় সেতুর উপর দাঁড়িয়ে খেয়ার জন্য অপেক্ষা করা
> ভালো নয় ইন্দিরা রোডে রেবুকে ফেলে লেখক শিবিরে মেতে থাকা
> বলতে পারতুম 'অত দ্রুত নয় হুমায়ুন, আস্তে আস্তে যা।'

হুমায়ুন খুন হওয়ার পর সর্বহারা পার্টির বিবৃতিতে হুমায়ুনের বিরুদ্ধে 'চাকরি ও বুর্জোয়া জীবনযাপনের' প্রতি লোভের ইঙ্গিত দিয়ে বিষোদগার করা

হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে হুমায়ুন ও রেবুর সংসারে সচ্ছলতা ছিল না। হুমায়ুন কপর্দকশূন্য অবস্থায় মারা যান। তাঁর পরিবার কীভাবে চলবে, এ নিয়ে বন্ধুরা বিচলিত হন। ওই সময়ের একটি বিবরণ পাওয়া যায় শ্রমিক-কৃষক সমাজবাদী দলের নেতা ও সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি নির্মল সেনের বয়ানে :

> হুমায়ুন কবিরের স্ত্রী সুলতানা রেবু একসময় আমাদের দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। হুমায়ুন কবির খুন হয়ে যাওয়ায় পারিবারিকভাবে অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা দেয়। আমি গণভবনে গেলাম। দেখলাম দূরে তাঁর কক্ষে প্রধানমন্ত্রী বসে আছেন। পাশে দাঁড়িয়ে রফিকুল্লাহ চৌধুরী। রফিকুল্লাহকে বললাম, চেক বইটা নিয়ে আসুন। প্রধানমন্ত্রী, আপনার তহবিল থেকে দুই হাজার টাকার একটি চেক লেখেন সুলতানা রেবুর নামে। টাকার বড্ড প্রয়োজন। প্রধানমন্ত্রী হেসে বললেন, আপনি প্রধানমন্ত্রী হয়ে গেলেন নাকি। হুমায়ুন কবির কি মুক্তিযোদ্ধা? তাঁর পরিবারকে টাকা দেব কেন? আমি বললাম, টাকা দিতে হবে এটাই শেষ কথা। আমার যুক্তি হচ্ছে—আপনি প্রধানমন্ত্রী। আপনার আমলে হুমায়ুন কবির খুন হয়েছে। আপনার সরকার এখনো আততায়ীকে ধরতে পারেনি। তাই আপনাকে জরিমানা দিতে হবে দুই হাজার টাকা। প্রধানমন্ত্রী জোরে হেসে ফেললেন। রফিকুল্লাহ চৌধুরী চেক লিখে নিয়ে এল। প্রধানমন্ত্রী স্বাক্ষর করলেন।

হুমায়ুন কবির নিহত হওয়ার তিনদিন পর লেখক শিবিরের উদ্যোগে তাঁর বন্ধু ও ভক্তরা একটি মিছিল করে গণভবনে যান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক এবং ছাত্রও ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী গণভবনেই ছিলেন। তিনি সমবেত লেখক ও ছাত্রদের উদ্দেশে বলেন, হুমায়ুন কবিরের নিহত হওয়ার খবরটি শুনে তিনি খুব মর্মাহত হয়েছেন। নিহত ব্যক্তির পরিবারের প্রতি তিনি সমবেদনা জানান এবং তাদের সব ধরনের সাহায্যের আশ্বাস দেন। সংবাদটি ১০ জুন *পূর্বদেশ* পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হলের প্রভোস্ট ছিলেন মেহেরুন্নেসা চৌধুরী। তাঁর আগ্রহে ও চেষ্টায় সুলতানা রেবু ওই হলে হাউস টিউটর হিসেবে নিয়োগ

পান। লেখককে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মেহেরুন্নেসা চৌধুরী বলেন :

আমি বাহাত্তরের এপ্রিলে শামসুন্নাহার হলের প্রভোস্ট হিসেবে দায়িত্ব পাই। এর আগে ছিলাম রোকেয়া হলের হাউস টিউটর। শামসুন্নাহার হলের বিল্ডিং তখনো পুরোপুরি তৈরি হয়নি। মাত্র একটা ফ্লোর রেডি হয়েছে। সব সিঙ্গেল সিটেট রুম। রোকেয়া হলে আড়াইশ মেয়ে ডাবলিং করত। ওরা দাবি জানিয়েছিল, তাড়াতাড়ি সেখানে উঠে যেতে।

হুমায়ুন কবির বাংলা ডিপার্টমেন্টে সবার প্রিয় ছিল। খুব ভালো লিখত। আহমদ শরীফ সাহেব, নীলিমা ইব্রাহীম সবাই তাকে খুব পছন্দ করতেন। তাঁরা চাচ্ছিলেন সুলতানা রেবুর জন্য কিছু করতে।

খবর পেয়েই আমি ছুটে গেছি ইন্দিরা রোডে ওর বাসায়। মাঠের পাশে কয়েকটা টিনশেড ঘর। সেখানে একটা বাসায় থাকত। খুঁজে পেলাম। আমাকে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে গিয়েছিল আমার ছেলে ফুয়াদ চৌধুরী। রেবুর জন্য খুব খারাপ লাগছিল। বরিশাল মহিলা কলেজে ও আমার ছাত্রী ছিল। আমি প্রিন্সিপাল। হিস্ট্রি পড়াতাম। ওর বাড়ির অবস্থা তেমন ভালো ছিল না। ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার ফিস দিতে দেরি হয়েছিল। পরীক্ষায় পাস করে সে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে বাংলা ডিপার্টমেন্টে ভর্তি হয়েছিল।

ওর বাসাটা খুঁজে পেলাম। দেখলাম ও ঘর থেকে বের হয়ে আসছে। কোলে একটা বাচ্চা মেয়ে। ওর নাম খেয়া। বড় ছেলেটার নাম আদিত্য, ডাক নাম সেতু। ছোট ছেলেটার নাম অভীক।

আমি ওকে জড়িয়ে ধরেছি। এ তো হাঁটতেই পারে না, এত নার্ভাস। শুধু কাঁদে। তাকে বললাম, একটা কিছু করা হবে তোমার জন্য। চিন্তা করো না।

বাংলা ডিপার্টমেন্টের সবাই তার জন্য উদ্বিগ্ন। সে তো থাকে বাচ্চাদের নিয়ে একা, একটা নিরিবিলি জায়গায়। বাংলা ডিপার্টমেন্টের সবাই মিলে একটা বাসার ব্যবস্থা করে তাদের সেখানে নিয়ে এল। বরিশালের মন্ত্রী আবদুর রব সেরনিয়াবাতের সঙ্গে পারিবারিকভাবে আমাদের জানাশোনা। আমি রেবুকে নিয়ে সেরনিয়াবাত সাহেবের কাছে গেলাম। বললাম, ওর জন্য একটা কিছু করা দরকার।

সেরনিয়াবাত সাহেব বললেন, ওরা তো আমাদের বিরুদ্ধে। বললাম, কিছু একটা করতেই হবে। ও আমার ছাত্রী।

আমি তাকে শামসুন্নাহার হলের হাউস টিউটর হিসেবে নিলাম। হাউস টিউটরদের জন্য বাসার ব্যবস্থা ছিল। একটা তিনতলা বিল্ডিং। তখনো পুরোপুরি তৈরি হয়নি। রেবু বলল, ও দোতলায় থাকতে চায়। আমি দোতলাটা তাড়াতাড়ি রেডি করালাম। ও সেখানে এসে উঠল।

পরে তাকে হাউস টিউটর পদ থেকে সরিয়ে টিএসসির স্টুডেন্ট কাউন্সেলিং অ্যান্ড গাইডেন্সের উপপরিচালক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। আমি তখন সেখানে পরিচালক। থাকত শামসুন্নাহার হলের হাউস টিউটরের কোয়ার্টারেই। টিএসসির কর্মকর্তাদের জন্য কোনো বাসা বরাদ্দ ছিল না।

১৬ জুন এক বিবৃতিতে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সভাপতি মওলানা ভাসানী হুমায়ুন কবিরের মৃত্যুতে শোক জানান। তিনি হত্যাকারীদের কঠোর শাস্তি দেওয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

৪

মাহবুব তালুকদার একজন কবি ও গল্পকার। হুমায়ুনকে নিয়ে তাঁর কিছু স্মৃতি আছে। মাহবুব তালুকদার বাহাত্তরের ১৭ জানুয়ারি রাষ্ট্রপতির স্পেশাল অফিসার হিসেবে যোগ দেন। বঙ্গভবনে অফিস। হুমায়ুন সেখানে কয়েকদিন গেছেন। স্মৃতির ঝাঁপি খুলে তার একটি অন্তরঙ্গ বিবরণ দেন মাহবুব তালুকদার।

স্বাধীনতার পরপর বঙ্গভবন ছিল সবার জন্য উন্মুক্ত। একদিন হুমায়ুন এসে হাজির মাহবুব তালুকদারের অফিসে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে মাহবুব তালুকদারের ছাত্রত্ব শেষ হয়ে যাওয়ার দুই বছর পর হুমায়ুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। দুজনের মধ্যে পরিচয় ছিল। মাহবুব তালুকদার অনেকদিন ধরেই গল্প-কবিতা লেখেন। সেই সুবাদে হুমায়ুনের সঙ্গে চেনাজানা। হুমায়ুন তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার। এই প্রথম তাঁর বঙ্গভবনে আসা।



মাহবুব তালুকদার

মাহবুব তালুকদারের অফিসে ঢুকেই হুমায়ুন সোফায় বসে পড়লেন। বললেন, অফিসটা খুব সুন্দর, সাজানোগোছানো। এরকম একটা চাকরি পেলে মন্দ না। বসে বসে শুধু কবিতা লেখা যাবে। চা-বিস্কুট খেয়ে হুমায়ুন চলে গেলেন।

হুমায়ুন বছর দুই বাংলা একাডেমিতে বৃত্তিপ্রাপ্ত গবেষক হিসেবে কাজ করেছেন। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল জীবনানন্দ দাশের কবিতা। তাঁর কবিতা তখন বিভিন্ন পত্রিকায় ছাপা হয়। মাহবুব তালুকদার কিছু কিছু পড়েছেন। তাঁর ভালো লেগেছে। হুমায়ুন প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন :

> কয়েকদিন পর আবার এলেন হুমায়ুন। বললেন, কী খাওয়াবেন?
>
> চা-বিস্কুট আছে। অন্য কিছু হলে বাইরে থেকে আনাতে হবে। সময় লাগবে।
>
> লাগুক। আমার তাড়া নেই। আজ এখানে বসে কবিতা লিখব। আপনার অসুবিধা হবে না তো?
>
> না। তোমার কাজ তুমি করবে। আমার কাজ আমি করব।

হুমায়ুন হাতে খাতা খুলে বসে গেলেন কবিতা লিখতে। কিছুক্ষণ পর বললেন, হয়ে গেছে। শোনাব?

শোনাও।

হুমায়ুন কবিতাটি পড়লেন। মাহবুব তালুকদার বললেন, ভালো হয়েছে। এর একটা কপি করে দাও। হুমায়ুন লিখে দিল :

ব্যাঘ্র তূনীরে তুমি একটি নির্ভুল তীর রেখেছিলে
দাঁড়ালাম করতল প্রার্থনায় মেলে
অঞ্জলি রেখেছি ভরে রক্তিম পুষ্পার্ঘ্যে, আমি
নতজানু স্বদেশের নামে।

নিসর্গ ঈশ্বর জেনে মায়াবী আবাসে
পাখিদের মত আমি ছিলাম সরল
গোলাপের সব অধিবাস ছিল ভালো।

মানুষের হত্যায় রক্তপাতে আকীর্ণ জিজ্ঞাসা
ক্ষমাহীন শব্দহীন প্রশ্নে প্রথম
নিসর্গের মোহিনী আড়াল ভেঙ্গে
পাঠালো রৌদ্রের দিকে, দাবদাহে, অঙ্গুলি সংকেতে।

গভীর তূনীর থেকে একটি শায়ক
তুমি আমার মুঠোয় দিলে ভরে।

হুমায়ুনের খাতায় আরও কবিতা লেখা আছে। তখনো তার কবিতার কোনো বই বের হয়নি। সদ্য পাঠ করা কবিতাটি মাহবুব তালুকদারের ভালো লাগল। তিনি এটা রেখে দিলেন।

জুনের ২ বা ৩ তারিখ। হুমায়ুন আবার এলেন বঙ্গভবনে। বললেন, বঙ্গভবন ঘুরে দেখব। মাহবুব তালুকদার তাঁকে নিয়ে গেলেন বঙ্গভবনের পেছন দিকে, যেখানে মাটির নিচে ঘর আছে। নির্জন পিচঢালা পথ। চারদিকে

গাছগাছালি। হুমায়ুন হাঁটছেন আর কবিতা আবৃত্তি করছেন। অফিসে ফিরে এসেই বললেন, আজ খাতা আনিনি। কাগজকলম দিন। কবিতা লিখব। এর মধ্যে মাহবুব তালুকদারের ডাক পড়ল। রাষ্ট্রপতি আবু সাঈদ চৌধুরী ডেকেছেন। হুমায়ুন কবিতা লিখছেন। তাঁকে না বলেই তিনি গেলেন রাষ্ট্রপতির কাছে। বেশ খানিকটা পরে ফিরে এসে দেখেন, হুমায়ুন চলে গেছে। টেবিলের ওপর ছোট্ট চিরকুট—আমি গেলাম।

হুমায়ুন সেই যে গেলেন, আর ফিরে আসেননি। ৭ জুন সকালে এক বন্ধুর ফোনে খবর পেলেন মাহবুব তালুকদার—হুমায়ুন কবির নেই। কাল রাতে মারা গেছে। তাঁকে হত্যা করা হয়েছে। মাহবুব তালুকদার ভাবতে লাগলেন হুমায়ুনের কথা। এক বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে ইন্দিরা রোডের বাসায় গিয়ে দেখেন, তাঁর লাশ ততক্ষণে সেখান থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখানে জানাজা পড়ানো হয়েছে। মাহবুব তালুকদার হুমায়ুন সম্পর্কে লিখেছেন :

> হুমায়ুন কবির মারা যাওয়ার পরও আমার অনেক দিন মনে হতো, সে বেঁচে আছে। হয়তো কোনোদিন বঙ্গভবনের ফটক থেকে কোনো পুলিশ কর্মকর্তা ফোন করে জানাবে তার উপস্থিতির কথা। আমার অফিস কক্ষে বসে সে আবার কবিতা লিখবে। ওর কথা মনে হলে বারবার আমার কানে বাজে ওর কণ্ঠে স্বরচিত আবৃত্তি—মানুষের হত্যায় রক্তপাতে আকীর্ণ জিজ্ঞাসা ...।

ঐক্য চাই

১৯৭২ সালের ৮-৯ জুলাই অনুষ্ঠিত হয় সর্বহারা পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির চতুর্থ সভা। সভায় ফজলু চক্র এবং হুমায়ুন কবির-সংক্রান্ত বক্তব্য অনুমোদন করা হয়। যাঁরা ফজলু চক্রকে খতম করার কাজে অংশ নিয়েছিলেন, তাঁদের জন্য একটি অভিনন্দনপত্র গৃহীত হয়। খতমে অংশ নেওয়া গেরিলা গ্রুপ ও অঞ্চল পরিচালকদের বীরত্বের জন্য তাঁদের যৌথভাবে কাস্তে-হাতুড়িখচিত একটি স্বর্ণপদক দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। ফজলু চক্রের সঙ্গে যুক্ত থাকার কারণে মনসুর, ইলিয়াস, রিজভী, সালমা ও ছবিকে পার্টি থেকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত হয়।

এ সময় 'চক্রবিরোধী সংগ্রাম ও শুদ্ধি অভিযানের সঙ্গে গোঁড়ামিবাদবিরোধী সংগ্রাম যুক্ত করুন' শিরোনামে একটি দলিলে সর্বহারা পার্টি দুনিয়ার প্রায় সব কমিউনিস্ট পার্টিকেই সংশোধনবাদী, গোঁড়ামিবাদী ও ভ্রান্ত হিসেবে চিহ্নিত করে কেবল চারটি পার্টির লাইন সঠিক ও বিপ্লবী বলে দাবি করা হয়। পার্টিগুলো হলো পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি, চিনের কমিউনিস্ট পার্টি, বার্মার কমিউনিস্ট পার্টি এবং আলবেনিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি। দলিলে বলা হয়, আলবেনিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির নেতা কমরেড এনভার হোক্‌জা এবং বার্মার কমিউনিস্ট পার্টির নেতা কমরেড থাকিন-থান-তুনের মহান বিপ্লবী ভূমিকার জন্য চেয়ারম্যান মাও সে তুং তাঁদের মহান মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বলে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

১৯৭২ সালের ১৫-১৬ সেপ্টেম্বর সর্বহারা পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির একটি সভা হয়। সভায় কমিটির তিনজন সদস্যই উপস্থিত ছিলেন। বিরাজমান পরিস্থিতির পর্যালোচনা করে সভায় কয়েকটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এ উপলক্ষে প্রকাশিত ইশতেহারে সর্বহারা পার্টির মূল্যায়ন ও সিদ্ধান্তগুলো ছিল এরকম :

- সম্ভাবনাময় অঞ্চলে জাতীয় শত্রু খতমের মাধ্যমে জাতীয় মুক্তির গেরিলাযুদ্ধের সূচনা করতে হবে। যেসব স্থানে গেরিলাযুদ্ধ শুরু হয়েছে, তা জোরদার করতে হবে।
- পার্টি পরিচিতি গোপন রেখে প্রকাশ্য, অপ্রকাশ্য এবং গণসংগঠনের কাজ করতে হবে। প্রধান ধরনের গণসংগঠন হচ্ছে সশস্ত্র বাহিনী। মুক্ত অঞ্চলে প্রকাশ্য গণসংগঠন করতে হবে।
- কাজী জাফর, অমল সেন, দেবেন সিকদার, আবুল বাসার, আবদুল হক, মোহাম্মদ তোয়াহা, আবদুল মতিন, আলাউদ্দিন আহমদ, মণি সিংহ, মোজাফফর আহমদ—এরা সংশোধনবাদী। এদের মুখোশ খুলে দিতে হবে। এদের পতন অনিবার্য।
- বাংলাদেশকে জাতিসংঘে প্রবেশের বিরুদ্ধে ভেটো দিয়ে চিন সঠিক কাজ করেছে। চিনের ভেটো দেওয়াকে কেন্দ্র করে ছয় পাহাড়ের দালাল ও তার প্রভুরা চিনবিরোধী ও কমিউনিস্টবিরোধী জনমত তৈরির চেষ্টা চালাচ্ছে। এদের লক্ষ্য হলো জনগণের দৃষ্টি সরিয়ে বামপন্থীদের খতম করা।
- বিয়ে করতে ইচ্ছুক পুরুষ ও নারী কমরেডগণ পরস্পরকে সঠিকভাবে বোঝা ও যাচাই করার জন্য দীর্ঘদিন ঘনিষ্ঠভাবে জীবনযাপন করা দরকার। এটা যথাযথ স্তর দ্বারা অনুমোদিত হতে হবে।

২

বাংলাদেশের গণপরিষদে খসড়া সংবিধান বিল উত্থাপন করা হয় ১৯৭২ সালের ১২ অক্টোবর। খসড়া সংবিধান নিয়ে বেশ কয়েকদিন কাটাছেঁড়া চলে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া ও মন্তব্য পত্রিকায় ছাপা হয়। কেউ কেউ সংবাদ সম্মেলন করে তাঁদের বক্তব্য তুলে ধরেন।

সর্বহারা পার্টিও পিছিয়ে ছিল না। 'ছয় পাহাড়ের দালাল আওয়ামী লীগ ফ্যাসিস্টদের দেওয়া সংবিধান প্রসঙ্গে' শিরোনামে এক প্রচারপত্রে সংবিধান রচয়িতাদের 'দেশবিক্রেতা, বিশ্বাসঘাতক ও মীরজাফর' হিসেবে উল্লেখ করা হয়। প্রচারপত্রটি ছিল বাগাড়ম্বরে ঠাসা। খসড়া সংবিধানে 'কী আছে' সে

আলোচনায় না গিয়ে 'কী নেই' তা নিয়ে অনেক কথাবার্তা লেখা হয়। 'কী নেই' প্রসঙ্গে তিনটি বিষয় তুলে ধরা হয় :

- এ সংবিধানে জাতিগত সংখ্যালঘু জনগণের ওপর পরিচালিত জাতীয় নিপীড়নের অবসানের কোনো কথা নেই।
- উর্দু ভাষাভাষী জনগণের ওপর পরিচালিত নিপীড়নের অবসানের কোনো কথা নেই।
- অনুন্নত অঞ্চলের, বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের দ্রুত উন্নয়নের ব্যবস্থা নেই।

অন্যান্য রাজনৈতিক দল খসড়া সংবিধানের বিভিন্ন অনুচ্ছেদের প্রসঙ্গ টেনে মতামত এবং বিকল্প প্রস্তাব দিলেও সর্বহারা পার্টির প্রচারপত্রে সুনির্দিষ্ট কোনো প্রস্তাব ছিল না। তবে উপরিউক্ত তিনটি মন্তব্যে বিকল্প প্রস্তাবের ছায়া দেখা যায়। সর্বহারা পার্টিই প্রথমবারের মতো জাতিগত সংখ্যালঘুদের বিষয়টি তুলে ধরেছিল।

৩

১৯৭২ সালের শেষের দিকে দারুণ একটা ব্যাপার ঘটে যায়। সর্বহারা পার্টির রাজনৈতিক এবং আদর্শিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বাঁকবদলের আভাস পাওয়া যায়। লেখা হয় 'পূর্ব বাংলার আন্তরিকভাবে সর্বহারা বিপ্লবীদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে ১নং বিবৃতি'। ১৯৭৩ সালে এটি প্রচারের সিদ্ধান্ত হয়। প্রচারের তারিখ জানা যায়নি।

এই বিবৃতিতে বিপ্লবীদের মধ্যে ঐক্য এবং বারবার তাদের মধ্যে বিভক্তি আসা সম্পর্কে দুঃখ প্রকাশ করে ঐক্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি পরিকল্পনা তুলে ধরা হয়। বলা হয়, মার্কসবাদের মৌলিক নীতিগুলো বজায় রেখে ঐক্যবদ্ধ হওয়া সম্ভব এবং সর্বহারা শ্রেণির প্রতিনিধিত্বকারী কেবল একটি রাজনৈতিক দল হতে পারে। একটি শ্রেণির প্রতিনিধিত্বের দাবিতে একাধিক পার্টি হতে পারে না। সুতরাং বিভিন্ন প্রশ্নে বিতর্ক বজায় রেখেও ঐক্যবদ্ধ

হওয়া সম্ভব। যাঁরা এই ঐক্যের ব্যাপারে অনিচ্ছুক, তাঁরা সর্বহারা শ্রেণির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছেন বলে ধরে নেওয়া হবে। এখানে ঐক্যের আহ্বান জানিয়ে পরোক্ষে সতর্কবার্তাও দেওয়া হয়েছে। বিবৃতিতে অন্যান্য কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে ঐক্য গড়ার ভিত্তি চিহ্নিত করে মন্তব্য করা হয় :

> আবদুল হক ও আমজাদ হোসেনের গ্রুপ সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারতের সঙ্গে পূর্ব বাংলার জনগণের জাতীয় দ্বন্দ্বকে প্রধান দ্বন্দ্ব মনে করে। তারা বলে, পূর্ব বাংলা সোভিয়েত ইউনিয়নের উপনিবেশ। ভারত এটা তদারক করছে।
>
> মোহাম্মদ তোয়াহা বলেন, পূর্ব বাংলা ভারত ও রাশিয়া উভয়েরই উপনিবেশ। ভারত-রাশিয়া উভয়ের সঙ্গেই পূর্ব বাংলার জাতীয় দ্বন্দ্ব প্রধান দ্বন্দ্ব।
>
> আবদুল মতিন-আলাউদ্দিন আহমদ গ্রুপ সামন্তবাদের সঙ্গে কৃষকের দ্বন্দ্বকে প্রধান দ্বন্দ্ব বলে। তাদের মতে, পূর্ব বাংলা আধা-ঔপনিবেশিক। তারা গেরিলাযুদ্ধের মাধ্যমে শ্রেণিশত্রু খতম করতে চায়।
>
> দেবেন সিকদার-আবুল বাসার প্রকাশ্য ও গণসংগঠনের কাজ করতে চান। এ ব্যাপারে তাঁদের সঙ্গে সর্বহারা পার্টির বিরোধ নেই। তবে গোপন পার্টির কাজ ও সশস্ত্র সংগ্রাম হলো প্রধান কাজ।
>
> এ বিশ্লেষণ থেকে সামরিক ক্ষেত্রে সর্বহারা পার্টির লাইন হলো জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ, জাতীয় শত্রু খতম করার মাধ্যমে গেরিলাযুদ্ধ শুরু করা।
>
> হক, তোয়াহা, আমজাদের বিশ্লেষণের ভিত্তিতে নেওয়া সামরিক লাইন হলো জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ, স্বাভাবিকভাবেই জাতীয় শত্রু খতমের মাধ্যমে গেরিলাযুদ্ধের সূচনা করা।
>
> কাজেই জাতীয় শত্রু নির্ণয়ের প্রশ্নে, অর্থাৎ সামরিক লাইনে হক, তোয়াহা, আমজাদের সঙ্গে সর্বহারা পার্টির পার্থক্য নেই। কাজেই বর্তমান সময়ে 'জাতীয় শত্রু খতমের মাধ্যমে জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ শুরু কর' এই স্লোগানের ভিত্তিতে হক, তোয়াহা ও আমজাদ গ্রুপের সঙ্গে সর্বহারা পার্টির ঐক্য সম্ভব।
>
> মতাদর্শগত ঐক্য না হলে সাংগঠনিক ঐক্য টিকবে না। তার

প্রমাণ হচ্ছে হক, তোয়াহা, মতিন, আলাউদ্দিন, দেবেন, বাসারদের বিভক্ত হয়ে পড়া।

ঐক্য প্রতিষ্ঠার সময়ে ঐক্যে ইচ্ছুক বিপ্লবীরা একে অপরকে কমরেডসুলভ সমালোচনা ও আত্মসমালোচনা করবেন। প্রকাশ্য সমালোচনা পরিহার করবেন, ঐক্যের কাজকে প্রাধান্য দেবেন এবং ঐক্য ব্যাহত হয় এমন কাজ করবেন না।

ঐক্যে ইচ্ছুক নন কিন্তু আন্তরিকভাবে বিপ্লবী, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে ধীরে ধীরে তাদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। যারা ঐক্যে অনিচ্ছুক বলে প্রমাণিত এবং শত্রুর চর, তাদের মুখোশ উন্মোচন করতে হবে।

দেশীয় ও আন্তর্জাতিক অনুশীলনে প্রমাণিত নয় এরূপ প্রশ্নে তত্ত্বগত বিতর্ক করে সিদ্ধান্ত নেওয়া বা বিভক্ত হওয়া উচিত নয়।

পার্টির নেতৃত্বে প্রধান ধরনের সংগঠন হচ্ছে সশস্ত্র বাহিনী এবং প্রধান সংগ্রাম হচ্ছে সশস্ত্র সংগ্রাম। জনগণের গণবাহিনী এবং ঘাঁটি এলাকা প্রতিষ্ঠা করাই হবে বিপ্লবের গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি। ঘাঁটি এলাকাতেই বিভিন্ন প্রশ্নে বিতর্ক, গবেষণা এবং সমাধান করতে হবে।

সর্বহারা পার্টির এই আহ্বান বিবৃতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। অন্য দলগুলোর নেতাদের সঙ্গে সর্বহারা পার্টির শীর্ষ নেতৃত্বের ব্যক্তিগত যোগাযোগ বা বৈঠক হয়েছে বলে জানা যায় না। সর্বহারা পার্টির এই আহ্বানে অন্যরা সাড়া দেয়নি। এটাও মনে রাখতে হবে, সবাই সব দলের সব প্রচারপত্র পড়েন না। ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রাথমিক শর্ত হচ্ছে পারস্পরিক আস্থা ও সম্মানের ভিত্তিতে আলোচনার পরিবেশ তৈরি করা। এটি কোনো শর্ত দিয়ে হয় না। আলোচনা করতে হয় খোলা মনে। এক বৈঠকে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় না। এ জন্য আলোচনার দরজা খোলা রাখতে হয়। প্রকৃতপক্ষে সবগুলো দল তাদের মনের কপাট বন্ধ করে রেখেছিল এবং নিজ নিজ অবস্থানে কোনো রকম ছাড় দিতে রাজি ছিল না। সিরাজ সিকদারের বিবৃতির ভাষা ছিল অনেকটা এরকম—হয় আমার সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হও, নতুবা তুমি বিশ্বাসঘাতক। এ ধরনের মানসিকতা ছিল পারস্পরিক আলোচনার পথে প্রধান বাধা।

৪

সিরাজ সিকদার অন্য দলের নেতাদের সঙ্গে মত ও পথ নিয়ে আলোচনা করেছেন বলে জানা যায় না। দলের বিবৃতি প্রচারপত্র তিনিই লিখতেন এবং তাঁর কর্মীরা গোপনে এসব প্রচার করত। প্রক্রিয়াটি ছিল পুরোপুরি গোপন। নেতৃত্বের ব্যাপারে তিনি ছিলেন 'এক ও অদ্বিতীয়'। অন্য কোনো দলের কোনো নেতা বা কোনো বুদ্ধিজীবীর তাঁর সঙ্গে কথা বলার আগ্রহ থাকলেও তাঁর নাগাল পাওয়া ছিল অসম্ভব। তাঁর দলের যেটুকু ব্যাপ্তি, তা হয়েছে তাঁর ওপর আস্থা ও আনুগত্যের ওপর ভিত্তি করে। পারস্পরিক আলোচনা ও বিতর্কের মাধ্যমে বিদ্বজ্জনকে দলে ভেড়ানোর বা তাঁদের সঙ্গে রাজনৈতিক বাহাসের কোনো সুযোগ তিনি রাখেননি। এ প্রসঙ্গে নির্মল সেন ১৯৭৩ সালে তাঁর একটি অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন। তিনি তখন শ্রমিক-কৃষক সমাজবাদী দলের নেতা। একই সঙ্গে *দৈনিক বাংলার* সহকারী সম্পাদক এবং ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি। অন্য কমিউনিস্ট পার্টিগুলো তাঁকে ট্রটস্কিপন্থী বলত। নির্মল সেনের বিবরণে জানা যায় :

> চারু মজুমদারের মৃত্যুর পর *দৈনিক বাংলায়* আমি একটি উপসম্পাদকীয় লিখেছিলাম। আমার সেই লেখা নিয়ে বিতর্ক হয়। লেখা ছাপা হয় সাপ্তাহিক *হলিডেতে*। ওই সময় আরেকটি চিঠি আসে পশ্চিমবঙ্গ থেকে। সে চিঠিও সাপ্তাহিক *হলিডেতে* প্রকাশিত হয়। সে চিঠিতে দাবি করা হয় যে নির্মল সেনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সঠিক।
>
> এর কিছুদিন পর আমি বরিশাল যাই। বরিশালে এক বন্ধুর বাসায় ছিলাম। ওই বাসায় সর্বহারা পার্টির দুই ছেলে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে। আমাকে বলা হলো—রাত বারোটায় কোনো একটি জায়গায় তাদের সঙ্গে আমাকে যেতে হবে। তারা চারু মজুমদার সম্পর্কে আমার সঙ্গে আলাপ করতে চায়। আমি রাজি হলাম। তবে আমার শর্ত ছিল আমার সঙ্গে বৈঠককালে সিরাজ সিকদারকে হাজির থাকতে হবে। যদি সিরাজ সিকদার সম্মত হয়, তাহলে রাত বারোটায় আমি তাদের সঙ্গে যাব। তারা আমার সঙ্গে কথা বলে চলে যায়। কিন্তু আর ফিরে আসেনি।

১৯৭৩ সালের নির্বাচনের আগে সর্বহারা পার্টির লোকেরা নির্মল সেনকে খুন করতে চেয়েছিল। নির্মল সেনের এক সাংবাদিক বন্ধু *ইত্তেফাক*-এর বজলুর রহমানের বাসায় গৃহশিক্ষক ছিলেন। সর্বহারা পার্টির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি। একদিন সর্বহারা পার্টির একটি দল নির্মল সেনের নতুন পল্টনের বাসায় গিয়ে তাঁর খোঁজ করেছিল। উদ্দেশ্য তাঁকে খুন করা। গৃহশিক্ষক বন্ধুটি নির্মল সেনকে সাবধানে চলাফেরার পরামর্শ দিয়েছিলেন। দলের লোকেরা ওই গৃহশিক্ষককে বলেছিল, নির্মল সেনকে খতম করতে হবে। পরে জানা যায়, সর্বহারা পার্টির নিয়ম হচ্ছে, সবাই একমত না হলে সিদ্ধান্ত কার্যকর হয় না। গৃহশিক্ষক বন্ধুটি নির্মল সেনের কাছে বার্তা পাঠিয়েছিলেন—আমার জন্য আপনি এবার বেঁচে গেলেন। পরেরবার হয়তো বাঁচবেন না। ওই গৃহশিক্ষক বন্ধুটি পরে সর্বহারা পার্টি ছেড়ে দেন। নির্মল সেন তাঁর স্মৃতিকথায় ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন।

শত্রু যখন জাসদ

আওয়ামী লীগের সহযোগী সংগঠন ছাত্রলীগ দেশের মধ্যে সবচেয়ে বড় ছাত্রসংগঠন। এই সংগঠনে দুটি ধারার মধ্যে টানাপোড়েন তৈরি হয়। '৭২-এর জুলাই মাসে আলাদা সম্মেলন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে ছাত্রলীগ দুভাগ হয়ে যায়। একটি অংশ বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র ও শ্রেণিসংগ্রামের বক্তব্য দিয়ে বাম রাজনীতিতে নতুন স্রোতের জন্ম দেয়। ছাত্রলীগের এই অংশটি পরিচিতি পায় দলের শীর্ষ নেতার নামে—রব গ্রুপ। '৭২-এর ৩১ অক্টোবর জন্ম নেয় জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) নামে নতুন একটি রাজনৈতিক দল। অন্য বাম ও কমিউনিস্ট পার্টিগুলো নতুন এই শক্তিকে সন্দেহের চোখে দেখে। সবার একই প্রশ্ন—এরা কারা?

বাহাত্তরের ২৬ সেপ্টেম্বর প্রচারিত এবং পরের বছর সেপ্টেম্বরে সংশোধিত সর্বহারা পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকের প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে একটি ইশতেহার প্রচার করা হয়। এই ইশতেহারে জাসদ সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা ও মূল্যায়ন ছিল। ইশতেহারে আটটি প্রশ্ন উত্থাপন করা হয় এবং সর্বহারা পার্টিই সব প্রশ্নের অনুমানভিত্তিক উত্তর দিয়ে দেয়। ইশতেহারে তাদের সওয়াল-জবাব ছিল এরকম :

১. আপনারা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র কায়েমের কথা বলেন এবং মার্কসবাদ মানেন এ কথাও বলেন। কিন্তু আপনারা সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার কথা বলেন না (মণি সিংহ-মোজাফফর চক্রও বলে না)। সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা না করার অর্থ হলো সামন্তবাদ, আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের দালালদের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করা। এ কারণেই সর্বহারার একনায়কত্ব

ব্যতীত সমাজতন্ত্র হচ্ছে জাতীয় বিশ্বাসঘাতকতা ও ফ্যাসিবাদ।

২. আপনারা মার্কসবাদ মানেন। মার্কসবাদ শিক্ষা দেয় যে, জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব পরিচালনা করতে হয়। পূর্ব বাংলায় কি জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হয়েছে?

৩. মার্কসবাদ শিক্ষা দেয় যে, জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন না করে সমাজতন্ত্রের কথা বলা হচ্ছে ট্রটস্কিবাদ। বর্তমান বিশ্বে ট্রটস্কিবাদীরা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা পরিচালিত। আপনাদের সমাজতন্ত্রের কথা কি প্রমাণ করে না যে আপনারা ট্রটস্কিবাদী এবং এ কারণে আপনারা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা পরিচালিত?

৪. আপনারা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র, শ্রেণিসংগ্রাম ও সামাজিক বিপ্লবের কথা বলেন। কিন্তু মার্কসবাদ শিক্ষা দেয় যে, মার্কসবাদ, লেনিনবাদ, মাও সে তুং চিন্তাধারায় সুসজ্জিত সর্বহারা শ্রেণির রাজনৈতিক পার্টির নেতৃত্ব ছাড়া এর কোনোটাই সম্ভব নয়। আপনারা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র, সামাজিক বিপ্লব, শ্রেণিসংগ্রামের নামে প্রকৃতপক্ষে পূর্ব বাংলাকে মার্কিনের উপনিবেশে পরিণত করার চেষ্টা চালাচ্ছেন। এভাবে সামাজিক প্রতিবিপ্লব, শ্রেণি ও জাতীয় বিশ্বাসঘাতকতা করছেন।

৫. আপনারা শ্রেণিসংগ্রাম ও শ্রেণিশত্রু খতমের কথা বলেন। বর্তমানে পূর্ব বাংলার জনগণের দাবি হচ্ছে, জাতীয় সংগ্রাম করা। ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ, সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দালালদের জাতীয় শত্রু হিসেবে খতম করা। পূর্ব বাংলাকে স্বাধীন করা। শ্রেণিসংগ্রাম ও শ্রেণিশত্রু খতমের নামে আপনারা প্রকৃতপক্ষে জাতীয় শত্রুদের বাঁচিয়ে দিচ্ছেন। এটা কি জাতীয় শত্রুদের তাঁবেদারি নয়?

৬. শ্রেণিসংগ্রাম, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র ও সামাজিক বিপ্লবের কথা বললেও আপনারা মার্কসবাদী বা বিপ্লবী নন। শ্রেণিসংগ্রামের কথা বললেই মার্কসবাদী বা বিপ্লবী হওয়া যায় না। এটা বড় বুর্জোয়া বা সাম্রাজ্যবাদীরাও হতে পারে।

৭. আপনারা তথাকথিত সরকারবিরোধিতা ও প্রগতিমার্কা বক্তব্য ও স্লোগানের আড়ালে কর্মীদের আকর্ষণ করে ভুল পথে পরিচালনা করছেন। এভাবে তাদের মুজিববাদের শিকারে পরিণত করছেন। ইতিমধ্যে জাসদ ও তার সঙ্গে যুক্ত সংগঠনগুলোর অনেক কর্মী মুজিববাদীদের হাতে প্রাণ হারিয়েছেন বা জেল-জুলুম-নির্যাতন ভোগ করেছেন। এটা কি দেশপ্রেমিক কর্মীদের জন্য ফাঁদ তৈরি করা নয়?
৮. আপনারা প্রকাশ্যে মুসলিম বাংলার বিরোধিতা করেন। কিন্তু গোপনে কর্মীদের মাধ্যমে মুসলিম বাংলার প্রচার করে উগ্র সাম্প্রদায়িকতা তৈরি করছেন। প্রকৃতপক্ষে আপনারা যদি মার্কসবাদ মানেন, সাম্রাজ্যবাদের সেবক না হন, তাহলে ভুল বক্তব্য ও কর্মপদ্ধতি সংশোধন করে সত্যিকার সর্বহারা শ্রেণির রাজনৈতিক পার্টিতে ঐক্যবদ্ধ হোন এবং জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করে স্বাধীন, শান্তিপূর্ণ, নিরপেক্ষ প্রগতিশীল পূর্ব বাংলা প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করুন।

সর্বহারা পার্টির শেষ জিজ্ঞাসাটি কৌতূহল জাগায়। তাঁরা মনে করেন, তাঁদের পার্টিই একমাত্র বিপ্লবী পার্টি, অন্য সবাই ভ্রান্ত। সুতরাং অগুনতি দেশপ্রেমিক কর্মীর উচিত জাসদের 'ভুল' পথে না ছুটে সাচ্চা বিপ্লবীদের পার্টি অর্থাৎ সর্বহারা পার্টির নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হওয়া। এটা ঠিক যে, ওই সময় তরুণদের মধ্যে যে অপরিসীম ক্ষোভ, আবেগ এবং আকাঙ্ক্ষা কাজ করছিল, জাসদ তাকে সাংগঠনিকভাবে কাজে লাগিয়ে নিজের বলয়ে নিতে পেরেছিল। পক্ষান্তরে সর্বহারা পার্টির কাজ হতো গোপনে। তাদের প্রচার ছিল দেয়ালের চিকা আর গোপন লিফলেটের মাধ্যমে। তাদের কর্মীদের সামনাসামনি দেখা যেত না। তাদের সঙ্গে কথা বলা বা আলোচনার সুযোগ ছিল না বললেই চলে। ফলে যারা সর্বহারা পার্টির সম্ভাব্য কর্মী হতে পারত বলে সর্বহারা পার্টির নেতারা মনে করতেন, তারা বিরাট সংখ্যায় জাসদের কক্ষপথে চলে যায়। সিরাজ সিকদার একবার আক্ষেপ করে বলেছিলেন, 'জাসদের জন্ম হওয়ায় আমার রিক্রুটমেন্টের পাইপলাইন ক্ষতিগ্রস্ত হলো।'

তরুণমন সব সময়ই আবেগাশ্রয়ী এবং এস্টাবলিশমেন্টবিরোধী।

উনসত্তরের গণ-আন্দোলন এবং একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে তরুণদের মনোজগতে বড় রকমের পরিবর্তন এসেছিল। বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন এবং সমাজতন্ত্রের জন্য লড়াই তরুণদের বিরাট ঝাঁকুনি দিয়েছিল। তাঁরা গতানুগতিক রাজনীতি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। জনগণের আকাঙ্ক্ষা ছিল আকাশছোঁয়া। যুদ্ধ-পরবর্তী এই প্রবণতাকে সাফল্যের সঙ্গে রাজনীতিতে সম্পৃক্ত করতে পেরেছিল জাসদ। ওই সময় জাসদের জন্ম না হলে তরুণদের একটা বড় অংশ সর্বহারা পার্টির দিকে ঝুঁকত—এ সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

তবে সর্বহারা পার্টি ও জাসদের চিন্তাধারা ও কাজের পদ্ধতিতে অনেক মিল দেখা যায়। পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন থেকে বিপ্লবী পার্টি গড়ার একটা চেষ্টা ছিল। এ প্রক্রিয়ার তিন বছরের মাথায় জন্ম নিয়েছিল সর্বহারা পার্টি। ১৯৭২ সালের মাঝামাঝি সর্বহারা পার্টির নেতৃত্বাধীন 'পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তিবাহিনী'র নাম বদলে 'পূর্ব বাংলার সশস্ত্র দেশপ্রেমিক বাহিনী' রাখা হয়। অনুরূপভাবে জন্মকালে জাসদ নিজেকে একটি সমাজতান্ত্রিক গণসংগঠন হিসেবে ঘোষণা দিয়েছিল। তৃতীয় বছরে তারা একটি বিপ্লবী পার্টি গড়ার প্রক্রিয়া শুরু করে। যদিও এই পার্টির নামকরণ হয়নি। এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ১৯৭৪ সালের জুনে গঠন করা হয় 'বিপ্লবী গণবাহিনী'। সর্বহারা পার্টির 'সশস্ত্র দেশপ্রেমিক বাহিনী' এবং জাসদের 'বিপ্লবী গণবাহিনী'র লক্ষ্য ছিল অভিন্ন—ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারকে উৎখাত করা।

২

নবীন রাষ্ট্র বাংলাদেশ। প্রতিষ্ঠানগুলো নতুন করে গড়ে উঠছে কিংবা নবীনদের হাতে পড়েছে। সব জায়গায় অনভিজ্ঞতা, অদক্ষতা ও দুর্বলতা। নতুন এই রাষ্ট্রের সুস্থ ও স্বাভাবিক বিকাশের জন্য সময়ের দরকার। সময় কতটুকু লাগবে তা নির্ভর করে বিরাজমান আর্থসামাজিক কাঠামো এবং তার নিজস্ব শক্তির ওপর, নেতৃত্বের ওপর।

শুরু থেকেই সর্বহারা পার্টি বাংলাদেশকে ভারতের উপনিবেশ এবং সরকারকে ভারতের পুতুল সরকার বলে আসছে। এই রাষ্ট্রের কাছে তার

চাওয়া পাওয়ার কিছু নেই। এই রাষ্ট্রব্যবস্থা ধ্বংস করাই তার লক্ষ্য। এভাবেই সম্পন্ন হবে 'জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব'।

বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন সরকারকে নিয়ে তাদের আবেগ বা পক্ষপাত না থাকলেও এখানে ভবিষ্যতে সামরিক অভ্যুত্থান হতে পারে—এরকম একটা সম্ভাবনা দেখেছিলেন সিরাজ সিকদার। ১৯৭২ সালের ৬-৮ ডিসেম্বর সর্বহারা পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সভার কার্যবিবরণীর ভিত্তিতে একটি বিবৃতি প্রচার করা হয় ৯ ডিসেম্বর। বিবৃতিতে বলা হয় :

> মার্কিন দালাল রব গ্রুপ (বর্তমান জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল) প্রাক্তন সামরিক কর্মচারী, মুক্তিবাহিনী, সামরিক বাহিনীর অসন্তুষ্ট অংশের সঙ্গে সংযোগ করার চেষ্টা চালাচ্ছে। ছাত্র, শ্রমিক এবং জনগণকে নিজেদের নেতৃত্বে নিয়ে আসার চেষ্টা চলছে।
>
> মার্কিনের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদীরা অর্থনৈতিক ঋণ, রিলিফ প্রভৃতির মাধ্যমে ব্যাপকভাবে অনুপ্রবেশ করছে। তারা সামরিক ক্যু-দেতা, রায়ট-দাঙ্গা, ছাত্র-শ্রমিক অসন্তোষ, অর্থনৈতিক চাপ, পাক-ভারত যুদ্ধ (এর ফলে ভারত পূর্ব বাংলায় সৈন্য পাঠাতে অসুবিধায় পড়বে) প্রভৃতি একযোগে বা একাধিক বিষয় ব্যবহার করে পূর্ব বাংলায় নিজের উপনিবেশ স্থাপনের চেষ্টা চালাচ্ছে।
>
> সামরিক ক্যু-দেতা চূর্ণ করার জন্য ভারতীয় সামরিক হস্তক্ষেপ ও তাদের দালাল পুতুল সরকারের অনুগত বাহিনীর হস্তক্ষেপ, শহরসমূহে সশস্ত্র সংঘর্ষ এবং পরিণতিতে গ্রামগুলো শহর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। এরকম অবস্থায় কী করণীয়, সে সম্পর্কে সর্বহারা পার্টির কর্মসূচি হবে এরকম :
>
> জাতীয় শত্রুর তালিকা তৈরি;
> জাতীয় শত্রু খতম ও নির্মূল;
> স্থানীয় অস্ত্র দখল;
> থানা দখল ও অস্ত্র নিয়ে নেওয়া;
> আর্থিক সমস্যার সমাধান;
> গেরিলা (যুদ্ধ) ও প্রতিরোধ চালানোর প্রস্তুতি;

কর্মীদের একত্রিত করা;
পার্টির সকল স্তরের মধ্যে যোগাযোগ।

বিবৃতিতে পূর্বাভাস দিয়ে বলা হয়, পরবর্তী নির্বাচনে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের পরাজয়ের সম্ভাবনাই বেশি। কিন্তু ইতিহাসের মঞ্চ থেকে বিদায় নেওয়ার আগে মুজিববাদের বিরুদ্ধে প্রচার চালিয়ে তারা মুজিববাদীদের মুখোশ উন্মোচনে সাহায্য করছে। এ ক্ষেত্রে লাভ হলো, শত্রুরা নিজেদের মধ্যে কামড়াকামড়ি করে নিজেদের দুর্বল করছে।

সর্বহারা পার্টি বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে সরাসরি কাজ করবে—এমন কথা স্পষ্টভাবে বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়নি। তবে কাজের ক্ষেত্র হিসেবে সশস্ত্রবাহিনীকে নাকচ করা হয়নি। বিবৃতিতে 'সামরিক-আধাসামরিক বাহিনী এবং জলিল-তাহেরদের ভূমিকা সম্পর্কে বক্তব্য' তৈরি করার সিদ্ধান্ত হয়।

উল্লেখ করা যেতে পারে, মুক্তিযুদ্ধের নবম সেক্টরের অধিনায়ক মেজর এম এ জলিল জাসদে যোগ দেন এবং দলটির সভাপতি হন। একাদশ সেক্টরের অধিনায়ক লে. কর্নেল আবু তাহেরও জাসদের সঙ্গে সম্পৃক্ত হন। তাঁরা উভয়েই সেনাবাহিনী থেকে অবসর নেন। সেনাবাহিনীতে তাঁদের যোগাযোগকে কাজে লাগিয়ে তাঁরা কিছু একটা করতে পারেন, এই ইঙ্গিত ছিল বিবৃতিতে। বিবৃতিতে জাসদের 'মুখোশ উন্মোচন হয়েছে' বলে দাবি করে বলা হয়, 'তাদের কর্মীদের মাঝে হতাশা তৈরি হয়েছে, সাচ্চা কর্মীদের আমাদের সঙ্গে যোগদানের প্রেরণা দিচ্ছে, গোঁড়াদের মাঝে ক্রোধের সঞ্চার করছে।' বাস্তবে দেখা গেছে, জাসদের উল্লম্ফন ঘটেছে অতি দ্রুত। বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রসংসদ নির্বাচনে তারা একের পর এক জয় পেয়েছে। পক্ষান্তরে সর্বহারা পার্টি কর্মিস্বল্পতার সমস্যায় পড়েছে। পার্টির বিভিন্ন দলিলে জাসদ প্রসঙ্গ বারবার এসেছে। তাতে ধারণা হয়, সরকারবিরোধী রাজনীতিতে সর্বহারা পার্টি জাসদকেই মূল প্রতিদ্বন্দ্বী কিংবা প্রতিপক্ষ মনে করে।

১৯৭৩ সালের জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে '১নং ব্যুরো পরিচালক কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাবসমূহ' শীর্ষক দলিলে জাসদ সম্পর্কে সর্বহারা পার্টির মূল্যায়নের সারসংক্ষেপ করা হয়। মূল্যায়নটি ছিল :

- বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ক্ষমতাসীন দল ও তাদের তাঁবেদারদের পরে জাসদই হচ্ছে আমাদের একমাত্র রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী। জনগণের প্রচণ্ড ভারতবিদ্বেষকে কাজে লাগিয়ে জাসদ ক্ষমতা দখল করতে চায় এবং মার্কিনের উপনিবেশ কায়েম করতে চায়। জাসদ সম্পর্কে আমাদের খুবই সতর্ক থাকতে হবে এবং ক্যাডার ও জনগণের কাছে জাসদের মুখোশ ভালোভাবে উন্মোচন করতে হবে। ১৯৭১ সালে আওয়ামী লীগ যে ভূমিকা নিয়েছিল, ভবিষ্যতে জাসদও একই ভূমিকা নিতে পারে।
- জাসদের শ্রেণিচরিত্র ও বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ করলে তিনটি সম্ভাবনা বেরিয়ে আসে :
  ক. জাসদ খুব শক্তিশালী হয়ে আওয়ামী লীগকে উৎখাতের চেষ্টা করবে এবং একই সঙ্গে আমাদের বিরুদ্ধে খতম অভিযান চালাবে।
  খ. জাসদ দুর্বল। তারা আওয়ামী লীগের পিটুনি খেয়ে আমাদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হতে পারে।
  গ. জাসদ দুর্বল। কিন্তু আওয়ামী লীগের সঙ্গে আঁতাত করে একযোগে আমাদের ধ্বংস করার চেষ্টা চালাবে।
- জাসদ সম্পর্কে উপরোক্ত রাজনৈতিক বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত সাংগঠনিক পদক্ষেপ নিতে হবে :
  ক. ক্যাডার ও জনগণের কাছে জাসদের মুখোশ উন্মোচন করতে হবে। এজন্য বিশেষ পাঠ্যসূচি হিসেবে কয়েকটি দলিল পড়তে হবে :
  পূর্ব বাংলার বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে কয়েকটি কথা;
  ছাত্রলীগের রব গ্রুপের কাছে কয়েকটি প্রশ্ন;
  সমাজতন্ত্র, শ্রেণিসংগ্রাম ও সামাজিক বিপ্লব প্রসঙ্গে।
  খ. জাসদ থেকে যারা রিক্রুট হবে তাদের সম্পর্কে :
  তাদের জাসদের রাজনৈতিক চরিত্র ভালোভাবে বোঝাতে হবে;
  রাজনৈতিক মান উন্নত করতে হবে;
  তাদের গতিবিধির ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে;

নেতারা যেসব শেল্টারে থাকেন সেগুলো তাদের চেনানো যাবে না;
গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগগুলো চেনানো যাবে না;
গুরুত্বপূর্ণ শেল্টার ও অস্ত্রের শেল্টার চেনানো যাবে না;
নিম্নস্তরে রেখে যাচাই করতে হবে।

৩

জাসদের মূল নেতা সিরাজুল আলম খান। রাজনীতিতে তাঁর উত্থান সিরাজ সিকদারের উত্থানের অনেক আগে। ছাত্রনেতা থাকাকালেই সিরাজুল আলম খান দেশব্যাপী পরিচিতি পান। সিকদার আলোচিত হতে থাকেন সিরাজুল আলম খানের ছাত্রত্ব শেষ হওয়ার অনেক পরে। সত্তর দশকের শুরুর বছরগুলোতে দুজনই এ দেশের প্রথাগত রাজনীতিতে আলোড়ন তৈরি করেছেন। একটি বিষয়ে তাঁদের দুজনের মধ্যে মিল দেখা যায়। ব্যক্তিগত জীবনে দুজনের কেউই আরাম-আয়েশ কিংবা সম্পদ আহরণের পেছনে ছোটেননি। দলের কর্মীদের ওপর দুজনেরই প্রচণ্ড প্রভাব। কর্মীরা নিজ নিজ নেতার বাতলে দেওয়া পথে পতঙ্গের মতো ঝাঁপ দিয়েছেন। কোনো পিছুটান নেই। এস্টাবলিশমেন্টবিরোধী রাজনীতিতে সচরাচর এমনটি দেখা যায় না।

সিরাজুল আলম খান এবং সিরাজ সিকদার পরস্পরের ব্যক্তিত্ব বা নেতৃত্ব নিয়ে সরাসরি কখনো কিছু বলেননি। সর্বহারা পার্টির অনেক দলিলে জাসদের বিরুদ্ধে বিষোদগার আছে। কিন্তু জাসদের কোনো দলিলে সর্বহারা পার্টির প্রসঙ্গ আলাদা করে কখনোই আলোচিত হয়নি। দুই নেতার মধ্যে কেউ কেউ তুলনা করেন। একসময় লেখক আহমদ ছফা দুই দলের মধ্যে একটা সম্মিলনের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। দুজন নেতাকেই তিনি চিনতেন। তাঁর সে ইচ্ছার প্রতিফলন পাওয়া যায় ১৯৭৬ সালে প্রকাশিত তাঁর *বাংলাদেশের রাজনৈতিক জটিলতা* নামক বইয়ে।

দুই নেতার একটা তুলনামূলক আলোচনার প্রসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক আহমদ শরীফের মন্তব্য উল্লেখ করা যায়। এখানে সর্বহারা পার্টিকে তিনি জাসদ থেকে একটু এগিয়ে রেখেছেন।

পূর্বাভাষ পত্রিকায় আহমদ শরীফের একটি সাক্ষাৎকার ছাপা হয়েছিল

১৯৯১ সালের ১৯ আগস্ট। সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন আমিনুর রশীদ ও আদিত্য কবির। আদিত্য কবির হলেন সর্বহারা পার্টির গুপ্তঘাতকদের হাতে নিহত হুমায়ুন কবিরের বড় ছেলে। শৈশবে তাঁর হাতেখড়ি হয়েছিল আহমদ শরীফের কাছে। হুমায়ুন কবির ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে আহমদ শরীফের ছাত্র এবং পরে সহকর্মী ছিলেন। আদিত্য কবিরের সঙ্গে আহমদ শরীফের কথোপকথন ছিল এরকম :

আদিত্য কবির : জাসদ সম্বন্ধে আপনার মূল্যায়ন কী?

আহমদ শরীফ : স্বাধীনতার পরে জাসদ বিরোধী দল হিসেবে দাঁড়িয়েছিল এ ব্যাপারটা উল্লেখযোগ্য। সে সময় আমি রবকে (আ স ম আবদুর রব) বক্তৃতা লিখে দিয়ে সহায়তাও করেছিলাম। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের একটা আদর্শের কথা তারা বলত। সে আদর্শ পরে আর রইল না। তাদের তাত্ত্বিক নেতা সিরাজুল আলম খান চেয়েছিলেন তার দলকে ক্ষমতায় নিয়ে যেতে।

আদিত্য কবির : স্বাধীনতার আগে তো তিনি ...

আহমদ শরীফ : তখন তিনি তেমন কিছু ছিলেন না।

আদিত্য কবির : তাহলে কখন থেকে তিনি রাজনীতি শুরু করেছিলেন?

আহমদ শরীফ : এই প্র্যাকটিস কখন থেকে শুরু হয়েছে জানি না। পরে দল ভেঙে গেল। আদর্শ-টাদর্শ কিছু রইল না। এখন তো আর আদর্শ নিয়ে কেউ রাজনীতি করে না।

আদিত্য কবির : সর্বহারা পার্টির সঙ্গে জাসদের ফেইট-এ (নিয়তি) একটা মিল দেখা যাচ্ছে।

আহমদ শরীফ : না, সর্বহারা পার্টির সঙ্গে জাসদের কোনো মিল নেই। ওরা (সর্বহারা পার্টি) হচ্ছে একটা গুপ্ত বিপ্লবী দল। তারা রক্তাক্ত বিপ্লবে বিশ্বাসী ছিল। সর্বহারা পার্টি ছিল একটি সুসংঘবদ্ধ দল। তারা বিপ্লবের কথা বলত। জাসদ কিছুই বলত না, শুধু বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের কথা ছাড়া। সে কথাটা তো বলেছি।

সশস্ত্র লড়াই

সর্বহারা পার্টির সাংগঠনিক কাঠামো এবং দলের লোকদের স্তরবিন্যাস উঠে এসেছে বিভিন্ন দলিলে ও সাক্ষাৎকারে। দলের সঙ্গে যাঁরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আছেন, তাঁদের চার স্তরে ভাগ করা হয়—কর্মী, গেরিলা, সহানুভূতিশীল এবং সমর্থক। কেন্দ্রীয় কমিটির অধীনে সংগঠন বিন্যস্ত হয়েছে নানান ধাপে। সারা দেশকে ভাগ করা হয়েছে ভৌগোলিক এলাকার ভিত্তিতে। সবার ওপরে ব্যুরো। কয়েকটি জেলা নিয়ে একটি ব্যুরো। ব্যুরোর দায়িত্বে আছেন একজন পরিচালক। ব্যুরোর অধীনে প্রত্যেক জেলার (বৃহত্তর জেলা) জন্য আছেন অঞ্চল পরিচালক। অঞ্চলের অধীনে আছে মহকুমাভিত্তিক উপ-অঞ্চল। এর দায়িত্বে উপ-অঞ্চল পরিচালক। 'এলাকা' বলতে থানা বোঝায়। সেখানে আছেন একজন এলাকা পরিচালক। ইউনিয়ন পর্যায়ে দায়িত্বে আছেন উপ-এলাকা পরিচালক।

বিভিন্ন পর্যায়ে পরিচালকরা যোগাযোগের জন্য যাঁদের ব্যবহার করেন, তাঁরা কুরিয়ার নামে পরিচিত। কুরিয়ারের মাধ্যমে পার্টির কাগজপত্র ও নির্দেশ পাঠানো হয়। নতুন সমর্থক ও সহানুভূতিশীল খুঁজে বের করার দায়িত্বও কুরিয়ারের। কে দলের জন্য কাজ করতে পারবেন, কে বিশ্বস্ত—এ ধরনের মূল্যায়ন কুরিয়ার করে থাকেন নিয়মিত যোগাযোগের মাধ্যমে।

১৯৭৩ সালের শুরু থেকে সর্বহারা পার্টি তার নিজস্ব সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলার কাজ শুরু করে জোর কদমে। এর নাম দেওয়া হয় 'দেশপ্রেমিক সশস্ত্র বাহিনী'। এর কাঠামো অনেকটা দেশের সামরিক বাহিনীর মতো। সবার নিচে হলো গেরিলা গ্রুপ। একটি গ্রুপে পাঁচ থেকে নয়জন সদস্য। তাঁদের হাতে থাকবে কমপক্ষে তিনটি থ্রি-নট-থ্রি রাইফেল এবং একটা আধা স্বয়ংক্রিয় এসএলআর অথবা জি-থ্রি রাইফেল।

তিনটি গেরিলা গ্রুপ নিয়ে হবে একটি প্লাটুন। প্লাটুনের কাছে কমপক্ষে একটি স্টেনগান থাকবে। তিনটি প্লাটুন নিয়ে তৈরি হবে একটি কোম্পানি। কোম্পানির সংগ্রহে থাকবে ন্যূনতম একটি স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র—এলএমজি এবং একটি রিভলবার বা পিস্তল। একটি ব্যুরোতে এক বা একাধিক সেক্টর থাকতে পারে। কোম্পানি থাকবে সরাসরি সেক্টর কমান্ডারের অধীনে।

অস্ত্রের সংখ্যা নিয়ে নিয়মের এত কড়াকড়ি ছিল না। এটা নির্ভর করত অস্ত্র পাওয়া বা না পাওয়ার ওপর।

প্রত্যেক স্তর বা ইউনিটে আছেন একজন রাজনৈতিক প্রধান। তাঁর পদবি রাজনৈতিক কমিসার। তাঁর সঙ্গে আছেন একজন সামরিক প্রধান। তাঁর পদবি কমান্ডার। গেরিলাদের অস্ত্রের প্রশিক্ষণের সঙ্গে সামরিক দলিল পড়ানো হয় এবং সামরিক অভিযানের পরিকল্পনা কীভাবে তৈরি করা হয়, তার খুঁটিনাটি শেখানো হয়। প্রশিক্ষণের দায়িত্বে থাকেন রাজনৈতিক কমিসার এবং কমান্ডার।

দল চালাতে টাকাপয়সা লাগে। কর্মীরা যথেষ্ট কৃচ্ছ্রসাধন করেন। আয়-ব্যয়ের সব হিসাব দলের ঊর্ধ্বতন পরিচালকের কাছে দিতে হয়। টাকাপয়সার টানাটানি লেগেই থাকে। দলের সেন্টার চালানো, দলিল ছাপানো ও বিলি করা, এসব কাজের জন্য টাকা জোগাড় করতে হয়। এজন্য ব্যাংক লুটের পথ বেছে নেওয়া হয়। অস্ত্র জোগাড়ের প্রধান উৎস হলো পুলিশের ফাঁড়ি কিংবা থানা লুট।

গেরিলারা দুই ধরনের আক্রমণে অংশ নেন। আচমকা কোনো লক্ষ্যবস্তুর ওপর হামলার জন্য অস্ত্রপাতি ব্যবহারের কোনো বাঁধাধরা নিয়ম নেই। হাতের কাছে যা পাওয়া যায়, তা দিয়েই আক্রমণ করা হয়। এরা হলো কমান্ডো। এদের দেওয়া হয় রিভলবার, পিস্তল, স্টেনগান, হ্যান্ড গ্রেনেড, ছুরি ইত্যাদি। সুবিধামতো অস্ত্র না পাওয়া গেলে শুধু গামছা ব্যবহার করেই কাজ সারা হয়। মেহেন্দিগঞ্জে একটি কমান্ডো গ্রুপ একবার শুধু ছাতায় ব্যবহৃত লোহার শিক, ছুরি ও পেনসিল দিয়ে আক্রমণ চালিয়েছিল। বরিশালে একবার একটি পুলিশ ফাঁড়িতে হামলা করা হয়েছিল শুধু ব্লেড দিয়ে।

বড় ধরনের কোনো আক্রমণের জন্য সাজানো হয় বিশেষ দল। এদের সার্বক্ষণিকভাবে প্রস্তুত রাখা হয়, যাতে যেকোনো সময় অভিযান চালানো যায়। এজন্য ভালো রকমের প্রস্তুতির দরকার হয়। এসব অভিযানে কমপক্ষে

দুটি স্টেনগান থাকলে ভালো। কারণ, প্রয়োজনের সময় একটি স্টেনগান না-ও কাজ করতে পারে। বরিশালে একটি অভিযানে একবার এরকম ঘটেছে। দলের সঙ্গে একটি স্টেনগান ছিল। গুলি করার সময় এটি জ্যাম হয়ে যায়। গুলি বের হয়নি। একবার একটি অপারেশনে গেরিলারা দুটি হ্যান্ড গ্রেনেড নিয়ে গিয়েছিল। একটাও ফাটেনি।

একবার একটি শহরে আক্রমণের পরিকল্পনা হয়। গেরিলা, গাইড, স্কাউটসহ প্রস্তুত করা হয় একটি দল। যথাসময়ে শুরু হয় আক্রমণ। কিন্তু স্টেনগান দিয়ে ব্রাশ ফায়ার করার সময় গুলি বের হয়নি। এতে ওই কমান্ডো ঘাবড়ে যান। আরেকজন কমান্ডো দ্বিতীয় স্টেনগানটি দিয়ে গুলি ছুড়তে গেলে সেটা দিয়েও গুলি বের হয়নি। এটা দেখে প্রথম কমান্ডো আরও ঘাবড়ে যান। অপারেশনের আগে অস্ত্রগুলো ভালোভাবে পরীক্ষা করা হয়নি।

অন্য একটি অপারেশনে দুটি হাতবোমা ব্যবহারের সিদ্ধান্ত ছিল। প্রথম বোমাটি ছোড়ার পর ফাটেনি। দ্বিতীয় বোমাটি লক্ষ্যবস্তুর ওপর ঠিকমতো পড়েনি। এই অপারেশনে গাইডের দায়িত্বে থাকা কর্মীটি অস্বাভাবিক আচরণ শুরু করে। সে কমান্ডোদের যে পথ দিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, তা ছিল তাঁদের অপরিচিত। ফেরার পথে তাদের অনেক সমস্যা হয়। পরে তাদের মূল্যায়নে বের হয়ে আসে যে, এসব অপারেশনে আরও অভিজ্ঞ ও সাহসী গাইড থাকা দরকার। ১৯৭৩ সালের মে মাসে 'অর্থনৈতিক অপারেশন-সংক্রান্ত কতিপয় পয়েন্ট' শিরোনামে সর্বহারা পার্টির একটি দলিলে এসব কথা উল্লেখ করা হয়। চিনের গণমুক্তি ফৌজের গেরিলাযুদ্ধের কলাকৌশল নিয়ে লেখা হয় দলিলটি। সামরিক অপারেশনের দায়িত্বে থাকা গেরিলাদের নৈতিকতা, দক্ষতা ও উপস্থিতবুদ্ধির ওপর জোর দিয়ে বলা হয়, বিনা প্রয়োজনে গুলি ছোড়ার অর্থ হলো অস্ত্রকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া এবং রোমাঞ্চের প্রকাশ ঘটানো। যুদ্ধক্ষেত্রে এটা ক্ষতিকর। যুদ্ধের সময় মাথা ঠান্ডা রাখা খুবই দরকার। ঘাবড়ে যাওয়ার অর্থ হলো বিপদ ডেকে আনা। অস্ত্রের ওপর বেশি গুরুত্ব দিলে কাজ হবে না। বরং মাথা বিগড়ে যাবে।

২

১৯৭৩ সালের ৩ জুন সর্বহারা পার্টির দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে 'জাতীয় মুক্তিফ্রন্টের ঘোষণা ও কর্মসূচি' নামে একটি দলিল প্রকাশ করা হয়। এতে 'দেশপ্রেমিক সংগঠনগুলোর' ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটি সংগঠন গড়ে তোলা হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়। বলা হয়, এই সংগঠনের নাম হলো পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট।

এই ফ্রন্টে অবশ্য সর্বহারা পার্টির বাইরে কোনো দল নেই। নিজেরাই নিজেদের লোক দিয়ে নানা সংগঠনের নামে সর্বহারা পার্টির কমান্ডে একটি গুচ্ছ সংগঠন বানিয়েছেন। দেশের বড় রাজনৈতিক দলগুলো যেমন সমাজের বিভিন্ন অংশকে লক্ষ্য করে নিজেদের দলের লোক দিয়ে অঙ্গসংগঠন বানায়, এ ক্ষেত্রেও তা-ই হলো। সর্বহারা পার্টির ছত্রচ্ছায়ায় নতুন নতুন ব্যানার যোগ হলো :

সশস্ত্র দেশপ্রেমিক বাহিনী:
শ্রমিক ও কর্মচারী মুক্তি সমিতি:
কৃষক মুক্তি সমিতি;
ছাত্র-যুব মুক্তি পরিষদ;
নারী, শিল্পকলা, সংস্কৃতি, সংবাদপত্র ও সাহিত্য মুক্তি সমিতি;
জাতিগত সংখ্যালঘু মুক্তি পরিষদ;
দেশপ্রেমিক ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি সমিতি;
দেশপ্রেমিক ওলেমা সমিতি;
বিভিন্ন দেশপ্রেমিক গ্রুপ ও বামপন্থীদের প্রতিনিধি পরিষদ

দলিলে বলা হলো, এসব গণসংগঠন ও প্ল্যাটফর্মের প্রতিনিধিরা ২০ এপ্রিল ১৯৭৩ 'পূর্ব বাংলা জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট' গঠন করেছে। দেশের সব 'দেশপ্রেমিক বামপন্থী'কে জাতীয় স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের সংগ্রামে এই মুক্তিফ্রন্টে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়। এই আহ্বানের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো সেনাবাহিনীসহ অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনীকে ফ্রন্টে

যোগ দিতে বলা—‘পূর্ব বাংলার ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, বিডিআর, পুলিশ এবং অন্যান্য সশস্ত্র, আধা সশস্ত্র বাহিনীর দেশপ্রেমিকদের প্রতি আহ্বান জানানো হচ্ছে জাতীয় মুক্তিফ্রন্টে যোগদানের জন্য।’

৩

১৯৭৩ সাল থেকেই সেনাবাহিনীর মধ্যে জাসদের সাংগঠনিক তৎপরতা ছিল। সেনাবাহিনীর এনসিও-জেসিওরা একটি সৈনিক সংস্থা গড়ে তুলেছিল। তারা জাসদের সভাপতি মেজর (অব.) এম এ জলিলের সঙ্গে দেখা করে তাঁর সমর্থন চায়। তখন থেকেই জলিল বিষয়টি দেখভাল করতেন। এটা ছিল জাসদের সাংগঠনিক কাঠামো ও কর্মসূচির বাইরে একটি উদ্যোগ, যদিও জাসদের কোনো কোনো নেতা এটা জানতেন। ১৯৭৪ সালের ১৭ মার্চ জলিল গ্রেপ্তার হয়ে গেলে তিনি এই যোগাযোগের দায়িত্ব দেন সেনাবাহিনী থেকে অবসরে যাওয়া লে. কর্নেল আবু তাহেরকে। পঁচাত্তরের ৭ নভেম্বর জাসদের সহযোগী সংগঠন হিসেবে ‘বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা’র নাম চাউর হয়। এর আগে জাসদের কোনো প্রচারপত্রে বা বিজ্ঞপ্তিতে এই সংগঠনের নাম উল্লেখ করা হয়নি এবং জাসদের কোনো সভায় এটি আলোচনায়ও আসেনি।

সর্বহারা পার্টি সেনাবাহিনীর মধ্যে কাজ করার আয়োজন ১৯৭৩ সালেই শুরু করেছিল এবং তা লিখিত কর্মসূচির মাধ্যমে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কোনো কোনো কর্মকর্তার সঙ্গে সর্বহারা পার্টির নেতা সিরাজ সিকদারের যোগাযোগ ছিল। আবু তাহের যখন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন, তখন তিনি সিকদারের সংস্পর্শে আসেন। তাঁদের মধ্যে একধরনের লাভ অ্যান্ড হেইট সম্পর্ক ছিল। সিকদার চাইতেন, তাহের সরকারি চাকরি ছেড়ে সার্বক্ষণিক সদস্য হিসেবে পার্টিতে যোগ দিক। তাহের চাকরি ছেড়ে আসতে চাননি। সিকদার এটাকে দেখেছেন পেটিবুর্জোয়া সুবিধাবাদ হিসেবে। তারপরও তাঁদের মধ্যে যোগাযোগ অব্যাহত ছিল। ১৯৭২ সালে তাহের যখন কুমিল্লা সেনানিবাসে, সিকদার সেখানে গেছেন। সিকদারের সঙ্গে তাঁর স্ত্রী জাহানারাও ছিলেন। তাহের তাঁর ছোট ভাই আবু সাঈদকে দিয়ে সিকদারের কাছে একটা অয়্যারলেস সেট পাঠিয়েছিলেন। পরে সেনাবাহিনীর চাকরি

থেকে তাহেরকে সরে যেতে হয়। সরকার তাঁকে একটি অসামরিক পদে চাকরি দেয়। বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন সংস্থার সি-ট্রাক ইউনিটের ব্যবস্থাপক করা হয় তাঁকে। ১৯৭৪ সালের ২১ নভেম্বর তিনি বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ড্রেজার বিভাগের পরিচালক পদে নিয়োগ পান। পানিসম্পদমন্ত্রী আবদুর রব সেরনিয়াবাত এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। পঁচাত্তরের ১৯ নভেম্বর পর্যন্ত তিনি এই পদে চাকরি করেছেন।

ঢাকার ৪৬ ব্রিগেডের কমান্ডার ছিলেন লে. কর্নেল মো. জিয়াউদ্দিন আহমেদ। তিনি সরকারের ওপর নানা কারণে ক্ষুব্ধ ছিলেন। ১৯৭২ সালের ২০ আগস্ট সাপ্তাহিক *হলিডের* প্রথম পাতায় 'হিডেন প্রাইজ' নামে তাঁর একটি লেখা ছাপা হয়। ক্ষমতাসীনদের 'স্বার্থপরতা'র দিকে ইঙ্গিত করে তিনি লেখেন :

> দেশের মানুষের কাছে স্বাধীনতা মর্মবেদনায় রূপান্তরিত হয়েছে। পথে বেরোলেই দেখা যায় লক্ষ্যহীন, স্বপ্নবিহীন, নিষ্প্রাণ মুখগুলো যন্ত্রের মতো চলছে। মুক্তিযুদ্ধের পর মানুষ সাধারণত নতুন স্বপ্ন নিয়ে চলে এবং দেশ শূন্য থেকে উঠে দাঁড়ায়। সবকিছুর মধ্যে একটা চ্যালেঞ্জ থাকে এবং মানুষ তা সাহসের সঙ্গে মোকাবিলা করে। বাংলাদেশে ঘটছে ঠিক এর উল্টো। দেশটা যেন ভাগ হয়ে গেছে।
>
> ক. বুদ্ধিজীবীরা চুলচেরা বিশ্লেষণে ব্যস্ত।
> খ. যারা কিছুটা লেখাপড়া জানে, তারা সবাই সমালোচনায় ব্যস্ত। অফিসে কিংবা বাসায় তারা সব সময় কারও না কারও খুঁত ধরছে।
> গ. যাদের হাতে টাকাকড়ি আছে, তারা সাধ্যমতো এর সদ্ব্যবহার করছে। কিন্তু তাদের অবস্থাও টলমলে।
> ঘ. যারা প্রশাসনে আছে, তারা প্রগতির পথ আটকে রেখে একটা বস্তাপচা ব্যবস্থা বজায় রাখার চেষ্টা চালাচ্ছে।
> ঙ. ক্ষমতাসীনেরা ইতিমধ্যে জাতীয় সার্বভৌমত্বের ব্যাপারে আপস করেছে এবং যুদ্ধের যা কিছু অর্জন তার দখল নিতে ব্যস্ত।
> চ. নিরন্ন গরিব মানুষের কোনো খোঁজ নেই এবং তারা করুণা ভিক্ষা করছে। ...

দেশ রসাতলে যাচ্ছে। এখন দরকার একতা। দরকার মর্যাদা নিয়ে এগিয়ে যাওয়া। এই মর্যাদা আমরা খুঁজে পেয়েছিলাম ২৬ মার্চ (১৯৭১)। 'গোপন চুক্তির' মধ্যে হারিয়ে গেছে আমাদের মর্যাদা। যারা এটা সই করেছে, তাদেরকে এই মর্যাদা ফিরিয়ে দিতে হবে। এই অর্জন জনগণের প্রাপ্য। চুক্তির ব্যাপারটা যারা জানে, তাদের বেইমানির কথা জনগণকে বলতে হবে। এটা যদি তারা স্বীকার না করে, তাহলে তারা হবে জনগণের শত্রু। জনগণ ও মুক্তিযোদ্ধাদের এটা চাওয়ার অধিকার আছে। ... বঙ্গবন্ধু যদি জনগণকে ভালোবাসেন, তাঁর উচিত হবে জনগণকে জানানো। তাঁর ভয় কী? আমরা তাঁকে ছাড়াই যুদ্ধ করেছি এবং জিতেছি। যদি দরকার হয়, আবার যুদ্ধ করব। কেউ আমাদের হারাতে পারবে না। আমরা ধ্বংস হতে পারি, কিন্তু পরাজিত হব না।

জিয়াউদ্দিন সেনাবাহিনী ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন। বেশ কিছুদিন অপেক্ষা করার পর তিনি সর্বহারা পার্টিতে যোগ দেন। কিছুদিন পর তাঁকে ময়মনসিংহে অঞ্চল পরিচালকের দায়িত্ব দেওয়া হয়। পরে তাঁকে পাঠানো হয় পার্বত্য চট্টগ্রামে। সর্বহারা পার্টিতে যোগ দিয়ে সামরিক বাহিনীর সহকর্মীদের উদ্দেশে জিয়াউদ্দিন একটি খোলা চিঠি দিয়েছিলেন। ইংরেজিতে লেখা এই চিঠিতে তিনি সর্বহারা পার্টিতে যোগদানের ব্যাখ্যা দিয়ে সবাইকে সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আহ্বান জানান। তিনি বলেন :

আমি মনে করি, দেশ এখন ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের উপনিবেশ এবং দেশের অর্থনীতি, রাজনীতি ও সামরিক বাহিনী আওয়ামী লীগের মাধ্যমে দিল্লি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় ...। সেনাবাহিনী থেকে বরখাস্ত হওয়ার পর আমি দেশের সকল রাজনৈতিক দলের ব্যাপারে খোঁজ নিয়েছি এবং সিরাজ সিকদারের নেতৃত্বাধীন পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টিকেই একমাত্র সঠিক পার্টি হিসেবে পেয়েছি। এই পার্টির তত্ত্ব, নীতি, পদ্ধতি, সক্ষমতা ও কার্যক্রম দেখে মনে হয়, এরাই আমাদের ঠিকমতো পরিচালনা করতে পারবে। ...

আমি আপনাদের বিবেক, যুক্তি ও অনুভূতির কাছে আবেদন

Dear ...

I take this opportunity to inform you all about a few facts
of our national life to which you are all linked with every
fibre of your being. As you remember I was dismissed
from the army by the present government because I maintain
that the country is a colony of Indian expansionism
and that we must continue to struggle for our liberation.
Nation's economic, political and military life is controlled and
directed by Delhi through Awami League, the party placed
in power under arrangements with the Indian expansionism.
The Soviet social Imperialist and the American Imperialists
have also joined in the naked exploitation of this country.

After my dismissal from the army I examined all
the parties in this country and have found that Purba
Bangla Sharbahara party under the guidance of Siraj
Sikder is the only correct party in this country. This
party judging from its theory, policy, method, ability and
activity is capable of guiding this course.

All of you carry a responsibility and an obligation
to fight for what is just and correct. Please do not go
checked by fear or petty moral and legal prejudices. All
those who assist the present or like government will be
fought and destroyed. Enemy cannot stop our victories——
— We are CORRECT and the people are with us. Please do not
believe the lies and bluffs of this reactionary government
which along with its agents are spreading the false rumour
that I am dead and am an agent of India etc. This has
been construed to prevent you all from joining us. Here I
also request you all not to get carried by petty emotional
interpretation of serious national issues by these enemies of
the people.

I appeal to your reasons, senses and feelings to REALLY
stand by us in deeds for the creation of a free ...
self-respecting nation. Please provide all assistance to the
bearer of this letter, through whom you can know more
about us. Hoping to see you all.

With Revolutionary Greetings

M. Ziauddin
Lt-Col

সেনাবাহিনীর সদস্যদের উদ্দেশে লে. কর্নেল জিয়াউদ্দিনের আহ্বান

করছি, একটি স্বাধীন ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন জাতি গড়ে তোলার সংগ্রামে আমাদের পাশে দাঁড়ান। ...

বিপ্লবী অভিনন্দনসহ

এম. জিয়াউদ্দিন

লে. কর্নেল

১৯৭৩ সালে (তারিখ নেই) সর্বহারা পার্টি 'স্বাধীন, গণতান্ত্রিক, শান্তিপূর্ণ, নিরপেক্ষ, প্রগতিশীল পূর্ব বাংলার প্রজাতন্ত্রের কর্মসূচি' শিরোনামে একটি দলিল প্রচার করে। দলিলে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী প্রসঙ্গে সুনির্দিষ্টভাবে বলা হয় :

> সশস্ত্র দেশপ্রেমিক বাহিনীর দেশপ্রেম, তাদের সংকল্প, শৃঙ্খলাবোধ জোরদার করার উদ্দেশ্যে এবং জনগণ ও সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যকার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তাদের মধ্যে রাজনৈতিক কাজ জোরদার করা।
>
> দেশপ্রেমিক বাহিনীর অফিসার ও সৈন্যদের ভোটদান করার ও নির্বাচিত হওয়ার অধিকার রয়েছে। তাঁরা ভূসম্পত্তির মালিক হতে পারেন এবং সাধারণ নাগরিকের সকল অধিকার ভোগ করতে পারেন।

১৯৭৪ সালের জুন মাসের শেষ দিকে সর্বহারা পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির দ্বাদশ বৈঠকে বিগত দিনের কাজের পর্যালোচনা করে একটি ইশতেহার প্রচার করা হয়। ইশতেহারে দাবি করা হয়, হক-তোয়াহা, মতিন-আলাউদ্দিনদের অনেক কর্মী ও শুভাকাঙ্ক্ষী সর্বহারা পার্টির সমর্থনে এগিয়ে এসেছে। এই বৈঠকে সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে কাজের গতি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত হয়। ইশতেহারে বলা হয় :

> বর্তমানে সশস্ত্র বাহিনীর বিরাট অংশ ভারত ও আওয়ামী লীগের প্রতি বিক্ষুব্ধ। ইতিহাস থেকে দেখা যায় সশস্ত্র বাহিনী বিভিন্ন সময় সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। কাজেই সশস্ত্র বাহিনীর মাঝে কাজ করা উচিত। এদের বিদ্রোহ করা বা সেনাবাহিনী ত্যাগ করে আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে উৎসাহিত করা উচিত। এভাবে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের বাঙালি দমনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে দিতে হবে।

১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে লাহোরে ইসলামিক শীর্ষ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবের যোগ দেওয়ার পূর্বমুহূর্তে বাংলাদেশকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দেয় পাকিস্তান। এ প্রসঙ্গে ইশতেহারে বলা হয়—এই সম্মেলনে যোগদান ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের স্বার্থের ওপর একটি আঘাত। তবে পাকিস্তানের স্বীকৃতি পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক অবস্থার কোনো মৌলিক পরিবর্তন ঘটায়নি। ইশতেহারে আবদুল হকের তত্ত্ব সম্পর্কে মন্তব্য করে বলা হয়, পাকিস্তান পূর্ব বাংলাকে তার অংশ হিসেবে দাবি করা থেকে সরে আসায় হকের নয়া পাকিস্তান গড়ার বক্তব্য ভুল প্রমাণিত হয়েছে।

পাহাড়ে ঘাঁটি

পাহাড় আর অরণ্য সিরাজ সিকদারের খুব প্রিয়। গেরিলাযুদ্ধের ঘাঁটি হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামকে বেছে নিয়েছিলেন তিনি। তাঁর মনে হয়েছে, পার্বত্য চট্টগ্রামের ভৌগোলিক পরিবেশ মুক্তাঞ্চল হওয়ার জন্য খুবই উপযোগী। তিনি একটি কবিতা লিখলেন 'চিম্বুক পাহাড়' নামে। তার কয়েকটি পঙ্‌ক্তি এরকম :

এই বন-পাহাড়
বাঁশের কোঁড়, আলু
ঝর্ণার মিষ্টি পানি
মাছ বন্যজন্তু
নিপীড়িত পাহাড়ি
গেরিলাদের স্বর্গভূমি।
মনে হয়
ভিয়েতনামের হাইপ্লাটেস্কে
রয়েছি আমি
পাহাড়ের ঢাল বেয়ে
নেমে যায় মুরং মেয়ে।
অঙ্গে তার ছোট্ট আবরণী
কী নিটোল স্বাস্থ্যবতী!
কবে তার কাঁধে শোভা পাবে
রাইফেল একখানি।

পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়িরা সংখ্যায় বেশি। প্রধান পেশা জুমচাষ। সেখানে বাইরের জেলাগুলো থেকে হুড়মুড় করে ঢুকছে মানুষ, গড়ছে বসতি। চাকরি, ব্যবসা, খামার সব তাদের দখলে। পাহাড়িরা যেন নিজভূমে পরবাসী।

'পূর্ব বাংলার জাতিগত সংখ্যালঘু মুক্তি পরিষদ' নামে একটা সংগঠন দাঁড় করাতে চাইলেন তিনি। এর দায়িত্ব দিলেন সর্বহারা পার্টির সদস্য সুদত্ত বিকাশ তঞ্চঙ্গ্যাকে। পার্টিতে তাঁর নাম জ্যোতি। এরকম আরও কয়েকটি গণসংগঠনের সৃষ্টি হলো। সবগুলোই ছিল নামমাত্র। এসব নিয়ে ১৯৭৩ সালের জুনে সিকদার বানালেন 'জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট'। নিজেই হলেন ফ্রন্টের সভাপতি। ফ্রন্টের পক্ষ থেকে একটি ঘোষণা ও কর্মসূচি তৈরি হলো। কর্মসূচিতে 'জাতিগত সংখ্যালঘুদের' নানান সমস্যা ও দাবির পরিপ্রেক্ষিতে একটি নীতিমালা বানানো হয়। এর মধ্যে ছিল :

- জাতিগত সংখ্যালঘুদের বিভক্ত ও শোষণ করার জন্য ব্যবহৃত সব আইন, পদ্ধতি, নীতি ও কৌশল বাতিল করা এবং তাদের ভয় দেখিয়ে বা জোর করে বাসস্থান থেকে উৎখাতের বিরোধিতা করা।
- তাদের সঙ্গে বাঙালি জাতির দীর্ঘদিনের একতা এবং পারস্পরিক সাহায্যের ঐতিহ্যকে বিকশিত করা, যাতে দেশ গঠনের কাজে সবাইকে শরিক করা যায়। চাকরি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, প্রশাসন, প্রতিরক্ষা ও অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে সকল জাতিসত্তার সমান অধিকার আছে।
- যে সমস্ত জমি ও সম্পত্তি অবৈধভাবে দখল করা বা বন্দোবস্ত নেওয়া হয়েছে, তা আগের মালিককে বিনা শর্তে ফেরত দিতে হবে।
- সংরক্ষিত বনাঞ্চলে বসবাসকারী ঝুমিয়া চাষিদের ওপর ভূমিদাসসুলভ শোষণ ও নির্যাতনের অবসান ঘটাতে হবে।
- যে জমি চাষ করে সে-ই জমির মালিক—এই নীতি প্রয়োগ করতে হবে।
- কৃষিকাজে বাধা সৃষ্টি করে এলাকা প্লাবিত না করে বিশেষজ্ঞ দ্বারা স্থির করে কাপ্তাই বাঁধের জলের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করতে হবে।
- জেলেদের ওপর ঠিকাদার, সরকারি কর্মচারী ও তাদের তাঁবেদারদের শোষণ বন্ধ করতে হবে। তাদের ন্যায্যমূল্যে মাছ ধরার জাল ও অন্যান্য সরঞ্জাম সরবরাহ করতে হবে। ন্যায্যমূল্যে মাছ কেনার ব্যবস্থা করতে হবে।

- তাদের অর্থনীতি ও সংস্কৃতি এবং জীবনধারণের মান উন্নত করতে হবে, যাতে তারা পূর্ব বাংলার জনগণের সাধারণ মানে পৌঁছাতে পারে।
- লিখিত ভাষার মাধ্যমে তাদের সংস্কৃতি ও শিল্পকলার বিকাশ এবং তাদের নিজস্ব আচার-অনুষ্ঠান বজায় রাখা বা পরিবর্তন করার অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।
- তাদের মধ্য থেকে দ্রুত প্রশাসনিক কর্মচারী তৈরি করা, যাতে অল্প সময়ের মধ্যে তারা স্থানীয় বিষয়গুলো নিজেরাই পরিচালনা করতে পারে।
- তাদের জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক অধিকার বাস্তবায়ন করা।
- জাতিগত সংখ্যালঘুদের জন্য স্বায়ত্তশাসিত এলাকা গঠন ও আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান, যাতে তাদের জাতিগত বিকাশ ত্বরান্বিত হয়। তাদের সংস্কৃতি রক্ষা করা।

পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থানীয় নৃ-গোষ্ঠীগুলোর উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নানান পরামর্শ ছিল, তবে তা ছিল ভাসা ভাসা। সর্বহারা পার্টিই একমাত্র দল, যারা এ অঞ্চলের মানুষের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট ও বিস্তারিত পরিকল্পনা উত্থাপন করেছিল।

২

ইতিমধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি বেশ বদলে গেছে। চাকমা নেতারা স্বায়ত্তশাসন-সংবলিত সাংবিধানিক সুরক্ষার দাবি তুলেছিলেন ১৯৭২ সালেই। সরকার তাতে সাড়া দেয়নি। পার্বত্য চট্টগ্রামে তখন শুরু হয় পাহাড়িদের রাজনৈতিক তৎপরতা। এর নেতৃত্বে ছিলেন বাংলাদেশ গণপরিষদের এবং পরে জাতীয় সংসদের সদস্য মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা। তাঁর উদ্যোগে তৈরি হয় চিটাগাং হিল ট্র্যাক্টস ইউনাইটেড পিপলস পার্টি। পরে এর নাম বদলে হয় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি। রাজনৈতিক আন্দোলনের পাশাপাশি তাঁরা গড়ে তোলেন সামরিক সংগঠন পিপলস লিবারেশন আর্মি (পিএলএ)।

এটি পরে 'শান্তিবাহিনী' নামে পরিচিতি পায়।

জনসংহতি সমিতি এবং পিএলএর নেতৃত্ব, লক্ষ্য ও কর্মসূচির ব্যাপারে সিরাজ সিকদারের উদ্বেগ ও আপত্তি ছিল। জনসংহতি সমিতির নেতাদের সঙ্গে সিকদারের কয়েক দফা বৈঠক হয়। তাঁরা একমত হননি। একপর্যায়ে সিকদার তাদের কঠোর সমালোচনা শুরু করেন। 'পার্বত্য চট্টগ্রামের সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদীদের প্রতিক্রিয়াশীল কার্যকলাপ' শিরোনামে তিনি একটি নিবন্ধ লেখেন। ১৯৭৪ সালের অক্টোবরে সর্বহারা পার্টির মুখপত্র *স্ফুলিঙ্গ* প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রথম সংখ্যায় সিকদারের নিবন্ধটি ছাপা হয়। নিবন্ধের মূল বক্তব্য ছিল এরকম :

- সামন্ত ক্ষুদে বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা জাতিসত্তার মধ্যে একটি সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন চলে আসছে। তারা শোষক ও শোষিত বাঙালির মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখে না, সব বাঙালিকেই শত্রু মনে করে। তারা মুক্তির জন্য বাঙালিদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তাকে বিরোধিতা করে।
- তারা পাহাড়িদের মধ্যে শোষক-শোষিতের পার্থক্য করে না।
- তারা পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন জাতিসত্তার জন্য স্বায়ত্তশাসনের কথা না বলে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বায়ত্তশাসন, কখনো কখনো বিচ্ছিন্নতা দাবি করে। এ দাবির অর্থই হচ্ছে ক্ষুদে বুর্জোয়া আলোকপ্রাপ্ত সংখ্যাগুরু চাকমা জাতিসত্তার ক্ষমতা দখল এবং অন্যান্য জাতিসত্তার ওপর তাদের কর্তৃত্ব ও নিপীড়ন।
- চাকমা জাতিসত্তার সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদীরা কেউ কেউ নিজেদের মার্কসবাদী দাবি করে। কিন্তু জাতীয় সমস্যা হচ্ছে মূলত শ্রেণি সমস্যা, এটা তারা স্বীকার করে না।
- পাক বাহিনী-পরিত্যক্ত অস্ত্র, প্রাক্তন রাজাকার ও সামন্ত বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে তারা একটি সশস্ত্র বাহিনী তৈরি করেছে। এর সাহায্যে তারা গ্রাম থেকে জোর করে টাকা জোগাড়, কোথাও কোথাও ডাকাতি করা, সামন্ত প্রতিক্রিয়াশীলদের নিরাপদে রাখা, এসব কাজ করে। পার্বত্য চট্টগ্রামে কিছুদিন আগে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে তারা বন্দুক দেখিয়ে জনগণকে তাদের পছন্দের প্রতিনিধিকে ভোট দিতে বাধ্য করেছে।

* এদের সংগঠন হচ্ছে 'জনসংহতি' ও পিএলএ বা শান্তিবাহিনী। কোথাও কোথাও তারা 'জংলি' নামে পরিচিত। সরকারবিরোধী কোনো তৎপরতা নেই তাদের। তাদের ওপর জনগণের আস্থা দ্রুত কমে যাচ্ছে।
* পক্ষান্তরে পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টির কাজ পার্বত্য চট্টগ্রামে দ্রুত বিকাশ লাভ করছে। সর্বহারা পার্টি নিপীড়িত বাঙালি-পাহাড়িদের ঐক্যের পক্ষপাতী, পাহাড়ি-বাঙালির সম-অধিকার এবং প্রত্যেক পাহাড়ি জাতিসত্তার জন্য স্বায়ত্তশাসন চায়।

সর্বহারা পার্টি ঐক্যের প্রস্তাব দিয়েছিল বলে নিবন্ধে দাবি করা হয়। এ নিয়ে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার সঙ্গেও আলোচনা হয়। কিন্তু তারা সাড়া দেয়নি। বরং তারা সর্বহারা পার্টির 'দ্রুত বিকাশে শঙ্কিত হয়ে' সর্বহারা পার্টির কয়েকজন কর্মীকে আটক করে নির্যাতন চালিয়েছে। নিবন্ধের শেষে মন্তব্য ছিল—অস্ত্রের জোরে তারা পাহাড়িদের দাবিয়ে রাখতে পারবে না এবং অচিরেই তারা উৎখাত হবে।

শিল্পবোধ

সিরাজ সিকদার অনেক পড়াশোনা করতেন। তবে মাও সে তুংয়ের রচনার ওপর তাঁর বেশি ঝোঁক এবং পক্ষপাত। তিনি মনে করেন, নেতৃত্ব বিকাশের জন্য এবং মতাদর্শগত লড়াই চালানোর সামর্থ্য অর্জন করতে হলে নির্দিষ্ট তালিকা ধরে পাঠ করা উচিত। ১৯৭৪ সালের মাঝামাঝি কর্মীদের জন্য তিনি একটি পাঠ্যসূচি তৈরি করেন। পাঠ্যসূচির দীর্ঘ তালিকাতে ছিল মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, স্ট্যালিন ও মাওয়ের নানান রচনা। ছিল সর্বহারা পার্টির দলিলপত্র। সিকদারের লেখাগুলোও পাঠ্যসূচিতে ছিল। মতাদর্শগত লড়াই চালানোর জন্য অন্য মতের দলের বক্তব্য পাঠ করা দরকার। কিন্তু সর্বহারা পার্টির জন্য নির্ধারিত পাঠ্যসূচিতে অন্য কোনো দলের কোনো দলিল বা ইশতেহার রাখা হয়নি। ফলে বিষয়টি দাঁড়াল, সিকদার যা লিখছেন বা বলছেন এবং যা পড়তে পরামর্শ দিচ্ছেন, তার বাইরে অন্য কিছু পড়ার দরকার নেই।

পার্টির মুখপত্র ছিল *লালঝান্ডা*। সিকদারের লেখা পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ এবং মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, স্ট্যালিন, মাওয়ের লেখা থেকে নির্বাচিত অংশের উদ্ধৃতিতে এটি ঠাসা থাকত। *লালঝান্ডা* প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭৪ সালের সেপ্টেম্বরে। এর সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয় :

> পার্টির বর্তমান সমস্যা হচ্ছে, কর্মীদের তাত্ত্বিক মান উন্নত করা এবং মতাদর্শগতভাবে অধিকতরভাবে সর্বহারায় রূপান্তরিত করা। ... আমাদের সময় ও লক্ষ্য স্থির করে মানোন্নয়ন চালিয়ে যেতে হবে এবং বিভিন্ন পাঠ্য তালিকা, অধ্যয়ন গ্রুপ, লেখক গ্রুপ, শিক্ষাদাতা গ্রুপ গঠন করতে হবে। মার্কসবাদ অধ্যয়ন ও উত্তমরূপে রপ্ত করার একটি প্রাণবন্ত আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

পাঠ্যসূচিতে মার্কস-এঙ্গেলসের লেখা 'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার' থেকে শুরু করে সিরাজ সিকদারের লেখা 'গণযুদ্ধের পটভূমি' কবিতার উল্লেখ ছিল। সিকদার কবিতা লিখতেন। চিনের কমিউনিস্ট পার্টি যেমন দলের চেয়ারম্যান মাওকে একজন বড় ও মহান কবি হিসেবে প্রচার করত, সর্বহারা পার্টির কর্মীরাও সিরাজ সিকদারকে একজন কবি হিসেবে প্রচারে পিছিয়ে ছিল না। পাঠসূচিতে থাকা 'গণযুদ্ধের পটভূমি' কবিতাটি একই নামের একটি কবিতা সংকলনে প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৭৩ সালের অক্টোবরে। সংকলনের প্রথম কবিতাটির শিরোনাম 'গণযুদ্ধের পটভূমি'। দীর্ঘ এই কবিতার শুরুর দিকের লাইনগুলো ছিল :

চলন্ত ট্রেনের শব্দ
জানালার বাইরে
বিকেলের উজ্জ্বল রৌদ্র।

পাটে-ধানে সবুজ মাঠ
মাঝে মাঝে ঘর-বাড়ি-গ্রাম
গাছ-গাছালিতে ঢাকা
বাংলার সমতট—
বন-গ্রাম-খাল-নদী-নালা
পাটে-ধানে সবুজ
মাঠের খেলা।
কয়েকটা শত্রু
খতম হলেই তো
গ্রামগুলো আমাদের;
জনগণ যেন জল
গেরিলারা মাছের মতো
সাঁতরায়।

২

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ব্রিটিশ-ভারতের একজন আলোচিত কথাসাহিত্যিক। তাঁর লেখা অনেক উপন্যাস কালজয়ী হয়েছে। সিরাজ সিকদার ভালো করেই পড়েছেন শরৎসাহিত্য। তাঁর জিজ্ঞাসা, বাংলা সাহিত্যে 'জাতীয় গণতান্ত্রিক লেখক' হিসেবে কাকে তুলে ধরা হবে?

সিকদারের মতে, জাতীয় গণতান্ত্রিক লেখক হলেন এমন একজন, যিনি আপসহীনভাবে শোষকদের উৎখাতের জন্য সশস্ত্র লড়াইয়ের পথকে তুলে ধরেছেন। *স্ফুলিঙ্গ*-র প্রথম সংখ্যায় এ বিষয়ে সিকদারের একটি লেখা ছাপা হয়েছিল। লেখাটি ছিল অসম্পূর্ণ। 'বাংলা সাহিত্যের জাতীয় গণতান্ত্রিক লেখক শরৎচন্দ্র' শিরোনামে এই লেখায় সিকদার বলেন :

> শরৎচন্দ্র সামন্তবাদী ধ্যানধারণা, আচার-অনুষ্ঠান, সামন্ত জমিদারদের নিষ্ঠুর শোষণ ও লুণ্ঠনকে এবং জনগণের সামন্তবিরোধী মনোভাবকে চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন।...
>
> শরৎচন্দ্র সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদ দ্বারা নিপীড়িতা, নির্যাতিতা নারীদের দুঃখ-বেদনাকে মর্মস্পর্শী রূপ দিয়েছেন, নিপীড়িতা নারীদের সমর্থন করেছেন। তিনি সামন্তবাদী ধ্যানধারণাকে ভেঙে ফেলা, নারী-পুরুষের সম-অধিকার, সমাজের হস্তক্ষেপ ব্যতীত নরনারীর স্বেচ্ছাভিত্তিক সম্পর্ক স্থাপনের পক্ষে সর্বদাই দৃঢ় থেকেছেন। আচার-অনুষ্ঠান নয়, নরনারীর ভালোবাসাই হচ্ছে সম্পর্কের ভিত্তি, এটা তিনি তুলে ধরেছেন। ...
>
> সাহিত্য-শিল্পকলা হচ্ছে উপরিকাঠামোর অঙ্গ। এটা মানুষের মতাদর্শকে নিয়ন্ত্রণ করে। কাজেই ভারত এবং বাংলাদেশে সাহিত্য-শিল্পকলার মাধ্যমে উপরিকাঠামোর মতাদর্শগত ক্ষেত্রে সম্প্রসারণবাদ, সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ, আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে জনমত সৃষ্টি করে তাদের টিকিয়ে রাখার প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। কিন্তু আপামর জনসাধারণ এ অপচেষ্টার বিপক্ষে। এ কারণে এখনো আধুনিক প্রতিক্রিয়াশীল লেখকদের চেয়ে শরৎচন্দ্রের জনপ্রিয়তা এবং তার পাঠকসংখ্যা বেশি।

৩

গণযুদ্ধের পটভূমি কবিতা সংকলনের ভূমিকায় সিরাজ সিকদার আশা প্রকাশ করেছেন, রাজনীতিতে এবং অনুশীলনপ্রক্রিয়ায় নিখুঁত শিল্পরূপ গড়ে উঠবে। তাঁর মতে, শিল্প-সাহিত্য তখনই সার্থক বলে বিবেচিত হবে যখন জনগণ তা গ্রহণ করবে এবং সেখান থেকে পাবে বিপ্লবের প্রেরণা। ভূমিকায় কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য্য সম্পর্কেও আলোচনা করেন তিনি।

সুকান্ত অনেক কমিউনিস্টের আইডল। এমনকি অনেক জাতীয়তাবাদীর মধ্যেও তিনি জনপ্রিয়। সুকান্তের অনেক কবিতা নিয়ে গান হয়েছে। বাংলাদেশের উত্থানপর্বে গানগুলো তরুণদের লড়াই-সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেছে। তবে সুকান্ত সম্পর্কে সিরাজ সিকদারের মন্তব্য বেশ চাঁছাছোলা। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন :

> সুকান্তের কবিতা ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ, সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদের দালাল শেখ মুজিব পাঠ করে, প্রশংসা করে। সংশোধনবাদীরাও একে সমাদর করে। এর কারণ শ্রেণিসংগ্রাম বুর্জোয়া এমনকি বড় বুর্জোয়াদের নিকটও গ্রহণীয়।
>
> সুকান্ত শ্রেণিসংগ্রামের কথাই বলেছেন। কিন্তু শ্রেণিসংগ্রামের অনিবার্য পরিণতি সর্বহারার একনায়কত্ব (বর্তমানে ও তখন জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব যা সর্বহারার একনায়কত্বের একটি রূপ) প্রতিষ্ঠার স্বীকৃতি তার কবিতায় নেই।
>
> সর্বহারা শ্রেণির শ্রেণিসংগ্রাম পরিচালনার বৈজ্ঞানিক তাত্ত্বিক ভিত্তি মার্কসবাদ, লেনিনবাদ (বর্তমানে মার্কসবাদ, লেনিনবাদ, মাও সে তুং চিন্তাধারা) এবং শ্রেণিসংগ্রাম পরিচালনার জন্য সর্বহারা শ্রেণির রাজনৈতিক পার্টি তার কবিতায় অনুপস্থিত।
>
> জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য পার্টির নেতৃত্বে সশস্ত্র এবং অন্যান্য সংগ্রামের বিপ্লবী অনুশীলন সুকান্তের কবিতায় প্রতিফলিত হয়নি।
>
> এগুলো হচ্ছে সুকান্তের সীমাবদ্ধতা। এ কারণে বুর্জোয়া এমনকি

বড় বুর্জোয়াদের নিকটও সুকান্ত গ্রহণীয়। পূর্ব বাংলার ইন্দু সাহার ক্ষেত্রেও একই বক্তব্য প্রযোজ্য।

সুকান্ত ভট্টাচার্য্য সম্পর্কে সিরাজ সিকদারের মন্তব্য বেশ অনুদার। যে কারণে সুকান্ত তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি, একই কারণে শরৎচন্দ্রের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন তিনি। সিকদারের অবস্থান এখানে স্ববিরোধী। শরৎসাহিত্যের কোথাও সর্বহারার একনায়কত্বের দাবি নেই। 'বুর্জোয়াদের' কাছে শরৎ এখনো আদরণীয়। শরৎচন্দ্রের আদর সবচেয়ে বেশি শহুরে মধ্যবিত্তের মধ্যে। শ্রমিকের বস্তিতে শরৎচন্দ্র অনুপস্থিত। সুকান্ত কবিতা লিখেছেন। তিনি কমিউনিস্ট পার্টির প্রচারপত্র লেখেননি। শব্দের পর শব্দ বসিয়ে দিলেই কবিতা হয় না। কবিতায় স্লোগানের যথেচ্ছ ব্যবহার হলে তা আর কবিতা থাকে কি না, এ নিয়ে অনেক বিদগ্ধ আলোচনা আছে।

৪

সিরাজ সিকদার নিজেও অনেক কবিতা লিখেছেন। বলা চলে, তার অনেক লেখাকে তিনি কবিতা বলে দাবি করেছেন। অনেক ক্ষেত্রে এটা হয়েছে কবিতার ঢংয়ে নিরেট প্রচারপত্র—প্রোপাগান্ডা। এমন একটি কবিতা হলো 'নাট্যমঞ্চ'। এটাকে কবিতা বলা হয়, যেহেতু এর রচয়িতা এটি কবিতা হিসেবে দাবি করেছেন। এর ছত্রে ছত্রে আছে সমাজ বিবর্তনের ইতিহাস আর স্লোগান। কবিতার লাইনগুলো এরকম :

পূর্ব বাংলা একটা নাট্যমঞ্চ
দর্শক জনতা
সত্যিকার নায়কের আশায় উন্মুখ
তারাও নায়কের সাথে
অংশ নেবে নাটকে
দুনিয়া আর সমাজটাকে পাল্টাবে
নাটকটি তিন অঙ্কের।

প্রথম অঙ্ক
সাতচল্লিশ থেকে একাত্তর
চব্বিশ বছর।

প্রথম দৃশ্য—
দুর্দান্ত প্রতাপ
পাক সামরিক দস্যুদের
হুংকার লম্ফ ঝম্প
নির্মম শোষণ লুণ্ঠন
তার সাথে আওয়ামী লীগের
বড় বড় বুলি আর রণধ্বনি।
বিভিন্ন আকৃতির সংশোধনবাদী
কুকুরগুলোর পা-চাটা
আর ঘেউ ঘেউ।

নাটক জমে ওঠে।

দ্বিতীয় দৃশ্যে শিশুর প্রবেশ
হাতে রক্ত পতাকা
দৃঢ় পদক্ষেপ।

পাকে সামরিক দস্যুদের চরম হামলা
আওয়ামী লীগের পলায়ন।
এর মাঝে শিশুর লড়াই
স্ফুলিঙ্গ দাবানল জ্বালে;
অভিজ্ঞতা আর শক্তির সঞ্চয়।
ভারতের আগমন
শিশুকে হত্যার চক্রান্ত
পাকিস্তানের পরাজয়
পূর্ব বাংলা ভারতের উপনিবেশ।

প্রথম অঙ্ক
এইভাবে হলো শেষ।

দ্বিতীয় অঙ্কের শুরু।
জনগণের কঠোর উপলব্ধি
বৃথা হলো তাদের রক্তপাত।
ক্রোধে তারা ফেটে পড়ে
রক্তের শোধ তারা তুলবেই।
বিশ্বাসঘাতকদের তারা খতম করবেই।
সরল স্মিত-হাসি শিশু
কৈশোরে পৌঁছায়।
সংশোধনবাদী কুকুরগুলো
নিজেদের মাঝে কামড়াকামড়ি করে।
কিশোরের পদাঘাতে তারা
ছিটকে পড়ে ড্রেনে।

আওয়ামী লীগের নায়কের বেশ খসে পড়ে—
পাক দস্যুর মতো ভিলেন বেরোয়।
জনগণ তাকে মার মার বলে তেড়ে আসে।
কিশোর দ্রুত যুবকের বয়সে পৌঁছায়
জনগণ তাকেই নায়কে বরণ করে।
দ্বিতীয় অঙ্কের গতি দ্রুততর।
তৃতীয় অঙ্ক সমাগত প্রায়।
নায়কের সাথে জনগণ
আওয়ামী লীগ ফ্যাসিস্টদের
খতমের দুর্বার সংগ্রাম চালায়।
গড়ে ওঠে ঘাঁটি এলাকা
বিস্তীর্ণ গেরিলা অঞ্চল।
এভাবে দ্বিতীয় অঙ্কের হলো অবসান।

তৃতীয় অঙ্ক—
গণযুদ্ধের রোমাঞ্চকর দৃশ্য।
যুবক, নায়ক, জনগণ
আর শত্রু
ঘেরাও-দমন-পাল্টা ঘেরাও-দমন,
গণযুদ্ধের চমৎকার খেলা।
প্যাঁচে প্যাঁচে ফ্যাসিস্ট খতম।
সচল যুদ্ধ, ঘেরাও যুদ্ধ, অবস্থান যুদ্ধ
কামান বন্দুক ট্যাংক।
কী রোমাঞ্চকর, অদ্ভুত শিহরণ!
বিশ্বজনগণেরও দৃষ্টি টানে।

গ্রাম দখল, শহর ঘেরাও
অবশেষে শহর দখল।
যুবক আর জনগণের মহান বিজয়
সমাপ্ত হলো তৃতীয় অঙ্ক
অবশেষে পূর্ব বাংলা হলো মুক্ত।

এই 'কবিতা'য় পার্টিকে রূপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। শুরুতে ছিল শ্রমিক আন্দোলন। তখন সে শিশু। ধীরে ধীরে তার রূপান্তর হলো, জন্ম নিল সর্বহারা পার্টি। কৈশোর পেরিয়ে যৌবন, তৈরি হলো সশস্ত্র মুক্তিবাহিনী, জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট। তার নেতৃত্বে হলো বিপ্লব।

অ্যাকশন

আগে ছোটখাটো সংঘর্ষ হতো। ১৯৭৩ সালের মাঝামাঝি থেকে সর্বহারা পার্টির কর্মীরা তাদের আক্রমণের গতি বাড়িয়ে দেয়। তাদের প্রধান লক্ষ্য জাতীয় শত্রু খতম। তেহাত্তরের জুলাই থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে ১৪টি পুলিশ ফাঁড়ি, থানা ও ব্যাংকে হামলা চালানো হয়। এর মধ্যে ছিল মুন্সিগঞ্জের লৌহজং থানা ও ব্যাংক (২৬ জুলাই), মানিকগঞ্জের ঘিওর থানার জাবরা পুলিশ ক্যাম্প (১ আগস্ট), ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জে উচাখিলা পুলিশ ক্যাম্প (৯ আগস্ট), ময়মনসিংহের ত্রিশালে ধানিখোলা পুলিশ ক্যাম্প (আগস্ট), মানিকগঞ্জের সাটুরিয়া থানা ও খাদ্যগুদাম (আগস্ট), সিলেটে বালাগঞ্জ থানা (নভেম্বর), চাঁদপুরে মতলব থানা ও ব্যাংক (৩ নভেম্বর), ময়মনসিংহে আঠারোবাড়ি ব্যাংক (৩ ডিসেম্বর), পার্বত্য চট্টগ্রামে চন্দ্রঘোনা থানা (১২ ডিসেম্বর), রাজবাড়ীর গোয়ালন্দে খানখানাপুর ব্যাংক, ফরিদপুর সদরে চানপুর পুলিশ ফাঁড়ি, বরিশাল সদরে ইন্দেরহাট পুলিশ ক্যাম্প ও ব্যাংক, বরিশালের ভাসানচর পুলিশ ফাঁড়ি এবং নেত্রকোনার বারহাট্টা থানা। এর মধ্যে বারহাট্টা থানা আক্রমণ পুরোপুরি ব্যর্থ হয় এবং আঠারোবাড়ি ব্যাংক হামলায় আংশিক বিপর্যয় ঘটে। বাকি আক্রমণগুলো সফল ও দখল হয়েছে বলে সর্বহারা পার্টির দাবি।

১৯৭৪ সালে ফাঁড়ি, থানা ও ব্যাংকে হামলা অব্যাহত থাকে। ফেব্রুয়ারিতে আক্রমণ হয় ময়মনসিংহের গফরগাঁও থানা, আগস্ট মাসে ঢাকার কেরানীগঞ্জে আটি পুলিশ ফাঁড়ি, পটুয়াখালীর বাউফল থানা, বরিশালের বাবুগঞ্জ থানা, টাঙ্গাইল সদরে পাতরাইল পুলিশ ক্যাম্প, বরিশাল সদরে টরকিতে একটি ব্যাংক, নেত্রকোনার মদন থানা এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে ফারোয়া পুলিশ ক্যাম্প। বরিশালে বল্লাফাঁড়ি আক্রমণটি ব্যর্থ হয়। বাউফল থানা আক্রমণ করতে গিয়ে সর্বহারা পার্টির লোকেরা বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে। এই অপারেশনে

পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মজিদ ওরফে নাসির পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। বাকি অপারেশনগুলো সফল হয় বলে পার্টি দাবি করে।

এসব আক্রমণে এবং বিভিন্ন জায়গায় পুলিশ ও রক্ষীবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে সর্বহারা পার্টির মোট ৪৬ জন নিহত হওয়ার একটি হিসাব পাওয়া যায়। সবচেয়ে বেশি মারা পড়ে মুন্সিগঞ্জে ১৭ জন এবং ময়মনসিংহে ১৩ জন। এছাড়া ফরিদপুরে নয়জন, বরিশালে ৪ জন এবং কুমিল্লায় ৩ জন নিহত হয়।

১৯৭৪ সালে মুজিব-ইন্দিরা চুক্তির শর্ত অনুযায়ী বেরুবাড়ি ছিটমহল ভারতের কাছে হস্তান্তর করা হয়। এর প্রতিবাদে সর্বহারা পার্টি আধাদিন হরতাল ডাকে। দেশের বিভিন্ন জায়গায় পার্টির লোকেরা পোস্ট অফিস ও রেলস্টেশনে হামলা চালায়। ঢাকার মিরপুরে ১০ নম্বর গোলচত্বরের কাছে তিতাস গ্যাস সেন্টারে মাইন বিস্ফোরণ ঘটানো হয়।

১৬ ডিসেম্বর জাতীয়ভাবে মুক্তিযুদ্ধের বিজয় দিবস উদ্‌যাপন করা হলেও সর্বহারা পার্টির কাছে এটা হলো বাংলাদেশকে ভারতের উপনিবেশ বানানোর দিন। এ জন্য তারা ১৯৭৩ সালের ১৬ ডিসেম্বর হরতাল ডেকেছিল। ১৯৭৪ সালের ১৫-১৬ ডিসেম্বর দুদিন টানা হরতাল ডাকে সর্বহারা পার্টি। পর্নো ম্যাগাজিন প্রকাশ করার অভিযোগে কয়েকটি সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকার অফিসে সর্বহারা পার্টির লোকেরা হামলা চালায়। পত্রিকাগুলো হলো *কামনা*, *বাসনা*, *শ্রীমতি* এবং *বিনোদন*। তারা ঢাকার নাখালপাড়ায় মাইন দিয়ে রেললাইন উপড়ে ফেলার চেষ্টা করে।

পুলিশ ও রক্ষীবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে সর্বহারা পার্টির কতজনের মৃত্যু হয়েছে এবং তাদের আক্রমণে পুলিশ ও রক্ষীবাহিনীর কতজন সদস্য নিহত হয়েছে, তার পুরো হিসাব কারও কাছে নেই। 'জাতীয় শত্রু খতমের' নামে সর্বহারা পার্টির লোকেরা কত মানুষ মেরেছে তারও তালিকা নেই। তদুপরি আছে দলের মধ্যে কোন্দলে এক গ্রুপের হাতে অন্য গ্রুপের লোকের খুন হওয়া এবং অন্যান্য দলের সঙ্গে সংঘর্ষে উভয় পক্ষের লোকের নিহত হওয়া।

নিহত ব্যক্তিরা তো কেবল সংখ্যা নয়। তারা ছিল একেকটি তাজা প্রাণ। এরা অকালেই ঝরে গেছে। যাদের উল্লেখ করার মতো পারিবারিক বা সামাজিক পরিচিতি নেই, দলীয় পদ-পদবি নেই, তাদের কথা কেউ মনে রাখেনি। গরিব ঘরের 'বিপ্লবী গেরিলা' কিংবা গরিব পুলিশ কনস্টেবল বা রক্ষীবাহিনীর সিপাইদের ইতিহাসে জায়গা হয় না।

বারহাট্টা থানা আক্রমণের সময় নিহত হয় কেন্দুয়ার আমিন। আঠারোবাড়ি ব্যাংক আক্রমণ করে ফিরে আসার পথে মারা যায় ঈশ্বরগঞ্জের নাসির ওরফে গিয়াস, মতিন ওরফে গিয়াসউদ্দিন এবং মানিকগঞ্জের সাঈদ। মাদারীপুরে কালকিনি থানার সাহেবরামপুরে রক্ষীবাহিনীর ক্যাম্পে হামলা চালাতে গিয়ে মারা যায় মাদারীপুরের মাখন, ফরিদপুরের খসরু, কালকিনির হিরণ এবং বরিশালের বাবুগঞ্জের সত্য। মুনীর মোরশেদের লেখায় এসব তথ্য উঠে এসেছে। এক এলাকার তরুণ অন্য এলাকায় 'যুদ্ধ' করে মারা পড়েছে। স্বজনদের কাছে তাদের লাশ পৌঁছায়নি। তারা হয়তো জানেও না তাদের সন্তান কোথায় কেমন আছে, বেঁচে আছে না মরে গেছে। হয়তো এখনো কোনো মা জায়নামাজে বসে কিংবা সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বেলে অপেক্ষায় থাকেন, সন্তান ফিরে আসবে।

২

সাপ্তাহিক *বিচিত্রা* বছরের শুরুতে একটি বিশেষ প্রতিবেদন ছাপে। এর শিরোনাম হয় 'বছরের আলোচিত চরিত্র'। ১৯৭৪ সালের ৪ জানুয়ারি সংখ্যায় প্রচ্ছদকাহিনি হিসেবে ছাপা হয় 'আততায়ী'। আততায়ীর মডেল হন সহকারী সম্পাদক শাহাদত চৌধুরী। প্রচ্ছদকাহিনিতে ১৯৭৩ সালের নানান প্রাসঙ্গিক ঘটনার ফিরিস্তি দেওয়া হয়। এ বিষয়ে একটি নিবন্ধ লেখেন সহকারী সম্পাদক মাহফুজ উল্লাহ।

বছরটি ছিল ভয়ংকর। ১৯৭৩ সালের ৫ জানুয়ারি জাতীয় সংসদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এক বিবৃতিতে বলেন, ১৯৭২ সালের জানুয়ারি থেকে তেহাত্তরের মে পর্যন্ত সারা দেশে দুষ্কৃতকারীদের হামলা ও গুপ্তহত্যার শিকার হয়েছে ৪ হাজার ৯২৫ জন। *বিচিত্রার* নিবন্ধে বলা হয়, তেহাত্তরের ১২ জুন থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ২০৩ দিনে ৫৮টি থানা ও ফাঁড়িতে সশস্ত্র হামলা হয়। এর মধ্যে ২৮টি থানা ও ফাঁড়ি লুট হয়। অস্ত্র লুট হয় ৩০০-র বেশি। হতাহত পুলিশের সংখ্যা শতাধিক। দিনাজপুর, রংপুর ও পাবনা ছাড়া সব জেলা থেকেই থানা ও ফাঁড়ি লুটের খবর এসেছে। পুলিশের মতে, সশস্ত্র হামলাকারীরা কোনো একটি সংঘবদ্ধ দলের নয়। তারা বিভিন্ন দলের। এসব হামলা ও লুটের অনেকগুলোই করেছে সর্বহারা পার্টির লোকেরা। অন্য

চিনপন্থী কমিউনিস্ট পার্টির লোকেরাও অনেক হামলার সঙ্গে জড়িত বলে জানা যায়। আবার রাজনৈতিক পরিচয়হীন ডাকাতরাও অনেক হামলার সঙ্গে জড়িত ছিল। ১৯৭৩ সালে যেসব থানা ও ফাঁড়ি লুট হয়েছে, তার একটা তালিকা পাওয়া যায় *বিচিত্রায়* প্রকাশিত নিবন্ধে। তালিকায় পুরোনো বৃহত্তর জেলার নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

জুন

১৮ : ছাতরা ফাঁড়ি, নিয়ামতপুর থানা, রাজশাহী

২২ : মাধায়া ফাঁড়ি, দৌলতপুর থানা, কুষ্টিয়া।

২৬ : মিয়াবাজার ফাঁড়ি, কাঁঠালিয়া থানা, বরিশাল।

২৮ : চরফ্যাশন থানা, বরিশাল।

জুলাই

২ : লালমোহন থানা, বরিশাল।

৯ : আলীপুর ফাঁড়ি, বৈদ্যেরবাজার থানা, ঢাকা।

২৬ : রামকৃষ্ণ মিশন ফাঁড়ি, কোতোয়ালি থানা, ফরিদপুর।

আগস্ট

১ : জাবরা ফাঁড়ি, ঘিওর থানা, ঢাকা।

৯ : উচাখিলা ফাঁড়ি, ঈশ্বরগঞ্জ থানা, ময়মনসিংহ।

১৩ : ইন্দেরহাট ফাঁড়ি, স্বরূপকাঠি থানা, বরিশাল।

২৩ : চন্দনপুর ফাঁড়ি, হোমনা থানা, কুমিল্লা।

সেপ্টেম্বর

১ : ধানিখোলা ফাঁড়ি, ত্রিশাল থানা, ময়মনসিংহ।

৩ : চানপুর ফাঁড়ি, কোতোয়ালি থানা, ফরিদপুর।

২৯ : দামনাস ফাঁড়ি, বাগমারা থানা, রাজশাহী।

অক্টোবর

৯ : হরিনাকুণ্ডু ফাঁড়ি, যশোর।

১৩ : হালদা ফাঁড়ি, মিরপুর থানা, কুষ্টিয়া।

২১ : হারতা ফাঁড়ি, উজিরপুর থানা, বরিশাল।
২৫ : বালিয়াকান্দি ফাঁড়ি, ফরিদপুর।
২৬ : ভাসানচর ফাঁড়ি, মেহেন্দিগঞ্জ থানা, বরিশাল।
২৮ : পাথরঘাটা থানা, পটুয়াখালী।

নভেম্বর
২ : পাথরাইল ফাঁড়ি, টাঙ্গাইল।
২২ : বালাগঞ্জ থানা, সিলেট।
২৫ : পাচনদার ফাঁড়ি, তানোর থানা, রাজশাহী।
২৯ : মতলব থানা, কুমিল্লা।

ডিসেম্বর
১২ : চন্দ্রঘোনা থানা, পার্বত্য চট্টগ্রাম।

এসব হামলায় অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা যতই হোক না কেন, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের অস্থির করে রেখেছিল তারা। এর সঙ্গে যোগ হয়েছিল ব্যাংকে হামলা। তেহাত্তরের পয়লা আগস্ট জাতীয় সংসদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন, তেহাত্তরের ওই দিন পর্যন্ত ব্যাংক থেকে লুট হয়েছে ৪০ লাখ টাকা। ২১ সেপ্টেম্বর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, লুটের পরিমাণ ৪৯ লাখ টাকা।

সব হামলা ও লুটের সঙ্গে সর্বহারা পার্টি জড়িত ছিল না। যে এলাকায় যে দলের শক্তি বেশি, তারা এ ব্যাপারে সুযোগ নিয়েছে। সশস্ত্র ডাকাত দলের তৎপরতাও ছিল অনেক জায়গায়। অস্ত্র সহজলভ্য হয়ে যাওয়ায় এটা সম্ভব হয়। ক্ষমতাসীন দলের ছত্রচ্ছায়ায় অনেক ডাকাতি, ছিনতাই হতো। সর্বহারা পার্টির নেতা রইসউদ্দিন আরিফ একসময় ফরিদপুর ও বরিশাল জেলার অঞ্চল পরিচালক ছিলেন। তিনি জানিয়েছেন :

> চুয়াত্তর সালে মুন্সিগঞ্জের লৌহজংয়ে সর্বহারা পার্টি ছিল তিনটি। একটি সিরাজ সিকদারের, আর দুটি আওয়ামী লীগের তৎকালীন প্রভাবশালী দুই নেতার, শাহ মোয়াজ্জেম ও কোরবান আলীর। সিরাজ সিকদারের সর্বহারা পার্টির কাজ ছিল জাতি ও জনগণের জন্য বিপ্লব

করা। আর আওয়ামী নেতাদের সর্বহারা পার্টির কাজ ছিল সিরাজ সিকদার ও সর্বহারা পার্টির নামে স্লোগান দিয়ে নিরীহ মানুষকে হত্যা করে লুট করে, ডাকাতি করে বিপ্লবী পার্টিকে স্যাবোটাজ করা।

দু-একটি জায়গায় এমনও হয়েছে, এক দলের লোকেরা থানা-ফাঁড়ি আক্রমণ করেছে, কিন্তু দায় পড়েছে অন্য দলের ওপর। এমনটি ঘটেছিল বরিশালের ভোলা মহকুমার লালমোহন থানা আক্রমণের সময়। সর্বহারা পার্টি সূত্রে জানা যায়, এটি করেছিল জাসদের লোকেরা। জনৈক সিদ্দিক মাস্টারের নেতৃত্বে তারা থানা আক্রমণের সময় 'সিরাজ সিকদার জিন্দাবাদ' স্লোগান দেয়। পত্রিকায় ছাপা হয়েছে, এটি সর্বহারা পার্টির কাজ। সর্বহারা পার্টির লোকেরা এটা জেনে খুশি হয়েছে, কাজ না করেও প্রচার পাওয়া গেছে।

পালাবদল

১৯৭২ সালে সর্বহারা পার্টির প্রথম কংগ্রেসে ছয় সদস্যের কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির দুজন সদস্য ফজলু ও সুলতান বাহাত্তর সালেই বহিষ্কৃত হন। শহীদ এবং মজিদ গ্রেপ্তার হন। বাকি থাকেন দুজন, সভাপতি সিরাজ সিকদার এবং ময়মনসিংহ ব্যুরোর পরিচালক রানা।

চুয়াত্তরের শুরুর দিকে আরও কিছু পরিবর্তন ঘটে। ময়মনসিংহ থেকে রানাকে প্রত্যাহার করে ঢাকায় নিয়ে আসা হয়। লে. কর্নেল জিয়াউদ্দিন আহমেদ অঞ্চল পরিচালকের দায়িত্ব নিয়ে ময়মনসিংহে যান। পার্টিতে তাঁর নাম হয় হাসান।

চুয়াত্তরের সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় সর্বহারা পার্টির বর্ধিত সভা। সভায় বিভিন্ন এলাকার দায়িত্বে থাকা পরিচালকরা যোগ দেন। সভায় রানার সমালোচনা করেন সিকদার। রানার বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি অঞ্চল ও ব্যুরো পরিচালক হিসেবে যথেষ্ট সামর্থ্যের পরিচয় দেননি। তাঁর এলাকায় সামরিক কাজকর্মে গতি ছিল না। প্রকৃতপক্ষে রানা পার্টির সামরিক কাজে কখনোই উৎসাহী ছিলেন না।

সিরাজ সিকদার দলের পুনর্বিন্যাস করেন। কেন্দ্রীয় কমিটির খোলনলচে পাল্টে দেন। তৈরি হয় অভিনব এক কাঠামো। জন্ম হয় এক সদস্যের কেন্দ্রীয় কমিটি। রানাকে কমিটি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। সিকদার একাই কেন্দ্রীয় কমিটি। তিনি মহিউদ্দিন বাহারকে প্রধান সমন্বয়ক হিসেবে নিয়োগ দেন। পার্টিতে তাঁর নাম জামিল। তিনি কাজ করতেন ময়মনসিংহে। পার্টির জন্য টাকা সংগ্রহ করা, ব্যাংক লুটের হিসাব রাখা, বিভিন্ন এলাকায় টাকা পাঠানো এবং খরচের হিসাব রাখার জন্য একজন সার্বক্ষণিক হিসাবরক্ষকের দরকার হয়। আকবর ওরফে বাবুল কেন্দ্রীয় হিসাবরক্ষক হিসেবে নিয়োগ পান।

সিরাজ সিকদার দুটি সাহায্যকারী গ্রুপ তৈরি করেন। একটি হলো রাজনৈতিক সাহায্যকারী গ্রুপ, অন্যটি সামরিক সাহায্যকারী গ্রুপ। প্রত্যেক গ্রুপে তিনজন সাহায্যকারী। ফলে সমন্বয়ক, হিসাবরক্ষক এবং সাহায্যকারী মিলিয়ে কেন্দ্রীয় কমিটির একক সদস্য সিরাজ সিকদারের কক্ষপথে যুক্ত হলেন আটজন। সিকদারকে কেন্দ্র করে এভাবেই তৈরি হলো সৌরমণ্ডল। এর আকার ও প্রকার হলো এরকম :

সিরাজ সিকদার : সভাপতি
জামিল ওরফে মহিউদ্দিন বাহার : প্রধান সমন্বয়ক
আকবর ওরফে বাবুল : কেন্দ্রীয় হিসাবরক্ষক
রানা ওরফে আকা ফজলুল হক : রাজনৈতিক সাহায্যকারী ১
মাহতাব ওরফে রামকৃষ্ণ পাল : রাজনৈতিক সাহায্যকারী ২
জ্যোতি ওরফে সুদত্ত বিকাশ তঞ্চঙ্গ্যা : রাজনৈতিক সাহায্যকারী ৩
আবদুল মতিন : সামরিক সাহায্যকারী ১
হাসান ওরফে জিয়াউদ্দিন আহমেদ : সামরিক সাহায্যকারী ২
রফিক ওরফে শাহজাহান তালুকদার : সামরিক সাহায্যকারী ৩

বর্ধিত সভায় সিদ্ধান্ত হয়, সভাপতির অনুপস্থিতিতে (গ্রেপ্তার বা মৃত্যু হলে) প্রধান সমন্বয়ক সাহায্যকারী দলের সভা ডাকবেন এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পার্টির কংগ্রেসের আয়োজন করবেন। প্রধান সমন্বয়কের অনুপস্থিতিতে (গ্রেপ্তার বা মৃত্যু) যেকোনো একজন সাহায্যকারী উদ্যোগ নিয়ে সভা ডেকে পরবর্তী করণীয় ঠিক করবেন।

এই সভার মধ্য দিয়ে সর্বহারা পার্টির কাঠামোয় আমূল পরিবর্তন ঘটে এবং এটি এক ব্যক্তির দল হয়। ব্যক্তিনির্ভরতা আগেও ছিল। কিন্তু তখন কেন্দ্রীয় কমিটি নামে একটি কাঠামো ছিল। এবার তা আনুষ্ঠানিকভাবে বিলুপ্ত হয়। দুনিয়ার কোথাও কোনো রাজনৈতিক দলে এ ধরনের নজির খুঁজে পাওয়া কঠিন।

বর্ধিত সভার পরপরই চুয়াত্তরের অক্টোবরে প্রধান সমন্বয়ক জামিল গ্রেপ্তার হয়ে যান। নিরাপত্তাহীনতার ঝুঁকিতে পড়ে সর্বহারা পার্টি। সিকদার কিছুদিনের জন্য ঢাকার শেল্টার ছেড়ে চট্টগ্রামে চলে যান।

অঞ্চল পরিচালকরা রুটিনমাফিক সভাপতির কাছে রিপোর্ট জমা দেন। অঞ্চলের রিপোর্ট জমা দিতে চুয়াত্তরের নভেম্বরে চট্টগ্রামে যান জিয়াউদ্দিন। সিকদার তখন চট্টগ্রামে। জিয়াউদ্দিন আন্ডারগ্রাউন্ড জীবনের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারছিলেন না। ময়মনসিংহে তিনি কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেননি। নিরাপত্তার সমস্যাও ছিল। সিকদার তাঁকে ময়মনসিংহে ফেরত না পাঠিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে পাঠিয়ে দেন। এক নম্বর সামরিক সাহায্যকারী মতিন ছিলেন ঢাকা (শহর ব্যতীত), কুমিল্লা, সিলেট ও কুষ্টিয়া জেলার দায়িত্বে। তাঁকে ময়মনসিংহের অঞ্চল পরিচালকের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ঢাকা শহরের পরিচালনা কমিটির সদস্য হিসেবে থাকলেন রানা। তাঁর অন্যতম দায়িত্ব হলো সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ রেখে কাজ করা।

চট্টগ্রাম তখন সর্বহারা পার্টির অন্যতম ভরকেন্দ্র। চুয়াত্তরের ডিসেম্বরে চট্টগ্রামে পার্টির নেতাদের মধ্যে ছিলেন আকবর ওরফে বাবুল (কেন্দ্রীয় হিসাবরক্ষক), মাসুদ ওরফে আমানউল্লাহ (কেন্দ্রীয় স্টাফ), জাহানারা বেগম (কেন্দ্রীয় স্টাফ), মালেক (কেন্দ্রীয় স্টাফ), নজরুল (কেন্দ্রীয় স্টাফ), তানিয়া (কেন্দ্রীয় স্টাফ), ইব্রাহিম (চট্টগ্রাম শহর পরিচালক), ইকরাম ওরফে মঈন (চট্টগ্রাম জেলা পরিচালক), খলিল ওরফে জিয়াউল কুদ্দুস (চট্টগ্রাম রিলে সেন্টার পরিচালক), আতিক ওরফে দেলোয়ার হোসেন চঞ্চল এবং ঝুমা। বৈরী পরিস্থিতির কারণে সুমনকে তাঁর সর্বশেষ কাজের এলাকা মুন্সিগঞ্জ থেকে প্রত্যাহার করে চট্টগ্রামে নিয়ে আসা হয় এবং তাঁকে শেল্টার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। আতিক ছিলেন কুষ্টিয়া অঞ্চল পরিচালক। তাঁকে কুষ্টিয়া থেকে বদলি করে চট্টগ্রামে নিয়ে আসা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে পাঠানোর পরিকল্পনা হয় তাঁকে। এর আগে চট্টগ্রাম থেকে মুর্তজা এবং তাঁর স্ত্রী লিপিকে বদলি করে ঢাকায় রিলে সেন্টারে নিয়োগ দেওয়া হয়। সর্বহারা পার্টিতে এ ধরনের নিয়োগ, বদলি, প্রত্যাহার ছিল নিয়মিত ঘটনা।

রাজনৈতিক সাহায্যকারীদের কাজের গুরুত্ব অনেক। ২ নং রাজনৈতিক সাহায্যকারী মাহতাব রাজশাহী বিভাগের পাবনা, বগুড়া, রাজশাহী, রংপুর ও দিনাজপুর জেলার কাজ তত্ত্বাবধান করতেন। ৩ নং রাজনৈতিক সাহায্যকারী জ্যোতি পার্বত্য চট্টগ্রামে থাকা দ্বিতীয় প্রধান নেতা। সিকদার নিজেই ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রামের মূল দায়িত্বে। কয়েক বছর ধরেই তিনি সেখানে ঘাঁটি এলাকা তৈরির কাজ করছিলেন।

সর্বহারা পার্টির গঠনতন্ত্রে তিন বছর পরপর কংগ্রেস অনুষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে। ঠিক হয়, পরবর্তী কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হবে ১৯৭৫ সালের জানুয়ারি মাসে। ততদিন পর্যন্ত সিকদার তাঁর সাহায্যকারীদের নিয়ে দল চালাবেন।

২

চুয়াত্তর সালে দেশের পরিস্থিতি দিন দিন খারাপ হয়ে পড়ছিল। রাজনৈতিক হানাহানি, মুদ্রাস্ফীতি, বন্যা ও খাদ্যসংকটে মানুষ জেরবার। সরকারব্যবস্থায় পরিবর্তন আসতে পারে বলে কানাঘুষা হচ্ছে। শাসকদলের মধ্য থেকেই পরিবর্তনের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। তারা বলছে, দেশ এভাবে চলতে পারে না। পথেঘাটে 'মুজিববাদ' প্রতিষ্ঠার স্লোগান আর না শোনা গেলেও 'শোষিতের গণতন্ত্র' কায়েমের কথা উচ্চারিত হচ্ছে জোরেশোরে। অক্টোবরে সর্বহারা পার্টির মুখপত্র *স্ফুলিঙ্গ* বিরাজমান পরিস্থিতির ওপর একটি প্রতিবেদন ছাপে। প্রতিবেদনে বলা হয় :

> আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারি রেখে বা প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতির সরকার গঠন করে জনগণের কোনো উপকার সাধন করতে পারবে না।
>
> কী পদ্ধতির সরকার হলো তাতে জনগণের কিছু আসে যায় না। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হলো, রাষ্ট্রক্ষমতা অর্থাৎ রাজনৈতিক ক্ষমতা, শ্রেণি নিপীড়নের ক্ষমতা (রাষ্ট্রযন্ত্র) কোন শ্রেণির হাতে।
>
> যেহেতু রাষ্ট্রক্ষমতা আওয়ামী লীগের হাতে, সেহেতু যে পদ্ধতির সরকারই হোক না কেন, এ সরকার আওয়ামী লীগের স্বার্থ রক্ষা করবে, জনগণের ওপর নির্যাতন চলবে।

সরকারের সঙ্গে সামরিক বাহিনীর টানাপোড়েন ছিল। দেশে সামরিক অভ্যুত্থান হতে পারে, এ ধরনের আশঙ্কাও ছিল। প্রশ্ন হলো, সামরিক বাহিনী অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা নিয়ে নিলে পরিস্থিতির কোনো পরিবর্তন হবে কি না। *স্ফুলিঙ্গের* অক্টোবর সংখ্যায় এ বিষয়ে সর্বহারা পার্টির বক্তব্য ছিল এরকম :

সামরিক বাহিনী নিজের শক্তিতে ক্ষমতায় যেতে সাহস করবে না ভারতের হস্তক্ষেপের ভয়ে। কারণ, ভারতীয় সেনাবাহিনীর সঙ্গে লড়ে বাংলাদেশের সেনাবাহিনী জয়ী হবে না। তবে সামরিক বাহিনী কোনো উপায়ে ক্ষমতায় এলে আওয়ামী লীগ ও মস্কোপন্থী দালালরা ব্যাপকভাবে মার খাবে এবং তাদের অস্তিত্ব ধ্বংসের মুখে পড়বে।

দ্বিতীয়ত, সামরিক বাহিনীকে ভারতীয় হস্তক্ষেপের মোকাবিলা করতে হবে। ফলে দেশে ২৫ মার্চ ১৯৭১-এর পরবর্তী অবস্থা তৈরি হবে। ভারত এবং অভ্যন্তরীণ আমলাদের মোকাবিলা করা সামরিক বাহিনীর পক্ষে সম্ভব হবে না।

বৈদেশিক (মার্কিন) হস্তক্ষেপের সাহায্যে সামরিক বাহিনী ক্ষমতায় টিকে গেলেও জনগণের অবস্থার কোনো পরিবর্তন হবে না। কারণ, সামরিক বাহিনীর উচ্চ আমলারা (অফিসাররা) আমলা-পুঁজি ও সামন্তবাদের সঙ্গে, সাম্রাজ্যবাদ সম্প্রসারণবাদের সঙ্গে যুক্ত।

পাকিস্তানের আইয়ুব-ইয়াহিয়ার আমল, বার্মায় নে উইন সরকারের ব্যর্থতা, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সামরিক একনায়কদের ব্যর্থতা এর প্রমাণ।

সর্বহারা পার্টি সামরিক বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখছিল। সামরিক বাহিনীতে তাদের শুভাকাঙ্ক্ষী ছিল। সামরিক বাহিনীর সদস্যদের বিদ্রোহ করার আহ্বান জানিয়েছিল সর্বহারা পার্টি। কিন্তু সিরাজ সিকদার সামরিক অভ্যুত্থান বা সামরিক শাসনের পক্ষে ছিলেন না, এই নিবন্ধে এটা স্পষ্ট।

এ সময় দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা বেড়ে যায়। শুরুর দিকে চিনপন্থী কমিউনিস্ট গ্রুপগুলো ভারতের নকশালবাড়ি অভ্যুত্থানের 'শিক্ষা' নিয়ে গণ-আন্দোলন ও গণসংগঠনের রণকৌশল শুধু পরিত্যাগই করেনি, তারা এটাকে নয়া-সংশোধনবাদী প্রবণতা বলে উপহাস ও গালমন্দ করত। সর্বহারা পার্টি কাগজেকলমে গণসংগঠনের লাইন ত্যাগ করেনি। যদিও সশস্ত্র লাইন এবং খতম অভিযানের মধ্যেই তারা ঘুরপাক খাচ্ছিল।

১৯৭৩ ও ১৯৭৪ সালে কয়েকটি হরতাল ডেকে দলটি জনসম্পৃক্ত রাজনীতির ইঙ্গিত দেয়। এটা সবাই জানে, জনসমর্থন ছাড়া হরতাল সফল করা যায় না। বোমাবাজি করে, মানুষকে ঘরে আটকে রেখে ছবিতে জনশূন্য

রাস্তা দেখানো সম্ভব। সেটা হয় মানুষকে ভয় দেখিয়ে। কিন্তু মানুষের সমর্থন নিয়ে হরতাল সফল করা, অর্থাৎ মানুষ স্বেচ্ছায় ঘরের বাইরে যাবে না, দোকানপাট খুলবে না—এরকম একটি পরিস্থিতি তৈরি হলে বোঝা যায়, হরতাল ডাকা দলের প্রতি মানুষের সমর্থন আছে। হরতাল ডাকার মধ্য দিয়ে বোঝা যায়, সর্বহারা পার্টি 'মাসলাইন' একেবারে পরিত্যাগ করেনি, বা তত্ত্বগতভাবে 'মাসলাইন' বাদ দেয়নি। হরতাল উপলক্ষে সরকার ও তার মিত্রদের হরতালবিরোধী প্রচারণা ও সভা-সমাবেশ যত বেশি হয়, ততই বোঝা যায় যে তারা হরতালকারীদের গুরুত্ব দিচ্ছে, তাদের আর উপেক্ষা করা যাচ্ছে না।

চুয়াত্তর সালে বিজয় দিবস সামনে রেখে সর্বহারা পার্টি ১৫ ও ১৬ ডিসেম্বর দুদিন হরতাল ডেকেছিল। তাদের ঘোষণায় বলা হয়, 'একাত্তরের ১৬ ডিসেম্বর ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের ঢাকাসহ পূর্ব বাংলা দখল এবং পূর্ব বাংলায় তাদের উপনিবেশ কায়েমের প্রতিবাদে ১৫ ও ১৬ ডিসেম্বর হরতাল পালন করুন।' সরকার যেকোনো মূল্যে এই হরতাল প্রতিহত করার চেষ্টা করে। ঢাকার পরিস্থিতি ছিল থমথমে। সর্বহারা পার্টি দাবি করে হরতাল সফল হয়েছে। চুয়াত্তরের ডিসেম্বরে প্রচারিত সর্বহারা পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির একটি ইশতেহারে বলা হয়, 'গোপনে থেকেও গণসংগ্রাম পরিচালনার সফলতা জাসদ, ভাসানী-ন্যাপ, জাফর-মেনন, হালিমদের ইউনাইটেড পিপলস পার্টি ইত্যাদির অস্তিত্ব অপ্রয়োজনীয় বলে প্রমাণ করেছে। এ হরতালের সফলতা হক-তোয়াহা-মতিনদের কর্মী, সহানুভূতিশীল, সমর্থক এবং অন্য বামপন্থীদের আমাদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হতে উদ্বুদ্ধ করবে।'

ওই সময় জাসদের ডাকে বেশ কয়েকটি হরতাল হয়। সর্বহারা পার্টি আগেই জাসদকে তাদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে উল্লেখ করেছিল। এই ইশতেহারে জাসদের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে বলা হয়, 'প্রকাশ্য রাজনৈতিক দল জাসদ হচ্ছে ভারত-মার্কিনের দালাল এবং আওয়ামী লীগের সঙ্গে গোপন আঁতাতযুক্ত, বিপ্লবীদের বিপথগামী, নিষ্ক্রিয় এবং নির্মূল করার ফাঁদ। কাজেই আওয়ামী লীগ জাসদ থেকে নিরাপদ।'

এ সময় প্রকাশ্যে রাজনৈতিক দলগুলো আওয়ামী লীগ ও তার মস্কোপন্থী মিত্রদের বাইরে একটি জোট গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়। ১৯৭৩ সালের ৩০ ডিসেম্বর পল্টন ময়দানের জনসভায় জাসদ 'ঐকবদ্ধ গণ-আন্দোলনের ভিত্তি

ও কর্মসূচি' ঘোষণা করেছিল। কর্মসূচির শেষ প্যারাগ্রাফটি ছিল এরকম :

> বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ভারত, সোভিয়েত রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সকল ষড়যন্ত্র ও অশুভ তৎপরতার আশু অবসানের নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। সকল প্রকার প্রকাশ্য ও গোপন চুক্তি বাতিল করতে হবে। সহাবস্থানের ভিত্তিতে জোটনিরপেক্ষ স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

শব্দের মারপ্যাঁচ বাদ দিলে জাসদের এই বক্তব্য সর্বহারা পার্টির বক্তব্যের খুব কাছাকাছি। জাসদের কোনো দলিল বা প্রচারপত্রে সর্বহারা পার্টিকে লক্ষ্য করে কখনো বিষোদগার করা হয়নি। এর কারণ অজানা। জাসদের মধ্যে একটা ধারণা ছিল সর্বহারা পার্টির বক্তব্য অনেকটাই সঠিক, কিন্তু প্রয়োগের পদ্ধতি ভুল। যদিও জাসদ পরে 'জাতীয় শত্রু' খতমের রাজনীতির দিকে ঝুঁকেছিল এবং গ্রামে গ্রামে ভিত্তি তৈরি করে শহরে গণ-অভ্যুত্থান ঘটানোর কৌশল নিয়েছিল।

চুয়াত্তরের ডিসেম্বরে এটা মোটামুটি ঠিক হয়ে যায় যে শিগগিরই সরকারব্যবস্থায় পরিবর্তন আসবে এবং একদলীয় ব্যবস্থা চালু হবে। এটাই পরে, ১৯৭৫ সালের জানুয়ারি মাসে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে কার্যকর করা হয় এবং ফেব্রুয়ারি মাসে বাকশাল (বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ) নামে একটি রাজনৈতিক দলের জন্ম হয়। আওয়ামী লীগ, ন্যাপ (মোজাফফর) এবং বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি বাকশালে একীভূত হয়। বাকশালে যোগ দেওয়ার জন্য জাসদের সঙ্গে আওয়ামী লীগের যোগাযোগ হয়েছিল। এটা জানতেন শুধু দুই দলের শীর্ষ নেতৃত্ব। বাকশালের অর্থনৈতিক কর্মসূচির একটা খসড়া তৈরি করে দিয়েছিলেন জাসদের নেপথ্যের নেতা সিরাজুল আলম খান।

শেখ মুজিবের সঙ্গে সিরাজুল আলম খানের যোগাযোগের মাধ্যম ছিলেন উভয়ের আস্থাভাজন একজন ব্যবসায়ী, সাইদুর রহমান। সিরাজুল আলম খানের আজিমপুরের বাসায় তাঁর হাতে লেখা খসড়াটি ওই বাসায়ই টাইপরাইটারে টাইপ করে শেখ মুজিবকে দিয়েছিলেন সাইদুর রহমান। ওই সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন জাসদ-ছাত্রলীগ এবং ঢাকা নগর বিপ্লবী

গণবাহিনীর নেতা রফিকুল ইসলাম ও আবুল হাসিব খান। ওই সময় শেখ মুজিবের সঙ্গে সরাসরি দেখা ও কথা হয়েছিল সিরাজুল আলম খানের। বিষয়টি সিরাজ সিকদারের নজরে এসে থাকতে পারে। সর্বহারা পার্টির ডিসেম্বরের ইশতেহারে এ ব্যাপারে ইঙ্গিত দিয়ে বলা হয় :

> সম্প্রতি দেখা যায় জাতীয় মুক্তি ও গণতন্ত্র কায়েম, অন্ন, বস্ত্র, চাকরি, বাসস্থান, চিকিৎসা ইত্যাদির সুনির্দিষ্ট ও ব্যাপক কর্মসূচি ছাড়াই বিভিন্ন রাজনৈতিক গ্রুপ তথাকথিত ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের চেষ্টা, পুরোনো দল ভেঙে দিয়ে নতুন দল গঠন ইত্যাদি তৎপরতা চালাচ্ছে। ... জাসদ ঐক্যের কথা বলে ঐক্যের চেষ্টাকে বানচাল করার জন্য একলা চলার নীতি অনুসরণ করছে। এভাবে সে নিজেকে ঐক্যবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীলদের স্বার্থ রক্ষাকারী শক্তি হিসেবে তুলে ধরেছে।

শেখ মুজিবের সঙ্গে সিরাজুল আলম খানের একটি বৈঠক হওয়ার কথা ছিল পঁচাত্তরের ২ জানুয়ারি। নতুন বছরের শুরুতেই পরিস্থিতি আচমকা পাল্টে যায়। বৈঠকটি স্থগিত করা হয়। সিরাজুল আলম খান কলকাতা চলে যান।

নক্ষত্রের পতন

১৯৭৫ সালের ৩ জানুয়ারি, শুক্রবার। সকালবেলা পত্রিকার পাতায় একটা সংবাদে চোখ আটকে গেছে সবার। *ইত্তেফাক*-এর প্রথম পাতায় দুই কলামে শিরোনাম, 'গ্রেপ্তারের পর পলায়নকালে পুলিশের গুলিতে সিরাজ সিকদার নিহত'। শিরোনামের নিচে এক কলামে সিকদারের একটা ছবি। ছাপানো সংবাদটি ছিল সরকারি প্রেসনোট। ছবিটিও প্রেসনোটের সঙ্গে পাঠানো—ম্লান, বিমর্ষ, বিধ্বস্ত একটি মুখচ্ছবি।

দৈনিক বাংলার সংবাদ শিরোনাম ছিল, 'সিরাজ সিকদার গ্রেপ্তার : পালাতে গিয়ে নিহত'। ২ জানুয়ারি গভীর রাতে পাওয়া পুলিশের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় :

> 'পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি' নামে পরিচিত আত্মগোপনকারী চরমপন্থী দলের নেতা সিরাজুল হক সিকদার ওরফে সিরাজ সিকদারকে পুলিশ গত ১ জানুয়ারি চট্টগ্রামে গ্রেপ্তার করে। সেই দিনই জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাকে ঢাকায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়।
>
> জিজ্ঞাসাবাদের সময় তিনি স্বীকারোক্তিমূলক বিবৃতি দেন এবং তার দলীয় কর্মীদের কিছু গোপন আস্তানা এবং তাদের বেআইনি অস্ত্রশস্ত্র এবং গোলাবারুদ দেখিয়ে দেওয়ার জন্য পুলিশের সাথে যেতে সম্মত হন। তদানুযায়ী গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে একদল পুলিশ যখন তাকে পুলিশ ভ্যানে করে গোপন আস্তানার দিকে নিয়ে যাচ্ছিল তখন তিনি সাভারের কাছে পুলিশের ভ্যান থেকে লাফিয়ে পড়েন এবং পালিয়ে যেতে চেষ্টা করেন। পুলিশ তার পলায়ন রোধের জন্য গুলিবর্ষণ করে। ফলে সিরাজ সিকদারের ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়।

সর্বশেষ

গ্রেফতারের পর পলায়নকালে পুলিসের গুলীতে সিরাজ সিকদার নিহত

গতকাল (বৃহস্পতিবার) শেষ রাত্রিতে প্রাপ্ত পুলিসের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানান হয় যে, 'পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি' নামে পরিচিত একটি গুপ্ত চরমপন্থী দলের নেতা সিরাজুল হক সিকদার ওরফে সিরাজ সিকদারকে পুলিস ১লা জানুয়ারী চট্টগ্রামে গ্রেফতার করেন। একটি



সিরাজ সিকদার নিহত হওয়ার খবর, ৩ জানুয়ারি ১৯৭৫, ইত্তেফাক

এ ব্যাপারে সাভার থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সিরাজ সিকদার তাঁর গোপন দলে একদল ডাকাতের সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন। এদের দ্বারাই তিনি গুপ্তহত্যা, থানা, বন বিভাগ দপ্তর, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ইত্যাদির ওপর হামলা, ব্যাংক লুট, হাটবাজার, লঞ্চ, ট্রেন ডাকাতি, রেললাইন উপড়ে ফেলে গুরুতর ট্রেন দুর্ঘটনা সংঘটন এবং জনসাধারণের কাছ থেকে জবরদস্তি টাকা আদায়—এ ধরনের উচ্ছৃঙ্খল অপরাধের মাধ্যমে শান্তি ও শৃঙ্খলাকে বিঘ্নিত করেছিলেন।

সিরাজ সিকদারের সমাহিত হওয়ার সংবাদ, ৪ জানুয়ারি ১৯৭৫, *গণকণ্ঠ*

খবরটি পাঠ করে অনেকেই চমকে উঠেছিল। তাদের চোখেমুখে অবিশ্বাস, সিরাজ সিকদার ধরা পড়তেই পারেন না। অনেকের মনেই স্বস্তি, যা হোক এতদিনে সন্ত্রাসীটার হিল্লে হলো। অনেকের মন ভার। তাদের কাছে তিনি স্বপ্নের নায়ক, এ যুগের রবিনহুড।

ওই দিন সিরাজ সিকদার ছিলেন টক অব দ্য টাউন। যারা সন্দেহের দোলাচলে ছিল, তা কেটে গেল পরদিন পত্রিকায় তাঁর মৃতদেহের ছবি দেখে। ৪ জানুয়ারি *দৈনিক বাংলায়* ছাপা হওয়া সংবাদে বলা হয় :

> আত্মীয়পরিজন পরিবেষ্টিত অবস্থায় গতরাতে প্রায় আটটার সময় উগ্রপন্থী গুপ্তদলের নেতা সিরাজ সিকদারকে মোহাম্মদপুর ঈদগাহ মাঠসংলগ্ন গোরস্তানে দাফন করা হয়েছে। তার বাবা জনাব আব্দুর রাজ্জাক সিকদার তার কবরের জন্য ওই সংরক্ষিত গোরস্তানে জমি কিনেছেন এবং তার অনুরোধে পুলিশ প্রহরায় তারই খরচে দাফনকার্য সম্পন্ন হয়। ঢাকার পুলিশ সুপার সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ খবর দেন।

> ময়নাতদন্তের স্থলে পুলিশ মৌখিকভাবে জানায় যে, ২ জানুয়ারি দিবাগত রাত সাড়ে তিনটার দিকে নিহত সিরাজ সিকদারের লাশ ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গে আনা হয়।

সিরাজ সিকদারের মৃত্যু নিয়ে পুলিশের প্রেসনোটে দেওয়া তথ্য অনেকেই বিশ্বাস করেনি। তাঁর ধরা পড়া ও মৃত্যু নিয়ে কয়েকটি ভাষ্য পাওয়া যায়। প্রথম ভাষ্যটি সাংবাদিক মাহফুজ উল্লাহর। ১৯ মে ১৯৭৮ সংখ্যা সাপ্তাহিক *বিচিত্রায়* 'সিরাজ সিকদার হত্যার নেপথ্য কাহিনী' শিরোনামে তাঁর একটি প্রতিবেদন ছাপা হয়। দ্বিতীয় ভাষ্যটি সর্বহারা পার্টির একসময়ের অ্যাকটিভিস্ট মুনীর মোরশেদের। ১৯৯৭ সালে প্রকাশিত *সিরাজ সিকদার ও পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি* ১৯৬৭-১৯৯২ বইয়ে তিনি এ বিষয়ে লিখেছেন। তৃতীয় ভাষ্যটি পাওয়া যায় বাংলাদেশের প্রথম পররাষ্ট্রসচিব এস এ করিমের *শেখ মুজিব : ট্রায়াম্ফ অ্যান্ড ট্র্যাজেডি* বইয়ে। চতুর্থ ভাষ্যটিতে কিছু ভিন্ন তথ্য পাওয়া যায়। এটি অবলুপ্ত রক্ষীবাহিনীর উপপরিচালক আনোয়ার উল আলমের। এ নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন এই বইয়ের লেখক।

২

মাহফুজ উল্লাহ

সিরাজ সিকদার কীভাবে গ্রেপ্তার হন এবং পুলিশি নিরাপত্তায় কীভাবে তাঁর মৃত্যু ঘটে, তার সঠিক ভাষ্য এখনো জানা যায়নি। কিন্তু বিভিন্ন সূত্রে আমরা যেসব তথ্য সংগ্রহ করেছি, তাঁকে নির্ভরযোগ্য মনে করেই আমরা তা প্রকাশ করছি।

১৯৭৫ সালের ১ জানুয়ারি দলের নেতৃত্বস্থানীয় কর্মীদের বৈঠকে যোগ দেওয়ার জন্য চট্টগ্রাম গিয়েছিলেন সিরাজ সিকদার। এর আগেই তিনি সংবাদ পেয়েছিলেন তাকে গ্রেপ্তার করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে।

চুয়াত্তরের ডিসেম্বরের শুরু থেকেই তাঁর দলের ওপর ব্যাপক বিপর্যয় নেমে আসছিল। হরতাল ডাকার কারণে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গ্রেপ্তার হয়ে যায় অনেক কর্মী। অপরদিকে, ১৯৭২ সালে দল পরিচালনার জন্য ছয়

সদস্যের যে কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়, ১৯৭৪ সালে তার অবস্থা দাঁড়ায় দুই সদস্যের কেন্দ্রীয় কমিটি। সেপ্টেম্বরে একজন সদস্য ব্যক্তিগত ব্যর্থতার কারণে কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে অপসারিত হলে অবশিষ্ট থাকেন শুধু সিরাজ সিকদার।

১৯৭৪ সালে দলের ব্যাপক বিকাশের সময় তাঁর দলে বহু অবাঞ্ছিত অনুপ্রবেশ ঘটে, যা পরবর্তী সময়ে তাঁর গ্রেপ্তারের কারণ হয়।

গ্রেপ্তারের আশঙ্কা আঁচ করতে পেরে এবং বিভিন্ন সূত্রে সে সংবাদ পেয়ে সিরাজ সিকদার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, ১৯৭৫ সালের ১৫ জানুয়ারি আরও গোপন স্থানে সরে যাবেন। তাঁর দলের অভিযোগ, ১৯৭৪ সালেই জনৈক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার ভাগনে এই দলের সদস্যপদ পায়। তার মাধ্যমে সিরাজ সিকদারকে পাঠানো সবগুলো সতর্কীকরণ চিঠি পুলিশের হাতে পৌঁছে যায়। এভাবেই পুলিশ জানতে পারে তাঁর ১ জানুয়ারির চট্টগ্রাম বৈঠকের কথা।

চট্টগ্রাম (হালিশহর) বৈঠকে আমন্ত্রিত সবাই উপস্থিত ছিলেন। বৈঠক শেষ হওয়ার আগে নিয়ম ভেঙে একজন সদস্য ঘুরে আসার কথা বলে বাইরে চলে যায়। সে আর ফিরে আসেনি। নিরাপত্তার কারণে সে বৈঠকে ঠিক করা হয়েছিল, সবার আগে সিরাজ সিকদার কুরিয়ারসহ বেরিয়ে যাবেন। সেই মোতাবেক মহসিনকে সঙ্গে নিয়ে সিরাজ সিকদার বেরিয়ে পড়েন।

কিছু দূর গিয়ে তাঁরা একটি বেবিট্যাক্সি ভাড়া করেন। এ সময় তাঁর পরনে ছিল ঘিয়া রঙের প্যান্ট, টেট্রনের সাদা ফুলশার্ট, চশমা এবং হাতে একটা ব্রিফকেস। যখন তাঁরা বেবিট্যাক্সিতে উঠেছেন, ঠিক সেই সময় একজন অপরিচিত ব্যক্তি তাঁদের কাছে লিফট চায়। সিরাজ সিকদার জানতে চান :

আপনি কোথায় যাবেন?

আমি সামনে নেমে যাব।

অন্য ট্যাক্সি দেখুন না?

আপনারা যদি আমাকে নিয়ে যান, তাহলে খুবই উপকার হয়।

এরপরই সে ট্যাক্সিতে চড়ে বসে।

পুলিশ আগের সংবাদ অনুযায়ী চট্টগ্রাম শহর থেকে হালিশহর পর্যন্ত পুরো রাস্তার ওপর কড়া নজর রেখেছিল। বেবিট্যাক্সি যখন নিউমার্কেটের (বিপণিবিতান) কাছে আসে, সেই অনাহূত সহযাত্রী ট্যাক্সি থামাতে বলেন। এ পর্যায়ে কথা-কাটাকাটি শুরু হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে সেই আগন্তুক লাফ

দিয়ে নেমে বেবিট্যাক্সির সামনে গিয়ে পিস্তল উঁচিয়ে ড্রাইভারকে থামতে বলে। ভয়ে ড্রাইভার গতি রোধ করে। সঙ্গে সঙ্গে চারপাশ থেকে স্টেনগান হাতে সাদাপোশাকের পুলিশ বেবিট্যাক্সি ঘেরাও করে ফেলে।

ঘটনার আকস্মিকতায় লোকজন জমে যায়। এক ভদ্রলোকের এই পরিণতির কারণ জানতে চাইলে জবাব দেওয়া হয়, 'সে একজন পলাতক কালোবাজারি। তাই তাকে এভাবে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে।' বেবিট্যাক্সি আটক করার পরই ছয়জন স্টেনগানধারীর একজন সিরাজ সিকদারের হাতে হাতকড়া পরিয়ে দেয় এবং চোখ বেঁধে ফেলে। সঙ্গী মহসিনেরও ঘটে একই পরিণতি।

গ্রেপ্তারের পর সিরাজ সিকদারকে নিয়ে যাওয়া হয় ডবলমুরিং থানায়। এই থানা থেকেই সব জায়গায় খবর পাঠানো হয়। সেদিন সন্ধ্যায় চট্টগ্রাম-ঢাকা বিমানে বন্দিদের জন্য জরুরি ভিত্তিতে আসন সংগ্রহ করা হয়।

সন্ধ্যা ৬টা ৪৫ মিনিটে যে বিমানে তাঁদের ঢাকায় নিয়ে আসা হয়, সে বিমানটি কক্সবাজার থেকে যাত্রী নিয়ে আসছিল। চট্টগ্রামে পৌঁছার পর নিয়ম ভেঙে ঢাকাগামী কয়েকজন যাত্রীকে নেমে যেতে বলা হয়।

যাত্রীরা নেমে গেলে একটি বিশেষ গাড়িতে করে বন্দিদের বিমানের কাছে নিয়ে আসা হয়। ককপিটের পরেই সামনের চারটি আসন তাঁদের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়। কিন্তু বিমান ছাড়ার সময় বিপত্তি দেখা দেয়। বিমানের পাইলট বন্দি অবস্থায় কোনো যাত্রীকে বহন করতে অস্বীকার করেন। কিছু বাগ্‌বিতণ্ডার পর বাংলাদেশ বিমানের সেই ফকার বিমানটি ঢাকার উদ্দেশে পাড়ি জমায়।

ঢাকা পৌঁছানোর পরপরই যাত্রীদের তড়িঘড়ি করে নামিয়ে দেওয়া হয়। তারপর বিমানটিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয় হ্যাঙ্গারের কাছে। সেখানে আগে থেকেই পেছনের গেট দিয়ে আসা পুলিশ অপেক্ষা করছিল।

বিমান থেকে নামার সময় পুলিশের জনৈক ইন্সপেক্টর হঠাৎ দৌড়ে এসে সিরাজ সিকদারের বুকে লাথি মেরে চিৎকার করে ওঠে, 'হারামজাদা, তোর বিপ্লব কোথায় গেল?' এ পর্যায়ে উপস্থিত অন্য পুলিশ কর্মকর্তারা হস্তক্ষেপ করে নতুন আক্রমণের হাত থেকে সিরাজ সিকদারকে রক্ষা করে এবং মন্তব্য করে, 'এত অস্থির হচ্ছ কেন কা ... ঘরে নিয়েই আমরা দেখে নেব।'

বিমান থেকে সিরাজ সিকদারকে সোজা নিয়ে যাওয়া হয় স্পেশাল ব্রাঞ্চ অফিসে। সেখানে 'পাগলা ঘন্টি' বাজিয়ে সবাইকে সতর্ক করে দেওয়া হয়।

সর্বত্র একটা সাড়া পড়ে যায়। কয়েকশ পুলিশ স্পেশাল ব্রাঞ্চের অফিস ঘিরে ফেলে। এ বক্তব্য সে সময় আটক এক রাজনৈতিক কর্মীর।

সিরাজ সিকদারকে যখন গাড়িতে করে নিয়ে আসা হয়, তখন সামনে-পেছনে ছিল কড়া পাহারা। জানা যায়, সাইরেন বাজিয়ে রাস্তার লোকজন সরিয়ে দেওয়া হয়। স্পেশাল ব্রাঞ্চ অফিসে নিরাপত্তার দায়িত্ব দেওয়া হয় 'কমিউনিস্ট টাস্কফোর্স' এবং রক্ষীবাহিনীর ওপর।

স্পেশাল ব্রাঞ্চে নিয়ে আসার পর সেখানে কর্তাব্যক্তিদের ভিড় বেড়ে যায়। সবাই এই মূল্যবান বন্দিকে একনজর দেখতে চায়। কিন্তু নিরাপত্তার কারণে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ডেপুটি সেক্রেটারি বা পুলিশের সুপারিনটেনডেন্ট পদমর্যাদার নিচে কাউকে দেখার অনুমতি দেওয়া হয়নি বলে পুলিশের নিম্নপর্যায়ের কর্মীরা অভিযোগ করেন।

গ্রেপ্তার সত্ত্বেও পুলিশের লোকজন প্রাথমিক পর্যায়ে তাঁর পরিচিতি সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হতে পারেনি। তাই স্পেশাল ব্রাঞ্চে আটক তাঁর দলীয় কয়েকজন কর্মীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।

প্রাথমিক হেফাজতেই তাঁর ওপর চালানো হয় অত্যাচার। অত্যাচার করে কথা বের করতে না পেরে শুরু হয় কথোপকথন :

আপনি কি জানেন আপনার শেষ পরিণতি কী?

আমি জানি। একজন দেশপ্রেমিকের পরিণতি কী হতে পারে তা ভালোভাবেই জানা আছে আমার।

আমরা আপনাকে শেখ সাহেবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে বলব।

জাতীয় বিশ্বাসঘাতকের কাছে একজন দেশপ্রেমিক ক্ষমা চাইতে পারে না।

তাহলে আপনাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে।

সে মৃত্যুকেই আমি গ্রহণ করব। সে মৃত্যু দেশের জন্য মৃত্যু, গৌরবের মৃত্যু।

কথোপকথন রেকর্ডকৃত ভাষ্যে নয়। কিন্তু নির্ভরযোগ্য মহল যা জানিয়েছে তার মর্মার্থ এই।

এ পর্যায়ে উপস্থিত পুলিশের জনৈক ঊর্ধ্বতন কর্তার কাছে নির্দেশ আসে। সঙ্গে সঙ্গে পাততাড়ি গোটানোর পালা শুরু হয়ে যায়। কোথায় যেতে হবে জানেন শুধু কয়েকজন। রাতের দিকে চলতে থাকে এক সাঁজোয়া বাহিনী। এবারের গন্তব্যস্থল গণভবন। সেখানে প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীসহ বেশ কিছু

লোক অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন ।

রাত সাড়ে দশটায় পেছনে হাত বাঁধা অবস্থায় সিরাজ সিকদারকে হাজির করা হয় শেখ মুজিবের সামনে। তাঁকে দাঁড় করিয়ে রেখেই প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিব তখন আলাপে ব্যস্ত ছিলেন তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারির সঙ্গে। এ সময় সিরাজ সিকদার প্রশ্ন করেন, রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে কাউকে বসতে বলার সৌজন্যবোধ কি আপনার নেই?

সঙ্গে সঙ্গে পেছন থেকে একজন পুলিশ সুপার এগিয়ে এসে পিস্তলের বাঁট দিয়ে তাঁর মাথায় আঘাত করেন। গণভবনে কথা-কাটাকাটির পর তাঁকে নিয়ে যেতে বলেন শেখ মুজিব। রাত তখন বারোটা।

মধ্যরাতেই শোরগোল বেঁধে যায় শেরেবাংলা নগরের তৎকালীন রক্ষীবাহিনী হেডকোয়ার্টারে। তাড়াহুড়ো করে সেখানে আটক অন্য বন্দিদের অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হয়। সমগ্র এলাকা আলোকিত করে জ্বালিয়ে দেওয়া হয় সার্চলাইট। পুরো এলাকা কর্ডন করে ফেলে রক্ষীবাহিনী। সবার মুখে গুঞ্জন, ফিসফিসানি। তখন কেউ জানে না কাকে নিয়ে আসা হচ্ছে।

রাত সোয়া বারোটায় তৎকালীন রক্ষীবাহিনী প্রধান অপারেশন প্রধানসহ হেডকোয়ার্টারে আসেন। এসেই ব্যাটালিয়ন কোয়ার্টারগার্ড থেকে সিরাজ সিকদারের দলের দুজন নেতৃস্থানীয় কর্মীকে হেডকোয়ার্টার গার্ডে সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেন।

রাত সাড়ে বারোটায় মহসিনসহ সিরাজ সিকদারকে নিয়ে আসা হয় রক্ষীবাহিনী হেডকোয়ার্টারে। তারপরই একজনকে আরেকজনের কাছ থেকে আলাদা করে নেওয়া হয়।

রক্ষীবাহিনীর হেডকোয়ার্টারে নিরাপত্তার দায়িত্ব দেওয়া হয় পুলিশের বিশেষ টিম এবং রক্ষীবাহিনীর ১১ ব্যাটালিয়নের এসপি কোম্পানির ওপর। পরবর্তী প্রহরগুলোয় তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো ঘটনা ঘটেনি। ২ জানুয়ারি ভোর পর্যন্ত অভুক্ত অবস্থায় তাঁকে রক্ষীবাহিনীর হেডকোয়ার্টারে আটক রাখা হয়।

২ জানুয়ারি সকালে কড়া পাহারায় সিরাজ সিকদারকে সাভারে নিয়ে যাওয়া হয়। চারটি ডজ গাড়ি ও একটি টয়োটা গাড়ি তাঁকে অনুসরণ করে। সাভারে তৎকালীন রক্ষীবাহিনী ক্যাম্পে তাঁকে সারাদিন রেখে দেওয়া হয়। সন্ধ্যার পর পুলিশের কয়েকজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা সেখানে উপস্থিত হন।

রাত নয়টার দিকে তাঁকে নিয়ে আসা হয় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরেকটু এদিকে। সেখানে হাত বেঁধে রাস্তার ওপর দাঁড় করিয়ে গুলি করা হয় বলে অনুমান করা হয়।

পার্শ্ববর্তী এলাকায় যাঁরা গুলির শব্দ শুনেছেন তাঁদের কেউ ভয়ে বের হননি। ভেবেছেন সে সময়ের নিত্যদিনের মতোই একটি ঘটনা। পরদিন অনেকেই রাস্তার ওপর দেখেছেন জমাট বাঁধা রক্তের দাগ।

মৃত্যুর পর তাঁর লাশ নিয়ে আসা হয় স্পেশাল ব্রাঞ্চে। সেখান থেকে নেওয়া হয় কন্ট্রোল রুমে। তারপর পাঠানো হয় মর্গে।

৩ জানুয়ারি বেলা সোয়া একটায় হাসপাতালের মর্গ থেকে দাফনের জন্য তাঁর লাশ নিয়ে যাওয়া হয় আজিমপুরে। কর্তৃপক্ষ সাধারণ কবরে দাফন করার ব্যবস্থা করেছিল। এতে সিরাজ সিকদারের পিতা আব্দুর রাজ্জাক সিকদার ক্ষুব্ধ হন। তিনি হুমকি দিয়ে বলেন, 'কবরের জন্য জায়গা কিনতে না পারলে আমি অস্বীকার করব এ লাশ আমার ছেলের নয়।' বাধ্য হয়ে কর্তৃপক্ষ নতি স্বীকার করে। ঠিক হয় মোহাম্মদপুর কবরস্থানে কবর হবে, কিছু পুলিশ পাহারা থাকবে এক মাস।

৩

মুনীর মোরশেদ

চট্টগ্রামের হালিশহর থেকে যে রাস্তাটি কর্ণফুলী মার্কেটের দিকে গেছে, সে রাস্তার ধারে সর্বহারা পার্টির চারটি গুরুত্বপূর্ণ শেল্টার ছিল। একটিতে থাকতেন সর্বহারা পার্টির চট্টগ্রাম শহরের পরিচালক ইব্রাহিম। দ্বিতীয় শেল্টারে থাকতেন সিরাজ সিকদার, কেন্দ্রীয় হিসাবরক্ষক আকবর এবং কেন্দ্রীয় স্টাফ মাসুদ মালেক, নজরুল ও জাহানারা বেগম। তৃতীয় শেল্টারে থাকতেন চট্টগ্রাম জেলার (শহর ব্যতীত) পরিচালক ইকরাম। চতুর্থ শেল্টারে থাকতেন চট্টগ্রাম রিলে সেন্টারের পরিচালক খলিল। যাঁরা এই শেল্টারগুলো ব্যবহার করতেন, যাতায়াতের সময় নিরাপত্তাজনিত কারণে তাঁরা সোজা পথ ব্যবহার না করে নিউমার্কেট হয়ে দেওয়ানহাটের মোড় ঘুরে শেখ মুজিব রোড দিয়ে নির্দিষ্ট শেল্টারে যেতেন। গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল পরিচালকরা চট্টগ্রামে এলে সাধারণত

ইকরামের শেল্টারে উঠতেন। জিয়াউদ্দিন ইকরামের শেল্টারটি ব্যবহার করতেন এবং জাহানারাও এই শেল্টারে আসা-যাওয়া করতেন।

হরতাল-পরবর্তী পরিস্থিতি পর্যালোচনা ও পার্টির কর্মপদ্ধতি নিয়ে আলোচনার উদ্দেশ্যে ১ নং সামরিক সাহায্যকারী মতিন চুয়াত্তরের ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে চট্টগ্রামে আসেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন চট্টগ্রামে নিয়োগ পাওয়া ঝুমা। তাঁদের ওঠার কথা ইকরামের শেল্টারে। কিন্তু বাসা খুঁজে না পেয়ে তাঁরা চট্টগ্রামের কর্মী কামরুলের মাধ্যমে রেলস্টেশনের কাছে একটা বাসায় ওঠেন। পরে যোগাযোগ করে তাঁদের ইকরামের বাসায় নিয়ে যাওয়া হয়।

চট্টগ্রামে কয়েকদিন ধরে সিরাজ সিকদারের সঙ্গে মতিনের বৈঠক চলছিল। ১ জানুয়ারি ইকরামের শেল্টারে তাঁদের শেষ বৈঠক হওয়ার কথা। শেষ বৈঠক হওয়ায় তাতে শিথিলতা ছিল। কেউ কেউ আসা-যাওয়ার মধ্যে ছিলেন।

বৈঠকে মতিনকে ময়মনসিংহের অঞ্চল পরিচালকের দায়িত্ব দেওয়া হয়। জিয়াউদ্দিন ময়মনসিংহ থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে বদলি হওয়ায় ময়মনসিংহ এতদিন কেন্দ্র থেকে পরিচালিত হচ্ছিল। ১ জানুয়ারি দ্রুত বৈঠক শেষ করে মতিনের ময়মনসিংহে যাওয়ার তাড়া ছিল।

ইকরামের শেল্টারে সিকদারের সঙ্গে মতিনের বৈঠক শুরু হওয়ার আগে রিলে সেন্টারের পরিচালক খলিল আসেন। তিনি মতিনকে বলেন রিপন ওরফে লিটনের সঙ্গে একটি প্রোগ্রামে দেখা করতে। প্রোগ্রামটি ছিল ঝাউতলা স্টেশনে। রিপন ঢাকা অঞ্চলের সার্বক্ষণিক কর্মী। মতিন প্রোগ্রামে গিয়ে রিপনকে না পেয়ে শেল্টারে ফিরে আসেন। ততক্ষণে সিকদার এবং কেন্দ্রীয় স্টাফ মাসুদ এসে গেছেন। শেল্টারে আরও উপস্থিত ছিলেন ইকরাম, ঝুমা, আকবর এবং কমবয়সী একজন জাতিগত সংখ্যালঘু পার্টিকর্মী।

সিকদারের সঙ্গে মতিনের বৈঠক চলাকালে মাসুদ বেরিয়ে যান। কিছুক্ষণের মধ্যে খলিল আসেন। খলিল দুপুরে আতিক ও ময়মনসিংহের নেতৃস্থানীয় কর্মী বাচ্চুর সঙ্গে প্রোগ্রাম দেন মতিনকে। এর মধ্যে ইকরাম এবং একটু পরে খলিল বেরিয়ে যান।

সিকদারের সঙ্গে মতিনের বৈঠক চলে দুপুর বারোটা পর্যন্ত। একটার মধ্যে আতিক ও বাচ্চুর সঙ্গে প্রোগ্রাম ধরার জন্য মতিন আকবরকে নিয়ে একটি বেবিট্যাক্সিতে ওঠেন। আকবর দেওয়ানহাটের মোড়ে নেমে তাঁর শেল্টারে চলে যান।

আতিকের সঙ্গে মতিনের প্রথম প্রোগ্রামটি ছিল রিয়াজউদ্দিন বাজারে। সেখানে আতিককে না পেয়ে বাচ্চুর সঙ্গে চট্টগ্রাম রেলস্টেশনে যান দ্বিতীয় প্রোগ্রামটির জন্য। বাচ্চু তাঁর ময়মনসিংহ যাওয়ার সব ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। তিনি জানালেন, ট্রেন ছাড়বে বেলা সাড়ে তিনটায়। কিছুটা সময় হাতে পাওয়ায় মতিন ফিরে আসেন ইকরামের শেল্টারে। ইকরাম তখন সেখানে ছিলেন। কিছুক্ষণ পর আকবর আসেন কিছু কাগজপত্র নিয়ে। সিকদার ও আকবর মতিনের ব্যাগ গুছিয়ে দেন। মতিন ও ইকরাম খেতে বসেন। মতিনকে স্টেশনে পৌঁছে দেওয়ার জন্য ইকরামকে নির্দেশ দেন সিকদার। মতিনকে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে আকবরকে নিয়ে সিকদার বেরিয়ে যান। পরে ইকরাম মতিনকে স্টেশনে পৌঁছে দেন। বাচ্চুকে নিয়ে মতিন ট্রেনে ওঠেন। ট্রেন ছেড়ে দেয়।

ইকরামের শেল্টার থেকে বেরিয়ে ঘুরপথে নিজের শেল্টারে যাওয়ার জন্য আকবরকে নিয়ে সিকদার একটা বেবিট্যাক্সিতে ওঠেন। ঠিক তখনই অপরিচিত এক ব্যক্তি বলে যে সে সামনেই নেমে যাবে। সিকদার তাকে অন্য ট্যাক্সি দেখার কথা বললে সে তার স্ত্রীর গুরুতর অসুখের কথা বলে তাকে নিয়ে যেতে অনুরোধ করে। সিকদার তাকে ট্যাক্সিতে তোলেন।

পরে জানা যায়, একটি 'বিশেষ সংবাদের' ভিত্তিতে সেদিন চট্টগ্রামে শত শত গোয়েন্দা মোতায়েন ছিল। বেবিট্যাক্সি নিউমার্কেটের কাছে এলে ওই ব্যক্তি ড্রাইভারকে ধমক দিয়ে গাড়ি থামাতে বলে। তার সঙ্গে সিকদারের কথা-কাটাকাটি হয়। ওই ব্যক্তি লাফ দিয়ে নেমে ড্রাইভারের দিকে পিস্তল ধরলে ড্রাইভার গাড়ি থামায়। সঙ্গে সঙ্গে নিউমার্কেটের চারপাশে অপেক্ষমাণ সাদাপোশাকের পুলিশ স্টেনগান উঁচিয়ে গাড়িটি ঘিরে ফেলে।

(এরপর ২ জানুয়ারি পর্যন্ত যা যা ঘটেছে, তা মাহফুজ উল্লাহর দেওয়া ভাষ্যের অনুরূপ। একটাই পার্থক্য, সিকদারের সঙ্গে গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিটি আকবর। মাহফুজ উল্লাহর বয়ানে তাঁর নাম মহসিন বলে উল্লেখ করা হয়েছে।)

মুনীর মোরশেদের দেওয়া বিবরণে বলা হয়, সাভারে রক্ষীবাহিনীর ক্যাম্পে সিকদারকে সারা দিন ইলেকট্রিক শক দেওয়া হয়। সিকদারের পিতার অভিমত ছিল, ইলেকট্রিক শকেই তাঁর মৃত্যু ত্বরান্বিত হয়। তাঁর শরীরে নীল নীল ছাপ ছিল। ছিল পাঁচটি বুলেটের চিহ্ন, যার মধ্যে চারটি বুলেট শরীর ভেদ করে গিয়েছিল।

৪

এস এ করিম

সিরাজ সিকদার কখন কোথায় থাকেন খুব কম লোকই জানে। এদের একজন 'কর্তৃপক্ষে'র কাছে সিকদারের চেহারার বর্ণনা এবং চট্টগ্রামে তাঁর শেল্টারের ঠিকানা লিখে বেনামী একটা চিঠি পাঠায় চুয়াত্তরের ডিসেম্বরে। পুরস্কারের আশায় নয় বরং সিকদারের প্রতি ক্ষোভ থেকেই চিঠিটি লেখা হয়েছিল। সিকদার কোথায় থাকেন এটা যাঁরা জানেন, তাঁদের একজন তাঁর সাবেক স্ত্রী জাহানারা হাকিম, তাঁর স্ত্রী এবং আরও দুজন নারী, যাঁরা ঘরের কাজ করতেন। সুন্দর হস্তাক্ষরে চিঠিটি লেখা হয়েছিল। মনে হতে পারে এটি মেয়েলি হাতের লেখা। এ ব্যাপারে জাহানারা হাকিমকে সন্দেহ হতে পারে। অথবা সিকদারের ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে অন্য কোনো সহকর্মীও এটা লিখে থাকতে পারেন।

পুলিশ সংঘর্ষ এড়াতে সিকদারের শেল্টারে হামলা চালায়নি। তারা শেল্টারের বাইরে অপেক্ষা করছিল, কখন তিনি বেরিয়ে আসবেন। সিকদার সহকর্মীদের দিনের আলোয় শেল্টারের বাইরে না যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে থাকেন। নিয়ম ভেঙে তিনি নিজেই দিনের বেলা বের হন এবং সাদাপোশাকে থাকা গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের নজরে পড়েন। তাঁকে ধরে সঙ্গে সঙ্গেই ডবলমুরিং থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। খবর দেওয়া হয় ঢাকায় পুলিশের সদর দপ্তরে। ঢাকা থেকে নির্দেশ আসে, যে বিমানটি সবার আগে ঢাকায় যাবে, সেই বিমানে যেন সিকদারকে ঢাকায় পাঠানো হয়। তাঁকে হাতকড়া পরিয়ে এবং চোখ বেঁধে পুলিশ পাহারায় বিমানে তোলা হয়। বিমানটি ঢাকায় নামে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায়।

সিকদারকে গ্রেপ্তার করে ঢাকায় নিয়ে আসার খবর পুলিশের ডিআইজি ই এ চৌধুরী ব্যক্তিগতভাবে শেখ মুজিবকে জানান। ১ জানুয়ারি সন্ধ্যায় তিনি গণভবনে যান। সেখানে প্রধানমন্ত্রীর অফিসের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন, কীভাবে সিকদারের বিষয়টি সামাল দেওয়া করা হবে। সেখানে আরও উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মনসুর আলী এবং পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা নুরুল ইসলাম। তাঁরা মনে করলেন, সিকদারকে পুলিশ হেফাজতে

রাখা নিরাপদ হবে না। এরপর তাঁকে মালিবাগের স্পেশাল ব্রাঞ্চের অফিস থেকে শেরেবাংলা নগরে রক্ষীবাহিনীর হেফাজতে পাঠানো হয়।

মুনীর মোরশেদ তাঁর বইয়ে দাবি করেছেন, সিকদারকে রাত দশটার দিকে গণভবনে শেখ মুজিবের সামনে হাজির করা হয়। সেখানে তীব্র বাদানুবাদের পর তাঁকে রক্ষীবাহিনীর কাছে পাঠানো হয়। তখন থেকে তিনি শেরেবাংলা নগরে রক্ষীবাহিনীর হেফাজতে ছিলেন। তাঁর দেওয়া তথ্য ই এ চৌধুরীর দেওয়া তথ্যের সঙ্গে মেলে না, বিশেষ করে তাঁরা যে সময়ের কথা বলেছেন। ই এ চৌধুরীর ভাষ্যমতে, সিকদারকে এর আগেই সন্ধ্যায় প্রথম প্রহরে রক্ষীবাহিনীর কাছে হস্তান্তর করা হয়েছিল। মুনীর মোরশেদ তাঁর দেওয়া তথ্যের কোনো সূত্র উল্লেখ করেননি। প্রধানমন্ত্রীর অফিসের কেউই সিকদারের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর কথা-কাটাকাটির তথ্যটি নিশ্চিত করেননি।

এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর নবনিযুক্ত সচিব রহিম সঠিক তথ্য দিতে পারবেন বলে মনে হয়, যদিও তিনি সন্ধ্যার আগেই অফিস ছেড়ে বাসায় চলে গিয়েছিলেন। তিনি তাঁর ডায়েরিতে এ বিষয়ে কিছু লেখেননি। তবে ডায়েরিতে তিনি উল্লেখ করেছেন, এনএসআইয়ের পরিচালক মেসবাহউদ্দিন পরদিন সকালে শেখ মুজিবের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন এবং তিনিও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সিকদারের বিষয়টি আইনানুগভাবে নিষ্পত্তির ব্যাপারটি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে বলেন মেসবাহউদ্দিন। মুজিব ইংরেজিতে বলেছিলেন, লিভ ইট টু মি (এটা আমার হাতে ছেড়ে দিন)। সিকদারের কাছে অনেক তথ্য ছিল। তাঁর কাছ থেকে কিছু তথ্য বের করার আগে তাঁকে বিচারে সোপর্দ করার ব্যাপারে মুজিবের তাড়াহুড়ো ছিল না। এ কারণেই হয়তো সিকদারকে জিজ্ঞাসাবাদ করার দায়িত্ব পুলিশ সুপার মাহবুবকে (মাহবুবউদ্দিন আহমদ) দেওয়া হয়। মাহবুব যাঁদের গণদুশমন মনে করতেন, তাঁদের সঙ্গে বিধি অনুযায়ী ভদ্রভাবে আচরণ করার খ্যাতি তাঁর ছিল না।

কঠোর জিজ্ঞাসাবাদের একপর্যায়ে সিকদার সম্ভবত ভেঙে পড়েন এবং অস্ত্রশস্ত্র লুকানো আছে এমন জায়গায় পুলিশকে নিয়ে যেতে রাজি হন। সরকারি ভাষ্য অনুযায়ী, তিনি সাভারের একটা জায়গায় পুলিশকে নিয়ে যান। সেখানে পুলিশের গাড়ি থেকে লাফিয়ে পালানোর চেষ্টা করলে পুলিশের গুলিতে নিহত হন।

সিকদারের মরদেহ দাফন করার জন্য তাঁর মা-বাবার কাছে হস্তান্তর করা হয়। যে পরিস্থিতিতে সিকদার নিহত হন, এ নিয়ে তাঁরা কোনো উচ্চবাচ্য করেননি। দাফনের কয়েকদিন পর সিকদারের বোন উদীয়মান ভাস্কর শামীম সিকদারের কাজের একটি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় ঢাকায়। সেখানে বেশ মর্যাদার সঙ্গেই শেখ মুজিবের একটি আবক্ষ মূর্তি রাখা হয়। অনেক পরে তিনি বলতে শুরু করেন, তাঁর ভাইকে পুলিশ ঠান্ডা মাথায় খুন করেছে। তিনি এর তদন্ত দাবি করেন।

ইতিমধ্যে বুদ্ধিজীবী মহলের কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করেন যে মুজিবের নির্দেশেই সিকদারকে হত্যা করা হয়েছে। তাঁদের এই ধারণার কারণ হলো, পঁচাত্তরের ২৫ জানুয়ারি জাতীয় সংসদে মুজিব বলেছিলেন, 'কোথায় আজ সিরাজ সিকদার?' এই 'স্বীকারোক্তির' মাধ্যমে সিকদার হত্যার দায় মুজিব নিজের কাঁধে নিয়েছিলেন বলে অনেকের অভিযোগ। মুজিব কোন পরিপ্রেক্ষিতে এই কথা বলেছিলেন, এটা তাঁরা খতিয়ে দেখেন না। মুজিব ওইদিন দেড় ঘণ্টা বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তাঁর প্রাসঙ্গিক কথাগুলো ছিল এরকম :

> দুনিয়ার ইতিহাস পড়ুন। বিপ্লবের পরে যারা বিপ্লবকে বাধা দিয়েছে, যারা শত্রুদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছে, যারা দেশের মানুষকে হত্যা করেছে, কোনো দেশ তাদের ক্ষমা করে নাই। কিন্তু আমরা করেছিলাম। সবাইকে ক্ষমা করেছিলাম। বলেছিলাম, দেশকে ভালোবাস, দেশের জন্য কাজ করো, স্বাধীনতাকে গ্রহণ করে নাও। থাকো। কিন্তু অনেকের পরিবর্তন হয় নাই। তারা গোপনে বিদেশিদের কাছ থেকে পয়সা এনে বাংলার স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। তারা মনে করে যে খবর রাখি না। এত বড় তারা ব্যান্ডিট। মানুষকে রাতের অন্ধকারে হত্যা করে মনে করে যে তাকে কেউ ধরতে পারবে না।
>
> কোথায় সিরাজ সিকদার? তাকে যদি ধরা যায়, আর তার যে দলবল, তাদের যদি ধরা যায়, ধরতে পারব না কোন অফিসে কে ঘুষ খান? ধরতে পারব না কে অন্ধকারে বিদেশের থেকে পয়সা খান? ধরতে পারব না কোথায় পয়সা লুট করেন? ধরতে পারব না কোথায় কারা হোর্ডার আছেন? ধরতে পারব না কারা ব্ল্যাক মার্কেটিয়ার আছেন? নিশ্চয় ধরতে পারব।

খোলামনে এই কথাগুলো পড়লে নিশ্চিতভাবে বলা যাবে না যে সিকদার হত্যার দায় নিচ্ছেন মুজিব। তাঁর বক্তৃতার মূল বিষয় ছিল, সিকদারের মতো আত্মগোপনকারীকে যদি ধরা যায়, তাহলে অন্যান্য সমাজবিরোধী ও দেশবিরোধী—যাদের মধ্যে আছে কালোবাজারি, লুটেরা, মজুতদার ও খুনি—তারা কেউ আইনের হাত থেকে রেহাই পাবে না।

এনএসআইয়ের প্রধান মেসবাহউদ্দিনকে বলা মুজিবের কথা (লিভ ইট টু মি) শুনে ধারণা হয় যে তিনি সিকদারের বিচারের ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করতে চাননি। তার মানে এই নয় যে বিচার করার মতো যথেষ্ট অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে ছিল না। তাঁর বিরুদ্ধে অনেক প্রমাণিত অভিযোগ ছিল। কিন্তু একটা বড় রকমের দুর্ভিক্ষে বিপর্যস্ত পরিস্থিতিতে মুজিব তাঁর বিরুদ্ধে আদালতে যাওয়া সমীচীন মনে করেননি। তাহলে মুজিবের শাসনামলে মানুষের দুর্দশার কথা বলার একটা সুযোগ পেয়ে যেত সিকদার। পরে একটা উপযুক্ত সময়ে বিচারের কাজ শুরু করা যেত। ততদিনে জিজ্ঞাসাবাদ করে তাঁর কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করা যেত।

মুজিব আপাদমস্তক একজন রাজনীতিবিদ। রাজনৈতিক বৈরিতা থেকে একজন বীর হয়ে উঠতে পারেন, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে এটা জানতেন তিনি। তার মানে এই নয় যে সিকদারের মৃত্যুর সঙ্গে মুজিব সরাসরি যুক্ত ছিলেন। নিরাপত্তা হেফাজতে মারা যাওয়ার কারণ হতে পারে তিনি পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, অথবা পুলিশ অতি-উৎসাহী হয়ে অথবা আইনি পদ্ধতিতে বিচার এড়ানোর জন্য তাঁকে মেরে ফেলেছে। উন্মুক্ত বিচার হলে সিকদার অভিযোগ করতে পারেন যে তাঁর ওপর নির্যাতন চালানো হয়েছে। সে ক্ষেত্রে তাঁকে নির্যাতনকারী কর্মকর্তারা অভিযুক্ত হতে পারতেন।

শেখ মুজিবের মেয়ে শেখ হাসিনা দাবি করেছেন, সিরাজ সিকদারের মৃত্যুর খবর যখন তাঁর বাবাকে দেওয়া হয়, তখন তিনি ওই বাসায় ছিলেন। তাঁর বাবা প্রচণ্ড রেগে গিয়ে বলেছিলেন, 'তোরা ওকে বাঁচাতে পারলি না!' আমি বিশ্বস্ত একজনের কাছে একটি ভিন্ন রকম কথা শুনেছিলাম। তিনি খবরটি শুনে রেগে যাননি, বরং বিচলিত হয়ে বলেছিলেন, 'তোরা ওকে মেরে ফেললি!'

এর যে কোনোটিই সত্য হোক না কেন, দুটি বক্তব্যের মধ্যে মিল আছে। সিরাজ সিকদারের মৃত্যুর খবর শুনে মুজিব বিস্মিত হয়েছিলেন এবং যেভাবে

তিনি মারা গেলেন, সেই পদ্ধতি তিনি অনুমোদন করেননি। তবে মুজিব তাঁর অনুগত কর্মকর্তাদের তদন্তের মধ্যে ফেলে বিব্রত করতে বা তাঁদের ক্যারিয়ার নষ্ট করতে চাননি। বরং অভিযোগের সন্দেহ যেচে নিজের ঘাড়ে নিয়েছিলেন।

পুলিশ সুপার মাহবুব সিকদারের রহস্যজনক মৃত্যুর ব্যাপারে ধোঁয়াশা দূর করতে পারতেন। সরকারি পদের কারণে তিনি সিকদারের মৃত্যুর পূর্বাপর জানতেন। একজনের মাধ্যমে খোঁজ নিয়ে আমি একটি সাক্ষাৎকারের জন্য তাঁকে অনুরোধ জানিয়েছিলাম। আমি বলেছিলাম, শেখ মুজিবের একটি জীবনীগ্রন্থ লেখার কারণেই তাঁর সঙ্গে কথা বলা দরকার। তিনি রাজি হন। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে তিনি আসেননি। তিনি কি আশঙ্কা করেছিলেন যে কীভাবে সিকদারের মৃত্যু হলো সে ব্যাপারে আমি তাঁকে প্রশ্ন করব এবং এতে তাঁর ভূমিকার কথা জানতে চাইব?

৫

আনোয়ার উল আলম

পুলিশ সিরাজ সিকদারকে গ্রেপ্তার করে চট্টগ্রামে। সেখান থেকে তাদের তত্ত্বাবধানে তাঁকে ঢাকায় আনা হয় এবং পুলিশ হেফাজতে হোয়াইট হলে রাখা হয়। শান্তিনগর চৌরাস্তা থেকে রাজারবাগ পুলিশ লাইনে যাওয়ার পথে বাঁ পাশে হোয়াইট হল নামের একটি ভবনে সিআইডি ও পুলিশের কার্যালয় ছিল। ১৯৭৫ সালের ১ জানুয়ারি সকালবেলা শেরেবাংলা নগরে অবস্থিত আমাদের অফিসে এসে জানতে পারি, মধ্যরাতে সিরাজ সিকদারকে আমাদের অফিসার্স মেসে আনা হয়েছে। খবরটা পেয়েই আমি সহকর্মী সারোয়ার হোসেন মোল্লার সঙ্গে ঘটনাটি নিয়ে কথা বলি। আলোচনার পর দুজন একমত হই, সিরাজ সিকদারকে রক্ষীবাহিনীর অফিসার্স মেসে রাখা ঠিক হবে না। আমরা দুজন একসঙ্গে আমাদের পরিচালক এ এন এম নূরুজ্জামানের অফিসকক্ষে যাই। পরিচালককে আমরা বলি, সিরাজ সিকদারকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে, সেজন্য তাঁকে পুলিশের হেফাজতেই রাখা হোক। আমাদের এখানে নয়। রক্ষীবাহিনীকে নিয়ে এমনিতেই সমালোচনার

শেষ নেই। তার ওপর যাঁকে আমরা গ্রেপ্তার করিনি তাঁর দায়িত্ব কেন নেব। উত্তরে পরিচালক এ এন এম নূরুজ্জামান বলেন, স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডিআইজি ই এ চৌধুরীর অনুরোধে তিনি সিরাজ সিকদারকে এখানে রাখার অনুমতি দিয়েছেন। কারণ সিরাজ সিকদারের মতো সর্বহারা পার্টির একজন দুর্ধর্ষ নেতাকে হোয়াইট হলে রাখা নিরাপদ নয়।

পুলিশের বেশির ভাগ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাই তখন পুলিশের চেয়ে রক্ষীবাহিনীর ওপর বেশি ভরসা করতেন, বিশেষ করে সিরাজ সিকদারের মতো বড় সর্বহারা নেতাকে নিরাপদে রাখার ব্যাপারে। সারোয়ার ও আমি দুজনই জোর দিয়ে পরিচালককে বলি, সিরাজ সিকদারকে রক্ষীবাহিনীর অফিসার্স মেসে রাখা ঠিক হবে না। এ এন এম নূরুজ্জামান আমাদের কথা দেন, তিনি ই এ চৌধুরীর সঙ্গে কথা বলবেন এবং সিরাজ সিকদারকে অন্য কোথাও স্থানান্তরের অনুরোধ করবেন।

পরিচালকের সঙ্গে কথা বলে সারোয়ার ও আমি রক্ষীবাহিনীর অফিসার্স মেসে সিরাজ সিকদারকে দেখতে যাই। সেখানে তিনি পুলিশের পাহারাতেই ছিলেন। নির্দিষ্ট কক্ষে গিয়ে দেখি, সিরাজ সিকদার মাটিতে বসে আছেন। একটা টেবিলে তাঁকে সকালের নাশতা দেওয়া হয়েছে। তিনি খাননি। কক্ষের ভেতরে একটা বিছানা ও একটা ছোট টেবিল। কোনো চেয়ার নেই। আমরা তিনটি চেয়ার আনার ব্যবস্থা করি। তার একটিতে বসতে দিই সিরাজ সিকদারকে। সারোয়ার তাঁকে জিজ্ঞেস করে সিগারেট খাবেন কি না। তিনি হাঁ-সূচক উত্তর দিলে সারোয়ার তাঁকে একটা সিগারেট ও ম্যাচ দেয়। সিরাজ সিকদার দেশলাই জ্বালিয়ে সিগারেট ধরান। কয়েকবার টান দিয়ে একটু স্বাভাবিক হন। এর আগে বসে ছিলেন বেশ গম্ভীর ভাব নিয়ে। আমরা তাঁকে নাশতা খেতে বলি। তিনি নাশতা খেতে শুরু করেন।

একপর্যায়ে আমরা তাঁর সঙ্গে কথা বলতে শুরু করি। আমরা দুজন যে তাঁর সঙ্গে এত ভালো আচরণ করছি, তিনি তা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। তাঁর কথায় বোঝা গেল, তিনি নিশ্চিত, তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর সহকর্মীরা বাংলাদেশে বুর্জোয়া সরকারকে উৎখাত করে সর্বহারাদের সরকার গঠন করতে পারবে। তিনি বারবার একটা কথাই বলছিলেন, 'আই নো মাই ফেইট ইজ ডিসাইডেড।'

সিরাজ সিকদারের সঙ্গে ১৪-১৫ মিনিট কথা বলে আমরা বেরিয়ে আসি।

এ সময় আমাদের একজন কর্মকর্তা জানান, পাশের ঘরে সর্বহারা পার্টির আরেক নেতা আছেন। তাঁকে না দেখেই আমরা দুজন অফিসকক্ষে ফিরে আসি। তিনি আসলে কে ছিলেন নানা ব্যস্ততায় আর জানা হয়নি। এখন আমার অনুমান ওই নেতা হয়তো কুরিয়ার ছিলেন অর্থাৎ যিনি সিরাজ সিকদারের পথপ্রদর্শক ছিলেন। রবিন নামে যে নেতা সিরাজ সিকদারকে ধরিয়ে দিয়েছিলেন, তিনিও হতে পারেন। রবিন প্রসঙ্গ পরে বলছি।

বিকেলবেলা জানতে পারি, সিরাজ সিকদারকে আমাদের অফিসার্স মেস থেকে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। এতে আমরা একটু স্বস্তি পাই। সন্ধ্যায় ই এ চৌধুরীর সঙ্গে দেখা হলে অভিযোগ করি, কেন তিনি সিরাজ সিকদারকে আমাদের অফিসার্স মেসে রেখেছিলেন। তাঁকে গ্রেপ্তারের সঙ্গে রক্ষীবাহিনী বিন্দুমাত্র জড়িত নয়, অথচ তাঁকে এক রাত আমাদের মেসে রাখার ফলে অনেকেই আমাদের সম্পৃক্ততার কথা ভাবতে পারে। ই এ চৌধুরী একজন দক্ষ ও বিচক্ষণ কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি আমাদের স্নেহও করতেন। আমাদের অভিযোগের জবাবে শুধু বললেন, 'কেন তাঁকে ওখানে রাখা হয়েছিল, পরে তোমাদের জানাব।'

দুদিন পর সকালে পত্রিকা খুলেই দেখি সিরাজ সিকদার নিহত। সরকারি এক প্রেসনোটে বলা হয়, সিরাজ সিকদার মানিকগঞ্জের দিকে তাঁর এক 'হাইড আউট' দেখিয়ে দেবেন, সেই কারণে পুলিশ তাঁকে নিয়ে সেদিকেই যাচ্ছিল। কিন্তু পথে সাভারের কাছে তিনি পালিয়ে যেতে চেষ্টা করলে পুলিশের গুলিতে নিহত হন। বিষয়টা নিয়ে আমার একটু খটকা লাগে। কারণ আমি ভেবেছিলাম, বিভিন্ন হত্যার সঙ্গে জড়িত থাকার কারণে তাঁকে বিচারের সম্মুখীন করা হবে।

তাঁর মৃত্যু নিয়ে তখন বিভিন্ন পত্রিকায় সত্য-মিথ্যা আলোচনা-সমালোচনা শুরু হয়। অনেকে হত্যার সঙ্গে রক্ষীবাহিনীকে জড়ানোর চেষ্টা করে। কিন্তু আমি স্পষ্টভাবে বলতে চাই, এ ব্যাপারে রক্ষীবাহিনীর বিন্দুমাত্র সংশ্লিষ্টতা ছিল না।

ওই ঘটনার বেশ কিছুদিন পর ই এ চৌধুরীর কাছ থেকে আমি সিরাজ সিকদারের গ্রেপ্তারের কাহিনি জানতে পারি। আসলে পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টির অভ্যন্তরীণ কোন্দল এবং কিছুটা নারীঘটিত কারণে সিরাজ সিকদার ধরা পড়েন। সিরাজ সিকদারের সর্বহারা পার্টির একজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা

ছিলেন রবিন নামের একজন প্রকৌশলী। তাঁর আসল নাম জানা হয়নি। তাঁর একজন প্রেমিকা ছিল। সিরাজ সিকদারের দুজন স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও তাঁর দৃষ্টি পড়ে রবিনের ওই প্রেমিকার ওপর। এ নিয়ে তাঁদের দুজনের মধ্যে মনোমালিন্য হয়। তাঁরা তখন সিলেটে ছিলেন। এরপর তাঁরা দুজন সিলেট থেকে আলাদাভাবে চট্টগ্রামে রওনা হন। কিন্তু রবিন সিলেট থেকে চট্টগ্রামের পথে ঢাকায় আসেন এবং তাঁর এক বিশ্বস্ত বন্ধুর মাধ্যমে পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। রবিনের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ সাদাপোশাকে কুমিল্লা থেকেই সিরাজ সিকদার ও তাঁর কুরিয়ারকে অনুসরণ করার চেষ্টা করে। সিরাজ সিকদার স্টেশন থেকে একটা স্কুটার নিলে সাদাপোশাকের পুলিশ কর্মকর্তারা তাঁর পিছু নেন এবং একপর্যায়ে তাঁকে সন্দেহজনক ব্যক্তি হিসেবে গ্রেপ্তার করেন। তখনো কিন্তু পুলিশ নিশ্চিত ছিল না যে তারা সত্যিই সিরাজ সিকদারকে গ্রেপ্তার করেছে। পরে রবিনই নিশ্চিত করেন, পুলিশ যাঁকে গ্রেপ্তার করেছে তিনিই সিরাজ সিকদার। সিরাজ সিকদারের সিলেট থেকে চট্টগ্রাম যাওয়ার সঠিক তথ্য দেওয়ায় সরকার কয়েকদিন পর পুরস্কারস্বরূপ রবিনকে তাঁর স্ত্রী বা প্রেমিকাসহ কানাডায় পাঠিয়ে দেয়।

এদিকে সিরাজ সিকদার গ্রেপ্তার হওয়ার পর, খবর পেয়ে বাংলাদেশের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো তৎপর হয়ে ওঠে। হোয়াইট হলে সিরাজ সিকদারকে রাখা নিরাপদ হবে না মর্মে গোয়েন্দা সংস্থাগুলো সরকারের কাছে তথ্য সরবরাহ করে। কারণ দেখায়, যেকোনো সময় সর্বহারা পার্টির সশস্ত্র ক্যাডাররা হোয়াইট হল থেকে সিরাজ সিকদারকে ছিনিয়ে নিতে পারে। আর না হলে ভারতীয় হাইকমিশনার অথবা মার্কিন রাষ্ট্রদূতের ওপর হামলা চালাতে পারে। এই তথ্যগুলো কতটুকু সত্য ছিল, কেউ পরখ করে দেখেছে কি না জানা নেই। ঠিক এ কারণেই সে রাতে সিরাজ সিকদারকে রক্ষীবাহিনীর অফিসার্স মেসে নিয়ে আসা হয় এবং ভারতীয় হাইকমিশনার ও মার্কিন রাষ্ট্রদূতের নিরাপত্তা জোরদার করা হয়।

১৯৭৫ সালের পরও সিরাজ সিকদারের হত্যার প্রসঙ্গ নিয়ে পত্রপত্রিকায় অনেক কিছু লেখা হয়েছে। এর কিছুটা ছিল আংশিক সত্য বা অর্ধসত্য। বাকিটা ছিল কল্পনা।

৬

১৯৯১ সালের নির্বাচনের পর জাতীয় সংসদে আওয়ামী লীগ হয়েছিল প্রধান বিরোধী দল এবং শেখ হাসিনা বিরোধী দলের নেতা। কবি-লেখক ফরহাদ মজহার তাঁর একটি সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন। কথায় কথায় উঠল সিরাজ সিকদার প্রসঙ্গ। সাপ্তাহিক *খবরের কাগজ*-এ ছাপা হওয়া 'রাজকুমারী হাসিনা ও বাংলার ঘরের মেয়ে হাসিনা : একটি প্রতীকী কিংবা ঐতিহাসিক স্ববিরোধিতা' নামে এক দীর্ঘ নিবন্ধে ফরহাদ মজহার বলেন :

> যে গুটিকয়েক বুদ্ধিজীবী আওয়ামী লীগকে বিরোধিতা করেছে, তারা তো ধর্মনিরপেক্ষতা বা অসাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নে বিরোধিতা করেনি ঠিকই, কিন্তু সার্বিক ক্ষেত্রে বিরোধিতা করেছে। আমি কংক্রিট একটা উদাহরণে যাওয়া দরকার মনে করে আওয়ামী আমলের হত্যা ও সন্ত্রাসের প্রসঙ্গটা তুললাম। অস্বীকার করার উপায় নেই, আওয়ামী আমলের এই দিকটার বিরোধিতা ছিল তীব্র। কথা প্রসঙ্গে সিরাজ সিকদার ও সর্বহারা পার্টি এবং আত্রাই ও উত্তরবঙ্গে রক্ষীবাহিনী ও সেনাবাহিনীর হত্যা, অত্যাচার ও নিপীড়নের প্রসঙ্গটা উঠল। হাসিনা বললেন, আপনার ঘরে কেউ যদি ডাকাতি করতে আসে তখন আপনি কী করবেন? এখন ফাঁড়ি লুট করতে গিয়ে যদি কেউ মারা যায়, তখন আপনি নিশ্চয়ই বলবেন না যে সরকার কিলিং করেছে। একটার পর একটা ইলেক্টেড এমপিকে মেরে ফেলে দিচ্ছে। কই আপনারা তো কখনো লেখেননি? ঈদের জামাতে নামাজ পড়া অবস্থায় কুষ্টিয়ায় আমাদের এমপি—কিবরিয়া সাহেব—তখন তাকে হত্যা করা হয়। তো যারা মারবে তাদের কী শাস্তি হওয়া উচিত? বলেন?
>
> একটা যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ, তখন সবাই মিলে দেশ গঠন করার কথা। সেখানে যারা ধ্বংসের কাজ করছে, তারা কি দেশের স্বাধীনতার জন্য সাহায্য করছে?
>
> তারপর সিরাজ সিকদারের মৃত্যুর কথা বলেন। আমি নিজে জানি, কারণ আমি এ বাড়ির মেয়ে, এ বাড়িতে ছিলাম। যেভাবে সিরাজ সিকদার নিহত হয়েছে, এভাবে তো তার নিহত হওয়ার কথা নয়। আমার

বাবা কখনো এটা চাননি। কারণ, তখন তো সিরাজ সিকদারকে জীবিত পাওয়াই দরকার ছিল। জীবিত পেলে তাদের প্ল্যান প্রোগ্রাম—তারা কী করতে চাচ্ছে—অনেক কিছুই জানা যেত। আমি বলি তারাই হত্যা করেছে, যারা চায়নি যে আসল তথ্যগুলো বেরিয়ে আসুক।

পুলিশের সরকারি প্রেস রিলিজ বেরিয়েছিল, কেমন করে মৃত্যু হলো। এমন কোনো পরিকল্পনা ছিল না। আমার মনে আছে, যখন এই খবরটা আসল, আব্বা ভীষণ ফিউরিয়াস হয়ে গেলেন। তো জানেন কীভাবে ধরা পড়ল, তাকে ট্র্যাপে ফেলেই মেরে ফেলা হয়।

সিরাজ সিকদার যতটুকু না করেছে, বিভিন্ন এজেন্সি সিরাজ সিকদারের নাম ভাঙিয়ে অনেক ধ্বংসাত্মক কাজ করেছে। যেমন ঢাকা শহরের ১৬ ডিসেম্বর বোমাবাজি। সিরাজ সিকদার তো এসব করায়নি, করেছে বিভিন্ন এজেন্সি। কারা? তারাই যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা মানতে পারেনি।

সিরাজ সিকদারের নাম ভাঙিয়ে অন্যেরা ধ্বংসাত্মক কাজ করেছে—শেখ হাসিনার এই মূল্যায়ন আমার কাছে নতুন মনে হলো। তাঁকে বললাম সেটা। এটাও বললাম, প্রশ্নটা তাঁকে সরাসরি এভাবে কখনোই হয়তো করা হয়নি বা করার মতো অবস্থাও ছিল না।

হ্যাঁ, প্রশ্নই করেনি। বরঞ্চ আমাদের দোষারোপই করা হয়েছে আর সিরাজ সিকদার সম্পর্কে মুখরোচক লিখেছে। মুখরোচক লেখা বলতে হাসিনা সম্ভবত ইঙ্গিত দিচ্ছিলেন আরেকটি বিয়ে করতে গিয়ে সিরাজ সিকদারের গোয়েন্দা সংস্থার ফাঁদে পড়ার কাহিনি ইত্যাদি। তবে সিরাজ হত্যা সম্পর্কে আওয়ামী লীগের প্রচলিত ব্যাখ্যাটাই তিনি আমাকে বললেন :

সিরাজ সিকদার ক্রস ফায়ারিংয়ে মারা গেলেন। গোলাগুলি পাল্টা গোলাগুলিতে মারা গেলেন। তাকে অর্ডার দিয়ে মারা হয়নি। একটা কথা মনে রাখবেন, এভাবে কিন্তু মারে না কেউ। এ ধরনের আসামি পেলে মারে না কেউ। ধরে নিয়ে আসে তার কাছ থেকে খবর বের করতে। কেন মারল? যারা সিরাজ সিকদারের নাম ভাঙিয়ে ধ্বংসাত্মক কাজ করত, তাদের নাম ফাঁস হয়ে যাবে—এটা একটা বিরাট কন্সপিরেসি ছিল।

৭

আসলে কী ঘটেছিল? সিরাজ সিকদারের গ্রেপ্তার ও মৃত্যু নিয়ে এখানে বেশ কয়েকটি ভাষ্য তুলে ধরা হয়েছে। তাঁদের সবার বয়ানে কিছু মিল আছে, কিছু অমিলও আছে। আছে কিছু ধোঁয়াশা।

মাহফুজ উল্লাহ 'নির্ভরযোগ্য সূত্র', 'মনে হয়', 'অনুমান করা যায়', এ ধরনের কিছু কথা বলেছেন। এতে প্রতিবেদনের বিশ্বাসযোগ্যতা ক্ষুণ্ন হয়েছে। চট্টগ্রামের শেল্টার থেকে বের হয়ে আসার পর থেকে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত পুরো ঘটনার সাক্ষী কি একজন, না কয়েকজন? তারা কারা? মাহফুজ উল্লাহর প্রতিবেদন ছাপা হয়েছে যে সময়, তখন মুজিব সরকার আর নেই। *বিচিত্রা*র জন্য তখন সময়টা বেশ অনুকূল। তারপরও প্রতিবেদনে তথ্যসূত্র উল্লেখ করার ক্ষেত্রে কিছুটা লুকোচুরি লক্ষ করা যায়।

মুনীর মোরশেদের বয়ানের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। চট্টগ্রাম থেকে সাভার পর্যন্ত সিরাজ সিকদারের গ্রেপ্তার ও পরবর্তী পরিক্রমার তথ্যসূত্র নেই। তিনি নিজে সেখানে ছিলেন না।

এস এ করিম নিজে ওই সময়ের দুজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলেছেন—সচিব জনাব রহিম এবং এনএসআইয়ের পরিচালক মেসবাহউদ্দিন। কিছু ক্ষেত্রে তিনি মুনীর মোরশেদের লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তবে তাঁর নাম ঠিকমতো লেখেননি। মুনীর মোরশেদ না লিখে মুনীর আহমেদ লিখেছেন। তিনি কি মুনীর মোরশেদের লেখা পড়েছেন, নাকি কারও কাছে শুনে লিখেছেন, বলা মুশকিল।

এঁদের মধ্যে আনোয়ার উল আলম একমাত্র ব্যক্তি, যিনি বন্দি সিরাজ সিকদারকে দেখেছেন এবং তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর বয়ানটি অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য হওয়ার দাবি রাখে। তিনি অবশ্য কিছু কথা বলেছেন পুলিশের ডিআইজি ই এ চৌধুরীর কাছ থেকে শুনে।

সিরাজ সিকদারের সহবন্দি রবিনের নাম উল্লেখ করেছেন তিনি। সুযোগ পেয়েও তিনি তাঁকে দেখতে যাননি। সর্বহারা পার্টির নেতা আকা ফজলুল হক রানার ভাষ্য অনুযায়ী মাহফুজ উল্লাহর মহসিন, মুনীর মোরশেদের আকবর এবং আনোয়ার উল আলমের রবিন একই ব্যক্তি।

অবলুপ্ত রক্ষীবাহিনীর উপপরিচালক (প্রশিক্ষণ) আনোয়ার উল আলম, উপপরিচালক (অপারেশন) সারোয়ার মোল্লা এবং ঢাকার তৎকালীন পুলিশ সুপার মাহবুবউদ্দিন আহমদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন লেখক। তাতে সিরাজ সিকদারের গ্রেপ্তার ও মৃত্যুরহস্যের জট পুরোপুরি খোলেনি। আনোয়ার উল আলমের সঙ্গে লেখকের কথোপকথন ছিল এরকম :

– আপনার বিবরণ অনুযায়ী সিরাজ সিকদার গ্রেপ্তার হয়েছেন চুয়াত্তরের ৩১ ডিসেম্বর। এখানে তারিখ বিভ্রাট আছে। পুলিশের প্রেসনোট অনুযায়ী তিনি গ্রেপ্তার হন পঁচাত্তরের পয়লা জানুয়ারি।

তাই নাকি? আমাকে তাহলে সরোয়ারের সঙ্গে কথা বলতে হবে।

– আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলেছি। তিনি বলেছেন, তিনি, আপনি, উপপরিচালক (সিগন্যাল) লে. কর্নেল সাবিহ উদ্দিন আহমেদ এবং পরিচালক ব্রিগেডিয়ার নূরুজ্জামান সিকদারকে দেখতে গিয়েছিলেন।

এটা ঠিক না। সাবিহ উদ্দিন এসেছিলেন। তবে পরিচালক ছিলেন না। আমরা অবশ্য তাঁকে বলেছিলাম, সিরাজ সিকদারকে আমাদের এখানে রাখা হলো কেন? আমাদের তো এমনিতেই অনেক বদনাম।

– তাঁকে কী অবস্থায় দেখলেন?

দেখলাম ফ্লোরে বসে আছেন। আমি লোক ডেকে চেয়ার আনালাম : তিনটা চেয়ার।

– তাঁকে দেখে আপনার কি মনে হয়েছে যে তাঁকে নির্যাতন করা হয়েছে?

না, সে রকম মনে হয়নি। তবে খুব মনমরা হয়ে বসে ছিলেন। কথা বলছিলেন না। আমি তাঁকে চেয়ারে বসতে বলায় তিনি অবাক হলেন। বোধ হয় এরকম ব্যবহার আশা করেননি। তারপর চেয়ারে বসলেন।

– সারোয়ার মোল্লা আমাকে বলেছেন, 'দেখলাম, তাঁর হাত-পা বাঁধা। বললাম, সে তো বন্দি? হাত-পা বেঁধে রাখার কী দরকার? তারপর তাঁর বাঁধন খুলে দেওয়া হয়'। তারপর কী হলো?

আমরা খাবার আনালাম। টেবিলে বসে একসঙ্গে খেলাম। আমরা গিয়েছিলাম সকালে। অনেকক্ষণ ছিলাম।

– তাঁর সঙ্গে কি কথাবার্তা হয়েছে?

টুকটাক। আমাকে দেখে তিনি একটু স্বস্তি পেয়েছেন বলে মনে হয়। তিনি বয়সে আমার চেয়ে কিছুটা বড়। তবে আমাদের চেহারায় দারুণ মিল। দুজনেরই মুখ চারকোনা। পার্থক্য হলো, তাঁর চোখ একটু বড় আর নাকটা একটু খাড়া। তাছাড়া তাঁর মুখটা আমার মুখে বসিয়ে দেওয়া যায়।

– তাঁকে কি গণভবনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল?

(একটু ইতস্তত করে) হ্যাঁ।

– তাঁকে কি পরে সাভারে আপনাদের ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল?

না, সেখানে কেন নিয়ে যাওয়া হবে?

– এরকম একটা প্রচার আছে যে তাঁকে সাভারে রক্ষীবাহিনীর ক্যাম্পে নিয়ে অত্যাচার করা হয়েছে। পরে তাঁকে সাভারে নিয়ে গিয়ে গুলি করা হয়।

এটা ঠিক না। তাঁকে নিয়ে পুলিশ মানিকগঞ্জের দিকে রওনা দিয়েছিল।

– মানিকগঞ্জে কেন?

সেখানে হয়তো কোনো আস্তানা বা অস্ত্রশস্ত্রের খবর ছিল। আমি এটা জানি না। শুনেছি মানিকগঞ্জে নিয়ে যাবে।

– আপনি কি সেখানে এসপি মাহবুবকে দেখেছেন?

মাহবুব ভাইয়ের সঙ্গে কি কথা বলেছেন?

– আমি তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি আমাকে বলেছিলেন, ‘তাঁর সঙ্গে তো আমার দেখা হয় নাই। তার আগেই তো স্পেশাল ব্রাঞ্চের লোকেরা তাঁকে নিয়ে যায়।’

পুরো বিষয়টার দায়িত্বে ছিলেন ডিআইজি ই এ চৌধুরী।

– আপনি যে রবিনের কথা বলেছেন, এ ব্যাপারে ভিন্নমত আছে।

রবিন তো তাকে ধরিয়ে দিয়েছিল। পরে সরকার তাঁকে কানাডা পাঠিয়ে দেয়।

– সিরাজ সিকদারের সঙ্গে যে গ্রেপ্তার হয়েছিল তাঁর নাম আকবর। তাঁকে তো পরে মৃত অবস্থায় বরিশালে পাওয়া গেছে বলে দলের লোকদের দাবি।

রবিনের সঙ্গে তো আমার দেখা বা কথা হয়নি। আমি এটা শুনেছি ই এ চৌধুরীর কাছে।

৮

সিরাজ সিকদারের মৃত্যু নিয়ে অনেক কথাবার্তা হয়েছে। পুলিশের প্রেসনোটে মানুষের আস্থা কম। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ছাত্রদের ওপর গুলি চালানোর সময় থেকে পরবর্তী সব ঘটনায় পুলিশের বয়ান একঘেয়ে, বাঁধাধরা—উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে শান্ত করতে না পেরে প্রথমে অনুরোধ, তারপর মৃদু লাঠিচার্জ ও শেষে উপায়ান্তর না দেখে আত্মরক্ষার্থে গুলি ছোড়া। নিরাপত্তা হেফাজতে থাকা বন্দির মৃত্যু নিয়েও পুলিশের ব্যাখ্যায় পরিবর্তন আসেনি—বন্দি পালাতে গেলে তাকে গুলি করা হয় অথবা দুষ্কৃতকারীরা তাকে ছিনিয়ে নিতে এলে দুপক্ষের গোলাগুলিতে সে মারা যায়। এর নাম হয়েছে 'ক্রসফায়ার'। ১৯৭১-৭২ সালে পশ্চিমবঙ্গে এরকম প্রায়ই ঘটত। তখন পুলিশের গুলিতে 'নকশাল' মারা পড়ত। ভারতীয় প্রচারমাধ্যমে এর নাম হলো 'এনকাউন্টার'।

সিরাজ সিকদারের পক্ষ-বিপক্ষ ছিল। কারও চোখে তিনি বিপ্লবী, কারও কাছে সন্ত্রাসী। তাঁর মৃত্যুতে অনেকেই স্বস্তি পেয়েছেন, অনেকেই ক্ষুব্ধ হয়েছেন। এ নিয়ে আলোচনার শেষ নেই।

পুলিশ হেফাজতে 'অস্বাভাবিক' মৃত্যু হলে প্রশ্ন তৈরি হয়। জনমত 'ভিকটিমের' পক্ষে যায়। এ প্রসঙ্গে আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরীর কথা বলা যেতে পারে। তিনি আওয়ামী লীগ ঘরানার একজন সাংবাদিক হিসেবে পরিচিত হলেও প্রায়ই মুজিব প্রশাসনের সমালোচনা করতেন। তখন তিনি সাপ্তাহিক *জনপদ*-এর সম্পাদক। সিরাজ সিকদারের মৃত্যুর পর তিনি *জনপদ*-এর প্রথম পাতায় স্বনামে একটি নিবন্ধ লিখেছিলেন। পরে শেখ মুজিবের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের অবনতি হয়। দেশের অবস্থা নিয়ে গাফ্‌ফার চৌধুরী যেসব কলাম লিখতে শুরু করেন, তাতে শেখ মুজিব ক্ষুব্ধ হন। তিনি গাফ্‌ফার চৌধুরীর নামে একটি ফাইল তৈরি করার নির্দেশ দিয়েছিলেন তাঁর সহকারী প্রেস সচিব মাহবুব তালুকদারকে।

বাংলার বাণী নামে একটি সরকার-সমর্থক দৈনিক ছিল। এর সম্পাদক ছিলেন আওয়ামী যুবলীগের চেয়ারম্যান শেখ ফজলুল হক মনি। পঁচাত্তরের ৫ জানুয়ারি *বাংলার বাণী* একটি উপসম্পাদকীয় ছাপে। এতে বলা হয় :

বিপ্লব করিবার জন্য চারু মজুমদারকে যে কল্পনাবিলাসে পাইয়া বসিয়াছিল, তাহার পরিণতি সকলের জানা থাকিবার কথা। সিরাজ সিকদারের পরিণতি তাহার চাইতে ভিন্নতর কিছু হয় নাই। ...

সিরাজ সিকদার ধৃত হইয়া মৃত্যুবরণ করিবার পর আশা করা যায়, যাহারা এই দেশে সন্ত্রাসবাদী তৎপরতাকে রাজনৈতিক কৌশল হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহারা অতঃপর নিজেদের ভুল ধরিতে পারিয়াছেন।

উপসম্পাদকীয় শেষ হয় সিরাজ সিকদারের একটি কবিতার উদ্ধৃতি দিয়ে :

বিদায়বেলা
মনে রেখো মনে রেখো একটি কথা
ঘাত-প্রতিঘাত, সংঘাত-প্রতিকূলতা
কিন্তু আমাদের আছে একটি কামনা
সে হলো নিঃস্বার্থ জনসেবা।

৯

সিরাজ সিকদার যখন মারা যান, মাহবুব তালুকদার তখন রাষ্ট্রপতির জনসংযোগ কর্মকর্তা। অফিস করেন বঙ্গভবনে। সিরাজ সিকদারের ছোট বোন শামীম সিকদারকে তিনি চেনেন ১৯৭৩ সালের মাঝামাঝি থেকে। তাঁদের যোগাযোগের সূত্র মাহবুব তালুকদারের কলকাতার বন্ধু অর্চনা চৌধুরী। তিনি শামীমেরও বন্ধু। সেই পরিচয়ের সূত্রে শামীম একদিন এলেন বঙ্গভবনে, মাহবুব তালুকদারের কাছে। শামীম সিরাজ সিকদারের বোন জেনে তালুকদার অবাক হলেন।

শামীম আরও কয়েকদিন গেছেন বঙ্গভবনে। তাঁকে বাসায় দাওয়াত দিয়েছেন মাহবুব তালুকদার। দুজনের মধ্যে অনেক গল্প হয়েছে। সিরাজ সিকদারের ব্যাপারে জানতে চাইলে শামীম তাঁকে বলেছিলেন, ভাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ হলে তাঁকে নিয়ে পরিচয় করিয়ে দেবেন। আরও বলেছিলেন, তাঁর ভাইকে নিয়ে একটা ভালো উপন্যাস লেখা যায়।

যাঁরা গোপন সংগঠন করেন বা আত্মগোপনে থাকেন, তাঁদের প্রতি মানুষের কৌতূহল থাকে। সিরাজ সিকদারের প্রতি মাহবুব তালুকদারের কৌতূহল ছিল। শামীমের কাছে শুনে শুনে সিরাজ সিকদার সম্পর্কে তাঁর একটা ধারণা হয়েছিল। তাঁর মনে হয়েছিল, সিরাজ সিকদারকে নিয়ে একটা উপন্যাস লেখা যেতে পারে।

চুয়াত্তর সালে সিরাজ সিকদার সম্পর্কে অনেক কথা তাঁর কানে এসেছে। কখনো মনে হয়েছে চারু মজুমদারের মতো হত্যাকাণ্ডই হচ্ছে তাঁর রাজনীতি। অকারণে মানুষ মেরে কী লাভ হয়? এর পেছনে রাজনৈতিক দর্শন কী? মাহবুব তালুকদার ভাবলেন, কখনো দেখা হলে তিনি সিরাজ সিকদারকে এই প্রশ্নগুলো করবেন।

পঁচাত্তরের ৩ জানুয়ারি *দৈনিক বাংলায়* সিরাজ সিকদারের মৃত্যুসংবাদ পড়ে তিনি স্তম্ভিত হয়ে যান। মনটা ভরে যায় বিষাদে। সিরাজ সিকদার পুলিশের হাত থেকে পালানোর চেষ্টা করলেন কীভাবে? সে সুযোগ পুলিশ দিল কেন? ঘটনাটি সম্পর্কে পুলিশের ভাষ্য ছাপা হয়েছে। পত্রিকার নিজস্ব কোনো রিপোর্ট নেই। মাহবুব তালুকদারের জিজ্ঞাসা—এ কেমন মূল্যবোধ? তিনি তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন :

> বঙ্গভবন থেকে অবজারভার হাউজে *পূর্বদেশ* পত্রিকায় চলে এলাম। সম্পাদক এহতেশাম হায়দার চৌধুরী বাইরে থেকে মাত্র ফিরেছেন। তাঁর অফিসকক্ষে আর কেউ ছিল না। চায়ের অর্ডার দিতে দিতে আমি বললাম, মনটা খুব খারাপ।
>
> কেন?
>
> সিরাজ সিকদারের মৃত্যুর খবরটা পড়ে।
>
> আমি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গিয়েছিলাম তাঁর লাশ দেখতে। মর্গে ফেলে রাখা হয়েছে।
>
> তাহলে আমিও যাই। একবার দেখে আসি।
>
> তোমার যাওয়া ঠিক হবে না। তুমি সরকারি চাকরি করো। ওখানে এজেন্সির লোকেরা রয়েছে।
>
> আপনি যে গেলেন!
>
> আমি পত্রিকার লোক। আমাদের সাতখুন মাফ। সরকারি কর্মকর্তা

হিসেবে নির্দেশিত না হলে তোমার সেখানে যাওয়া উচিত নয়।

আমি কি পরিচিতজন হিসেবে যেতে পারি না?

ঝামেলায় পড়ে যাবে। শুধু শুধু ঝামেলায় পড়ে লাভ কী? আমার কথা শোনো। ওখানে যেয়ো না।

হায়দার ভাই, ওর সঙ্গে দেখা করার আগ্রহ ছিল আমার।

সেটা যখন হয়নি, তা-ই স্বাভাবিক বলে মেনে নাও।

কী অবস্থায় দেখলেন তাঁকে?

দেখলাম রাজপুত্রের মতো শুয়ে আছে সে। শান্ত সৌম্য চেহারা। গতকাল মারা গেলেও লাশ বিকৃত হয়নি।

মনে কষ্ট নিয়ে বঙ্গভবনে ফিরে এলাম আমি। ভেবেছিলাম শামীমের সঙ্গে দেখা করে শোকসন্তপ্ত পরিবারকে সমবেদনা জানাব। কিন্তু পরে মনে হলো, এই স্বাভাবিক শিষ্টাচারটুকু পালন করতে গেলেও বিপদ হতে পারে।

শামীম সিকদারের সঙ্গে আমার দীর্ঘদিন দেখা হয়নি। কিন্তু সিরাজ সিকদারকে দেখেছিলাম স্বপ্নে। রাজপুত্রের মতো সুন্দর দেখাচ্ছিল তাঁকে।

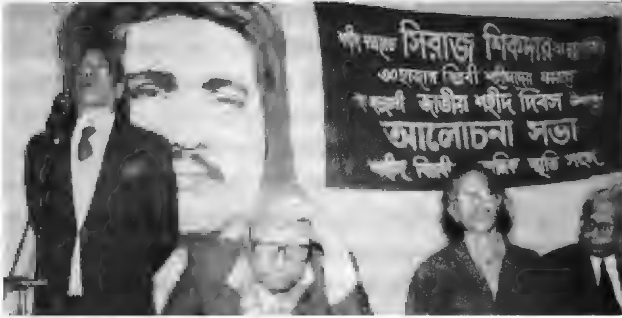
পাঁচাত্তরের ২৫ জানুয়ারি সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে চালু হয় রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারব্যবস্থা। মুহম্মদুল্লাহকে সরিয়ে রাষ্ট্রপতি হন শেখ মুজিবুর রহমান। মাহবুব তালুকদার নতুন রাষ্ট্রপতির সহকারী প্রেস সচিব নিযুক্ত হন। থাকেন বঙ্গভবনে। কিন্তু তাঁর অফিস চলে যায় গণভবনে। ওই সময় শামীম সিকদারের সঙ্গে সরকারের একটা যোগাযোগ হয়। শামীম তখন উদীয়মান ভাস্কর। মাহবুব তালুকদার লেখককে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, শেখ মুজিবের একটি আবক্ষ মূর্তি বানানোর দায়িত্ব পান শামীম। এজন্য তাঁকে দশ হাজার টাকা দেওয়া হয়। পাকিস্তান আমলে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে যে কামরায় থাকতেন বন্দি শেখ মুজিব, সেখানে এই ভাস্কর্যটি বসানোর কথা। পরিকল্পনা ছিল, এটা হবে জাদুঘর। শামীম সিকদার ভাস্কর্যটি তৈরি করেছিলেন।

১০

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক আহমদ শরীফ একজন র‍্যাডিক্যাল ধারার বুদ্ধিজীবী হিসেবে পরিচিত। দেশের নানান সংকটের সময় তিনি নাগরিক সমাজের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। ১৯৬৭ সালে যখন পাকিস্তানবাদীরা রবীন্দ্রনাথকে ছেঁটে ফেলতে চেয়েছিল, তখন তিনি আরও কয়েকজনের সঙ্গে মিলে এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। ১৯৭৪ সালের ৩১ মার্চ জাতীয় প্রেস ক্লাবে তাঁর সভাপতিত্বে আয়োজিত এক নাগরিক সভায় তৈরি হয়েছিল 'মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ কমিটি'। চুয়াত্তরের ১১ অক্টোবর ঢাকায় 'মন্বন্তর প্রতিরোধ আন্দোলন' নামে একটি নাগরিক উদ্যোগের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তি ছিলেন তিনি।

সিরাজ সিকদারের মৃত্যু তাঁকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছিল। ব্যক্তিগতভাবে তিনি সিরাজ সিকদারকে চিনতেন না। 'বিপ্লবী সিরাজ সিকদার' নামে তিনি একটি প্রবন্ধ লিখেছেন তাঁর মৃত্যুর পর। এই প্রবন্ধের প্রথম দিকের কয়েকটি বাক্যে সিকদার সম্বন্ধে তাঁর মুগ্ধতা প্রকাশ পেয়েছে, 'সিরাজ সিকদার আজ আর কোনো ব্যক্তির নাম নয়। সিরাজ সিকদার একটি সংকল্পের, একটি সংগ্রামের, একটির আদর্শের, একটি লক্ষ্যের ও ইতিহাসের একটি অধ্যায়ের নাম।' একটা বইয়ে বাংলাদেশের হাতে গোনা কয়েকজন রাজনীতিবিদের স্মৃতিচারণা করেছেন তিনি। সিরাজ সিকদার তাঁদের একজন। তাঁর মতে, সিরাজ সিকদারের নেতৃত্ব এবং তাঁর দল ছিল অনন্য। এ সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত মূল্যায়ন বেশ খোলামেলা :

> কোনো তরুণ বিপ্লবী নেতার মধ্যে স্বল্পকালের মধ্যে এমন জাদু-ব্যক্তিত্বের পরিচয় মেলেনি। দলপতির নেতৃত্বমুগ্ধ কর্মীরা সর্বহারা দলের বিকল্প নাম হিসেবে 'সিরাজ সিকদারের দল' উচ্চারণ করে সুখ পেয়েছে বেশি।
>
> আমরা সর্বহারা দলের ও তার নেতার নাম শুনতে থাকি ১৯৭২ সন থেকেই। ১৯৭৩-৭৪ সন এর প্রভাব ও প্রত্যয়ের যুগ। সিরাজ সিকদারের জনপ্রিয়তা, সুস্থ নেতৃত্ব ও প্রত্যাশা-জাগানো ব্যক্তিত্ব



সিরাজ সিকদারের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত স্মরণসভায় জীবনের শেষ ভাষণটি দিচ্ছেন অধ্যাপক আহমদ শরীফ। পাশে ফয়েজ আহমদ, হাসান ফকরী ও আবদুল মান্নান। ২ জানুয়ারি ১৯৯৯

জনগণকে করেছিল আশ্বস্ত আর বিপ্লব করেছিল আসন্ন। তাই উঠতি বুর্জোয়ার প্রতিনিধি ও বিদেশি শক্তির ক্রীড়নক লুটেরা সরকার ছলবল কৌশল প্রয়োগে এই দল ও দলপতিকে উৎখাত করার প্রয়াসে একান্ত হয়ে ওঠে এবং সিরাজ সিকদারকে হত্যা করে নিঃশঙ্ক ও নিঃসংশয় হয়ে নিরাপত্তার সানন্দ স্বস্তি স্বশব্দে উচ্চকণ্ঠে উপভোগ করে।

সর্বহারা দলের সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিল না। এর নেতার সঙ্গেও ছিল না পরিচয়, তাঁকে চাক্ষুষও করিনি কখনো। ক্বচিৎ-কদাচিৎ হাতে-আসা দলের ইশতিহার পড়ার মধ্যেই দলের সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান ছিল সীমিত। কাজই আমাদের লক্ষ্য যদিও আক্ষরিক অর্থে ছিল অভিন্ন, তবু মত পথ পদ্ধতিগত পার্থক্য ছিলই। যেহেতু সর্বহারা দল দেশের সর্বত্র প্রসার লাভ করেছিল, যেহেতু এদের স্বপ্নে ও সংকল্পে, উদ্যোগে ও আয়োজনে পার্থক্য বাইরের লোকের অনুভবে ধরা পড়ত না, সেহেতু আমরাও মনে করেছিলাম এদের নেতৃত্বে প্রার্থিত ও প্রত্যাশিত বিপ্লব বুঝি আসন্ন। তাই নির্দল নিষ্ক্রিয় বাক্যবাগীশ আমরাও মনে পুলক অনুভব করেছি তখন। শোষিত-পীড়িত গণমানুষের হয়ে তাদের মুক্তির জন্যে চিরকালই সংগ্রাম করতে এগিয়ে এসেছে বিবেকতাড়িত হয়ে

শোষকশ্রেণির সংবেদনশীল ন্যায়বান মানুষ। সিরাজ সিকদার তেমন একজন পদস্থ চাকুরের সন্তান, ইঞ্জিনিয়ার। গণমানুষের দুঃখ মোচনের জন্যেই তিনি নিশ্চিত আরামের, নিশ্চিত জীবনের স্বস্তি-সুখ স্বেচ্ছায় পরিহার করে জেল-জুলুম-নির্যাতন-লাঞ্ছনার ও মৃত্যুর ঝুঁকি জেনেবুঝে বরণ করেছিলেন। এ মানবতাবাদী-সাম্যবাদী নেতাকে হাতে পেয়েই যেদিন প্রচণ্ডপ্রতাপ শঙ্কিত সরকার বিনা বিচারে খুন করল, সেদিন ভীত ত্রস্ত আমরা তাঁর জন্যে প্রকাশ্যে আহা শব্দটি উচ্চারণ করতেও সাহস পাইনি। সে গ্লানিবোধ এখনো কাঁটার মতো বুকে বেঁধে। যদিও সেদিন জানতাম যে এমন দিন শিগগির আসবে, যখন সিরাজ সিকদারের কবরে নির্মিত হবে স্মারক মিনার—সমাধিসৌধ আর হন্তাদের জঙ্গলাকীর্ণ গোরে আশ্রিত হবে ফেরু।

১৯৯১ সালে সিরাজ সিকদারের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত স্মৃতিচারণা অনুষ্ঠানে আহমদ শরীফ এটি পাঠ করেছিলেন। তাঁর আশা পূরণ হয়নি। সিরাজ সিকদার স্মরণে হয়নি কোনো স্মৃতির মিনার। তাঁর দলের লোকেরা নিজেরা নিজেরা খুনোখুনি করে নিঃশেষ হয়েছে। সিরাজ সিকদার এখন একটি বিস্মৃত নাম।

১১

অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সমালোচনায় সিরাজ সিকদার ছিলেন নির্মম। স্বপ্নবাজ তরুণদের আকর্ষণ করার ক্ষেত্রে জাসদকে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করতেন। জাসদকে তুলাধোনা করে তিনি একাধিক প্রচারপত্র লিখেছেন। তাদের তিনি মনে করতেন 'জাতীয় শত্রু'। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁকে নিয়ে তাঁর দলের কেউ দু'লাইন লিখেছেন বলে মনে হয় না। অথচ তাঁকে নিয়ে আস্ত একটি কবিতা লিখেছেন জাসদ-ছাত্রলীগের অ্যাকটিভিস্ট-কবি মোহন রায়হান। 'কমরেড সিরাজ সিকদারকে' উৎসর্গ করা 'রণাঙ্গন থেকে' কবিতায় তিনি লিখেছেন :

লোকালয়ে কৃষাণীয় বিষণ্ন চোখের হাওয়া
রাতজাগা পাখিদের গান শুনতে শুনতে

একদিন আমি ঝড়ের দোলায় চলে যাব
প্রকম্পিত যুদ্ধ-ময়দানে
আমাকে ফেরাবে তুমি কোন বিশ্বাসের ছলনায়?
যুদ্ধ, প্রিয়তম যুদ্ধ ছাড়া প্রিয় কিছু নেই।

অহো! আমার অরণ্য, বসতি, ফসল
আমি তোমার নিকটে যাব, যোজন যোজন
পুঁতে রাখা কলার পোয়ার মতো দুঃখ শোক জরা মৃত্যু
আমি শিকড়সমেত উপড়ে ফেলব দেখো।

আমি এই হাতে তুলে নেব শোণিত বল্লম
কাস্তে শাবল, ঠেকাবে সাধ্য কার?

ন্যাপথলিনের মতন শিলার বর্ষণে ভাঙে
আমার উর্বর মৃত্তিকার বেড়ে ওঠা কোমল পাটের মাথা
ভাঙে আমার স্বর্ণের ভবিষ্যৎ
জানি লুণ্ঠিত ফসল ফিরে পাব না গোলায়
ফিরে পাব না আমার হারানো স্বজন আমি কোনোদিন
প্রিয়তমা, ফিরে এসে বলবে না—ভালোবাসি।

১২

এ দেশের রাজনীতির ডামাডোলের বছরগুলোতে সিরাজ সিকদারের উত্থান। নানা কারণে তিনি নিন্দিত ও নন্দিত। ইতিহাস তাঁকে মূল্যায়ন করবে কীভাবে? তিনি বিপ্লবী না সন্ত্রাসী, সফল না ব্যর্থ। মাত্র ৩০ বছর দুই মাস ছয়দিন বেঁচেছিলেন। এটুকু সময়ের মধ্যেই তিনি সরকারের কাছে হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন 'মোস্ট ওয়ান্টেড'। কেমন ছিল তাঁর জীবনবোধ? তাঁর উপলব্ধির কথা তিনি নিজেই লিখে গেছেন 'জীবন' কবিতায় :

কতগুলো সফলতা
কতগুলো ব্যর্থতা
কতগুলো যোগ্যতা
কতগুলো সীমাবদ্ধতা
কতগুলো ভালো
আর কতগুলো খারাপ
এই তো জীবন।

কতগুলো আনন্দ
কতগুলো বেদনা
কতগুলো দ্বন্দ্ব
কতগুলো সংঘাত
এই তো জীবন।

১৩

বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমির প্রথম ব্যাচের পাসিং আউট প্যারেড অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭৫ সালের ১ জানুয়ারি কুমিল্লার ময়নামতি সেনানিবাসে। এক বছর আগে সেনাবাহিনীর তরুণ ক্যাডেটদের এই কোর্স উদ্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, 'আমার জীবনের একটি স্বপ্ন বাস্তবায়িত হলো।'

পাসিং আউট প্যারেডের মহড়া দেখার জন্য সেনাবাহিনীর চিফ অব স্টাফ জেনারেল কাজী মো. সফিউল্লাহ ও চিফ অব জেনারেল স্টাফ ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ কুমিল্লা গিয়েছিলেন মূল প্যারেডের কয়েকদিন আগে। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন সাপ্তাহিক বিচিত্রার সহকারী সম্পাদক শাহাদত চৌধুরী ও মাহফুজ উল্লাহ। ফেরার সময় দাউদকান্দি ফেরিঘাটে ফেরির অপেক্ষায় খালেদ মোশাররফের গাড়িটিকে থামতে হয়েছিল। সেখানে হকারের কাছ থেকে বাংলাদেশ অবজারভার-এর একটি কপি কেনেন খালেদ। পত্রিকা পড়ে তিনি জানতে পারেন সিরাজ সিকদারকে মেরে ফেলা হয়েছে। তিনি আগের রাতে তাঁর গ্রেপ্তারের খবর পেয়েছিলেন। কিন্তু মেরে ফেলা হবে ভাবতে

পারেননি। মাহফুজ উল্লাহর ভাষ্য অনুযায়ী, খবরটা পড়তে পড়তে খালেদ কেঁদে ফেলেন এবং মন্তব্য করেন, 'ওরা একে মেরে ফেলল?' এরপর ঢাকা পর্যন্ত সেই অতিপরিচিত খালেদকে আর চেনা যাচ্ছিল না।

১৪

সিরাজ সিকদারের গ্রেপ্তার ও মৃত্যুর পর সর্বহারা পার্টির পক্ষ থেকে কোনো তৎপরতা দেখা যায়নি। সবাই যেন চুপ মেরে গেছে। কিছুদিন পর অনুকূল বাতাবরণ তৈরি হয় এবং সিরাজ সিকদার স্মৃতি পরিষদ নামে সংগঠন দাঁড়িয়ে যায়। আওয়ামীবিরোধী রাজনীতিবিদরা তাঁর 'হত্যার' বিচার চেয়ে স্লোগান দেয়, মৃত্যুবার্ষিকীতে গোরস্থানে গিয়ে ফুল দেয়। ব্যস, এ পর্যন্তই।

১৯৯২ সালে 'সিরাজ সিকদার পরিষদে'র সভাপতি শেখ মহিউদ্দিন আহমেদ একটি হত্যা মামলা করেন। মামলায় সিরাজ সিকদারকে 'হত্যা'র অভিযোগে সুনির্দিষ্টভাবে ছয়জনকে আসামি করা হয়। তাঁরা হলেন : ১. সাবেক পুলিশ সুপার মাহবুবউদ্দিন আহমদ, ২. আবদুর রাজ্জাক এমপি, ৩. তোফায়েল আহমেদ এমপি, ৪. সাবেক আইজিপি ই এ চৌধুরী, ৫. অবলুপ্ত রক্ষীবাহিনীর পরিচালক ব্রিগেডিয়ার (অব.) নূরুজ্জামান, ৬. মোহাম্মদ নাসিম এমপি। তাঁদের বিরুদ্ধে ৩০২ ও ১০৯ ধারায় অভিযোগ আনা হয়। সাংবাদিক শওকত হোসেন মাসুমের ব্লগে এ মামলার বিবরণ পাওয়া যায়। মামলার আবেদনে বলা হয় :

> আসামিরা মরহুম শেখ মুজিবের সহচর ও অধীনস্ত কর্মী থেকে শেখ মুজিবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ও গোপন সলাপরামর্শে অংশগ্রহণ করতেন এবং ১নং থেকে ৬নং আসামি তৎকালীন সময়ে সরকারের উচ্চপদে থেকে অন্য ঘনিষ্ঠ সহচরদের সঙ্গে শেখ মুজিবের সিরাজ সিকদার হত্যার নীলনকশায় অংশগ্রহণ করেন। তাঁরা এ লক্ষ্যে সর্বহারা পার্টির বিভিন্ন কর্মী হত্যা, গুম, গ্রেপ্তার, নির্যাতন ও হয়রানি করতে থাকেন।
>
> মরহুম শেখ মুজিব ও উল্লিখিত আসামিরা তাঁদের অন্য সহযোগীদের

সাহচর্যে সর্বহারা পার্টির মধ্যে সরকারের চর নিয়োগ করেন। এঁদের মধ্যে ই এ চৌধুরীর একজন নিকটাত্মীয়কেও চর হিসাবে নিয়োগ দেওয়া হয়। এভাবে ১৯৭৫ সালের ১ জানুয়ারি চট্টগ্রামের নিউমার্কেট এলাকা থেকে অন্য একজনসহ সিকদারকে গ্রেপ্তার করে ওই দিনই বিমানে করে ঢাকায় আনা হয়। ঢাকার পুরনো বিমানবন্দরে নামিয়ে গাড়িতে করে বন্দিদের পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের মালিবাগের অফিসে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে সিরাজ সিকদারকে আলাদা করে তাঁর ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালানো হয়। ২ জানুয়ারি সন্ধ্যায় পুলিশ ও রক্ষীবাহিনীর বিশেষ স্কোয়াডের অনুগত সদস্যরা গণভবনে মরহুম শেখ মুজিবের কাছে সিরাজ সিকদারকে হাত ও চোখ বাঁধা অবস্থায় নিয়ে যান। সেখানে শেখ মুজিবের সঙ্গে তাঁর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মরহুম ক্যাপ্টেন মনসুর আলীসহ আসামিরা, শেখ মুজিবের পুত্র মরহুম শেখ কামাল এবং ভাগনে মরহুম শেখ মণি উপস্থিত ছিলেন।

প্রথম দর্শনেই শেখ মুজিব সিরাজ সিকদারকে গালিগালাজ শুরু করেন। সিরাজ এর প্রতিবাদ করলে শেখ মুজিবসহ উপস্থিত সবাই তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। সিরাজ সে অবস্থায়ও শেখ মুজিবের পুত্র কর্তৃক সাধিত ব্যাংক ডাকাতিসহ বিভিন্ন অপকর্ম, ভারতীয় সেবাদাসত্ব না করার, দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য শেখ মুজিবের কাছে দাবি জানালে শেখ মুজিব আরও উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। সে সময় ১নং আসামি মাহবুবউদ্দিন তাঁর রিভলবারের বাঁট দিয়ে মাথায় আঘাত করলে সিরাজ সিকদার মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। শেখ কামাল রাগের মাথায় গুলি করলে সিরাজ সিকদারের হাতে লাগে। ওই সময় সব আসামি শেখ মুজিবের উপস্থিতিতেই তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কিল, ঘুষি, লাথি মারতে মারতে তাঁকে অজ্ঞান করে ফেলেন। এরপর শেখ মুজিব, মনসুর আলী এবং ২ থেকে ৬নং আসামি সিরাজ সিকদারকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেন এবং ১নং আসামিকে নির্দেশ দেন।

১নং আসামি মাহবুবউদ্দিন আহমদ আসামিদের সঙ্গে বন্দি সিরাজ সিকদারকে শেরেবাংলা নগর রক্ষীবাহিনীর সদর দপ্তরে নিয়ে যান। এরপর তাঁর ওপর আরও নির্যাতন চালানো হয়। অবশেষে ২ জানুয়ারি আসামিদের উপস্থিতিতে রাত ১১টার দিকে রক্ষীবাহিনীর

> সদর দপ্তরেই সিরাজ সিকদারকে গুলি করে হত্যা করা হয়। পরে ১নং আসামির সঙ্গে বিশেষ স্কোয়াডের সদস্যরা পূর্বপরিকল্পনামতো বন্দি অবস্থায় সিরাজ সিকদারের লাশ সাভারের তালতলা এলাকা হয়ে সাভার থানায় নিয়ে যায় এবং সাভার থানা পুলিশ পরের দিন ময়নাতদন্তের জন্য লাশ মর্গে প্রেরণ করে।

মামলাটি যখন করা হয়, তখন ক্ষমতায় বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি সরকার। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই মামলাটি করানো হয়েছিল। মামলার বাদী শেখ মহিউদ্দিনের সঙ্গে সর্বহারা পার্টির কোনো সংশ্লিষ্টতা ছিল না। সর্বহারা পার্টির নেতা রানা লেখককে সাক্ষাৎকারে বলেছেন, স্পেশাল ব্রাঞ্চের পুলিশকে দিয়ে মামলাটি সাজানো হয়েছিল শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগকে অপদস্থ করার জন্য। তবে তিনি একটি ব্যাপারে একমত হন যে সিরাজ সিকদারকে সে রাতেই শেরেবাংলা নগরে খুন করা হয়েছিল। সাভারের গল্পটি বানানো।

বিএনপি সরকার সিরাজ সিকদারের জন্য সহানুভূতি এবং প্রতিপক্ষ আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে ঘৃণা সৃষ্টির চেষ্টা করেছিল বলে রানা মন্তব্য করেন। এটাকে তাঁরা আমলে নেননি। বিস্ময়ের ব্যাপার, খালেদা জিয়ার সরকার এই 'হত্যাকাণ্ডের' বিচারের ব্যাপারে কোনো আগ্রহ দেখায়নি। মামলাটির অপমৃত্যু হয়। পরে বিএনপির অনেক নেতা 'সিরাজ সিকদার হত্যা' নিয়ে অনেক কথা বললেও তাঁরা সরকারে থাকাকালে এরকম একটি 'অব্যর্থ অস্ত্র' কেন ব্যবহার করলেন না, কেন মামলাটি চালানো হলো না, এ বিষয়ে তাঁরা নিশ্চুপ। ব্যক্তি সিরাজ সিকদারের ব্যাপারে তাঁদের কোনো আগ্রহ বা আবেগ ছিল না।

যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে একদা সোচ্চার ছিলেন সিরাজ সিকদার, একসময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হয়ে ওঠে তাঁর সন্তানদের গন্তব্য। তাঁর মেয়ে শিখা সিকদার এবং ছেলে শুভ্র সিকদার ৮ ডিসেম্বর ২০০৫ সালে ঢাকায় এসে একবার সংবাদ সম্মেলন করেছিলেন জাতীয় প্রেস ক্লাবে। বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি তখন দ্বিতীয়বারের মতো সরকারে। এক লিখিত বিবৃতিতে শিখা আর শুভ্র বলেন :

> সিরাজ সিকদারকে কোনো ব্যক্তি হত্যা করেনি। শোষক-লুটেরা ও তাদের সহযোগীরা তাঁকে হত্যা করেছে। কোনো সরকারই তাঁর

হত্যার বিচার করেনি। বর্তমান সরকারও এটা করবে না। সরকারের একটি অংশ তাঁকে হত্যা করেছে এবং অন্য অংশটি তার রাজনৈতিক ফায়দা নিয়েছে।

১৫

সাপ্তাহিক *বিচিত্রার* ১৯ মে ১৯৭৮ সংখ্যায় প্রকাশিত নিবন্ধটি মাহফুজ উল্লাহ পরে তাঁর একটি গ্রন্থে সংকলিত করেছেন। সেখানে তিনি সিরাজ সিকদার সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করেন। মাহফুজ উল্লাহর মূল্যায়ন ছিল এরকম :

> বাংলাদেশে বিনা বিচারে বন্দি অবস্থায় 'ক্রসফায়ারে' নিহত প্রথম ব্যক্তি সিরাজ সিকদার। মৃত্যুর আগে সিরাজ সিকদারের নেতৃত্বাধীন সর্বহারা পার্টির কর্মকাণ্ড তৎকালীন শাসকদের মনে ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছিল। জনমনে তৈরি হয়েছিল সিরাজ সিকদারের জন্য একধরনের শ্রদ্ধাবোধ। ১৯৭৪ সালের ১৬ ডিসেম্বর আহূত হরতাল সর্বহারা পার্টির শক্তি সম্পর্কে মানুষকে আশান্বিত করে তোলে। যদিও সিরাজ সিকদার অনুসৃত রণনীতি ও রণকৌশল সম্পর্কে অন্যান্য কমিউনিস্ট পার্টির তীব্র বিরোধিতা ছিল। কিন্তু তাতে সিরাজ সিকদারের পার্টি সদস্য সংগ্রহে ব্যর্থ হয়নি।
>
> সিরাজ সিকদার ছিলেন একজন রোমান্টিক বিপ্লবী, যিনি প্রায় সকল কর্মকাণ্ডে মাও সে তুংকে অনুসরণ করতে চাইতেন। ছাত্রাবস্থায় তিনি যখন আমাদের হলে (মুহসীন হলে) রাতের বেলায় আসতেন সাংগঠনিক আলোচনার জন্য, তখন অনেকেই তাঁর বক্তব্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারত না। বিপ্লবের জন্য তিনি বিভিন্ন পথে পরীক্ষা চালিয়েছিলেন, কিন্তু সফল হতে পারেননি। বেঁচে থাকলে তাঁর রাজনীতির পরিণতি কী হতো, তা বলা কঠিন। বেঁচে থাকলে বাম রাজনীতিতে তাঁর উজ্জ্বল উপস্থিতি ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পর জাতীয় জীবনে কিছু পরিস্থিতি সৃষ্টি করত।

ভাঙনপর্ব

সিরাজ সিকদারের মৃত্যুর পর সর্বহারা পার্টিতে দ্বন্দ্ব, কোন্দল এবং বিভক্তি দেখা দেয়। এক গ্রুপের হাতে অন্য গ্রুপের লোকেরা খুন হতে থাকে। এ সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া যায় মুনীর মোরশেদের বইয়ে।

চুয়াত্তরের সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত সর্বহারা পার্টির বর্ধিত সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছিল, সভাপতির অনুপস্থিতিতে গ্রেপ্তার বা মৃত্যু হলে রাজনৈতিক সাহায্যকারী গ্রুপের তিন সদস্য এবং সামরিক সাহায্যকারী গ্রুপের তিন সদস্য—এই ছয়জন একসঙ্গে বসে সিদ্ধান্ত নেবেন। জিয়াউদ্দিন এবং জ্যোতি তখন পার্বত্য চট্টগ্রামে। তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি। বাকি চারজন একসঙ্গে বসেন পঁচাত্তরের ৯ জানুয়ারি। তাঁরা ১ নং সামরিক সাহায্যকারী আবদুল মতিনকে সমন্বয়ক এবং ২ নং রাজনৈতিক সাহায্যকারী মাহতাবকে সহসমন্বয়ক নির্বাচন করেন। জিয়াউদ্দিন ও জ্যোতিকে রেখেই ছয় সদস্যের 'অস্থায়ী সর্বোচ্চ সংস্থা' (অসস) গঠন করা হয়। অসসের অন্য দুজন হলেন রানা এবং রফিক ওরফে শাহজাহান তালুকদার।

অসস গঠনকে কেউ কেউ ভালো চোখে দেখেননি। তাঁদের মধ্যে ছিলেন চট্টগ্রাম রিলে সেন্টারের পরিচালক খলিল এবং কুষ্টিয়া থেকে বদলি হয়ে আসা আতিক ওরফে দেলোয়ার হোসেন চঞ্চল। তাঁদের সঙ্গে আরও যোগ দেন চট্টগ্রাম শহরের পরিচালক ইকরাম, সিলেটের পরিচালক মনসুর এবং চাঁদপুরের পরিচালক বিন্দু ওরফে মোস্তফা কামাল। অসস তাঁদের ঢাকায় ডেকে পাঠায়। আতিক ২০ জানুয়ারি ঢাকায় এলে তাঁকে 'উৎখাত' করা হয়, অর্থাৎ মেরে ফেলা হয়। এরপর উৎখাত হন বিন্দু। কয়েকদিন পর মনসুর খুন হন দলের লোকদের হাতে।

ব্যক্তি ও গোষ্ঠীগত দ্বন্দ্ব অব্যাহত থাকে। একপর্যায়ে অসস সদস্য শাহজাহান তালুকদারকে বিচ্যুতির অভিযোগে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের মেধাবী ছাত্র শাহজাহান তালুকদার একাত্তর সালে ক্লাস ছেড়ে বিপ্লবের পথের যাত্রী হয়েছিলেন।

রাজনৈতিক লাইন নিয়ে মতপার্থক্য থাকায় নিরাপত্তা ক্ষুণ্ন হবে, এই আশঙ্কায় ঝিনুক ওরফে জাহাঙ্গীরকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। উল্লেখ্য ১৯৭৩ সালের ডিসেম্বরে ঝিনুককে সতর্ক করে দিয়ে সিরাজ সিকদার একটি লিফলেট বিলি করেছিলেন। প্রথম স্ত্রী রওশন আরার সঙ্গে সিকদারের বিয়ে ভেঙে গিয়েছিল ১৯৭০ সালেই। পাঁচ বছরের বিবাহিত জীবনে তাঁদের দুটি সন্তান—মেয়ে শিখা আর ছেলে শুভ্র। রওশন আরা পরে ঝিনুককে বিয়ে করেছিলেন। তাঁদের একটি পুত্রসন্তান আছে।

পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট দেশের রাজনীতিতে বড় রকমের পালাবদল হলেও অসস তাদের আগের রাজনৈতিক লাইন অব্যাহত রাখে। অস্ত্র ও অর্থসংকট মোকাবিলার জন্য অসসের সমন্বয়ক মতিনের নেতৃত্বে পঁচাত্তরের ৪ সেপ্টেম্বর দিনের বেলায় নেত্রকোনায় মোহনগঞ্জ থানা ও ব্যাংকে হামলা চালানো হয়। হামলা সফল হয়। ব্যাংক থেকে লুট করা টাকা তারা নির্বিঘ্নে পার্টির কাছে পৌঁছে দেন। কিন্তু থানা থেকে ফেরার পথে পুলিশের আক্রমণে তাঁদের বিপর্যয় ঘটে। তাঁদের দখলকৃত অস্ত্র খোয়া যায়। এই সংঘর্ষে মোহনগঞ্জের আলম ওরফে নিখিল চন্দ্র, পূর্বধলার নূরু এবং ধরমপাশার হাফিজুদ্দিন মাস্টার নিহত হন। গ্রেপ্তার হন রফিক। বিচারে তাঁর ১৪ বছরের সাজা হয়েছিল।

পঁচাত্তরের ৭ নভেম্বর সিপাহি অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে জেনারেল জিয়াউর রহমানের উত্থান ঘটে। ওই সময় চারটি রাজনৈতিক দল ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচি দেওয়ার লক্ষ্যে ঢাকায় বৈঠকে বসে। দলগুলো হলো মোহাম্মদ তোয়াহার সাম্যবাদী দল (মা-লে), বদরুদ্দীন উমরের বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (মা-লে), সাঈফ-উদ-দাহারের কমিউনিস্ট কর্মী সংঘ এবং অসসের নেতৃত্বে সর্বহারা পার্টি। বৈঠকে তোয়াহা উপস্থিত না থাকলেও তাঁর প্রতিনিধি ছিলেন। সর্বহারা পার্টির প্রতিনিধিত্ব করেন রানা ওরফে আকা ফজলুল হক এবং সুফি ওরফে মহসিন আলী। সভায় তাঁরা একটি যৌথ বিবৃতি দেওয়ার ব্যাপারে একমত হন। বৈঠকে বসেই বিবৃতির একটি খসড়া তৈরি করেন রানা। এতে বলা হয়, আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তা হারানোর সুযোগ

নিয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করে একটা ক্যু সংঘটিত করেছে। এটা জনগণের কোনো উপকারে আসবে না, যদি না তারা কয়েকটা পদক্ষেপ নেয়। রানার ভাষ্য অনুযায়ী :

> এরপর আমি কয়েকটা দাবির উল্লেখ করলাম। বদরুদ্দীন উমর মাস্টারসুলভ ভঙ্গিতে আমার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন—ভালো। সেখানে শ্রমিকনেতা সিরাজুল হোসেন খান এবং *বিচিত্রার* সহকারী সম্পাদক শাহরিয়ার কবিরও উপস্থিত ছিলেন। আমরা তাঁদের সহযোগিতা নিয়ে বিবৃতিটি ছাপাতে চাইলাম। শাহরিয়ার কবিরকে এটা ছাপানোর দায়িত্ব দেওয়া হলো। আমরা ভেবেছিলাম, সে সাংবাদিক, প্রেসের কাজ ভালো পারবে।
>
> লিফলেটটা ছাপানোর পর দেখলাম আমাদের বক্তব্য পাল্টে দেওয়া হয়েছে। লিফলেটে বলা হয়েছে—বিপদের দিনে সেনাবাহিনী এগিয়ে এসেছে; তাদের অভিনন্দন। লিফলেট ইতিমধ্যে ডিস্ট্রিবিউটও হয়ে গেছে। আমাদের কর্মীরা দেখল—আরে, এটা তো আমাদের পার্টি লাইনের বিরুদ্ধে! শাহরিয়ার কবির এই জঘন্য কাজটা করেছে তার মতলব থেকে। এই লিফলেটের মাধ্যমে সে দেখাতে চেয়েছে যে আমরা মিলিটারি ক্যু সমর্থন করেছি।
>
> মোহাম্মদ তোয়াহা অবশ্য এই পাল্টে যাওয়া বক্তব্যের সঙ্গে একমত ছিলেন। পরে তিনি জিয়াউর রহমানের সামরিক সরকারকে সমর্থন দিয়েছিলেন।

এ সময় সর্বহারা পার্টির মধ্যে আরেকটি উপদল মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। এর নেতৃত্বে ছিলেন পার্টির দ্বিতীয় সারির কর্মী প্রবীর নিয়োগী। তাঁর বাড়ি পাবনা। পার্টিতে তিনি কামাল হায়দার নামে পরিচিত। পঁচাত্তরের সেপ্টেম্বরে অসস সমন্বয়ক মতিন গ্রেপ্তার হয়ে গেলে মাহতাব, রানা ও জিয়াউদ্দিনের বিরুদ্ধে ডান সুবিধাবাদের অভিযোগ আনে কামাল হায়দারের গ্রুপ। তাঁরা ষাটের দশকে চিনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের স্লোগান 'বোম্বার্ড দ্য হেডকোয়ার্টার'-এর তত্ত্ব দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে অসসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। তাঁরা অসস নেতাদের 'ভ্রান্ত ও প্রতিবিপ্লবী' আখ্যা দিয়ে একটি পাল্টা কমিটি তৈরি করেন। পঁচাত্তরের

১৪ ডিসেম্বর তাঁরা গঠন করেন 'অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থাপকমণ্ডলী' (অবম)।

অসস সমন্বয়ক মাহতাব অবমকে সমর্থন দেন। অবমের সমন্বয়ক হন কামাল হায়দার। অসস নেতাদের বিরুদ্ধে অবম শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়। জিয়াউদ্দিন, রানা, জ্যোতি, আরিফ ওরফে রইসউদ্দিন তালুকদার, মাসুদ ওরফে আমানউল্লাহ এবং সুফি ওরফে মহসিন আলীকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করে তাঁদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। ১৯৭৬ সালের জানুয়ারিতে রানা, সুফি এবং মিজান নামের একজন কর্মী ঢাকার গ্রিন সুপার মার্কেটের সামনে অতর্কিত আক্রমণের শিকার হন। তাঁদের ওপর গুলি চালানোর চেষ্টা হয়। রানা আক্রমণকারীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লে সে পালিয়ে যায়। তবে কপাল খারাপ মাসুদ ওরফে আমানউল্লাহর। কিছুদিন পর জয়দেবপুরে তাঁকে হত্যা করা হয়।

কামাল হায়দার গ্রুপের নেতৃস্থানীয় কর্মীরা ১৯৭৬ সালের ১১-২০ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় এক বৈঠকে বসেন। বৈঠকে অবম বিলুপ্ত ঘোষণা করে তৈরি হয় 'সর্বোচ্চ বিপ্লবী পরিষদ' (সবিপ)। এর সম্পাদক হন কামাল হায়দার। সদস্য নির্বাচিত হন শফিক ওরফে আনোয়ার কবীর এবং সালাম ওরফে সগির মাস্টার।

কামাল হায়দারের উপদলের মধ্যেও সংহতি ছিল না। মাহতাবের সঙ্গে কামাল হায়দারের বিরোধ দেখা দেয়। মাহতাবকে কামাল 'মধ্যপন্থী সুবিধাবাদী' হিসেবে অভিযুক্ত করেন। এ ধরনের দ্বন্দ্বের অনিবার্য পরিণতি হলো খুনোখুনি। মাহতাব খুন হন। সেই সঙ্গে খুন হন তাঁর স্ত্রী জীবন ওরফে পারভিন আখতার।

অসস নেতারা ১৯৭৬ সালের মার্চে পার্বত্য চট্টগ্রামে নেতৃস্থানীয় কর্মীদের একটা বৈঠক ডাকেন। বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অসস বিলুপ্ত হয়। তৈরি হয় 'অস্থায়ী পরিচালনা কমিটি' (অপক)। কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হন ফরিদপুর ও বরিশালের সাবেক অঞ্চল পরিচালক আরিফ ওরফে রইসউদ্দিন তালুকদার। কমিটির অন্য চারজন সদস্য হলেন রানা, জিয়াউদ্দিন, জ্যোতি এবং পঙ্কজ ওরফে আদিত্য বিকাশ তঞ্চঙ্গ্যা। বৈঠকে মাহতাব, কামাল হায়দার এবং শফিককে বহিষ্কার করা হয়। এই বৈঠকে জিয়াউদ্দিন এবং জ্যোতি উপস্থিত ছিলেন না। এই বৈঠক বিধি অনুযায়ী হয়নি বলে কেউ কেউ মন্তব্য করেন।

১৯৭৬ সালের শেষের দিকে অপকের সঙ্গে যুক্ত হয় উত্তরবঙ্গের সব

শাখা, মুন্সিগঞ্জ, ময়মনসিংহ ও ফরিদপুরের একাংশ। অন্যদিকে মাদারীপুর, ময়মনসিংহ ও ঢাকার একাংশ সবিপের সঙ্গে থাকে। যশোর ও খুলনা সবিপ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বতন্ত্র অবস্থান নেয়।

সর্বহারা পার্টির একটি অংশ ১৯৭৬ সালের শেষের দিকে আলাদা নামে একটি প্রকাশ্য সংগঠন তৈরির চেষ্টা করে। তারা পলিটিক্যাল পার্টিজ রেগুলেশনের (পিপিআর) অধীনে জনগণতান্ত্রিক পার্টি নামে নিবন্ধনের আবেদন জানায়। এই গ্রুপের আহ্বায়ক ছিলেন মইদুল ইসলাম। সরকারি অনুমোদন না পাওয়ায় এ উদ্যোগ ব্যর্থ হয়।

১৯৭৬ সালের এপ্রিল-মে মাসে সবিপ ও অপকবিরোধী একটি ধারার জন্ম দেন সর্বহারা পার্টির সাবেক দুই সমন্বয়ক মহিউদ্দিন বাহার ও মতিন। তাঁদের নেতৃত্বে তৈরি হয় পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টির বিপ্লবী সত্তা, সংক্ষেপে সত্তা। মহিউদ্দিন বাহার তখন জেলে।

১৯৭৮ সালের মার্চে মহিউদ্দিন বাহার জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর পার্টি ছেড়ে দেন। সত্তার নেতৃত্বে আসেন কারাবন্দি মতিন ও নূরু।

১৯৭৬ সালের ৬ ডিসেম্বর গ্রেপ্তার হন কামাল হায়দার। সাতাত্তরের জানুয়ারিতে সবিপের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হন আনোয়ার কবীর। ১৯৭৮ সালের মাঝামাঝি সত্তা ও সবিপ একীভূত হয়।

১৯৭৯ সালের জুন মাসে অনুষ্ঠিত সবিপের বৈঠকে কামাল হায়দারের 'বাম লাইন' বর্জনের সিদ্ধান্ত হয়। সবাই আনোয়ার কবীরের অবস্থানকে সমর্থন দেন। ১৯৮০ সালের ৪ এপ্রিল কামাল হায়দার জেল থেকে ছাড়া পেয়ে সবিপের শেল্টারে আসেন। তাঁকে 'সংশোধনের' সুযোগ দেওয়া হয়। ২৯ মে তিনি কাউকে না জানিয়ে শেল্টার ছেড়ে চলে যান। সেপ্টেম্বরে এই গ্রুপের এক বৈঠকে তাঁকে বহিষ্কার করা হয়। তখন থেকেই এই গ্রুপের নেতৃত্ব দিচ্ছেন আনোয়ার কবীর।

১৯৭৭ সালের আগস্টে অপকের রানা, আরিফ ও সুফি গ্রেপ্তার হয়ে যান। ১৯৭৮ সালের এপ্রিলে ছাড়া পেয়ে তাঁরা রাজনীতিতে আর সক্রিয় থাকেননি। অপকের মূল নেতা তখন জিয়াউদ্দিন।

১৯৬৮ থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত সিরাজ সিকদারের ভূমিকাকে 'বিপ্লবী জাতীয়তাবাদী' হিসেবে মূল্যায়ন করে অপক। ১৯৮০ সালের ৫-৮ নভেম্বর পার্টির কংগ্রেসে পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টির নাম বদলে বাংলাদেশের সর্বহারা

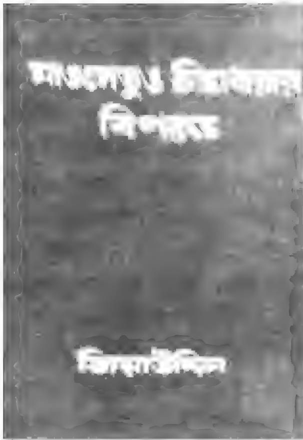
পার্টি রাখা হয়। ছয় সদস্যের কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক হন জিয়াউদ্দিন। কমিটির সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হন কামরুল ওরফে নিজামউদ্দিন, খালিদ হোসেন ওরফে মইদুল, রাশেদ ওরফে আলী জব্বার মাস্টার, মোশাররফ ওরফে সরোয়ার এবং পলাশ ওরফে কামরুজ্জামান।

পার্টিতে ভাঙনের ধারা অব্যাহত থাকে। ১৯৮৭ সালের ২১ এপ্রিল বাংলাদেশের সর্বহারা পার্টির কেন্দ্রীয় সদস্য কামরুল ও পলাশ এবং নেতৃস্থানীয় কর্মী মহসিন কবির, এনাম ও মামুন তৈরি করেন আলাদা কমিটি। এই কমিটির সম্পাদক হন কামরুল। জিয়াউদ্দিন গ্রুপ কামরুল গ্রুপের সদস্যদের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করে। জিয়াউদ্দিন গ্রুপের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য রাশেদ কামরুল গ্রুপের হাতে খুন হন। জিয়াউদ্দিন গ্রুপ তার প্রতিশোধ নেয়। তাদের হাতে কামরুল গ্রুপের দ্বিতীয় প্রধান নেতা পলাশ খুন হন।

১৯৭৮ সালে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে অপকের সাবেক সম্পাদক আরিফ পার্টিকে প্রকাশ্য সংগঠনে রূপান্তর করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তখন জিয়াউদ্দিন এই প্রস্তাবকে 'ডান সুবিধাবাদী ও বিলোপকারী' প্রবণতা বলে চিহ্নিত করে আরিফকে বহিষ্কার করেন।

১৯৮০-র দশকে সর্বহারা পার্টির দুটি কেন্দ্র হয়। একটি নিয়ন্ত্রণ করেন আনোয়ার কবীর। অন্যটি জিয়াউদ্দিন আহমেদের নিয়ন্ত্রণে। দুই কেন্দ্রের মধ্যে 'মতাদর্শগত' লড়াই চলতে থাকে।

ততদিনে জিয়াউদ্দিন গ্রুপ 'অপক' নাম ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বাংলাদেশের সর্বহারা পার্টি নাম গ্রহণ করেছে। ১৯৮৩ সালে তারা 'মাও সে তুং চিন্তাধারার পর্যালোচনা' নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে। এই পুস্তিকায় মাও সে তুং রচনাবলি থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃতি দিয়ে মাও সে তুং চিন্তাধারার কিছু অংশকে মার্কসবাদ-লেনিনবাদবিরোধী হিসেবে দেখায়। জবাবে আনোয়ার কবীর ৩০৯ পৃষ্ঠার একটি বই প্রকাশ করেন। 'মাও সে তুং চিন্তাধারার স্বপক্ষে' নামে বইটি ছাপা হয় ১৯৮৪ সালে। এ বইয়ে জিয়াউদ্দিন গ্রুপের বক্তব্যের সমালোচনা করে মাও সে তুং চিন্তাধারার প্রতি সম্পূর্ণ আনুগত্য ঘোষণা করা হয়। বলা হয়, 'কমরেড মাও সে তুং হচ্ছেন এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মার্কসবাদী-লেনিনবাদী। ... আজকের যুগে যে সংগঠন ও ব্যক্তি মাও সে তুং চিন্তাধারা




জিয়াউদ্দিন আর আনোয়ার কবীরের মধ্যে মতাদর্শগত লড়াই নিয়ে লেখা দুজনের বইয়ের প্রচ্ছদ

বর্জন ও বিরোধিতা করবে, তাঁদের পক্ষে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের চত্বরে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়।'

আনোয়ার কবীরের 'মাও সে তুং চিন্তাধারার স্বপক্ষে'র জবাবে ১৯৮৯ সালে জিয়াউদ্দিন প্রকাশ করেন 'মাও সে তুং চিন্তাধারায় বিপক্ষে' নামে একটি ৮১ পৃষ্ঠার বই। বইয়ের উপসংহারে শেষ পরিচ্ছেদের মন্তব্যটি গুরুত্বপূর্ণ। জিয়াউদ্দিন লেখেন :

> মাওবাদীরা দাবি করে থাকেন যে, আধা ঔপনিবেশিক, ঔপনিবেশিক ও নয়া ঔপনিবেশিক দেশের বিপ্লবী তত্ত্ব হচ্ছে মাও সে তুং চিন্তাধারা। এই দৃষ্টিভঙ্গি ভুল। এসব দেশের বিপ্লব বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবেরই অংশ। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বের আলোকেই এসব দেশের বিপ্লব সংগঠিত করতে হবে। মাও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রকে দেখেছেন চিনের প্রগতি ও মঙ্গলের অবস্থান থেকে। এটা এক নতুন

> ধরনের সংশোধনবাদ। এদেশে বিপ্লবের যথার্থ বিকাশ হতে পারে মাও চিন্তা বর্জন করে; এর কোনো প্রভাবকে ধরে রেখে নয়। এই তত্ত্বের প্রভাবের জের যাদের মনে এখনো রয়েছে তাদের প্রতি বিশেষভাবে এবং সাধারণভাবে বিপ্লবীদের প্রতি আহ্বান, আপনারা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-স্ট্যালিন থেকে অধ্যয়ন করুন এবং মাও চিন্তার সংস্কারবাদী চরিত্রকে বুঝতে চেষ্টা করুন। মাও চিন্তা বর্জন করুন। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিজয় অনিবার্য।

১৯৮৯ সালে জিয়াউদ্দিন দলকে প্রকাশ্য করার প্রস্তাব দেন। তাঁর প্রস্তাব কমিটি নাকচ করে দেয়। জিয়াউদ্দিন পার্টি থেকে পদত্যাগ করেন।

১৯৯০ সালের এপ্রিল মাসে বাংলাদেশের সর্বহারা পার্টির কংগ্রেসে পার্টি বিলুপ্ত হয়। জন্ম নেয় বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (বিসিপি)। সম্পাদক হন খালিদ হোসেন। ১৯৯০ সালের ৯ আগস্ট বিসিপির লোকদের হাতে খুন হন বিদ্রোহী গ্রুপের নেতা কামরুল।

জিয়াউদ্দিনের আন্ডারগ্রাউন্ড জীবন আর ভালো লাগছিল না। সর্বহারা পার্টির কাজ করতে গিয়ে তিনি অসুস্থ ও হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রপতি থাকাকালে সেনাবাহিনীর কোয়ার্টার মাস্টার জেনারেল সাদিকুর রহমান চৌধুরী পরে রাষ্ট্রপতি এইচ এম এরশাদের সামরিক সচিব হন। তিনি জিয়াউদ্দিনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। জিয়াউদ্দিন তাঁকে টেলিফোন করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার আগ্রহ জানান। রাষ্ট্রপতি এরশাদের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে কথা বলে তিনি জিয়াউদ্দিনকে সবুজসংকেত দেন। এরপর জিয়াউদ্দিন প্রকাশ্য হন।

১৯৯১ সালে বিএনপি নির্বাচনে জয়ী হয়ে সরকার গঠন করে। প্রধানমন্ত্রী হন বেগম খালেদা জিয়া। তিনি জিয়াউদ্দিনকে ১৯৯৩ সালের ২ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম ডেভেলপমেন্ট অথরিটির (সিডিএ) চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ দেন। ১৯৯৬ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত একটানা তিন বছর তিনি এই দায়িত্বে ছিলেন। সরকারি চাকরি জিয়াউদ্দিনের ধাতে সয়নি। ১৯৯৯ সালে তিনি চট্টগ্রামের ইংরেজি মাধ্যমের প্রেসিডেন্সি ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে প্রিন্সিপাল হিসেবে যোগ দেন।

জিয়াউদ্দিন ছিলেন চৌকস সেনা কর্মকর্তা। পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে

তাঁকে নিয়ে আলোচনা হতো। পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তারা বলতেন, কোনো বাঙালি যদি কোনোদিন সেনাপ্রধান হয়, তাহলে জিয়াউদ্দিন হবেন সেই ব্যক্তি। তাঁকে অনেকে দালাই লামা নামে ডাকতেন। সততা এবং চিরকুমার থাকার ব্রত নিয়েছিলেন বলেই হয়তো-বা এ তকমা জুটেছিল। বিয়ে অবশ্য করেছিলেন অনেক বছর পর, রাজনীতির পিচ্ছিল পথ ছেড়ে এসে।

সর্বহারা পার্টির নামে একটি কাঠামো এখনো টিকে আছে আনোয়ার কবীরের নেতৃত্বে।

ভেতর থেকে দেখা

জিয়াউদ্দিন আহমেদ ছিলেন সর্বহারা পার্টির চট্টগ্রাম ব্যুরোর পরিচালক। দলে তিনি হাসান নামে পরিচিত। পার্বত্য চট্টগ্রামের সামরিক ঘাঁটি নিয়ন্ত্রণ করতেন তিনি। সিকদারের মৃত্যুর পর দলের সাহায্যকারী গ্রুপের অন্যদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন থাকে। ১৯৭৬ সালের মার্চে পার্বত্য চট্টগ্রামের একটি গোপন আস্তানায় অনুষ্ঠিত হয় সর্বহারা পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস। এই কংগ্রেসে রইসউদ্দিন আরিফকে প্রধান করে দলের কেন্দ্রীয় কমিটি পুনর্বিন্যস্ত হয়। দলে তখন ভাঙনের সুর।

সিকদারের গ্রেপ্তার ও ছিয়াত্তরের পার্টি কংগ্রেসের মধ্যবর্তী অংশের বিস্তারিত কোনো বিবরণ দল থেকে তৈরি করা হয়নি। এ সময়ের একটি সারসংক্ষেপ অবশ্য তৈরি করেছিলেন স্বয়ং জিয়াউদ্দিন। এটি তাঁর জবানিতে পাওয়া যায়। তাঁর এই পর্যালোচনামূলক বিবরণে দলের ভেতরের অনেক কথা উঠে এসেছে। সেই সঙ্গে দলের নেতা-কর্মীদের প্রসঙ্গও বাদ যায়নি। এই মূল্যায়ন জিয়াউদ্দিনের একান্ত নিজস্ব। মূল্যায়নটি একদিক থেকে ব্যতিক্রমী। কারণ, এতে আত্মসমালোচনা আছে এবং কাউকে গালাগাল করা হয়নি। জিয়াউদ্দিনের লিখিত ভাষ্য এখানে তুলে ধরা হলো।

কমরেড সিরাজ সিকদারের গ্রেপ্তার ও হত্যার পর থেকে মার্চ '৭৬ অধিবেশন পর্যন্ত সংঘটিত ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে মতামত

ভূমিকা

সভাপতি কমরেড সিরাজ সিকদারের গ্রেপ্তার ও হত্যার পরবর্তী ঘটনাবলি সঠিকভাবে বুঝতে হলে সভাপতির মৃত্যুর পূর্বেকার সময়ের পার্টির অভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে একটা ধারণা থাকা প্রয়োজন। এই অবস্থাটি ছিল নিম্নরূপ।

পার্টিতে আসার কিছুদিন পর আমাকে ময়মনসিংহে নিয়োগ করে। কমরেড মতিনকে সে অঞ্চল থেকে প্রত্যাহার করলে এ বিষয়ে সভাপতির সাথে তার দ্বন্দ্ব শুরু হয় এবং বিভিন্ন সময়ে তার অসন্তুষ্টি প্রকাশ পায়। নিরাপত্তার কারণে আমাকে ময়মনসিংহে নিয়োগ করার যথার্থতা সম্পর্কে সভাপতি কমরেড রানার মাধ্যমে কমরেড মতিনকে বোঝানোর প্রচেষ্টা চালান। পরে সভাপতির সাথে আমার ও কমরেড রফিকের উপস্থিতিতে এক বৈঠকে কমরেড মতিন বিষয়টি পুনরায় উল্লেখ করলে সভাপতি আমাকে এড়িয়ে যান। একজন নতুন কর্মী হিসেবে আমাকে একটা অঞ্চলের দায়িত্ব দেওয়া উচিত ছিল কি না, সেটা অবশ্যই বিবেচ্য এবং এ ব্যাপারে দ্বিমত থাকাটা স্বাভাবিক ও যথাযথ। তবে কমরেড মতিনের অসন্তুষ্টির কারণ সেটা নয়। তাকে যে পদাবনতি করা হলো বা ময়মনসিংহ থেকে সরানো হলো, সেটাই তার নিকট প্রধান বিষয়বস্তু এবং তার চাইতে আমাকে কেন প্রাধান্য দেওয়া হলো, সেটাই তার অসন্তুষ্টির মূল কারণ।

কমরেড মতিন পার্টির তখনকার বিকাশের স্তরে সামরিক ও সমন্বয়ের কাজে দক্ষতার পরিচয় দেন (আমার জানা মতে)। আমাকে তার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবেই দেখতেন এবং কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম সদস্য কমরেড মজিদ শত্রুর হাতে ধরা পড়ায়, কমরেড রানার কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে পদাবনতি ঘটায় ও প্রধান সমন্বয়কারী কমরেড জামিলের সরকার কর্তৃক গ্রেপ্তার হওয়ার পর তিনি নিজেকে সভাপতির পরবর্তী ব্যক্তি হিসেবেই ধরে নিয়েছিলেন। বিশেষ করে '৭৪-এর হরতালের পরবর্তী সময় কমরেড মতিনই সমন্বয়ের কাজ চালাতেন, যদিও তিনি প্রধান সমন্বয়কারী হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন না।

অন্যদিকে কমরেড মতিনের রুক্ষ আচার-ব্যবহার, ছোটখাটো অপরাধে কর্মীদের খতম করার প্রবণতা, অতি বিপ্লবী সাজার ঝোঁক ও ভয়ংকর রকমের

নৈতিকতাসম্পন্ন যোগ্য বিপ্লবী হিসেবে নিজেকে জাহির করার মনোভাব ইত্যাদি কারণে কিছুসংখ্যক কমরেড তাকে ভালোভাবে গ্রহণ করতেন না। তার তাত্ত্বিক ও শিক্ষাগত মানও নিম্ন ছিল।

আমাকে পুরনো নেতৃস্থানীয়রা সন্দেহের চোখেই দেখতেন। সামরিক বাহিনীর উজ্জ্বল 'ক্যারিয়ার' ছেড়ে বিপ্লবে যোগ দেওয়াটা অনেকেই স্বাভাবিকভাবে নিতে পারেননি। কোনো ব্যক্তিস্বার্থজনিত কারণে না হলেও প্রতিবিপ্লবী চর হিসেবে বিপ্লবকে ক্ষতিসাধন করার উদ্দেশ্যে অনুপ্রবেশ করেছে কি না, এ দৃষ্টিকোণেও অনেকে দেখতেন। আবার পার্টির অভ্যন্তরে (গণতান্ত্রিক পরিবেশের অভাবে) শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থার প্রতিকারের জন্য কিছুসংখ্যক কমরেড আমার দিকেই দৃষ্টিপাত করতেন।

কমরেড জাবেদ ও কমরেড মতিনের মধ্যে পূর্ব থেকেই দ্বন্দ্ব ছিল। স্বয়ং সভাপতিকেই একবার মধ্যস্থতা করে তাদের মধ্যে কার্যকর অবস্থা সৃষ্টি করতে হয়েছিল।

চট্টগ্রামে হরতালের পর এক বৈঠকে সভাপতি কমরেড মতিনকে সমন্বয়ের দায়িত্বটি আমাকে বুঝিয়ে দিতে বলেন। পরে নিরাপত্তার সমস্যার কারণে আমাকে পার্বত্য অঞ্চলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

'৭৪-এর হরতালের পর এক বৈঠকে সভাপতি নিম্নলিখিত নিয়োগ-বদলি করেন।

ক. কমরেড জাফর ও তার স্ত্রী কমরেড লিপিকে ঢাকা রিলে সেন্টারের দায়িত্ব দেওয়া হলো।

খ. কমরেড জাবেদকে চট্টগ্রাম থেকে প্রত্যাহার করে ময়মনসিংহে নিয়োগ করা হয়। আবার এ সিদ্ধান্ত পাল্টিয়ে কমরেড মতিনকে ময়মনসিংহে নিয়োগ করেন এবং কমরেড জাবেদকে উত্তরবঙ্গে পাঠান।

কমরেড রফিকের স্থলে অন্য কাউকে নিয়োগ করার প্রয়োজনীয়তার কথা সভাপতি উল্লেখ করলে কমরেড বিন্দু ও কমরেড মনসুর থেকে একজনকে নিয়োগ করার জন্য কমরেড মতিন প্রস্তাব রাখেন।

সেপ্টেম্বর '৭৪ অধিবেশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সভাপতি ও প্রধান সমন্বয়কারী উভয়ের অনুপস্থিতিতে সাহায্যকারী গ্রুপদ্বয়ের 'যে কেউ উদ্যোগ নিয়ে সভা ডাকবেন ও ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ করবেন'—(অলিখিত সিদ্ধান্ত)।

সাহায্যকারী গ্রুপের কোনো কার্যকরী ক্ষমতা ছিল না। এমনকি

ভোটাধিকারও নয়। তাই সভাপতির গ্রেপ্তার ও হত্যার পর এই ভুল লাইনের পরিণতি হিসেবে নেতৃত্বজনিত সংকট ও চরম বিশৃঙ্খল এবং কর্মীদের নিম্নমান ও সভাপতির মৃত্যুর পর আবেগ ও উত্তেজনাময় পরিস্থিতিতে তাড়াহুড়াবাদকে প্রশ্রয় দেওয়া এবং এর ফলে সার্বিক অবস্থা জটিলাকার ধারণ করে।

ঘটনাবলির বিবরণ :

২৬ ডিসেম্বর '৭৪ তারিখে আমি পাহাড়ে যাই। এর একদিন পর কমরেড জ্যোতি চট্টগ্রামে সভাপতির সাথে বৈঠকে যোগ দিতে যান।

আমার নতুন প্রাপ্ত দায়িত্ব ছিল :

ক. একটি ক্যাডার স্কুল স্থাপন করা।

খ. পার্বত্য অঞ্চলের মাঝে একটি সমন্বিত অঞ্চল গড়ে তোলা।

গ. চট্টগ্রাম অঞ্চল পরিচালনা করা।

চট্টগ্রামের দায়িত্ব কমরেড জাবেদ থেকে বুঝে নিয়ে তাকে ময়মনসিংহের দায়িত্ব বুঝিয়ে দিই আমি। ৩ জানুয়ারি '৭৫-এ কমরেড মিজান রেডিওতে সভাপতির দুর্ঘটনার সংবাদ শুনে এসে আমাকে অবহিত করেন। সেদিনই বা তার পরদিন কমরেড জাবেদ ও কমরেড স্বপ্ন পাহাড়ে পৌঁছেন। এরপর কমরেড জ্যোতি শহর থেকে ফিরলে সংবাদপত্রে দুর্ঘটনা সম্পর্কে দেখি। তারপর আসেন কমরেড আতিক—তার ও কমরেড খলিল স্বাক্ষরিত একটা বিজ্ঞপ্তি দেখান। এটা তখনকার মতো আমার কাছে অস্বাভাবিক বা চক্রান্তমূলক ঠেকেনি। কমরেড জ্যোতিও শহরে বিজ্ঞপ্তিটি পড়েন এবং তিনিও এটাকে সন্দেহের চোখে দেখেননি।

এর একদিন পর কমরেড আতিক পুনরায় আসেন। কমরেড জ্যোতি, কমরেড আতিক, কমরেড জাবেদ ও আমি এক বৈঠকে বসি। বৈঠকের বিবরণ হলো :

ক. কমরেড আতিক ও কমরেড জাবেদের মতে একমাত্র সাহায্যকারী গ্রুপদ্বয় বৈঠক করে কেন্দ্র স্থাপন করতে পারে না। একমাত্র সেপ্টেম্বর অধিবেশনের অনুরূপ বৈঠকেই এ সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে। আর সাহায্যকারী গ্রুপদ্বয়ের নিজ থেকে কার্যকরী ক্ষমতা গ্রহণ করার অধিকার নেই। এ প্রস্তাবের সাথে আমি ও কমরেড জ্যোতি একমত হই। তবে সাহায্যকারীদের অন্যান্যের সাথে বৈঠকের গুরুত্ব ও

প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করি। এরপর আমি ও কমরেড জ্যোতি অঞ্চল পরিচালক ও গুরুত্বপূর্ণ কর্মীদের একটি বৈঠক আহ্বান করে তিন কপি বিজ্ঞপ্তি কমরেড রানা, কমরেড মাহতাব, কমরেড মতিন ও কমরেড রফিকের নিকট নিয়ে যাওয়ার জন্য কমরেড আতিককে দিই।

খ. কমরেড আতিককে চট্টগ্রাম কো-অর্ডিনেটিং সেন্টারের দায়িত্বে নিয়োগ করে একটি বিজ্ঞপ্তি লিখি। কমরেড আতিকের বক্তব্য অনুযায়ী সভাপতি নাকি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। আর বর্ধিত অধিবেশন ও অন্যান্য কাজের জন্য এর প্রয়োজন ছিল।

গ. কমরেড জাবেদ আমাকে পার্টির নেতা বানাবার জন্য বারবার উল্লেখ করেন এবং আমাকে এ বিষয়ে বুঝিয়ে রাজি করাতে চাইলে আমি অসম্মত থাকি। তিনি বারবার আমাকে বলেন যে, আমি (হাসান) কোনো উদ্যোগ না নিলে কমরেড মতিন পার্টির ক্ষমতা দখল করে নেবে। এ কথার বাস্তবতা উপলব্ধি করলেও আমি তার সাথে একমত হইনি। কমরেড জ্যোতি এর প্রতিবাদ করেন।

বর্ধিত অধিবেশনের প্রস্তাব স্বাক্ষরের পর আমার মাঝে বেশ দোদুল্যমানতা সৃষ্টি হয়। আমার স্বাক্ষরিত প্রস্তাবকে 'ব্যক্তিগত উদ্যোগ' আখ্যা দিয়ে সভাপতির দুর্ঘটনার সাথে এটিকে জড়িয়ে একটা গণ্ডগোল সৃষ্টি করে পার্টির অভ্যন্তরে ও জনগণের মাঝে একটা ভুল-বোঝাবুঝির সৃষ্টি করতে পারে ভেবে আমি চিন্তিত হয়ে পড়ি। যদিও নীতির ক্ষেত্রে এসব প্রশ্নের প্রাধান্য পাওয়া অনুচিত, তবু বাস্তবতাকেও ঠেলে ফেলা যায় না। কমরেড আতিক প্রস্তাবটি নিয়ে শহরে চলে যান। একপর্যায়ে প্রস্তাবপত্রটি না পাঠানোর জন্য কমরেড জ্যোতিকে প্রস্তাব দিই। কিন্তু কমরেড জ্যোতি দৃঢ়ভাবেই পাঠাবার সপক্ষে থাকেন। কমরেড আতিক চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পর কমরেড স্বপন কমরেড মতিনের লেখা 'অনুরোধপত্র' এবং কমরেড শফিকের ও কমরেড রানার লেখা পত্র নিয়ে শহর থেকে এসে পৌছান। কমরেড মতিন ও কমরেড শফিকের পত্রানুযায়ী চারজন সাহায্যকারীর বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ নিয়ে তাদের একজনের সেগুলো প্রস্তাবাকারে এনে আমাদের সঙ্গে আলাপ করার কথা ছিল। আর আমাদের চেহারাগত বৈশিষ্ট্যের জন্য পাহাড়ে থাকতেই আমাদের বলা হয়। উল্লেখযোগ্য যে আমাদেরও যে কোনো প্রস্তাব থাকতে

পারে, এটাকে কোনো গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। কমরেড রানার পত্রে উপরোক্ত পয়েন্ট ব্যতীত আমাকে চট্টগ্রামের মহিলাদের ও অন্যান্য কাজ সম্পর্কে অনুরোধ জানানো হয়েছিল সাহায্য করতে।

পার্টির কেন্দ্রীয় ফান্ড ও অতীত কাজের সার-সংকলন সম্পর্কে কিছু প্রস্তাব লিখে কমরেড জ্যোতি ও আমি কমরেড জাবেদকে শহরে পাঠাই। যাওয়ার পথে কমরেড জাবেদ, কমরেড স্বপন ও কমরেড শফি আর্মির হাতে ধরা পড়ে। ছোট বলে শফিকে ছেড়ে দেয় আর্মি। পাহাড়ে কম্বিং শুরু হয়। কদিন পর শফিকে আমরা শহরে পাঠাই। সে আর ফিরে আসেনি (টাঙ্গাইলে সর্বোচ্চ সংস্থা কর্তৃক সে খতম হয়)। এরপর কমরেড জ্যোতি তার বাহিনী নিয়ে উত্তরে চলে যান। ভারতীয় ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনী যৌথভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে কম্বিং চালায়।

কম্বিং চলাকালে স্থানীয় জনগণের কাছ থেকে কমরেড জাবেদের ফিরে আসার সংবাদ পাই। এবং তার সাথে যোগাযোগ করি। তার একপা প্লাস্টার করা ছিল। ধরা পড়ার পর পালাতে চেষ্টা করলে আর্মি তার পা ভেঙে দেয়। জানতে পারি, চট্টগ্রাম ব্রিগেড কমান্ডার দস্তগীর সরকারের আদেশক্রমে তাকে পাঠিয়েছে। আমার কাছে সরকারের পাঠানো প্রস্তাব হলো, আমি যদি আত্মসমর্পণ করি, তাহলে আমাকে বিদেশে সেটেল করিয়ে দেওয়া হবে। কমরেড জাবেদের মাধ্যমে ব্রিগেডিয়ার দস্তগীর পেন্সিলে লেখা একটা চিরকুট পাঠায়। কাগজটি ছিল নিম্নরূপ :

DALAI LAMA
FAIR DEAL
Friend from Latashaif of Latambar

সামরিক বাহিনীতে আমার নিক নেম ছিল দালাই লামা। লাতাশা পশ্চিম পাকিস্তানের বান্নুর এক ব্যক্তির নাম—আমার ও দস্তগীরের পরিচিত। লাতাম্বার বান্নুরই নিকটবর্তী এক স্থানের নাম। এখানে আমরা আর্মি ম্যানুভার করেছিলাম। আমাদের যে টিকে থাকা সম্ভব, তা কমরেড জাবেদকে বোঝাবার সময় আমি কাগজটি ছিঁড়ে ফেলি। কমরেড শাহনেওয়াজও উপস্থিত ছিল তখন। কম্বিংয়ের কারণে ভাঙা পায়ে কমরেড জাবেদকে আমাদের সাথে

DALAI LAMA
FAIR DEAL

NICK NAME

DALAI LAMA

লে. কর্নেল জিয়াউদ্দিনকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার জন্য সাংকেতিক বার্তা পাঠিয়েছিলেন ব্রিগেডিয়ার দস্তগীর

রাখা সম্ভব ছিল না বলে তাকে এক নিরাপদ স্থানে রেখে আমরা অন্যত্র সরে যাই। ১৫ দিন পর তার সাথে প্রোগ্রাম রাখি দেখা করার। নির্দিষ্ট প্রোগ্রামে তাকে পাওয়া যায়নি। আমাদের জন্য একটি চিঠি তিনি সহানুভূতিশীলদের হাতে রেখে যান। চিঠির বক্তব্য ছিল, পাহাড়ে পড়ে থাকার পেছনে তিনি কোনো যুক্তি খুঁজে পাচ্ছেন না এবং তার চিকিৎসার প্রয়োজন; আর তাই তিনি শহরে চলে যাচ্ছেন।

এর কিছুদিন পর কিছুকালের জন্য কম্বিং বন্ধ থাকে। কমরেড খলিলের সাথে আলাপে নিম্নোক্ত বিষয়াদি জানতে পারি :

ক. কমরেড আতিককে ময়মনসিংহে আটকানো হয়েছে এবং কমরেড মতিনকে প্রধান সমন্বয়কারী করে 'অস্থায়ী সর্বোচ্চ সংস্থা' নামক একটি কেন্দ্র গঠিত হয়েছে।

খ. কমরেড আতিক আমাদের (আমি ও জ্যোতি) লিখিত প্রস্তাবগুলো চট্টগ্রামে ফেলে গিয়েছেন।

গ. সর্বোচ্চ সংস্থা গঠনের পক্ষে জনমত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ময়মনসিংহে ভীতিজনক পরিবেশে কমরেড বিন্দু ও কমরেড মনসুরের স্বাক্ষর নেওয়া হয়েছে। এবং এ ব্যাপারে জনমত সৃষ্টি হচ্ছে।

ঘ. কমরেড মতিন জাবেদকে 'ফেলে দেওয়া'র জন্য কমরেড বিন্দু ও কমরেড মনসুরকে নির্দেশ দিয়েছেন।

ঙ. সর্বোচ্চ সংস্থা থেকে কমরেড লাবলুকে চট্টগ্রামের দায়িত্ব বুঝে নেবার জন্য পাঠানো হয়েছিল এবং ময়মনসিংহে যাওয়ার জন্য কমরেড খলিলকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

চ. কমরেড রানার এক পত্রে কমরেড খলিলের পদক্ষেপসমূহ যথাযথ এবং সময়োপযোগী বলে জানানো হয় (হয়তো এর মাধ্যমে কমরেড খলিলকে নিয়ে গিয়ে খতম করার উদ্দেশ্যে এটা একটা কৌশল ছিল)।

ছ. মহিলাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য ঢাকা থেকে কুরিয়ার এলে মহিলাদের পাঠিয়ে দেওয়ার নির্দেশসংবলিত চিঠিটি কমরেড খলিল তাদের দেখান। মহিলারা ঢাকা যেতে রাজি হননি।

জ. কমরেড আলম, কমরেড মনসুর, কমরেড বিন্দু আমার সাথে দেখা করার জন্যে চট্টগ্রামে অপেক্ষা করছেন।

ঝ. কমরেড জাফর কমরেড লিপিসহ ঢাকা হতে চট্টগ্রামে এসেছেন। শেল্টারের যে মূল্যবান দ্রব্যাদি তারা বহন করছিলেন, গাড়ি থেকে নামার সময় তার সুটকেসটা তারা যথাস্থানে পাননি।

কমরেড আলমের একটি পত্রে তিনি আমাকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে অনুরোধ জানান। এবং কমরেড অনন্ত ও কমরেড শাহনেওয়াজের মধ্যে একজনকে ওখানে পাঠাতে বলেন। এত কথার মাঝেও কেন তিনি কমরেড আতিককে আটকিয়েছেন তা উল্লেখ করেননি। তাছাড়া পূর্বের চিঠিতে চেহারাগত বৈশিষ্ট্যের জন্য আমাকে পাহাড়ে থাকতে বলে (তখন পাহাড়ের প্রতি সরকারের বিশেষ দৃষ্টি থাকা সত্ত্বেও) আবার ময়মনসিংহ যাওয়া আমার কাছে কোনো দিক থেকেই নিরাপদ মনে হয়নি—না সরকারের তৎপরতার দরুন আসা-যাওয়ার ব্যাপারে, না আলাপ-আলোচনায় সর্বোচ্চ সংস্থার আন্তরিকতার ওপর।

এরপর আমি মন্তব্য করি যে মতিনই এসব ব্যাপারের হোতা—কেউ যদি তাকে নকআউট করে দেয় তাহলে পার্টির ৭৫ ভাগ সমস্যা মিটে যাবে। তবে কমরেড খলিল বলেন যে, আমাদের আলাপে যাওয়া উচিত এবং মনে করি যে বিপ্লবের জন্য ঐক্য প্রয়োজন। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সুন্দর সমাধান করতে পারলে ভালো হয়। তাই ধৈর্যসহকারে আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যাওয়াই যথাযথ।

কমরেড অনন্ত আমার থেকে অনেক দূরে অন্য অঞ্চলের অন্য পরিচালকের অধীনে অবস্থান করছিলেন। আর পত্রে নির্ধারিত সময়সীমার সংকীর্ণতার দরুন কিছু করার ছিল না। এর কিছুদিন পর কমরেড গিয়াস পাহাড়ে আসেন। আমার পূর্বে তিনি নাকি সর্বোচ্চ সংস্থার সদস্যদের সঙ্গে দেখা করে আসেন। তার কাছে জানতে পারি যে সংস্থার সদস্যরা আমার সাথে দেখা করতে ইচ্ছুক। কিন্তু কমরেড খলিলের মাধ্যমে তারা কোনো যোগাযোগ করতে নারাজ (তারা নিজের ভুলগুলো উপলব্ধি না করে অন্যের ভুলকে একতরফাভাবে দেখেন। এর উৎস হলো হত্যারীতির প্রচলন এবং বিজ্ঞানের বিপরীতে পছন্দ-অপছন্দের প্রাধান্য বিস্তার)। কমরেড আতিককে আটকানো এবং খতমের ব্যাপারে এবারও তারা কিছু বলেননি। কমরেড গিয়াসের মাধ্যমে কিছু দলিলপত্র পাই, তাতেও এর কোনো উল্লেখ ছিল না। কমরেড গিয়াসকে কমরেড খলিলের দায়িত্ব বুঝে নিতে বলি এবং দক্ষিণে চলে আসার জন্য কমরেড খলিলকে চিঠি দিই। এ ছাড়াও আমাদের প্রস্তাবের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে সর্বোচ্চ সংস্থার সদস্যদের পত্র দিই। কমরেড গিয়াস ফেরার সময় সংস্থার একজন সদস্যকে নিয়ে আসার কথা ছিল। কমরেড গিয়াসের সাথে আলাপের সময় অভ্যন্তরীণ ঐক্যের ব্যাপারে আমি জোর দিই এবং সংস্থার সাথে আলাপে যাওয়াই ভালো বলে জানাই।

এরপর কমরেড খলিল আসেন। তাকে পার্টির অভ্যন্তরীণ ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলি এবং আলাপের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করি। তার শহরের কাজ কমরেড গিয়াসকে বুঝিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিই। তাদের নিরাপত্তার কথা উল্লেখ করলে কমরেড রুবী ও কমরেড লিপিকে পাহাড়ের সংলগ্ন সমতলের শেল্টারে পাঠিয়ে দিতে বলি। সাময়িকভাবে তখন কম্বিং বন্ধ ছিল।

কমরেড বিন্দু ও কমরেড খলিল পাহাড়ে আসেন এবং তাদের দুজনসহ কমরেড মনসুর, কমরেড আলম ও কমরেড গিয়াসের স্বাক্ষরিত সর্বোচ্চ সংস্থার নিকট প্রেরিতব্য কটি পত্র আমাকে দেন। সেগুলোতে আমার ও কমরেড জ্যোতির স্বাক্ষরের জন্য দুটো স্থান ফাঁকা ছিল। সংস্থার নিকট এভাবে সরাসরি পত্র দেওয়ার আমি পক্ষপাতী ছিলাম না। কারণ, সংস্থা এরকমই একটা কিছু চাচ্ছিল, যাকে পুঁজি করে পার্টিকে বিভক্ত করা চলে। কমরেড মনসুর ও আলম আমার সাথে দেখা করার জন্য শহরে অপেক্ষা করছিলেন। বিন্দুকে নিজ অঞ্চলে ফিরে যেতে বলে কমরেড মনসুর ও আলমকেও নিজ নিজ অঞ্চলে ফিরে যেতে বলে পত্র দিই।

সমতলে বাস্তব অসুবিধার দরুন কমরেড রুবী ও কমরেড লিপিকে পাহাড়ে নিয়ে আসা হয়। এর কিছুদিন পর কমরেড জ্যোতিকে উত্তর থেকে খলিলের সাথে দেখা করে টাকাপয়সার একটা হিসাব দিতে বলি। কমরেড রুবীর কাছ থেকে এ সময় কমরেড বিন্দুর খতমের কথা জানতে পাই। তারপর কমরেড গিয়াস আসার স্থিরীকৃত দিনেই পুনরায় কম্বিং শুরু হয় এবং এলাকা ছেড়ে দিয়ে নতুন কাজ বিস্তারের জন্য দক্ষিণে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হই। তবে দক্ষিণে যাওয়ার পূর্বে কমরেড মনসুরের আসার কথা ছিল। তার জন্য অপেক্ষা করি। কিন্তু কুরিয়ার নাসির সুবিধাবাদী হওয়ায় কমরেড মনসুরের প্রোগ্রামের কোনো সংবাদ পাইনি। এ সময়ে কমরেড জাফরের সাথে আলাপে নিম্নলিখিত তথ্যাদি পাই :

১. কমরেড জাবেদের সঙ্গে কমরেড জাফরের দেখা হয় ঢাকায় এবং কমরেড জাবেদ তাঁর কাছে অঞ্চল পরিচালকদের প্রোগ্রাম জানতে চান।
২. কমরেড জাবেদের প্রস্তাব—আবু স্যার, কমরেড জাফর ও আমাকে (হাসান) নিয়ে একটি কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করাকে কমরেড জাফর সমর্থন করেন না।
৩. কমরেড জাবেদ কমরেড জাফরকে বলেন যে, সভাপতি ধরা পড়ার আগে হালিশহর শেল্টারের পাশের বাড়ির একটা ছোট ছেলেকে একটি চিঠি পোস্ট করতে নিয়ে যেতে দেখলে তাকে তিনি (জাবেদ) চিঠি সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। ছেলেটি উত্তর দেয়, পাশের বাড়ির (পূর্বোক্ত শেল্টার) এক মহিলা তাকে চিঠিটি পোস্ট করতে দিয়েছে।

এটাকে গুরুত্ব না দিয়ে তিনি চলে যান। সভাপতির ধরা পড়ার পর ঘটনাটা হঠাৎ তাঁর মনে পড়ে যায় এবং শেল্টারের মহিলাকে (ঝুমা) চিঠির ব্যাপারে চাপ দেন। তাঁকে শপথ করিয়ে মহিলা বলেন যে, পার্টিতে তিনি বেশ্যা ব্যতীত কিছু নন এবং প্রতিশোধের তাড়নায় তিনি সভাপতির যাতায়াতের রাস্তার বর্ণনা দিয়ে পুলিশকে পত্র দিয়েছেন।

৪. কমরেড জাফরকে জাবেদ বলেন যে পার্টি ভাগ হয়ে গেছে। তাই তিনি (জাফর) তাঁর চেনা অংশের দিকে যেতে সিদ্ধান্ত নেন। কমরেড লিপিসহ চলে আসার সময় শেল্টারের মূল্যবান দ্রব্যাদিও তারা নিয়ে আসেন এবং ট্রেন থেকে নামাবার সময় জিনিসগুলো যথাস্থানে পাননি।

৫. ঢাকায় কমরেড জাবেদের সঙ্গে বৈঠকে কমরেড শফি ও অন্য দুজন অপরিচিত কমরেডের সঙ্গে কমরেড জাফরও উপস্থিত ছিলেন।

কমরেড বিন্দুর খতমের সংবাদ শুনে আমি সর্বোচ্চ সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ না করারই সিদ্ধান্ত নিই এবং সংস্থার কার্যাবলি ও কমরেড জাবেদের কার্যাবলি সম্পর্কে একটি দলিল লিখি এবং তা কমরেড জ্যোতিকে দেখালে তিনি মতামত প্রকাশ করেন যে,

১. এটি প্রকাশ করলেই পার্টি ভাগ হয়ে যাবে।
২. কমরেড জাবেদের কার্যকলাপের আরও যাচাই প্রয়োজন। কারণ, সভাপতির ধরা পড়ার ব্যাপারটা ওকে ক্রিমিনালের পর্যায়ে ফেলে।
৩. আলাপের জন্য প্রচেষ্টা চালানো উচিত এবং যেহেতু ওরাও কিছু ভুল করেছেন বলে স্বীকার করেছেন, তাই আলাপের ভিত্তি তখনো ছিল।

এই আলোকে দলিলটি আবার লিখি এবং এক কপি কমরেড জ্যোতির নিকট পাঠাই। আরেক কপিসহ কমরেড জাফরকে কমরেড আলম ও মনসুরের মতামত সংগ্রহ করতে বলি। চট্টগ্রামে দেখা না হওয়াতে কারও সঙ্গে কমরেড জাফর যোগাযোগ করতে পারেননি।

আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি। কমরেড গিয়াস আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন। তার কাছে কমরেড বিন্দু, কমরেড মনসুর ও কমরেড তানিয়ার খতমের সংবাদ জানার পর সর্বোচ্চ সংস্থার ওপর আমার শেষ আস্থা ও শ্রদ্ধাবোধটুকু হারিয়ে ফেলি। তবে পাহাড়ের কর্মীরা (কমরেড জ্যোতি,

কমরেড পঙ্কজ, কমরেড অনন্ত) যোগাযোগ করার সিদ্ধান্ত নেন।

এ পর্যায়ে আমি কার কতটুকু ভুল ও আমার ভুল সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণায় পৌঁছি; তথা পার্টির কার্যকলাপ সম্পর্কে মতাদর্শগতভাবে আমার কোনো সন্দেহ তেমন থাকে না, এবং এরপর অন্যদের মতানুযায়ী সর্বোচ্চ সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগের সিদ্ধান্ত নিই। কমরেড মিজান ও কমরেড গিয়াসকে যোগাযোগের সিদ্ধান্তের কথা জানাই এবং কমরেড আলম ও কমরেড খলিলকে নিয়ে আমার জন্য প্রোগ্রাম ঠিক করে তা কমরেড জ্যোতিকে জানাই। নির্ধারিত প্রোগ্রামে কমরেড মিজান ও কমরেড খলিল আসেন এবং কমরেড গিয়াসের বাস-দুর্ঘটনা সম্পর্কে জানতে পারি।

কমরেড গিয়াসের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার অর্থ ছিল সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়া। তাই কমরেড জাফরকে পাঠিয়ে আবার কমরেড আলমকে প্রোগ্রাম দিই। কিন্তু নির্দিষ্ট প্রোগ্রামগুলোতে তিনি আসেননি। এর কিছুদিন পর কমরেড আলমের একটি পত্র পাই, যাতে তিনি আমাদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করা যথাযথ মনে করেন না বলে উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন, 'সর্বোচ্চ সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগের চ্যানেল না থাকলে অপরাপর চ্যানেলের মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন করতে।' এরপর দুবার কমরেড মিজান যোগাযোগের প্রচেষ্টায় ঢাকা যান। তারপর কমরেড গিয়াস থেকে কমরেড রানার পত্র নিয়ে একজন কুরিয়ার আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে আসেন। এর পরবর্তী ঘটনাবলি অনেকেরই জানা আছে।

বিভিন্ন ঘটনাবলি ও কর্মীদের সম্পর্কে মতামত

কোন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে হবে?—সাধারণভাবেই, মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ দিয়ে।

মার্কসবাদ কোনো বিমূর্ত সংজ্ঞা নয়। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিপ্লবের লক্ষ্য স্থির করা হয়, সে লক্ষ্য বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াই মার্কসবাদ এবং তা করার সময়ে কিছু মৌলিক বৈজ্ঞানিক নীতিমালা অনুসরণ করা প্রয়োজন। মৌলিক সাংগঠনিক নীতিমালা হলো গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা। তাই আমার মতে, সভাপতির মৃত্যুর পর উচিত ছিল গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার ভিত্তিতে

একটি বৈধ কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্য নিয়ে দ্বন্দ্বসমূহের সঠিক মীমাংসা করা, দ্বন্দ্বসমূহের মীমাংসায় পার্টির ঐক্যের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা ও কোনো ইতর রীতির আশ্রয় না নেওয়া।

উপরোক্ত মাপকাঠিতে আমার মতে সাহায্যকারীদের কর্তব্য ছিল,

১. সাহায্যকারীদের একটি বৈঠক ডাকা এবং তা সম্ভব না হলে তাদের নিকট থেকে প্রস্তাব সংগ্রহ করা।
২. পার্টির অন্যান্য নেতৃস্থানীয় ক্যাডারদেরও কোনো প্রস্তাব থাকলে তা আন্তরিকভাবে গ্রহণ করা।
৩. সভাপতির মৃত্যুর পর তাঁর ত্রুটিসমূহ নিয়ে অযথাযথভাবে সমালোচনা উত্থাপনের সম্ভাবনাকে বাস্তব বলে ধরে নিয়ে সবাইকে ওই বিষয়ে পূর্বেই সতর্ক করা।
৪. সাংগঠনিক নীতির ভিত্তিতে কেন্দ্র স্থাপনের লাইন নির্ধারণ করা এবং এর ভিত্তিতে কেন্দ্র স্থাপন করা। এ প্রক্রিয়ায় ভুল লাইনের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে প্রসারিত করা ও পার্টি কর্মীদের শিক্ষিত করা।

উপরোক্ত আলোকে বিচার করছি

ক. কমরেড খলিল

গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার ভিত্তিতে কেন্দ্র স্থাপনের প্রশ্নটি কমরেড আতিক, কমরেড জাবেদ ও কমরেড মাসুদের নিকট উত্থাপন করেন। কমরেড আতিকের সঙ্গে মিলে তিনি একটি বিজ্ঞপ্তি দেন, যাতে কমরেড মাহতাবের জন্য নির্দেশমূলক বক্তব্য ছিল। প্রকাশ্যে তিনি সেপ্টেম্বর '৭৪ অধিবেশনের সিদ্ধান্তকে ভুল বলে ব্যাখ্যা দেন। অযথাযথভাবে সভাপতির সমালোচনা করেন। কেন্দ্রীয় অফিস তিনি পোড়াননি বা কেন্দ্রীয় স্টাফদেরও আটক করেননি। তার বিরুদ্ধে সভাপতিকে ধরিয়ে দেওয়ার যে অভিযোগ আনা হয়েছে, তার কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই। কেন্দ্রীয় ফান্ডের কিছু অর্থ ও স্বর্ণ কারও অনুমতি ব্যতিরেকেই অন্য কর্মীদের দেন। তার বিরুদ্ধে বহিষ্কৃত মহিলা কর্মীকে পার্টিতে আনার অভিযোগ ছিল।

কমরেড মতিনকে হত্যার প্রচেষ্টায় তিনি কমরেড জাবেদের সঙ্গে যুক্ত

ছিলেন কি না, তা আমার পক্ষে বলা যাচ্ছে না। অসাংগঠনিকভাবে অঞ্চলে যাওয়ার অভিযোগ ও এর সঙ্গে কমরেড মতিনের হত্যার প্রচেষ্টার যোগসূত্র আছে কি না, নির্দিষ্ট করে বলা যাচ্ছে না। তবে কমরেড আতিক আটক হওয়ার পর যদি তিনি অন্যান্য অঞ্চলে যান, তাহলে তা অসাংগঠনিক নয়। কারণ, কমরেড আতিককে আটকানোর সংবাদ চেপে রেখে সর্বোচ্চ সংস্থা তাদের সঙ্গে—যারা গণতান্ত্রিক বৈঠকের প্রস্তাবকারী ও এর সমর্থক—সম্পর্ক বের করে ফেলেছেন। নীতিগতভাবে কমরেড খলিল ও কমরেড জাবেদ সংস্থার পদক্ষেপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে পারেন। তবে কমরেড জাবেদ, কমরেড বিন্দু ও কমরেড মনসুরের পদক্ষেপ সময়োপযোগী হয়নি, তা তাড়াহুড়ো করে অযথাযথভাবে করা হয়েছে। তাদের সংগ্রামের সাধারণ লাইন সঠিক হলেও পদ্ধতি ছিল ভুল। এটা ঠিক বিদ্রোহ ঘোষণা করা ছিল না। ছিল ষড়যন্ত্রমূলক কাজ। এই প্রবণতার উৎস পূর্বে প্রচলিত পার্টির ইতর রীতি। কমরেড খলিল যদি কমরেড মতিনকে হত্যার প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত থেকে থাকেন, তাহলে তার কার্যকলাপ সেই পর্যায়ে ভুল।

কমরেড আতিককে আটকানোর পর কেন্দ্রীয় ফান্ড সংস্থাকে হস্তান্তর করার প্রশ্নই ওঠে না। তবে কারও অনুমোদন ব্যতীত তা ব্যয় করা ভুল। মহিলাদের ঢাকা যাওয়ার ব্যাপারে কমরেড খলিল যা বলেছেন, তা মিথ্যা নয়। তবে কমরেড আতিককে আটকাবার পর কমরেড খালেদের ঢাকা না যাওয়াটাই স্বাভাবিক এবং খালেদ না গেলে কমরেড রুবীও যাবেন না। কমরেড তানিয়ার সিলেট যাওয়া কমরেড আতিককে আটকাবার পরই হয়েছে। কমরেড ঝুমা ঢাকা চলে যান। কমরেড খলিল হয়তো তাঁদের যেতে বারণ করেননি। কিন্তু তার হাবভাবে ঘোলাটে ও অনিশ্চিত পরিস্থিতির ইঙ্গিত হয়তো ছিল।

বিজ্ঞপ্তিতে নির্দেশসূচক বক্তব্য রাখা ছিল ভুল। আর এতে লেখকের উদ্দেশ্যের প্রতি কেউ সন্দেহ পোষণ করলে তাকে দোষ দেওয়া যাবে না। তবে কমরেড আতিক সংস্থার নিকট যাওয়ার পর এটাকে পুঁজি করে চক্র আখ্যা দেওয়া ভুল ও বদ উদ্দেশ্যমূলক। এবং কমরেড খলিলের পদক্ষেপ যথাযথ বলে তাঁকে সংস্থার আওতায় নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা আরও অসৎ উদ্দেশ্যের ইঙ্গিত বহন করে।

আতিক, জাবেদ ও মাসুদের সঙ্গে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কেন্দ্র স্থাপনের

প্রস্তাব রাখায় কোনো ভুল নেই। তবে এ প্রস্তাব তারা নিজেরাই রাখতে পারতেন। কিন্তু গণতান্ত্রিক পরিবেশের অভাবহেতু কোনো নেতৃস্থানীয় ক্যাডারের মাধ্যমে তার ঐকমত্যের প্রস্তাবটি পেশ করতে চাইলে, আমার ধারণা তাতে কোনো ভুল নেই। উপরন্তু কমরেড আতিক যখন ব্যক্তিগতভাবে সংস্থার নিকট যান, তখন তাকে চক্র বলা যায় না।

কোনো ব্যক্তিবিশেষকে পার্টির নেতা হিসেবে চাওয়া না-চাওয়াটা বাস্তব, এটাকে বিপ্লবের প্রতি আন্তরিকতার অভাব বলা যায় না। বরং তাদের দিক থেকে কমরেড মতিনকে না চাওয়ার পেছনে যে বক্তব্য ছিল, তা বাস্তবে সঠিক বলে প্রমাণিত হয় (কমরেড জাবেদের মাধ্যমে প্রকাশিত)। কমরেড জাবেদের বক্তব্য ছিল, 'আপনি (হাসান) যদি কিছু না করেন, মতিন পার্টির ক্ষমতা দখল করে নেবে এবং এই পার্টি গোল্লায় যাবে'—এতে বাস্তবতার অভাব নেই। তবে তাদের সমস্যা সমাধানের পদ্ধতি অতি সহজেই ভুল-বোঝাবুঝির সৃষ্টি করে।

সেপ্টেম্বর '৭৪ অধিবেশনের সিদ্ধান্ত ভুল বলে উল্লেখ করা এবং অতীত কাজের অযথাযথ সমালোচনা নেহাত ছেলেমি হয়েছে—যাকে পুঁজি করে সর্বোচ্চ সংস্থার কিছু সদস্য এসব কিছুর সারমর্মকে চাপা দিতে চাচ্ছিলেন। এর যেমন নেতিবাচক তেমনি ইতিবাচক দিকও রয়েছে। অতীতের কাজের ভুলত্রুটি সম্পর্কে এভাবে কেউ উল্লেখ না করলে আমরা অনেকেই হয়তো অনেক কিছুই চেপে যেতে পারতাম।

খ. কমরেড আতিক

বিজ্ঞপ্তিতে তার স্বাক্ষর ছিল। আর আমাদের প্রস্তাবগুলো তিনি সর্বোচ্চ সংস্থায় নিয়ে যাননি। আমাদের তিনি কেন্দ্র থেকে ১২০০ টাকা দেন। গণতান্ত্রিক প্রস্তাবের কথা যারা প্রথম উল্লেখ করেন, তাদের মধ্যে তিনি একজন। বিজ্ঞপ্তিতে স্বাক্ষরের ব্যাপারে কমরেড খলিলের ওপর মন্তব্য তার বেলায়ও প্রযোজ্য। কেন্দ্রের টাকা বিনানুমতিতে খরচ করা অযথাযথ। চক্র তিনি করেননি। সর্বোচ্চ সংস্থাই তাকে আটকায় ও খতম করে। সংস্থার এ পদক্ষেপ থেকেই ভুল-বোঝাবুঝির মাত্রা গুরুতর হয়। অবৈরী দ্বন্দ্ব বৈরী রূপ নেয়। এরপর সর্বোচ্চ সংস্থার পদক্ষেপকে যেকোনোভাবে যথাযথ প্রমাণ করা ব্যতীত আর কোনো পথ থাকে না।

গ. কমরেড জাবেদ

প্রথম থেকেই তিনি মতিনবিরোধী জনমত সৃষ্টিতে ব্যস্ত ছিলেন। তার বক্তব্যের বাস্তব ভিত্তি ছিল যদিও, তা প্রকাশ করতে তিনি ভুল পন্থা অবলম্বন করেন। নেতৃত্ব দখল করতে তিনি আমাকে বারবার তাগিদ দেন। তার বক্তব্য ছিল, 'আপনি (হাসান) কিছু না করলে মতিন ক্ষমতা দখল করে নেবে এবং তাহলে কংগ্রেস করেও কিছু করা যাবে না। আর পার্টি ধ্বংস হবে। রানা ভাই নিষ্ক্রিয় থাকবেন। মাহতাব ওদের প্রভাবাধীন থাকলে ওদের চাইতে ভিন্ন কিছু করতে চাইবে না। রফিক কিছু বুঝেসুঝে না। ওদিকে মতিনই উদ্যোগটা নেবে।' এ কথাগুলোর মধ্যে বাস্তবতার অভাব না থাকলেও তা অযথাযথ ও অসাংগঠনিক। ঘটনাপ্রবাহ তার বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণ করে।

আর্মির হাতে ধরা পড়ে সে পার্টির কিছু শেল্টার প্রকাশ করে দেয়। এটা পার্টিবিরোধী কাজ।

কমরেড বিন্দু ও মনসুরকে নিয়ে মতিনকে হত্যার পরিকল্পনা ষড়যন্ত্রমূলক। কমরেড জাফরকে তিনি মিথ্যা বলে প্রতারিত করেন। আবু স্যার, কমরেড জাফর ও আমাকে নিয়ে কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করতে চাওয়া ভুল ও চক্রের কাজ। তার দেওয়া সভাপতির গ্রেপ্তারের বিবরণ যদি সত্য হয়, তাহলে এ সম্পর্কে সংগঠনকে অবহিত না করা মারাত্মক অপরাধ। কমরেড বিন্দু ও মনসুরকে গণতান্ত্রিক প্রস্তাব সম্পর্কে বুঝিয়ে ঐকমত্যে আনার পদক্ষেপ সঠিক। একে পার্টি থেকে বহিষ্কার করা উচিত।

ঘ. কমরেড বিন্দু ও কমরেড মনসুর

এরা প্রথমে সর্বোচ্চ সংস্থার গঠনকে যথাযথ বলে পরে জাবেদের সঙ্গে আলাপের পর গণতান্ত্রিক প্রস্তাবের প্রতি ঐকমত্য ঘোষণা করে। জাবেদের সঙ্গে মিলে তারা মতিনকে খতমের প্রচেষ্টা চালায়। পরে তারা (তানিয়াসহ) খতম হয়। সর্বোচ্চ সংস্থা নিজের ভুলের প্রতি উদার মনোভাব প্রদর্শন করেই তাদের খতম করে। কমরেড আতিকের খতমের পর এ সংবাদ যখন অন্যত্র পৌঁছে, তখন তার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া কী হওয়া উচিত, তা না ভেবেই সংস্থা একের পর এক খতম করতে থাকে। ফলে পার্টি ক্রমশই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এসবের কিছুই সংস্থার চেতনায় ঘা দিচ্ছিল না—তারা নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত ছিল।

মতিনকে খতমের জন্য বিন্দু ও মনসুরের প্রচেষ্টা অযথাযথ ও সময়োপযোগী নয়। আর এর পদ্ধতিও ছিল ষড়যন্ত্রমূলক।

কমরেড মনসুরের পদক্ষেপ :

কমরেড মনসুর 'সর্বহারা শ্রেণি পুনর্গঠন আন্দোলন' নামে একটি সংগঠন দাঁড় করাতে চেষ্টা করেন। কমরেড রফিকের সঙ্গে বৈঠকে কোনো আশ্বাস না পাওয়ায় সর্বোচ্চ সংস্থার অনমনীয় মনোভাব, আমার পক্ষ থেকে কোনো সাড়া না পাওয়ায় তিনি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। এই মানসিক অবস্থায় তিনি এক ভিন্ন সংগঠন করতে চেষ্টা করেন। সর্বোচ্চ সংস্থার সাথে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর, আমার দিক থেকে কোনো সাড়া না পাওয়াতে, বিন্দুর খতমের পর এবং জাবেদ পুনরায় গ্রেপ্তার হওয়ার পর এই পদক্ষেপটি মূলত মরিয়া হওয়াজনিত কাজ—বিপ্লব নয়।

ঙ. কমরেড জাফর

জাবেদ হতে পার্টি ভাগ হওয়ার সংবাদ পাওয়ার পর স্ত্রী ও শেল্টারের মূল্যবান দ্রব্যাদিসহ চলে আসা অস্বাভাবিক নয়। মূল্যবান দ্রব্যাদি ট্রেনে হারিয়ে যায়। তার মানে চক্রান্তমূলক কিছু নেই।

চ. কমরেড রুবী

তিনি পার্টি কর্তৃক বহিষ্কৃত ছিলেন না। তার বিরুদ্ধে আনীত সভাপতিকে ধরিয়ে দেওয়ার অভিযোগের কোনো প্রমাণ নেই।

পার্টির বিশিষ্ট আন্তরিক কর্মী কমরেড তাহেরের স্ত্রী ছিলেন তিনি। কমরেড তাহেরের মৃত্যুর পর পার্টি তার দায়িত্ব নিলেও তাকে যাচাইয়ে কিছু ক্রটি থাকবে হয়তো। তাকে ভ্রষ্টা বলে অপবাদ দেওয়া হয়েছে, এটা জীবন সম্পর্কে সহজ ধারণা থেকে উদ্ভূত। ছোটবেলা থেকে পিতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত বলে তার কথাবার্তা ও আচার-ব্যবহারে সর্বদা তিনি এটা খুঁজতে থাকতেন। এ মানসিকতা সংগঠনের অভ্যন্তরে বহু জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে। তার দুরারোগ্য ব্যাধিও আছে। পূর্বেই তাকে সাধারণ জীবনে স্থিত করা উচিত ছিল।

ছ. কমরেড গিয়াস

তার কার্যকলাপ যথাযথ। পাহাড়ের সঙ্গে বাইরের যোগাযোগের ব্যাপারে তিনি প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেন।

জ. কমরেড মাসুদ

সভাপতির মৃত্যুর পর তিনি নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। কমরেড আতিক, কমরেড খলিল ও জাবেদের সঙ্গে তিনি গণতান্ত্রিক প্রস্তাবের ব্যাপারে আলাপ করেন। তিনিই সভাপতির দপ্তর পুড়িয়ে দেন। সংস্থার পক্ষে যোগ দিয়ে তিনি কমরেড আতিককে খতমের পক্ষে মত দেন এবং আরও অন্যান্য মিথ্যার সাথে ঐকমত্য প্রকাশ করেন। আমার সাথে তিনি যোগাযোগ করে পরের দিকে পার্টির অভ্যন্তরীণ ঐক্যের ব্যাপারে প্রচেষ্টা চালান। চক্র কর্তৃক তিনি খতম হন।

ঝ. কমরেড জ্যোতি

এই কমরেডের ভূমিকা প্রশংসনীয়। তিনি একবার গণতান্ত্রিক প্রস্তাবে ঐকমত্যে আসার পর শেষ পর্যন্ত সেই লাইনে দৃঢ় থাকেন। আমি যখন সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ না করার সিদ্ধান্ত নিই, তখন তিনি যোগাযোগের প্রচেষ্টার পক্ষে দৃঢ় থাকেন এবং আমাকে তাই করতে পরামর্শ দেন। এ ক্ষেত্রে তার চিন্তাধারা সঠিক প্রমাণিত হয়। তবে সর্বোচ্চ সংস্থার কার্যকলাপে আন্তরিকতার অভাব সম্পর্কে উপলব্ধিতে পৌঁছাতে তার সময় লাগে। সংকটময় পরিস্থিতিতে তিনি স্থিরতার পরিচয় দেন। কমরেড রুবীকে আমার এলাকা থেকে সরিয়ে নিয়ে ভালোই করেছিলেন। আতিককে কোঅর্ডিনেটিং সেন্টারে নিয়োগ করা ভুল ছিল।

ঞ. কমরেড পঙ্কজ ও কমরেড অনন্ত

তাদের পদক্ষেপ যথাযথ।

ট. আমার (হাসান) প্রসঙ্গে

গণতান্ত্রিক বৈঠকের প্রস্তাব সঠিক ছিল। আর আমরা এটা না দিলে প্রশ্নটি উত্থাপিতই হতো না হয়তো। বরং ওই পরিস্থিতিতে কমরেড খলিলের পক্ষে

প্রশ্নটা স্বাধীনভাবে উত্থাপন করা বেশ কষ্টকর হতো।

কোঅর্ডিনেটিং সেন্টারে আতিককে নিয়োগ করাটা ভুল ছিল। যদিও এটা—কমরেড আতিকের মতে—সভাপতি কর্তৃক অনুমোদিত ছিল, তবু আমার সে ক্ষমতা ছিল না।

আমার পরিচালনাধীন কর্মীদের যেকোনো ধরনের সমালোচনা অযথাযভাবে না করার জন্য সতর্ক না করাটা ভুল।

কমরেড আতিক কেন্দ্রীয় ফান্ড থেকে টাকা নেবার সময় তাকে ওই ফান্ডের অর্থসম্পদ কারও অনুমোদন ব্যতীত এভাবে খরচ না করার জন্য বলা উচিত ছিল।

কমরেড জাফর থেকে জাবেদের কার্যকলাপ সম্পর্কে জানতে পাওয়ার পর তা সর্বোচ্চ সংস্থাকে অবগত না করা ছিল ভুল। না জানানোর কারণ ছিল, সংস্থা থেকে আন্তরিকতার কোনো আভাস না পাওয়া। আমাদের প্রস্তাব সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার পরও আতিকের খতমের সংবাদ চেপে গিয়ে অসাংগঠনিকভাবে সংস্থা কর্তৃক দলিলপত্র প্রেরণের অব্যাহত গতি—এই কপট আচরণে আমি সংস্থার ওপর সম্পূর্ণভাবে আস্থা হারিয়ে ফেলি।

দুর্বলতার লক্ষণ হিসেবে কমরেড রুবীর সঙ্গে আমার খোলামেলা আচরণ ভুল ছিল—যা সেই পরিস্থিতিতে যথেষ্ট ভুল-বোঝাবুঝির সৃষ্টি করতে পারত। কমরেড জ্যোতি কমরেড রুবীকে সরিয়ে নিয়ে ভালোই করেছিলেন।

কমরেড আতিকের আটকের সংবাদের পর কমরেড খলিল, আলম, জাবেদ, মনসুর ও বিন্দুকে সঠিকভাবে পরিচালনার দায়িত্ব আমার নেওয়া উচিত ছিল। এবং এর সঙ্গে সঙ্গে সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগের প্রচেষ্টা চালিয়ে গেলে এত কর্মী প্রাণ হারাতেন না এবং তা যথাযথ হতো। আমার কাছ থেকে কোনো গাইডেন্স না পাওয়াতে তারা নিজ ঝোঁকে চলে, যা সংস্থার ভুল পদক্ষেপকে আরও প্রশ্রয় দেয়। আমি তাদের কিছু করতে বা না করতেও বলছিলাম না। অথচ প্রস্তাব আমিই (কমরেড জ্যোতিসহ) লিখিতভাবে দিই। এখানে আমার দোদুল্যমানতা, কাপুরুষতা এবং দায়িত্বজ্ঞানহীনতার প্রকাশ ঘটে। এর উৎস দুই লাইনের সংগ্রামের অনভিজ্ঞতা এবং বারবার পুরনোদের থেকে আলোচনার অপেক্ষা করা।

সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ হওয়ার পরও আমার আচরণ অদ্ভুত ছিল। কমরেড রানার সক্রিয় ভূমিকার ফলেই সংগ্রাম সঠিক পথে এগোয়।

ঠ. কমরেড রানা

প্রথম কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে পদাবনতির পর তিনি নিষ্ক্রিয় ভূমিকা নেন। সেপ্টেম্বর '৭৪ অধিবেশনের ভুল সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তিনি সভাপতিকে স্মরণ করিয়ে দেন। কিন্তু সভাপতি তা উপেক্ষা করে যান।

সর্বোচ্চ সংস্থা গঠনে যে ভুল ছিল, তা তিনি উল্লেখ করেন। তা আরও সঠিকভাবে করা সঠিক হতো। মতিন বা মাহতাবের পক্ষে তাকে খতম করা সম্ভব ছিল না। কারণ, প্রাথমিক পর্যায়ে এ ধরনের কিছু করলে তারা নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হতো।

কমরেড আতিককে খতমের সিদ্ধান্ত তারই ছিল। এটা মারাত্মক ক্ষতিকর সিদ্ধান্ত, যা পরবর্তী সময়ে পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণের বাইরে নিয়ে যায়। বিন্দু ও মনসুরের খতমেও তিনি মত দেন। অথচ উচিত ছিল, আমাদের সঙ্গে আলাপের মাধ্যমে তাদের নিয়ন্ত্রণে আনা। আতিককে খতমের পর পার্টি আমাদের বা সংস্থার কারও নিয়ন্ত্রণেই থাকে না।

বস্তু তার নিজস্ব নিয়মে বিকাশ লাভ করে। সেই নিয়ম, অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব—মতিন বনাম জাবেদ, এই প্রক্রিয়ায় জাবেদ সরকারের হাতে পুনরায় ধরা পড়ে, বিন্দু ও মনসুর খতম হয়। মতিন নিজ গতিতেই সরকারের হাতে ধরা পড়ে এবং পার্টির পরিস্থিতি একটা স্থিতিশীলতা লাভ করে। মুজিব সরকার উৎখাত হওয়ায় সরকারি গোয়েন্দারা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। আমাদের সঙ্গে সংস্থার যোগাযোগ হওয়ার পর একটি নতুন পর্যায় শুরু হয়, যার মাঝ দিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি। এ পর্যায়ে পার্টির অভ্যন্তরীণ সংগ্রাম চলে সঠিক লাইন (কমরেড জ্যোতি, হাসান, রানা, আরিফ) বনাম অতীত ভুল লাইনের ধ্বংসাবশেষের উত্তরাধিকারী কামাল, মাহতাব, শফিক চক্রের মাঝে।

ড. কমরেড আরিফ

তার কার্যকলাপ অত্যন্ত প্রশংসনীয় এবং উদাহরণস্বরূপ। তার সক্রিয় ভূমিকা ব্যতীত পার্টির বিজয় অনিশ্চিত থাকত।

ঢ. মতিন

এর কার্যকলাপ ষড়যন্ত্রমূলক। একে পার্টি থেকে বহিষ্কার করা উচিত।

ণ. কমরেড রফিক

একে খতম করা ভুল হয়েছে। বদ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে এটা করা হয়েছে।

ত. সভাপতির গ্রেপ্তার প্রসঙ্গে

এ সম্পর্কে আমার নিকট দুটো তথ্য আছে।

১. জাবেদের থেকে কমরেড জাফরের মাধ্যমে পাওয়া তথ্য, যা বিশ্বাসযোগ্য। তবে আরও অনুসন্ধানের দাবি রাখে। জাবেদের সঙ্গে যোগাযোগ করে এ বিষয়ে আরও স্বচ্ছ ধারণার প্রয়োজন। এদিক থেকে মতিনকেই সন্দেহ করা যায় এবং ঝুমাকেও যুক্ত করা যায়।
২. সহানুভূতিশীল থেকে পাওয়া বক্তব্য অনুযায়ী, সভাপতির কুরিয়ার আকবরই সভাপতিকে সরকারের নিকট খবর পাঠিয়ে ধরিয়ে দিয়েছে। আকবর সরকার কর্তৃক খতম হওয়াতে এ সম্পর্কে সবিশেষ কিছু জানা যায় না।

দ্বিতীয় পর্ব

তাহাদের কথা

পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন থেকে পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি। এই পরিক্রমায় জড়ো হয়েছিলেন কিংবা জড়িয়ে পড়েছিলেন অনেকেই। একেকজনের ভূমিকা একেক রকম। কেউ সমর্থক, কেউ সহানুভূতিশীল, কেউ ক্যাডার, কেউ কর্মী। তাদের নেতা সিরাজ সিকদার।

এ দলটিকে বুঝতে হলে দলের সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যক্তিদের কথা জানা দরকার। এটি শুধু একটি দল ছিল না, ছিল এক মহাযজ্ঞ। যাঁরা এই যজ্ঞে শামিল হয়েছিলেন, তাঁদের গল্পগুলো না জানলে দলটিকে বোঝা যাবে না। আলাপচারিতার মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে তাঁদের জীবনের গল্প, তাঁদের স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের আখ্যান।

দলের শুরুর দিকে ছিলেন ফরহাদ মজহার। তাঁর ভূমিকা স্পষ্ট নয়। তিনি সমর্থক, সহানুভূতিশীল, নাকি কর্মী। দলের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল ক্ষণস্থায়ী।

আবুল কাসেম আর বজলুল করিম আকন্দকে এই দলের সহানুভূতিশীল হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সিরাজ সিকদারকে নিয়ে তাঁদের কিছু স্মৃতি আছে।

রাজিউল্লাহ আজমী শুরু থেকেই ছিলেন সিরাজ সিকদারের সহযাত্রী। বাজ এবং হাফিজ ছিলেন পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের কর্মী। তাঁরা কেউ সর্বহারা পার্টিতে যুক্ত হননি। দলের উত্থানপর্বে তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। তাঁরা আসল নামে পরিচিত হতে চান না।

চিকিৎসাবিজ্ঞানের ছাত্র আবুল কাসেম মুজিরুদ্দিন মাহমুদ শ্রমিক আন্দোলনের কর্মী ছিলেন। তিনি ফারুক মাহমুদ নামেই বেশি পরিচিত। বিচিত্র তাঁর অভিজ্ঞতা। একাত্তর সালে তিনি দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান।

আকা মো. ফজলুল হক রানা এবং রইসউদ্দিন আরিফ দলের কমান্ড কাঠামোয় ছিলেন। তাঁদের ঝুলিতে অভিজ্ঞতার বিপুল সঞ্চয়। এগুলো না জানলে দলটির স্বরূপ বোঝা যাবে না। তাঁরা সপরিবার দলে সমর্পিত হয়েছিলেন।

সেনাবাহিনী ছেড়ে এই দলে যোগ দিয়েছিলেন জিয়াউদ্দিন আহমেদ। তাঁর ভূমিকা অন্য রকম। দলে তাঁর নাম কখনো হাসান, কখনো সফিউল আলম।

সবশেষে মনজি খালেদা বেগম। তাঁর নাম কখনো সুফিয়া, কখনো রুবী, কখনো বুলু। এসেছিলেন দলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সামিউল্লাহ আজমীর হাত ধরে। তাঁর জীবনের উত্থানপতন নিয়ে একটি উপন্যাস হতে পারে।

এঁরা প্রত্যেকেই আলাদাভাবে নিজেদের মেলে ধরেছেন। একজনের কথার সঙ্গে অন্যজনের কথার মিল না-ও থাকতে পারে। সবাইকে একসঙ্গে বসিয়ে ওয়ার্কশপ করে পুরো ছবিটা বের করে নিয়ে আসা তো সম্ভব না।

তাঁরা প্রায় সবাই মন খুলে কথা বলেছেন। দু-একজনের কথায় কিছু অতিরঞ্জন, বাগাড়ম্বর, তথ্য গোপনের চেষ্টা এবং অন্যের ভূমিকাকে খাটো করে দেখার প্রবণতা আছে। একটা বিষয় পরিষ্কার। সবাই সবটা জানেন না। এ বই পড়ে তাঁরা অনেক কিছু জানবেন, তাঁদের সহযাত্রীরা কে কী ভেবেছেন, কে কী করেছেন।

রাজিউল্লাহ আজমীর কথাগুলো পত্রিকায় ইংরেজিতে ছাপা হয়েছে। অনুবাদ লেখকের। বুলুর সঙ্গে আলাপচারিতা ছাড়াও তাঁর হাতে লেখা একটি 'জবানবন্দি' এখানে যুক্ত করা হয়েছে। জিয়াউদ্দিনের ভাষ্য তাঁর নিজের হাতে লেখা। বুলুর জবানবন্দি এবং জিয়াউদ্দিনের ভাষ্য তাঁরা লেখককে সরাসরি দেননি। এগুলো লেখকের হাতে এসেছে।

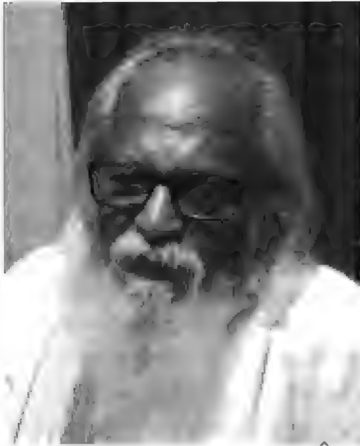
আরও অনেক গল্প ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও করোনাকালে লেখক সংশ্লিষ্ট অনেকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেননি। ফলে কিছু অপূর্ণতা থেকেই যাবে।

ফরহাদ

আমি সর্বহারা পার্টির লোক না। কখনো সর্বহারা পার্টি করি নাই। প্রথমেই আমি মেথডোলজি নিয়ে একটা প্রশ্ন তুলব। সর্বহারা পার্টিকে কিন্তু শুধু ঘটনা দিয়ে বোঝা যাবে না। সর্বহারা পার্টির যে মেইন ডকুমেন্ট, তাদের যে মেইন থিয়োরেটিক্যাল আরগুমেন্ট ছিল, তার মধ্যে আমরা ছিলাম। যেমন রেহমান সোবহানের বিরোধিতা করা। আমাদের সঙ্গে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ছিল। পরে সে আবদুল হকের সঙ্গে চলে যায়। দুই অর্থনীতির যে তত্ত্বটা—আমরা এর সমালোচনা করেছি।

আমাদের কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব ছিল, রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিল, এর একটা গৌরবজনক সময় হলো ১৯৬৭ থেকে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পর্যন্ত। হুমায়ুন কবিরের সঙ্গে সম্পর্কের কারণে আমার সম্পর্কটা ছিল সর্বহারাদের সঙ্গে। মোস্টলি পোয়েট্রি—থিয়োরেটিক্যাল সাইডে। হুমায়ুন আর আমি ছিলাম মেইন থিয়োরেটিশিয়ান। সে যত দলিল লিখেছে, আমার সঙ্গে আলোচনা করে লিখেছে। সর্বহারা পার্টির অনেক দলিল হুমায়ুনের লেখা।

জাতীয় দ্বন্দ্ব প্রধান না শ্রেণিদ্বন্দ্ব প্রধান, এ তর্কটা কিন্তু আমাদের। আমরাই প্রথমে তুলি—জাতীয় নিপীড়নটাই প্রধান, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বাঙালির লড়াইটা করা দরকার। দাদার (সিরাজুল আলম খান) সঙ্গে অন বিহাফ অব সর্বহারা পার্টি আমরা একটা মৈত্রীর সম্পর্কের চিন্তা করেছি। যেহেতু আমরা জাতিবাদী সংগ্রামটা কারেক্ট মনে করেছি। কিন্তু আমরা তাঁর জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল বা তার হিটলারপ্রীতি পছন্দ করতাম না। তাঁর সঙ্গে এ নিয়ে অনেক কথা হয়েছে। আমাদের বাড়িতে আসতেন। হি ইজ আ গ্রেট ম্যান, এতে কোনো সন্দেহ নেই।



ফরহাদ মজহার

দাদার যে মুভটা ছিল, তার যে অর্গানাইজিং ক্যাপাসিটি, এটা আমাদের ছিল না। আমাদের ভাইদের মধ্যে একটা ফকিরি ব্যাপার আছে। আমরা কিন্তু প্রভাবিত করতে পারি উইথ আইডিয়া। সিরাজ সিকদারের কথা শুনেই দাদা লাফিয়ে উঠেছেন—এইটা যদি তোমরা করতে পারো, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি। দাদা তো জাতিসত্তার প্রশ্নে, বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে আনকম্প্রোমাইজিং।

তখন কিন্তু বৃহৎ বাংলার পরিকল্পনা ছিল। বাঙালি জাতির যে বৃহত্তর স্বার্থ, ১৯৪৭ সালে কলকাতার বর্ণহিন্দুরা তা নষ্ট করেছে। তখন তো ইতিহাসটা একাডেমিক্যালি এত ক্লিয়ার ছিল না।

আমরা তো চলি নকশালদের সঙ্গে। নকশালরা জাতিবাদী না। ক্লাসের জায়গা থেকে তারা লড়াইটা করেছে। নকশালরা যখন ক্ষয় হয়ে গেছে, বাঙালি জাতিবাদী আন্দোলন তখন শুরু হয়েছে। আমরা নেগোশিয়েটেড ইন্ডিপেনডেন্স চাইনি। আমরা বিচ্ছিন্নতার বিরোধী ছিলাম। তখনো ২৫ মার্চ হয়নি। তার আগের কথা বলছি। আমরা শেখ মুজিবের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের ঘোর বিরোধী ছিলাম। আমরা বলেছি, বাংলাদেশের বিচ্ছিন্ন

হওয়া মানে ভারতের অধীন হওয়া।

২৫ মার্চের আগে স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হয়ে গেল, যেহেতু ব্যাপারটা জাতিগত নিপীড়নের দিকে চলে গেছে। তখন আমার একটা সাইক্লোস্টাইল করা বক্তব্য ছিল : ছয় পাহাড়ের দালালেরা হুঁশিয়ার। একটা বিখ্যাত লিফলেট। একাত্তরের ৭ মার্চ এটা বিতরণ করা হয়েছে। তখন কিন্তু আমরা অলরেডি বিচ্ছিন্নতাবাদী হয়ে গেছি। আমরা কখনো মনে করি নাই—আমি এ জায়গাটা ইনসিস্ট করছি—শেখ মুজিব বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন করছেন। সে সময় দাদার মাধ্যমে শেখ মুজিবের সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছে। জাতিবাদী আন্দোলনটাকে আমরা টোটাল মুক্তির আন্দোলন বলেছি। এর পেছনে যে যুক্তি, সেটা আমরা কিছুটা বুঝতাম। চিনপন্থী হিসেবে আমরা সে লাইনে চিন্তা করতাম। পরে বিষয়টা আরও পরিষ্কার হয়েছে।

– মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে সংক্ষেপে আপনার মূল্যায়ন কী?

বাঙালি জাতিবাদী আন্দোলনটা ব্যর্থ হয়েছে। বাংলাদেশ কলোনি হয়ে গেছে। সেকেন্ডলি, বুর্জোয়া ডেমোক্রেটিক স্টেট আমরা করতে পারিনি। এখন আমরা কী করতে পারি? আমরা করতে পারি রিফর্ম।

সিরাজুল আলম খানের পলিটিক্যাল লাইনের বিরোধিতা করি। ছাত্র ইউনিয়ন তখন সবচেয়ে শক্তিশালী দল। আমরা ছাত্র ইউনিয়ন করি। আর আমি সিরাজুল আলম খানের ভাই হওয়ার কারণে, খসরুর ভাই হওয়ার কারণে ঢাকা হলে থাকতাম রাজার মতো। আমার ঘরে এনএসএফের খোকা সাপের বাক্স রাখত। পাচপাত্তু আসা-যাওয়া করত। বের হওয়ার সময় আমাকে সালাম দিত।

কেন এটা বলছি? ছাত্রলীগের মতো একটা দল, সিরাজুল আলম খান এটা সিঙ্গেল-হ্যান্ডেডলি দাঁড় করিয়েছেন। আপনি তো তাঁর সঙ্গে কাজ করেছেন। দেখেছেন। হি হ্যাড অর্গানাইজিং ক্যাপাসিটি। সিরাজ ভাই যদি পলিটিক্যালি আমাদের একটু কাছাকাছি আসত, বাংলাদেশ অন্য জায়গায় চলে যেত। উনি যে ধারায় গেছেন, বুঝতে পারি কেন গেছেন। এটা না হলে তো বাংলাদেশ স্বাধীন হতো না—এই ছিল তাঁর কথা।

– উনি কি আপনার মামাতো ভাই?

হ্যাঁ। তাঁর বাবা আমার বড় মামা। আমরা তখন ছোট, সিরাজ ভাই আসছে। আমরা তো বলতাম নিজাম ভাই। ট্রেন থেকে যখন নামলেন, তাঁর

হাতে হাতকড়া। দিস ইজ দ্য মেমোরি ইন মাই লাইফ।

– তিনি প্যারোলে এসেছিলেন বাবার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে। আমাকে বলেছেন, ১৯৬৪ সালে যখন তার বাবা মারা যান, তিনি তখন জেলে।

আমার ভূমিকাটা সব সময় ইন্টেলেকচুয়াল। লেখালেখি করেছি। আমার তখন তরুণ বয়স। লেনিনের বই আমরা হাতে লিখে বিলি করেছি। প্রিন্ট পাওয়া যায় না। তখন তো জেরক্স নাই।

একমাত্র উপায় সাইক্লোস্টাইল।

সাইক্লোস্টাইল মেশিন চুরি করলাম না? এটা ছিল আমাদের প্রথম অপারেশন।

– আপনি ছিলেন এর মধ্যে?

আমি ছিলাম। ইকবাল, হুমায়ুন, শাহীন রেজা ছিল।

– কোথা থেকে আনলেন?

সেগুনবাগিচা, পাকিস্তান কাউন্সিল থেকে।

– হুমায়ুন কবির খুন হওয়ার পর আপনাকে নিয়ে একটা রটনা হয়েছিল।

হয়েছে। সে পিওর রেভল্যুশনারি ছিল না। তার মধ্যে এলিটিজম ছিল। এটা ছিল ফ্যামিলির দ্বন্দ্ব। হুমায়ুনের পারিবারিক দ্বন্দ্ব। তারই পরিণতি। হুমায়ুন তো আমার বন্ধু, কবি। অসম্ভব হৃদয়বান।

– কোনটা পারিবারিক দ্বন্দ্ব?

সেলিম শাহনেওয়াজ, হুমায়ুনের বোনের হাজব্যান্ড। তাকে নিয়েই কনফ্লিক্ট।

– আমি তার স্ত্রী সুলতানা রেবুর সঙ্গে কথা বলেছি। হুমায়ুনকে দেখতে আহমদ ছফা হাসপাতালে গিয়েছিলেন।

হাসপাতালে আমিও গেছি।

– আপনি পরে তাকে নিয়ে একটি কবিতা লিখেছিলেন। *কণ্ঠস্বর*-এ ছাপা হয়েছিল।

আমার সীমাবদ্ধতা আমি বুঝি। তখন কবিতা, সাহিত্যের দিকে আমার আগ্রহ ছিল বেশি। রাজনীতিতে আগ্রহী, কিন্তু রাজনীতি দিয়ে আমি কিছু অর্জন করব, এরকম ইচ্ছা ছিল না। এটা পরে ডেভেলপ করেছে। যখন করতে গেছি, তখন বাংলাদেশের পলিটিকস অনেক বদলে গেছে।

আমার চোখের সামনে দেখেছি, কী হচ্ছে। এই যে মারপিট, আমার ভাই

ছাত্রলীগে। অন্যরা এসব করে। এগুলো পছন্দ করতাম না। অ্যাসথেটিক সেন্সে খারাপ লাগত। এদের টাউট মনে হতো।

– হুমায়ুন কবির আর আপনি তো ব্যাচমেট?

সমসাময়িক। আমি ফার্মেসিতে। সে বাংলায়। আমি সিক্সটি ফোরে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হই।

– হুমায়ুন ভর্তি হয়েছেন সিক্সটি ফাইভে। আপনি কি ছাত্র ইউনিয়নের অর্গানাইজেশনাল স্ট্রাকচারে ছিলেন?

না।

– আমি আবুল কাসেম ফজলুল হকের সঙ্গে কথা বলেছি। তিনি আমাকে বলেছেন, সিরাজ সিকদার সমরবাদী।

সমরবাদী হওয়া তো দোষ না। আমিও তো সমরবাদী। দোষ হলো বিচ্ছিন্ন কিলিং করা। তখন হক সাহেবের সঙ্গে আমার একটা বড় তর্ক ছিল : গণঅভ্যুত্থান এবং গণসংগ্রাম। খুবই ইমপ্রেসিভ কথাবার্তা।

– আমি দেখেছি, ছিয়াত্তর সালে আহমদ ছফা আর আপনি সর্বহারা পার্টি আর জাসদকে এক করার একটা উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

নিয়েছিলাম। একটা বিষয় খেয়াল করেন। সর্বহারা পার্টি কিন্তু যেকোনো সময় ক্যু করতে পারত। সে ক্যাপাসিটি তাদের ছিল। তারা এটা করে নাই। সেজন্য আমরা মনে করি, শেখ মুজিবের কিলিংয়ের সঙ্গে ইন্ডিয়া জড়িত। কিছু ডেঞ্জারাস মিথ আছে। আমাদের এগুলো কাটিয়ে উঠতে হবে। এগোতে পারছি না ইন্ডিয়ান ডমিনেশনের জন্য।

– সিরাজ সিকদারের কিলিং নিয়ে আপনি শেখ হাসিনার সাক্ষাৎকার নিয়েছেন, বই লিখেছেন *রাজকুমারী হাসিনা*। মুনীর মোরশেদ আর এস এ করিম তাঁদের বইয়ে এ কথা উদ্ধৃত করেছেন।

আমি তো শেখ হাসিনাকে সাংঘাতিক অ্যাপ্রিশিয়েট করি। আমি যখন তার ইন্টারভিউ করি, তিনি কিন্তু তখন কামাল হোসেনকে ছুড়ে ফেলে দিয়েছেন। কামাল হোসেন কনস্টিটিউশন মুসাবিদা করেছেন, শেখ মুজিবকে একনায়ক বানানোর মুসাবিদা। শেখ মুজিব তো তাঁকে এটা করতে বলেন নাই। শেখ মুজিবের তো আইনের দ্বারা একনায়ক হওয়ার দরকার নাই। এটা এরা করিয়েছে। আর সিপিবিওয়ালারা তাকে দিয়ে করিয়েছে বাকশাল। এটা তো হিস্ট্রি।

আমার কোনো লেখায় শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে ব্যক্তি-আক্রমণ নাই। এটা করে খালেদা জিয়া। সেজন্য আমি শেখ হাসিনার সঙ্গে কথা বলতে গেছি। খালেদা জিয়ার বিপরীতে আমি তাকে রাজকুমারী বলেছি। এটা বলে আওয়ামী লীগাররা খুব আনন্দ পায়। আসলে এর মধ্যে শ্লেষ ছিল। এটা হাসিনাকে বোঝানো যে রাজকুমারী হলে পারবেন না।

তাত্ত্বিক জায়গা থেকে আমি এখনো লড়াই করছি। আমেরিকায় আমি কর্নেল তাহেরের জন্য ক্যাম্পেইন করেছি। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী জায়গা থেকে সর্বহারা পার্টির সঙ্গে সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও তাহেরের র‍্যাডিক্যাল ভূমিকার জন্য আমার সমবেদনা ছিল। ইন ফ্যাক্ট, আমি ফিরেও এসেছি এ জন্য। আপনার মনে আছে কি না?

– ছিয়াত্তর সালে।

হ্যাঁ, ফিরে এসে অনুষ্ঠান-টনুষ্ঠান করেছি। তারপর তো জিয়াউর রহমানের গোয়েন্দারা আমাকে তাড়িয়ে দিল। জিয়া এনায়েতুল্লাহ খানকে আমেরিকায় পাঠিয়েছে আমাকে বোঝাতে, অফিসারদের চাপে পড়ে কেন তাকে তাহেরকে ফাঁসি দিতে হলো। আমার ক্যাম্পেইনটা খুব স্ট্রং ছিল। কিন্তু জাসদের লোকেরা এতই অকৃতজ্ঞ, এরা এ সম্পর্কে কিছু বলে না। আমি তো এটা করেছি আমার নিজের কারণে, আমার বিশ্বাসের জায়গা থেকে।

তখন মির্জা সুলতান রাজা, কাজী আরেফ আহমদ, এদের সঙ্গে কথা হয়েছে। আমাকে অনেক বুঝিয়েছে, জাসদে যোগ দেন। পরবর্তী সময়ে ছফাও বলেছে। ছফাকে কিন্তু আমি অনেক কষ্ট করে জাসদ থেকে বের করে এনেছি। ছফাকে বলেছিলাম, জাসদ একটা ডায়নোসরের মতো। শরীরটা বিশাল, মাথাটা ছোট। এটা টিকবে না। বিলুপ্ত হবে। আমার এই কথাটা আপনি কোট করতে পারেন।

সিকদার যদি মারপিট-খুনোখুনি না করত, তাহলে বাংলাদেশে সে অপ্রতিরোধ্য থাকত। অপ্রতিরোধ্য।

করিম

আমি পড়তাম ময়মনসিংহে, আনন্দমোহন কলেজে। ছাত্র ইউনিয়ন করতাম। তখন তো মেনন গ্রুপ। রইসউদ্দিন তালুকদার এসে এই কলেজে ভর্তি হলো। আমি তাকে ছাত্র ইউনিয়নে রিক্রুট করি। তখন থেকেই তার সঙ্গে যোগাযোগ ও বন্ধুত্ব। পরে সে নাম বদলে হলো রইসউদ্দিন আরিফ।

স্বাধীনতাযুদ্ধ যখন শুরু হয়, তখন আরিফের মাধ্যমে কিছু লিফলেট আসে। ছয় পাহাড়ের দালাল, এসব কথাবার্তা। তারা বলতে চাচ্ছে, স্বাধীনতার যে যুদ্ধ শুরু হয়েছে, এটা ভারতের নিয়ন্ত্রণে। এই স্বাধীনতা সত্যিকারের স্বাধীনতা হবে না। আওয়ামী লীগ হলো ভারতের দালাল। এছাড়া বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে তারা অমুক-তমুকের দালাল অর্থাৎ এরা ছয় পাহাড়ের দালাল—এসব বলে লিফলেট দিয়েছে। এখন তারা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে স্বাধীনতাযুদ্ধ করবে। স্বাধীনভাবে করবে। এসব কাগজপত্র আমাদের কাছে এল।

আমরা তো হাইলি কনফিউজড। ভালো বুঝি না। আরিফ বন্ধু মানুষ। তার সঙ্গে যোগাযোগ চলছে। আফটার লিবারেশন, সে বলত স্বাধীনতা অসমাপ্ত। এটা সমাপ্ত করতে হবে। 'ভারত হটাও'—এরকম একটা আওয়াজ দিয়ে তারা স্বাধীনতাযুদ্ধ আবার শুরু করল। আরিফ নিয়মিত যোগাযোগ করত। তখনই সিরাজ সিকদারের ব্যাপারটা টের পাই। সে সর্বহারা পার্টির নেতা, একটা বিশাল ব্যক্তি।

আমি তখন বিসিএসআইআর-এ (বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ) কাজ করি। আমরা কয়েকজন ছিলাম আরিফের বন্ধু বা ভক্ত। তবে আমরা কখনোই তাদের দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম না। একপর্যায়ে তারা থানা, ফাঁড়ি লুট করতে শুরু করে। সে মাঝে মাঝে এসে এসব জানায়। বলে, তারা

ধীরে ধীরে শক্তিশালী হচ্ছে।

– আমরা বলতে আপনি ছাড়া আর কে?

আমাদের একজন বন্ধু ছিল আবু মোহাম্মদ ফেরদৌস। সে ছিল মাইক্রো-বায়োলজিস্ট। একসময় ছাত্রলীগ করত। আমরা স্বাধীনতাবিরোধীদের কখনোই সমর্থন করিনি। তখন তো সর্বহারা পার্টির স্লোগান ছিল স্বাধীনতাযুদ্ধ অসমাপ্ত। তারা এটা সমাপ্ত করতে চায়। আরিফ এসব কথা আমাদের বলত। ফজলুল হক রানাও আসত মাঝে মাঝে।

– রানার সঙ্গে আপনার যোগাযোগ হলো কীভাবে?

১৯৭৪ সালের মাঝামাঝি আরিফ একবার রানাকে নিয়ে এল আমার কাছে। আমি আর ফেরদৌস তার সঙ্গে কথা বললাম। ফেরদৌসের বাসায় একবার রেইড হয়েছিল।

– কোথায় ছিল বাসা?

এলিফেন্ট রোডে। ফেরদৌসের ভায়রা ভাই ছিল নাসিম সাহেব, আওয়ামী লীগের নেতা। রক্ষীবাহিনীর লোকেরা তার বাসা রেইড করেছিল। তারা এর আগে সর্বহারা পার্টির এক সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছিল। তার কাছে শুনেছিল, ফেরদৌস তাদের সঙ্গে জড়িত।

বাসা রেইড হওয়ার সময় ফেরদৌস বলেছিল, আমার তালই যেখানে বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী (মনসুর আলী), আমার কি এদের সঙ্গে যুক্ত থাকার দরকার আছে? এ কথা বলে সে রেহাই পায়। তার বাসা সার্চ করা হয়। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। আমার নাম কেউ বলেনি। সে জন্য আমি কখনো সমস্যায় পড়িনি। আর আমি তো কখনো তাদের দল করিনি।

একবার আরিফ এসে বলল, 'সর্বহারা পার্টির সর্বোচ্চ পর্যায়ের একজন নেতা আপনার এখানে বসতে চান।' আমি তখন বিসিএসআইআর কম্পাউন্ডে একটা সিঙ্গেল রুমে থাকি। আরিফ বলল, একটু অ্যারেঞ্জ করেন।

কখন আসতে চান?

দশটার দিকে।

দিনে না রাতে?

দিনে। অফিস চলাকালে।

তো সর্বহারা পার্টির নেতা এল। সময়টা হলো চুয়াত্তর সালের অক্টোবর। তার সঙ্গে আরেকজন ছিল, বাহার। পরে নাম জেনেছি। একটা ফাইল হাতে



বজলুল করিম আকন্দ

নিয়ে রিকশা থেকে নামল। বুঝলাম, ইনিই সিরাজ সিকদার। তাকে আমার রুমে ঢোকালাম। আরিফ আর আমি বারান্দায় বসলাম। আরও চার-পাঁচজন লোক এল। তারা সবাই রুমের ভেতরে গিয়ে কথাবার্তা বলল।

আরিফ আমাকে আগেই বলেছিল, 'আপনি পরিচয় জিজ্ঞেস করবেন না।' আমিও জিজ্ঞেস করিনি। ধরে নিয়েছি, ইনিই তিনি, সিরাজ সিকদার।

– তখনই ধরে নিয়েছেন?

তখনই বুঝতে পেরেছি আমার ইনটুইশন থেকে। পরনে প্যান্ট, শার্ট, পায়ে অর্ডিনারি স্যান্ডেল। চোখে চশমা। সঙ্গে ছিল বাহার। সেও প্যান্ট-শার্ট পরা।

তারা আমার বাসায় প্রায় এক ঘণ্টা ছিল। আমি চা-বিস্কুটের আয়োজন রেখেছিলাম। মিটিং করে তারা চলে গেল। আরিফকেও জিজ্ঞেস করিনি, ইনিই সর্বহারা পার্টির নেতা কি না। বুঝে নিয়েছি, ইনিই সর্বোচ্চ পর্যায়ের নেতা। পরে তিনি যখন কিল্‌ড হন, তখন দেখি, ইনিই সিরাজ সিকদার।

– পত্রিকায় ছবি দেখে?

হ্যাঁ। আরিফ পরে বলেছিল, 'আপনার রুমে যিনি এসেছিলেন, তিনি

একসময় এলিফেন্ট রোডে থাকতেন। তখন মওলানা ভাসানী টাঙ্গাইলের সন্তোষ থেকে একবার ঢাকায় এসে এলিফেন্ট রোডে তার সঙ্গে দেখা করেছিলেন। পরে যখনই দরকার পড়ত, আরিফ আমার কাছে আসত, শেল্টার নিত।'

– কর্নেল তাহেরের সঙ্গে আপনার কখনো যোগাযোগ বা কথা হয়েছে।

না। তবে তার ছোট ভাই আবু সাঈদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। সে করাচি থেকে এসে ময়মনসিংহে আনন্দমোহন কলেজে ভর্তি হলো। পরে যখন আমি চাকরিতে ঢুকি, সায়েন্স ল্যাবরেটরিতে, তখন সে একবার এল আমার কাছে। সময়টা স্বাধীনতার আগে। সে এসে আমার সঙ্গে আরাকানি ভাষায় কথা বলতে থাকল। আমি তো ওই ভাষা বুঝি না। সে বলল, 'আমি তো আরাকানে ছিলাম। এ জন্য আমার ভাষাটা এরকম হয়ে গেছে।' সে সিরাজ সিকদারের পার্টি করত, পার্বত্য চট্টগ্রামে ছিল। তার বড় ভাই আবু তাহেরও সর্বহারা পার্টির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল।

এটা আমি টের পেলাম কীভাবে? আমার এক বন্ধু, নাম ফরহাদ। সে নাসার সায়েন্টিস্ট। সে থাকত ধানমন্ডির ৪ নম্বর রোডে। তার ওয়াইফ ইতালিয়ান, মিজ ওয়ান্ডা। ফরহাদ এগারো বছর নাসায় ছিল। দেশে আসার পর আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করল। সে ছিল চারু মজুমদারের ভক্ত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে থিরোরেটিক্যাল ফিজিকসে ফার্স্টক্লাস ফার্স্ট হয়েছিল। ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট।

দেশে এসে সে খোঁজ নিল চারু মজুমদারের সমর্থকদের কোনো পার্টি আছে কি না। আবদুর রহমান নামে আমার এক বন্ধু ছিল। গণপূর্ত বিভাগের ইঞ্জিনিয়ার। তার বন্ধু হলো ফরহাদ।

আবদুর রহমান আর আমি চিন্তা করলাম, ফরহাদের সঙ্গে আরিফের একটা যোগাযোগ করানো দরকার। তখন ৪ নম্বর রোডে ফরহাদের বাসায় গেলাম। সেখানে আরিফ, আবদুর রহমান, ফরহাদ আর আমি।

– এটা কোন সালে?

আফটার লিবারেশন। বাহাত্তর সালে। ওই সময় ফরহাদ দেশে আসে। সে কিছু একটা করতে চায়। সে ঢাকা ইউনিভার্সিটির ফিজিকস ডিপার্টমেন্টের প্রফেসর আবদুল মতিন চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করল। মতিন চৌধুরী শুধু টালবাহানা করে। সময় দেয় না। তার ছাত্র ফরহাদ তো ব্রিলিয়ান্ট, এটা

সে জানে। শেষে তাদের দেখা হলো। এখানে ফরহাদের কোনো ভালো জব হলো না। অ্যাটমিক এনার্জি কমিশনে একটা পোস্ট দেওয়া হলো। এই পোস্টটা তার জন্য স্যুটেবল ছিল না। এমন এক সিচুয়েশনে তার দেখা হলো আমাদের সঙ্গে। সেখানে আরিফ একটা টেপ বাজিয়ে শোনাল। এটা ছিল কর্নেল তাহেরের সঙ্গে সর্বহারা পার্টির নেতা সিরাজ সিকদারের ডিসকাশন। ইনকমপ্লিট লিবারেশনকে কীভাবে কমপ্লিট করতে হবে। তখন ফরহাদ বলল, 'আপনাদের এই লিবারেশন মুভমেন্টকে আমি হেল্প করব। এখানে একজন পিটার আছে, সিআইএ এজেন্ট। সে আমার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করছে। আমি তাকে প্রশ্রয় দিচ্ছি না।'

– পিটার কাস্টার্স?

সম্ভবত। পিটার কাস্টার্সের সঙ্গে তাহেরের ভাই আবু সাঈদের নাম দেখেছিলাম। তাদের দুজনকেই পুলিশ খুঁজছে। ফরহাদ বলল, পিটারের সঙ্গে আরিফ বা আমরা যেন যোগাযোগ না করি।

এর তিন-চার দিন পর ফরহাদ আমাদের ডেকে পাঠাল। বলল, 'স্যরি, আমি তো আর বাংলাদেশে থাকতে পারছি না। কারণ, এখানে আমার জন্য ভালো কোনো জব নেই। জার্মানির একটা ইউনিভার্সিটি থেকে ইনভাইটেশন পেয়েছি। আই অ্যাম গোয়িং টু জার্মানি।' এরপর তার সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গেল। তবে জার্মানি থেকে সে একটা মুভি ক্যামেরা পাঠিয়েছিল। ওই ক্যামেরায় তোলা কিছু ভিডিও দেখেছি। আরিফ দেখিয়েছিল, পার্বত্য চট্টগ্রামে তাদের নেতা ব্যাটল ফিল্ডে কীভাবে যুদ্ধ করছে। কর্নেল জিয়াউদ্দিন সেনাবাহিনী ছেড়ে সর্বহারা পার্টিতে যোগ দিয়েছিল। তার ছবি দেখাল। মানে তাদের লিবারেশন ওয়ার শুরু হয়ে গেছে।

কাসেম

সিরাজ সিকদারের পরবর্তী লেভেলের যে লিডাররা ছিল, তাদের অনেকেই ইঞ্জিনিয়ার। আমারও কিছু জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার বন্ধু ছিল। তারা মাঝে মাঝে আসত। তারা সিমপ্যাথাইজার খুঁজত। এরকম দুজন ইঞ্জিনিয়ার এনামুল আর ইঞ্জিনিয়ার দেলোয়ার আমার পরিচিত। ওরা আমার কাছে সর্বহারা পার্টির গল্প করত। দেশে তো তখন নানান অসন্তোষ। অনেকেই আশা করত, এরা বুঝি কিছু করবে। এনাম আমাকে বলেছিল, 'আমাদের নেতা যেকোনো সময় আপনার এখানে আসতে পারে। তার সঙ্গে একটু কথা বলবেন।' একদিন সত্যি সত্যিই তিনি এলেন।

– এটা কি চট্টগ্রামে?

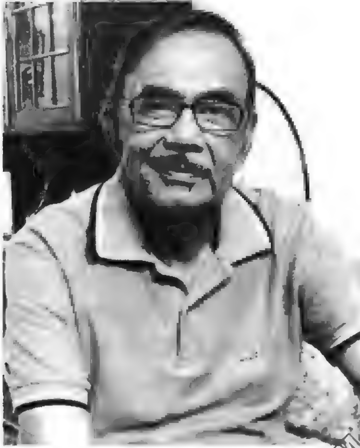
চট্টগ্রামে।

– আপনি সেখানে কী করতেন?

আমি চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের চিফ ইন্সট্রাক্টর, সিভিলের। কিংবা ভাইস প্রিন্সিপাল হয়ে গেছি হয়তো। তিনি এলেন। সুঠাম দেহ। বেশ লম্বাচওড়া ফিগার। পরনে প্যান্ট এবং ফুলহাতা শার্ট। পকেটে কলম। দেখে মনে হয় কোনো প্রতিষ্ঠানের অফিসার। যতক্ষণ ছিলেন এবং যে গল্পগুলো করেছেন, তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গেছি। ইউরোপে কোথায় কখন বিপ্লব হয়েছে, কে নেতৃত্ব দিয়েছে, কীভাবে বিপ্লব সফল বা ব্যর্থ হলো সব তাঁর নখদর্পণে। আমি ভাবতে পারিনি যে লোকটা এত জ্ঞানী।

তাঁর ঠান্ডা লেগেছিল। আমার গিন্নি বলল, 'একটু চা দিই?' বললেন, 'চা আমি খাই না। ঠান্ডা লেগেছে তো। দেন, খেতে পারি।'

তিনি আসবেন এজন্য আমরা প্রস্তুত ছিলাম না। তাঁকে চালভাজা আর চা দিলাম। তিনি বেশ আগ্রহ নিয়ে খেলেন। তাঁর কথার মধ্যে একটা বিষয়



আবুল কাসেম

বারবার উঠে আসছিল—আমার ছেলেরা। আমার ছেলেরা অমুক জায়গায় এই করেছে, আমার ছেলেরা টাঙ্গাইলে এই করেছে, ফরিদপুরে এই করেছে, আমার ছেলেরা বরিশালে এই করেছে—এভাবে কথা বলছিলেন।

চলে যাওয়ার সময় জিজ্ঞেস করলাম, 'কোথায় যাবেন?' দেখলাম, তাঁর মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল। কোনো উত্তর দিলেন না। পরে তাদের অন্য লিডারদের কাছে জানতে চেয়েছি, জিজ্ঞেস করেছিলাম কোথায় যাবেন? তিনি তো কোনো জবাব দিলেন না? ওরা বলল, 'লিডার কখন কোথায় যাবেন, কাউকে বলে যাবেন না। এটাই নিয়ম।'

যতক্ষণ ছিলেন, মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে তাঁর কথা শুনেছি। কয়েকদিন পর আমার এক ইঞ্জিনিয়ার বন্ধু এক ভদ্রমহিলাকে আমার বাসায় নিয়ে এলেন।

– কোন ইঞ্জিনিয়ার?

এনাম বা দেলোয়ার। সঠিক মনে নেই। সময়টা ডিসেম্বরের শুরুর দিকে, ১, ২ বা ৩ তারিখের কথা। পরে জানলাম, উনি সিকদারের স্ত্রী।

– নাম কী?

নাম মনে করতে পারছি না। হালকা পাতলা শরীর, গায়ের রং ফর্সা।

যেদিন সিকদার ধরা পড়লেন, সে খবর তো চাউর হয়ে গেল। তারপর তাঁকে গুলি করে মারাও হলো। সে খবর শোনার পর উনি চিৎকার করে বলেছিলেন, 'না, আমি বিশ্বাস করি না। এটা হবে না। এটা হতে পারে না।'

– ওই সময় কি তিনি আপনার বাসায়?

হ্যাঁ।

– মানে সিকদারের অ্যারেস্ট হওয়া ও মৃত্যুর সময় তাঁর স্ত্রী আপনার বাসায়? কোথায় ছিল বাসা?

চিটাগাং পলিটেকনিক স্টাফ কোয়ার্টার।

– এটা কোন জায়গায়?

নাসিরাবাদ।

– তারপর কী হলো?

আমি তো মহাসংকটে পড়ে গেলাম। যে কোনো মুহূর্তে একটা বিপদে পড়তে পারি। বন্ধুদের আর খুঁজে পাই না। পরে দেলোয়ারকে পেলাম। বললাম, শিগগির উনাকে আমার বাসা থেকে সরাও। আমি তো ভীতু বাঙালি! যেকোনো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। ওরাও তাঁকে সরানোর কায়দা পাচ্ছিল না। একদিন দুদিন এরকম চলল। তারপর দেলোয়ার এসে তাকে নিয়ে গেল। আমি খুব ভয়ে ছিলাম।

একদিন আমাদের ইনস্টিটিউটের প্রিন্সিপাল বলল, 'ইন্টেলিজেন্সের খবর আছে। সিরাজ সিকদার নাকি আমাদের এলাকায় এসেছিল। কোথায় আসতে পারে, বলেন তো? মনে হয়, হোস্টেলের ছেলেদের সঙ্গে যোগাযোগ করে থাকতে পারে।'

আমি তাকে আসল কথাটা বলি নাই। সিকদার যে আমার কাছে এসেছিল, এটা তো বলতে পারছি না।

– তাঁর গ্রেপ্তার ও মৃত্যুর খবর শুনে আপনার স্ত্রীর কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল? তিনি তো তাঁকে দেখেছেন, চা খাইয়েছেন?

দেখুন, যেকোনো মৃত্যুই বেদনা সৃষ্টি করে। তার চোখ দিয়ে দরদর করে পানি পড়ছিল। এরকম জলজ্যান্ত একটা মানুষকে মেরে ফেলল! সে রাজনীতি অত বোঝে না। মানুষটাকে তো দেখেছে।

– তার মানে, আপনার বাসায় আসার এক মাস পর তিনি নিহত হলেন। তারপর তাঁর স্ত্রীকে দেলোয়ার এসে নিয়ে গেল।

তারপর আর তার কোনো খবর পাইনি।

– দেলোয়ারের সঙ্গে কি আপনার যোগাযোগ আছে?

না। দেলোয়ারের সঙ্গে যোগাযোগ হয় না। এনামুলকে কিন্তু মেরে ফেলেছে।

– তাই? কোথায়? কে মারল?

নেতা মারা যাওয়ার পর কীভাবে ...।

– কিল্‌ড বাই পুলিশ? নাকি ইনার পার্টি কনফ্লিক্ট?

সরকারের লোকেরাই বোধ হয়।

– এনামুল কি অ্যাকটিভিস্ট ছিল? দেলোয়ারও কি অ্যাকটিভিস্ট?

দেলোয়ার চাকরি করত। আর ভেতরে ভেতরে এসব করত। সে বেঁচে আছে কি না জানি না।

– সিকদারের মৃত্যুর খবর শুনে আপনার কেমন অনুভূতি হয়েছিল?

দুঃখ পাওয়া তো স্বাভাবিক। সে তো জোরেশোরে—বাংলাদেশে একটা হইচই ফেলে দিয়েছিল। ১৬ ডিসেম্বর সারা দেশে বোমা ফেটেছিল। এটা তো আপনি জানেন। এভাবে কোনো মৃত্যুই কামনা করি না।

আজমী

১৯৭৫ সালে সিরাজ সিকদারের মৃত্যুর পর গত চার দশকে তাঁর এবং তাঁর দল (পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি) সম্পর্কে অনেক কিছু লেখা হয়েছে। কিন্তু খুব কমই লেখা হয়েছে তাঁর ঘনিষ্ঠতম সহযোগী এবং দলের শুরুর দিকের ইতিহাস সম্পর্কে। যেহেতু আন্দোলনটি ছিল গোপন, প্রকাশিত লেখাগুলোয় অনেক ভুল এবং ফাঁকফোকর রয়ে গেছে।

১৯৯১ সালে পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টির ২০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত হয় *স্ফুলিঙ্গ*-এর একটি বিশেষ সংখ্যা। এতে দলের শহীদদের একটি তালিকা দেওয়া হয়।

তালিকাটি লম্বা। সম্পাদকীয় ভূমিকায় বলা হয়, তালিকায় ভুল থাকতে পারে, কেননা অনেক ইতিহাসই হারিয়ে গেছে। এ ব্যাপারে মন্তব্য, পরামর্শ এবং সংশোধনীকে স্বাগত জানানো হয়।

'দলের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রথম কেন্দ্রীয় কমিটির চেয়ারম্যান শহীদ কমরেড সিরাজ সিকদার' শিরোনামে লেখায় সিরাজ সিকদারের একটি ছবি আছে।

সিকদারের পরে তালিকার প্রথম নামটি হলো তাহের, আসল নাম সামিউল্লাহ আজমী, কমলাপুর, ঢাকা (কোনো ছবি নেই)। সংক্ষিপ্ত পরিচিতিতে বলা হয়, তিনি ছিলেন ভারতের হায়দরাবাদ থেকে আসা একটি উদ্বাস্তু পরিবারের সদস্য। এছাড়া আর কোনো কথা নেই।

প্রায় অপরিচিত সামিউল্লাহর ব্যাপারে আমি স্মৃতিকাতর। তিনি শুধু আমার ভাই নন, তিনি বাংলাদেশের জনগণের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন। ইতিহাসকে সঠিক জায়গায় রাখার জন্য তাঁর সম্পর্কে কিছু কথা বলতেই হয়।

'টেররিস্ট অর গেরিলাজ ইন দ্য মিস্ট'-এ ২০০৫ সালের ডিসেম্বরে সর্বহারা পার্টির সাবেক নেতা ও লেখক রইসউদ্দিন আরিফকে উদ্ধৃত করে



স্ফুলিঙ্গ
সর্বহারা পার্টির
২০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী
উপলক্ষে প্রকাশিত
বিশেষ সংখ্যা

নাঈম মোহাইমেন বলেছেন, পতাকার অন্যতম নকশাকার সামিউল্লাহ আজমী দলের একজন সদস্য এবং তিনি ছিলেন অবাঙালি।

কথিত পতাকার নকশাটি খুবই সাধারণ, সবুজ পটভূমিতে (সুফলা গ্রামবাংলা/কৃষক) লাল বৃত্ত (বিপ্লব/শ্রমিক শ্রেণি), কাকতালীয়ভাবে এটিকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের পতাকা হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

মহান মুক্তিযুদ্ধ ও সাতই নভেম্বর অভ্যুত্থানে কর্নেল তাহের বইয়ে ড. মো. আনোয়ার হোসেনও 'অবাঙালি সামিউল্লাহ আজমী' এবং তাঁর ভাইয়ের (অর্থাৎ আমি) কথা বলেছেন।

সূর্য রোকনের 'রুহুল ও রাহেলা' লেখায় 'অবাঙালি সাইফুল্লাহ আজমী'র প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে :

> ১৯৬৮ সালে সিরাজ সিকদার ওরফে রুহুল আলম গেরিলা প্রশিক্ষণের জন্য বার্মায় যান এবং ১৯৬৮ সালের ডিসেম্বরে পার্বত্য চট্টগ্রামে সুড়ঙ্গ খননের চেষ্টা করেন। তাঁর পাঁচজন সঙ্গী পালিয়ে যাওয়ার পর থেকে

যান শুধু অবাঙালি দুই ভাই, আজমী ওরফে রুহুল কুদ্দুস এবং তাঁর ছোট ভাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নের প্রথম বর্ষ অনার্সের ছাত্র।

কথিত এই ছোট ভাই অর্থাৎ আমি (মোহাম্মদ রাজিউল্লাহ আজমী) প্রাণিবিদ্যা (রসায়ন নয়) বিভাগে পড়তাম। আমি পরিষ্কারভাবে বলতে চাই, সিরাজ সিকদার কখনোই বার্মায় যাননি। ১৯৬৮ সালের বসন্তে প্রকৌশলীর চাকরি নিয়ে তিনি টেকনাফের কয়েক মাইল উত্তরে ছিলেন। সেখানে সামিউল্লাহসহ ১০-১২ জন বিপ্লবী জড়ো হয়েছিলেন। আনোয়ার হোসেনসহ আমরা সামিউল্লাহর নেতৃত্বে নাফ নদী পেরিয়ে বার্মায় যাই। উদ্দেশ্য ছিল বার্মার কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ করা। কিন্তু ব্যর্থ হয়ে কয়েকদিন পর ফিরে আসি।

এই দলের কয়েকজন এরপর ব্যক্তিগত কারণে পালিয়ে যায়। অন্যরা সিকদারের সঙ্গে মতপার্থক্য হওয়ায় দলত্যাগ করে। এদের একজন আনোয়ার হোসেন। তিনি তাঁর বইয়ে দলের সদস্যদের একটা আংশিক তালিকা দিয়েছেন।

ভারতের উত্তর প্রদেশের পূর্বদিকে বাল্লিয়া শহরে ১৯৪৭ সালের জানুয়ারি মাসে জন্মগ্রহণ করেন মোহাম্মদ সামিউল্লাহ আজমী (বাচ্চু)। পাঁচ ভাই তিন বোনের মধ্যে তিনি প্রথম। আমি তাঁর পিঠাপিঠি ছোট ভাই এবং তাঁর ঘনিষ্ঠতম ও আস্থাভাজন সহযোগী ও বন্ধু।

আমাদের মা-বাবা দুজনই উত্তর প্রদেশের (হায়দরাবাদ নয়) আজমগড় জেলার (এখন নাম মও) কৈরাপার গ্রামের বাসিন্দা। ১৯৪৮ সালে মা-বাবা দেশ ছেড়ে বাংলাদেশে (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) চলে এলে সামিউল্লাহ এখানেই বেড়ে ওঠেন। ঢাকায় থিতু হয়ে ইংরেজি মাধ্যম ডন স্কুলে ক্লাস সেভেনে ভর্তি হওয়ার আগে তিনি গাইবান্ধার তালোরা এবং ফেনীতে বাংলা মাধ্যম স্কুলে পড়েছেন। তারপর নবম ও দশম শ্রেণিতে পড়েছেন ঢাকার শাহীন স্কুলে। তেজগাঁও ইন্টারমিডিয়েট টেকনিক্যাল কলেজে উচ্চমাধ্যমিক এবং পরে কায়েদে আজম কলেজে বিএসসি পড়ার সময় বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৬৯ সালে আন্ডারগ্রাউন্ডে যাওয়ার আগে তিনি ঢাকার কমলাপুরের ৯৫ সবুজবাগে থাকতেন।

একদিন আমি সামিউল্লাহর সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের (ইপসু)



রাজিউল্লাহ আজমী

অফিসে যাই। আমরা শীর্ষ নেতাদের বক্তব্য শুনছিলাম (মাহবুব উল্লাহর কথা মনে আছে)। হঠাৎ আমাদের মনোযোগ কেড়ে নেন পেছনে বসা একজন, যিনি আরেকজনের সঙ্গে কথা বলছিলেন। আগ্রহী হয়ে আমরা তাঁর কাছে যাই তাঁর কথা শুনতে। তাঁর কথায় ও ব্যক্তিত্বে আমরা মুগ্ধ হই।

এভাবেই সিরাজ সিকদারের সঙ্গে কাকতালীয়ভাবে আমাদের প্রথম দেখা। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (এখন বুয়েট) বাইরে ইপসুতে তাঁকে কম লোকই চিনত। বিএসসি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষা দিয়ে তিনি আন্তরিকভাবে বিপ্লবী তরুণদের বাছাই করে পূর্ব বাংলার নির্যাতিত মানুষের জন্য মুক্তিসংগ্রাম শুরু করেন।

প্রথম সাক্ষাতের কয়েকদিনের মাথায় সিকদারের ঘনিষ্ঠতম সহযোগী হয়ে পড়লেন সামিউল্লাহ। ১৯৭১ সালের আগস্টে সাভারে তাঁর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এই সম্পর্ক বজায় ছিল। ঢাকা ও অন্যান্য জায়গার সংঘাতময় ও অনিশ্চিত পরিস্থিতির কথা ভেবে তাঁর পরিবারের সদস্যরা এর আগেই করাচি চলে যায়। সামিউল্লাহর মৃত্যুর পর সিকদার মোহাম্মদপুরে আমাদের বোনের কাছে হাতে লেখা প্রশংসাসূচক একটা চিঠি পাঠিয়েছিলেন। চিঠিতে তিনি

বাংলাদেশের জনগণ ও পার্টির জন্য তাঁর অবদানের কথা বলেন।

বাঙালি নৃ-গোষ্ঠীর একজন না হয়েও বাংলাদেশের জনগণের জন্য সামিউল্লাহ যে ত্যাগ স্বীকার করেছেন, সিকদার তাকে তুলনা করেছেন কানাডীয় কমিউনিস্ট নরম্যান বেথুনের সঙ্গে, যিনি চিনের লাল ফৌজের সঙ্গে চিকিৎসক হিসেবে কাজ করতে গিয়ে ১৯৩১ সালে মারা যান। তাঁর কথা আমরা জেনেছি মাও সে তুংয়ের লেখায়। তিনি বেথুনকে 'আমাদের মহান কান্ডারি' বলে শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন।

আমাদের টেকনাফ মিশন কিছুই দেয়নি, ভিয়েতকংদের মতো পাহাড়ে সুড়ঙ্গ কাটতে গিয়ে হাত ক্ষতবিক্ষত করা এবং স্বপ্নভঙ্গ হওয়া ছাড়া। আমাদের মূল দলটি ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় এবং মনোবল নেমে যায় তলানিতে। এক সন্ধ্যায় ঢাকার খিলগাঁওয়ের বাসার বাগানে বসে সিরাজ সিকদারের সঙ্গে উদ্দীপনামূলক কথোপকথনের পর সিকদার, সামিউল্লাহ ও আমি অনিবার্য বিপ্লবের পক্ষে একসঙ্গে থাকার রক্তশপথ নিই।

আমরা ছদ্মনামে শপথনামায় সই দিই। রুহুল আলম নামে প্রথম সই দেন সিরাজ সিকদার। সামিউল্লাহ সই দেন রুহুল আমিন নামে (পরে তাঁর নাম হয় কমরেড তাহের)। আমার নাম কী হবে এটা ঠিক করার আগেই সিকদার আমার নাম প্রস্তাব করলেন, 'রুহুল কুদ্দুস'। আমাদের তিনজনই 'রুহুল', অর্থাৎ ঘনিষ্ঠ কমরেডদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব।

১৯৭০ সালে খালেদা নামের এক বিপ্লবী তরুণী কার্যত সামিউল্লাহর স্ত্রী হলেন। তিনি এসেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে। তিনি আমাদের দলের সহানুভূতিশীল কালামের বোন।

আমাদের বাবা মোহাম্মদ সফিউল্লাহ ভারতের রেল বিভাগে চাকরি করতেন। ১৯৪৮ সালে পূর্ব পাকিস্তানে চলে আসার পর তিনি তিস্তামুখ ঘাট, রুহিয়া, বদরগঞ্জ, কাউনিয়া, তালোরা, গাইবান্ধা, ফেনী, সিলেট, জামালপুর টাউন, গেন্ডারিয়া এবং সব শেষে গোয়ালন্দঘাটে স্টেশনমাস্টার ছিলেন। ১৯৬৯ সালে তিনি অবসর নেন।

আমাদের বাবা ছিলেন একজন আদর্শ ভারতীয় বাবু। উত্তর ভারতীয় সামন্ত মানসিকতা নিয়ে তিনি রেলস্টেশনে কর্তৃত্ব করতেন। সত্তর বছর বয়স হওয়ার আগে তিনি ইদের জামাত ছাড়া কখনো নামাজ পড়েননি, রোজা রাখেননি।

আমাদের মা মেহেরুন্নেসা বেগম ছিলেন খুবই ধার্মিক এবং দয়াবান।

সব ধর্মের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল। তিনি আমাদের মানবিক হতে শিখিয়েছেন এবং বিশেষ করে গরিব ও শোষিতদের প্রতি দয়াবান হতে এবং একই সঙ্গে নিরাপদ দূরত্বে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন।

১৯৭১ সালে বুলেটে ঝাঁঝরা হয়ে তেইশ বছরের সামিউল্লাহর মৃত্যুর খবরটি তিনি বিশ্বাস করেননি। প্রত্যেক রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে তিনি আল্লাহর কাছে মুনাজাত করতেন—তাঁর ছেলে বেঁচে আছে এবং একদিন সে ফিরে আসবে।

২

১৯৬৯ সালের মাঝামাঝি থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যে একঝাঁক নিবেদিতপ্রাণ বিপ্লবীর সাহায্যে সিরাজ সিকদার সারা দেশে সর্বহারা পার্টির শক্তিশালী শাখা ও ঘাঁটি গড়ে তুলতে সক্ষম হন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরপর ১৯৭২ সালের শুরু থেকেই আওয়ামী লীগ ও সর্বহারা পার্টির মধ্যে প্রকাশ্য সংঘাত হতে থাকে। শেখ মুজিবুর রহমান ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন এ অভিযোগ এনে সর্বহারা পার্টি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে গেরিলাযুদ্ধের সূচনা করে, থানা দখল করে এবং নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের আক্রমণ করতে থাকে।

১৯৭৫ সালের ২ জানুয়ারি সিরাজ সিকদারের গ্রেপ্তার ও মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সরকার একটা বড় জয় পায়। একটি সত্যিকার রাজনৈতিক দল ও গেরিলা সংগঠন হিসেবে তখনই পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টির পতনের শুরু। একটি অন্তর্বর্তীকালীন কমিটি দলের নেতৃত্ব নেয় এবং সন্দেহজনক ভিন্নমতাবলম্বীদের খতম শুরু হয়। উপদলীয় কোন্দল ও আত্মঘাতী সংঘর্ষে দলটি জেরবার হয়।

উপদল ও বিচ্ছিন্ন গ্রুপগুলো প্রত্যেকেই নিজেদের পার্টির সত্যিকারের উত্তরাধিকারী বলে দাবি করে। এদের মধ্যে কয়েকটি তো নিছক ডাকাত দল। বাকিরা মার্কস, মাও ও সিকদারের কথা বলে বেড়ায়। এরা পুলিশের কাছে সাময়িক ঝামেলাকারী ছাড়া আর কিছু নয়। দল মরে গেছে।

সিকদার সামিউল্লাহ আজমীর চেয়ে চার বছর বেশি বেঁচে ছিল। তার

এই সহকারী ১৯৭১ সালের আগস্টে আওয়ামী লীগের পরিচিত মুখ গিয়াসউদ্দিনের (গেসু চেয়ারম্যান) হাতে এমন একসময় খুন হলো, যখন আওয়ামী লীগ নিজেই পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও তার দোসরদের হাতে আক্রান্ত। সিকদার কেন এই খুনের প্রতিশোধ নেয়নি, তা বোঝা মুশকিল।

১৯৭২ সালের জানুয়ারিতে দলের কংগ্রেসে সিকদার যে প্রতিবেদন উপস্থাপন করে, সেখানে ছয়-সাতজন কমরেডসহ সামিউল্লাহর খুনের প্রসঙ্গটি আশ্চর্যজনকভাবে অনুপস্থিত। এমনকি তাদের প্রতি কোনো রকম শ্রদ্ধা জানানো হয়নি।

এটা ঠিক যে সিকদার হাতে লেখা একটা চিঠি সামিউল্লাহর পরিবারের কাছে পাঠিয়েছিলেন। নিহত কমরেডের স্মরণে তিনি ছোট একটি কবিতাও লিখেছিলেন। কিন্তু তার মৃত্যুর ব্যাপারে তদন্ত করা বা প্রতিশোধ নেওয়া তো দূরে থাকুক, দলের পরবর্তী সভায় এ বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়াকে খাটো করে দেখা যায় না।

দলের শুরুর দিকে কেন্দ্রিকতা এবং সিকদারের প্রতি প্রশ্নাতীত আনুগত্য ইতিবাচক মনে হলেও পরে এর অপব্যবহার এবং বিকৃতি হয়েছে। সর্বোচ্চ নেতার ধরা পড়া ও মৃত্যুর মধ্য দিয়ে কেন্দ্রীভূত এই গোপন সংগঠনে যে শূন্যতা এবং নেতৃত্ব দখলের যে লড়াই শুরু হয়, কিছু লোকের খতমের মধ্য দিয়ে তা দলকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়।

বুদ্ধিমান ও প্রভাব বিস্তার করার ক্ষমতার অধিকারী সিকদার ছিলেন একাধারে সাহসী, একরোখা এবং লক্ষ্য অর্জনের ব্যাপারে নিষ্ঠুর। এ জন্যই তিনি বাংলাদেশে একটি বিপ্লবী মাওবাদী পার্টি গড়ে তুলতে পেরেছিলেন বলে তাঁর পরিচিতজনেরা মনে করেন। তাঁকে সমসাময়িককালের কম্বোডিয়ার কুখ্যাত পলপটের সঙ্গে তুলনা করা যায়।

অসাধারণ বুদ্ধিমান এবং স্বভাবনেতা ছিলেন সামিউল্লাহ আজমী। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন একজন বুদ্ধিজীবী এবং স্বপ্নদ্রষ্টা। ১৯৬৭ সালে প্রথম সাক্ষাতের পর থেকেই তিনি সিকদারকে মূল নেতৃত্বে দেখে খুশি ছিলেন। তাঁরা একসঙ্গে কাজ করেছেন চার বছরেরও কম সময়। এর মধ্যে শেষ দেড়টি বছর ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

আমার এই আখ্যানে অন্যান্য চরিত্রও প্রাসঙ্গিক। কমরেড খালেদা ওরফে বুলু একজন সহজাত বিপ্লবীর মতোই ছিলেন। সামিউল্লাহর সঙ্গে তাঁর শেষ

দিকের চার মাসের বিচ্ছিন্নতা তাঁকে দুঃখ দিয়েছিল। জবরদস্তি করে তাঁদের বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল। এজন্য তিনি সিকদারকে দায়ী করেছেন—সিকদার কেন তাঁর স্বামীর কথিত খুনের তদন্ত করেনি এবং খুনিদের শাস্তি দেয়নি।

১৯৭৫ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তিনি (বুলু) অসুস্থ হয়ে পড়েন। যখন দেখলেন দল ভেঙে যাচ্ছে এবং কমরেডরা একে অন্যকে খতম করছে, তিনি ১৯৭৬ সালে পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহারে তাঁর বাড়িতে চলে যান। ১৯৮৩ সালে তিনি আবারও বিয়ে করেন। তাঁর ৩০ বছর বয়সী একটি ছেলে আছে।

খালেদা (ওরফে বুলু) যখন ছাত্রদের পড়ান না বা ছাত্রদের সঙ্গে সময় কাটান না, তখন তিনি ইন্টারনেট ঘেঁটে বা অতীতকে স্মরণ করে ভাবতে বসেন। সামিউল্লাহ ছিলেন তাঁর সবচেয়ে ভালোবাসার মানুষ। তাঁর ছেলে তানভির মায়ের কাছে সামিউল্লাহর গল্প শুনেই বড় হয়েছে।

সামিউল্লাহ একাত্তরের মে বা জুনে ঢাকায় পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে গেলে আমাদের বোন তাকে আমাদের মা-বাবার করাচি চলে যাওয়ার খবরটি দিয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তানের সংঘাতময় পরিবেশ থেকে বাঁচার জন্য তাঁরা চলে গিয়েছিলেন। করাচিতে আমাদের বাবা মারা যান ১৯৮৪ সালে। মায়ের মৃত্যু হয় ১৯৯২ সালে। তাঁরা সব সময়ই সামিউল্লাহর কথা ভাবতেন, যদিও আমার সামনে কখনো তাঁর নাম উচ্চারণ করতেন না। ২৪ বছর বয়স হওয়ার আগেই তাঁদের প্রিয় সন্তান খুন হয়েছে, এটি তাঁরা শুনতে চাননি।

টেকনাফে সর্বহারার বিপ্লব করার লক্ষ্যে আমরা যে দশজনের মতো জড়ো হয়েছিলাম, তাঁদের একজন আকা ফজলুল হক রানা এখন ঢাকায় একজন ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্ট হিসেবে কাজ করেন। মাঝেসাঝে সর্বহারা পার্টি নিয়ে সাক্ষাৎকার দেন। তাঁর স্তালিনীয় গোঁফের সঙ্গে বিপ্লবী উন্মাদনাও উবে গেছে। সম্প্রতি ঢাকা সফরের সময় আমি তাঁর স্ত্রীর রান্নার প্রশংসা করলে তিনি এ জন্য সিকদারকে ধন্যবাদ দেন।

শুধু রান্না শেখা নয়, আকার সঙ্গে তাঁর বিয়ের জন্যও তিনি সিকদারের কাছে ঋণী। আকা এখনো স্মরণ করেন, সিকদার একদিন তাঁকে হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসলেন, 'অই, বিয়া করবি?' এটা শুনে এই নিবেদিতপ্রাণ বিপ্লবী সঙ্গে সঙ্গেই রাজি হয়ে যান। তাঁর জন্য একটি বিপ্লবী পরিবারের একজন সুন্দরী তরুণীর কথা সিকদার ইতিমধ্যেই ভেবে রেখেছিলেন।

আমার কলেজের বন্ধু আনোয়ার হোসেন চে গুয়েভারার মতোই হাড়ে-মজ্জায় একজন বিপ্লবী। টেকনাফের ব্যর্থ মিশনের পর সিকদারের সঙ্গে তাঁর ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। এই অভিযানের পর তিনি তাঁর ভাই পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কমান্ডো কর্নেল তাহেরের সঙ্গে যোগ দেন এবং বিপ্লবী কর্মকাণ্ড চালিয়ে যান।

আনোয়ারের ভাই আবু সাঈদও টেকনাফ গ্রুপের একজন। তিনি এরপরও একক মিশনে বার্মার ভেতরে ঢুকেছিলেন। সেটি সফল হয়নি। কয়েক বছর পর তিনি বিশৃঙ্খল জীবনে জড়িয়ে পড়েছিলেন।

১৯৭৬ সালে জেলে আটক কর্নেল তাহেরকে জেনারেল জিয়াউর রহমান ফাঁসি দিলেও একটা জাপানি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাণরসায়নে আনোয়ারের পিএইচডি করা থেমে থাকেনি। তিনি এখন বাংলাদেশের একজন সুপরিচিত শিক্ষাবিদ এবং কলামলেখক।

সাঈদ ফিরে গেছেন ব্যক্তিগত ব্যবসায়। তিনি শান্তিপূর্ণ জীবন কাটাচ্ছেন। তাঁর ২৫ বছর বয়সী মেধাবী ছেলেটির পানিতে ডুবে মারা যাওয়ার স্মৃতি তাঁকে এখনো তাড়া করে। (সাঈদ সম্প্রতি প্রয়াত হয়েছেন।)

আমাদের কলেজের আরেকজন বন্ধু মতিউর রহমান আমাদের ছেড়ে গেছে অনেক আগেই। টেকনাফ থেকে ফিরে চট্টগ্রামে আমরা একটা হোটেলে ছিলাম দুই রাত। আমরা তখনো ভাবছি, কী করব। দেখলাম তার বিছানা খালি। সে হাতে লেখা একটা চিরকুট রেখে গেছে। সে লিখেছে, আমাদের ছেড়ে যেতে তার কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু অনিশ্চিত জীবনের এই ভার সে আর বইতে পারছে না।

টেকনাফ গ্রুপের আরেকজন হলো এনায়েত ওরফে বাবর। সামিউল্লাহর সঙ্গে সাভারে যারা খুন হয়েছিলেন, তিনি তাঁদের একজন। আরেকজন হলো কালো মুজিব। তিনি কিছুদিনের মধ্যেই দলে ফিরে এসেছিলেন। দল ভাঙাভাঙির সময় তিনি আবারও দল ছেড়ে যান। কিছুদিন আগে তিনি ক্যানসারে মারা গেছেন।

টেকনাফ মিশনের পর সামিউল্লাহ যাঁদের দলে এনেছিলেন, তাঁদের একজন হলেন ফারুক ভাই। মৃদুভাষী, ভদ্র, কাব্যিক এই মানুষটিকে বিপ্লবের সন্ত্রাসবাদী কাজের চেয়ে সিনেমার রোমান্টিক নায়ক হিসেবেই ভালো মানায়। সামিউল্লাহর মৃত্যুর পর তিনি মেডিকেল কলেজের পড়াশোনায় ফিরে যান।

তিনি ঢাকার একজন চক্ষু বিশেষজ্ঞ। এখনো তিনি মোহিনী চৌধুরীর গানের লাইনগুলো স্মরণ করেন, যা শুনিয়ে সামিউল্লাহ তাঁকে দলে টেনেছিলেন, 'মুক্তির মন্দির সোপানতলে, কত প্রাণ হল বলিদান, লেখা আছে অশ্রুজলে।'

যদি সিকদারের স্ত্রী, বলা চলে স্ত্রীবৃন্দের কথা না বলি, তাহলে তো সবটা বলা হবে না। ১৯৬৭ সালে তাঁর সঙ্গে যখন প্রথম দেখা হয়, তখন তিনি রওশন আরার সঙ্গে ঘর করছেন। রওশন আরা একজন অল্পশিক্ষিত গ্রামের গরিব ঘরের মেয়ে। বয়সে সিকদারের অনেক ছোট। বাবার অমতে বিয়ে করেছিলেন। বলা যায়, এটাই ছিল তাঁর প্রথম বিপ্লবী কাজ, পরিবারের পেটিবুর্জোয়া শ্রেণিচরিত্রকে অগ্রাহ্য করা।

রওশন আরা একজন সুশ্রী, লাজুক ধরনের মেয়ে। কারও সাতেপাঁচে নেই। একজন অনুগত স্ত্রী হওয়া ছাড়া তার আর কিছু চাওয়ার নেই। টেকনাফে সে একটি মেয়ের জন্ম দেয়, নাম শিখা। সিকদার আমাকে বলল, একছুটে একজন ডাক্তারকে নিয়ে আসো। কিছুক্ষণ পর আমি ফিরলাম একা। দেখলাম, সিকদার একাই ডাক্তার ও দাই। তিনি নিজেই বাচ্চা প্রসব করিয়েছেন।

১৯৬৯ সালে শিখা যখন এক বছরের, জাহানারা নামে এক বিপ্লবী নারীর সঙ্গে পরিচয় হলো সিকদারের। তাঁর স্বামী একজন জ্যেষ্ঠ সরকারি কর্মকর্তা। তাঁর কিশোর বয়সের ছেলেমেয়ে আছে। তিনি গল্প লেখেন, দেখতে ভালো এবং আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী।

সিকদারের কাছে জাহানারা ছিলেন অপ্রতিরোধ্য। তিনি ঘোষণা দিলেন, বিপ্লবী পুরুষের জন্য অনুগত গৃহবধূ নয়, প্রয়োজন বিপ্লবী স্ত্রী। স্বঘোষিত এই ফতোয়া দিয়ে তিনি জাহানারার দিকে ঝুঁকলেন এবং তাঁকে বিয়ে করলেন। রওশন আরা পরিত্যক্ত হলো। পরে কিছুটা অপরাধবোধ থেকেই রওশন আরা ওরফে মুক্তির সঙ্গে কমরেড ঝিনুক ওরফে বাউফলের বিয়ে দিলেন।

সিকদারের মৃত্যুর পর দলের ভেতরে খুনোখুনি শুরু হলে কমরেড ঝিনুক রেহাই পাননি। সিকদারের পার্টি লাইন যথাযথভাবে প্রয়োগের নামে এক বছরের মধ্যেই অভ্যন্তরীণ শত্রুদের অনেকের সঙ্গে ঝিনুককেও খতম করা হয়।

খিলগাঁওয়ে দলের গোপন সদর দপ্তরে কমরেড জাহানারা ওরফে রাহেলার সঙ্গে আমার কয়েকবার দেখা হয়েছে। তিনি যে আকর্ষণীয়, এটা আমার নজর এড়ায়নি। কিন্তু রওশন আরাকে সন্তানসহ পরিত্যাগ করার কারণে আমার অসন্তুষ্টির কথা গোপন করিনি। আদর্শের দোহাই দিয়ে এর সাফাই

গাওয়া আমার কাছে হাস্যকর মনে হয়েছে।

উইকিপিডিয়ার ১৯৮৬ সালের এশিয়ান সার্ভের বরাত দিয়ে নুরুল আমিনকে উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে, ১৯৬৭ সালে সিরাজ সিকদার মাও সে তুং রিসার্চ সেন্টার প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৯৬৮ সালের ৮ জানুয়ারি এই গ্রুপটি পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন গঠন করে। ঢাকার এক চটকলশ্রমিকের বাসায় ৪৫-৫০ জনের উপস্থিতিতে একদিনের সম্মেলনে দল তৈরি হয়।

মাও সে তুং রিসার্চ সেন্টারের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৯৬৮ সালের শেষের দিকে। ১৯৬৮ সালের ৮ জানুয়ারি ৪৫-৫০ জনের কোনো সম্মেলন হয়নি। এগুলো হয়েছে আমরা টেকনাফ থেকে ফিরে আসার পর। আসলে ওইদিন আমরা অল্প কয়েকজন সিকদারের খিলগাঁওয়ের বাসায় একটা সভা করেছিলোম। সভায় সিকদার, সামিউল্লাহ, আকা ফজলুল হক রানা এবং আমিসহ অল্প কয়েকজন উপস্থিত ছিলাম। সেখানে আমরা সিকদারের নেতৃত্বে একটি ইশতেহারের ব্যাপারে একমত হই। এমনকি পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন নামটিও গ্রহণ করা হয় পরে।

সামিউল্লাহ আজমীর কথা দিয়ে এই আখ্যান শুরু করেছিলাম। তাঁকে দিয়েই শেষ করব। আওয়ামী লীগের লোকদের হাতে তাঁর জীবন থেমে গেছে। কিন্তু তিনি তাঁর কমরেড স্ত্রী খালেদাকে নিয়ে স্বাধীন পূর্ব বাংলায় পতাকার নকশা তৈরি করেছিলেন, যা পরে আওয়ামী লীগ সরকার বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা হিসেবে গ্রহণ করেছে।

আয়তাকার গাঢ় সবুজ রঙের মাঝখানে লাল বৃত্ত আঁকা এই পতাকা ১৯৭০ সালের ৮ জানুয়ারি পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে দেশের কয়েকটি জায়গায় উত্তোলন করেছিল দলের কর্মীরা। পরবর্তী বছর কোনো এক তারিখে এটি আরও অনেক জায়গায় তোলা হয়। ১৯৭১ সালের ১৪ জানুয়ারি ঢাকার অবলুপ্ত *পূর্বদেশ* পত্রিকায় 'নতুন পতাকা' শিরোনামে এ সম্পর্কে একটি খবর প্রকাশিত হয়েছিল।

বাংলাদেশের কোনো নাগরিক যখনই গর্বভরে এই পতাকাকে সালাম জানায়, এটি হয় উত্তর প্রদেশের কৈরাপারের স্টেশনমাস্টারের ছেলে সামিউল্লাহ আজমীর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি, যিনি মাত্র ২৩ বছর বয়সে তাঁর প্রিয় পূর্ব বাংলার মানুষের মুক্তির জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন।

ফারুক

ছাত্রজীবনেই মনে হতো আমরা নিজ দেশে পরবাসী। প্রথমে মুসলিম বয়েজ হাইস্কুল, তারপর নটরডেম কলেজ হয়ে যখন ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হলাম, দেখলাম পরিস্থিতি বেশ উত্তপ্ত। ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের সময় ভর্তি হই ঢাকা মেডিকেল কলেজে। যেদিন প্রথম গেছি, সেদিনই মিছিলে যেতে হলো। তখন পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধ শুরু হয়েছে। আমরা মিছিল করলাম 'ক্রাশ ইন্ডিয়া' স্লোগান দিয়ে। একাত্তরে মেডিকেল কলেজ থেকে বেরোলাম 'ক্রাশ পাকিস্তান' বলে।

মেডিকেল কলেজের পাঁচটি বছর ছিল নানা দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য। ওই সময়ের রাজনীতির সঙ্গেও খানিকটা জড়িয়ে পড়ি। লেখাপড়া আর রাজনীতির মধ্যে চলেছি তাল মিলিয়ে। রাজনীতির ঘটনাপ্রবাহ থেকে দূরে থাকতে পারিনি।

– পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে কখন যোগাযোগ হলো?

মেডিকেল কলেজে বামপন্থীদের সংগঠন ছিল 'অগ্রগামী'। আমাদের নেতা ছিলেন মওলানা ভাসানী। ১৯৬৮-৬৯ সালে সিরাজগঞ্জের শাহপুরে কৃষকদের যে মিটিং হলো, ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে আমরাও সেখানে গেছি, ছাত্র ইউনিয়ন থেকে। সেখানে মওলানা ভাসানী, মোহাম্মদ তোয়াহা, আবদুল হক, আলাউদ্দিন আহমদ, টিপু বিশ্বাস ছিলেন।

এর আগের কথাও বলতে পারি। জাফরুল্লাহ চৌধুরী তখন ডাক্তারি পাস করে ইন-সার্ভিস ট্রেনিং করছেন। তাঁর ছোট ভাই নাজিমুল্লাহ চৌধুরী নটরডেম কলেজে আমার সঙ্গে পড়ত। সে আমাকে বলল, 'তোরা ঢাকা মেডিকেলে যখন ভর্তি হচ্ছিস, উনার সঙ্গে দেখা করিস, পরিচিত হবি। তিনি তো ওখানে লিডার।' উনি এর আগের টার্মে ছাত্রসংসদের জেনারেল সেক্রেটারি ছিলেন।

তারও আগে উনি ডক্টরস মুভমেন্টে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তো তাঁর সঙ্গে পরিচয় হলো। তিনি আমাদের গাইড করলেন, কোন রাজনীতির সঙ্গে জড়িত হব, কীভাবে।

শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হই আমার স্কুলজীবনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু সামিউল্লাহ আজমীর মাধ্যমে।

– আপনারা কি এক স্কুলে পড়তেন?

না। উনি পড়তেন ডন স্কুলে, পুরানা পল্টনে। আমি পড়তাম গভমেন্ট মুসলিম হাইস্কুলে। একই পাড়ায় থাকি। সে হিসেবে বন্ধুত্ব। আমরা সমসাময়িক। যদিও ও আমার এক ক্লাস নিচে পড়ত। পরে সে ভর্তি হলো কায়েদে আজম কলেজে। ছাত্র ইউনিয়ন করত। রাজনীতি নিয়ে তার সঙ্গে কথাবার্তা হতো। একসময় সে আমাকে বলল, আমরা তো পূর্ব বাংলার স্বাধীনতার কথা চিন্তা করছি। স্বাধীনতা শব্দটি আমাকে উদ্দীপ্ত করল। তখন তো সুভাস বোস, ক্ষুদিরাম, বাঘা যতীন, তিতুমীরের জীবনী পড়ছি। আমি দ্রুত স্বাধীনতার ব্যাপারটিতে আকর্ষিত হলাম।

– সিরাজ সিকদারের সঙ্গে কি যোগাযোগ হয়েছিল?

যোগাযোগ হয়েছে ১৯৬৯ সালের দিকে। তিনি নানাভাবে আমাকে উদ্দীপ্ত করলেন, তুমি ডাক্তারি পড়ো, ঠিক আছে। তবে আমাদের জনগণের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে মুক্ত হওয়া দরকার। এর সাথেও তোমার থাকার প্রয়োজন আছে।

– প্রথম আলাপ হয়েছিল কোথায়?

যদ্দুর মনে পড়ে, শ্রমিক আন্দোলনের একটা মিটিংয়ে, মগবাজারের দিকে। মজিদ ভাই এবং কাদের ভাই নামে দুজন ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। খুব বিশ্বস্ত ছিলেন। ওনাদের বাড়িতে কয়েকবার মিটিংয়ে গেছি। সেই মিটিংয়ে অনেকেই আসতেন। একজন ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন, বুয়েটের। তিনিও আসতেন। আমানুল্লাহ নাম। আমরা ডাকতাম মাসুদ ভাই। পুরানা পল্টনে থাকতেন। উনার বাসায়ও মিটিং হতো। সেখানেও গেছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এসএম হলে আমার কিছু বন্ধু ছিল। তারাও আমাদের এই রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিল। এদের একজন রোকনউদ্দিন আহমেদ। পরে প্রফেসর হয়েছিল। আমার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু। রাজনীতি করতে গিয়েই বন্ধুত্ব। শামসুল হুদা, পরে বাংলাদেশ ব্যাংকের জেনারেল ম্যানেজার হয়েছিল।

রোকনউদ্দিন পড়ত ফিলোসফিতে, শামসুল হুদা পড়ত বায়োকেমিস্ট্রি। তারা আমার এক বা দুবছরের জুনিয়র হবে। তাদের রুমে যেতাম প্রায়ই। শামসুল হুদার রুমমেট ছিল সম্ভবত আনোয়ার হোসেন। তবে তার সঙ্গে আমার সরাসরি কোনো কথা হয়নি।

জগন্নাথ হলের মাঠে প্রায়ই আমাদের মিটিং হতো। জগন্নাথ হলেরও কিছু ছেলে আমাদের সঙ্গে ছিল—সহস্রাংশু গুপ্ত, গৌতম নামে পরিচিত। তারপর সজল-কাজল দুই ভাই। আরও কিছু সিমপ্যাথাইজার ছিল।

ঢাকা মেডিকেলে আমরা যারা ছাত্র ইউনিয়ন করতাম, আমাদের মধ্যে একটা ছোট গ্রুপ ছিল, যারা স্বাধীনতার কথা চিন্তা করতাম। পাকিস্তানের সঙ্গে পূর্ব বাংলার দ্বন্দ্বই মুখ্য বলে মনে করতাম। যখন ফিফথ ইয়ারে পড়ি, তখন আমি মেডিকেল কলেজ শাখা ছাত্র ইউনিয়নের ভাইস প্রেসিডেন্ট হই।

– আপনাদের ইউনিটের প্রেসিডেন্ট কে ছিলেন?

হুমায়ুন কবির। আমরা একই ব্যাচের। এটা ১৯৭০ সালের কথা। আমিনুল হাসান ছিল জেনারেল সেক্রেটারি।

– ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কবি হুমায়ুন কবির কি আপনার সমসাময়িক?

তিনি আমার এক বছর সিনিয়র। একাত্তরের ২৪ মার্চ বাংলা একাডেমিতে একটা মিটিংয়ে শেষ দেখা হয়েছিল। উনার সঙ্গে আমার দেখা হতো ঢাকা স্টেডিয়ামে। স্ট্যান্ডার্ড পাবলিশার্স নামে একটা বইয়ের দোকান ছিল, দোতলায়। সেখানে বই কিনতে যেতাম মাঝে মাঝে। সেখানে তাঁর সঙ্গে দেখা হতো। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি তো নিহত হলেন।

– পার্টিতে আপনি কী ধরনের কাজ করতেন?

আমি লিটারেচারের সঙ্গে জড়িত ছিলাম। পার্টির স্লোগানগুলো লিখতাম। ঢাকা ইউনিভার্সিটি, স্টেট ব্যাংক, ইন্দো-সুয়েজ ব্যাংক, মতিঝিলের আমেরিকান এক্সপ্রেস বিল্ডিংয়ে আমরা তখন চিকা মেরেছি। স্বাধীনতার কথা লিখেছি চিকায়—আমাদের মাতৃভূমি পূর্ব বাংলা পরাধীন। ইলেকশন করতে হবে, ভোট দিতে হবে, এসব আমাদের গ্রুপের চিন্তায় ছিল না। ঢাকা ইউনিভার্সিটির ভিসির বাড়ির ওয়ালে, নিউমার্কেটের ওয়ালে রাতের বেলা পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিয়ে এসব লিখতাম। স্লোগান তৈরি করতে হতো। কোনটা লিখলে পাবলিক সহজে বুঝবে আমাদের দাবি—এসব ভাবতাম।

একটা চিকার কথা মনে আছে। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে অভীক

সরকারের একটা বই—আনন্দ পাবলিশার্সের—*বাংলা নামে দেশ*, বের হলো। ওই বইয়ে আমার একটা চিকা বড় করে ছাপিয়ে দিয়েছিল। চিকাটা ছিল মতিঝিলে ইন্দো-সুয়েজ ব্যাংকের ওয়ালে, আমার হাতে লেখা। দোতলায় কার্নিশে উঠে রাত দুইটা-আড়াইটার দিকে লিখেছিলাম। আমরা কয়েকজন লিখতাম আর কয়েকজন পাহারা দিত। যে কথাগুলো লিখেছিলাম, তা হলো—'আমাদের মাতৃভূমি পূর্ব বাংলা পরাধীন। একমাত্র সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমেই স্বাধীনতা অর্জন করা সম্ভব।'

– এটা কোন সময়?

১৯৭০ সালের শুরুর দিকে। তারপর মে মাসে পাকিস্তান কাউন্সিলে বোমা মারা হলো। এগুলো ছিল সিম্বলিক।

– এই বোমা মারার মধ্যে কি আপনি ছিলেন?

আমি ছিলাম।

– আর কে কে ছিল?

যদ্দুর মনে পড়ে, নুরুল হাসান ভাই ছিলেন। উনি একটা গ্রুপের লিডার ছিলেন। উনি একটু দূরে ছিলেন। একটা গ্রুপের দায়িত্বে ছিল ইউসিস। আরেকটা গ্রুপের দায়িত্ব ছিল পাকিস্তান কাউন্সিল। দুই জায়গায় একই সাথে, একই সময়ে বোমা মারা হলো। পাকিস্তান কাউন্সিলে বোমা মারার গ্রুপে রোকনউদ্দিন ছিল লিডার। সেখানে আমি, শামসুল হুদা এবং আরও অনেকে ছিল। খিলগাঁওয়ের বেশ কয়েকজন ছিল, যাদের সঙ্গে আমার সরাসরি পরিচয় নেই। তবে আমি জানতাম যে এরা এগুলো তৈরি করে। আমি তৈরি করতাম না।

– আপনি বোমা নিজের হাতে ধরেছেন?

ধরেছি।

– ছুড়ে মেরেছেন?

মেরেছি, পাকিস্তান কাউন্সিলে, দোতলায় গিয়ে। এর আগে রেকি করা হয়েছে। আমি রেকিতেও গেছি—কীভাবে মারব, কখন লোক কম থাকে, পাঠক কম থাকে, কখন মারলে পাঠকের গায়ে লাগবে না, কিন্তু রেজাল্ট পাওয়া যাবে বেশি। ওটা তো লাইব্রেরি। পাঠকরা তো সেখানে পড়তে যেতেন। আমরা এগুলো স্টাডি করেছি। আমরা তো একটা জানান দিতে চাই। আমাদের সঙ্গে তো লিফলেট থাকবে। পাবলিক জানবে, কেন আমরা

এটা করেছি। মানুষ ভাববে, পাকিস্তান কাউন্সিলে কেন মারল? পাকিস্তানের সঙ্গে যে এক সাথে ঘর করতে পারব না, এটা পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দেওয়া।

– রেকি হলো কবে?

একদিন আগে। সামিউল্লাহ আজমী ছিল এর দায়িত্বে। সামিউল্লাহ আজমী আর নুরুল হাসান। নুরুল হাসানের নাম শুনেছেন?

– শুনেছি, শিল্পী কামরুল হাসানের ছোট ভাই। আমি তো উনাকে খুঁজছি।

আমার কাছে চোখ দেখাতে আসতেন। এখন কনট্যাক্টটা নাই। খুব শান্তশিষ্ট প্রকৃতির মানুষ। পরে তিনি এ রাজনীতির সঙ্গে আর থাকেননি। পরে তিনি ওয়ার্কার্স পার্টির সঙ্গে জড়িত হয়েছিলেন।

ইউসিস লাইব্রেরির অপারেশনটা নুরুল হাসান ভাইয়ের নেতৃত্বে হয়। তবে ওটা বেশি ইফেকটিভ হয়নি। ইফেকটিভ হয়েছিল আমাদেরটা। প্রচণ্ড আওয়াজ হয়েছে, আগুন ধরেছে, ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। কথা ছিল, সেখান থেকে বের হয়ে আমরা যে যেভাবে পারি ডিসপার্স হয়ে যাব। ঘণ্টা দুয়েক পরে বর্তমান সংসদ ভবনের উত্তর দিকের যে সিঁড়ি—তখন আন্ডার কনস্ট্রাকশন—সেখানে এসে আমাদের মিট করার কথা। সেটা হয়েছিল।

– বোমাটা কত বড় ছিল?

একটা জাম্বুরার মতো।

– কীভাবে নিয়ে গেলেন?

চটের ব্যাগে করে।

– বোমাটা আপনাকে দিল কে?

সম্ভবত রোকনউদ্দিনই দিয়েছে। তৈরি করেছে অন্য গ্রুপ। যারা তৈরি করেছে, তারা আবার থিয়োরেটিক্যালি এত আপডেটেড না। তারা সব মিটিংয়ে আসত না। তারা সমর্থক, অ্যাকটিভিস্ট, প্যাট্রিয়ট। হুকুম দিলে তারা যেকোনো কাজই করতে পারে।

– সামিউল্লাহ এবং নুরুল হাসানের সংশ্লিষ্টতা দেখে মনে হয় এটা ছিল একটা কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত।

অবশ্যই।

– দু জায়গায় একই দিনে বোমা মারা হলো?

একই দিন একই সময়। আমরা যখন বেরিয়ে এলাম, প্রচণ্ড আওয়াজ। আমাদের গ্রুপে রাজিউল্লাহ আজমীও ছিল।

– এই অভিযান কত সময় ধরে ছিল?

দশ থেকে পনেরো মিনিট। সেখানে ঢুকেই রোকনউদ্দিন বলল, আমরা পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের পক্ষ থেকে এসেছি। আপনারা যে যেখানে আছেন সরে যান। আমরা এখনই পাকিস্তান কাউন্সিল বোমা দিয়ে উড়িয়ে দেব। তার সাথে সাথে আমরাও ঢুকে গেলাম।

– আপনারা কটা বোমা নিয়ে গিয়েছিলেন?

আমার হাতে একটাই ছিল।

– অন্যদের হাতেও ছিল?

ছিল। রোকনউদ্দিনের হাতেও ছিল।

– কেমন ওজন হবে?

ধরেন হাফ কেজি।

– আওয়াজ হয়েছিল কেমন?

বিকট আওয়াজ।

– বোমায় স্প্লিন্টার ছিল?

ছিল। তারপর ককটেলও ছিল। সালফিউরিক অ্যাসিড দিয়ে ককটেল তৈরি করা হতো। আমি এসব তৈরির সঙ্গে সরাসরি জড়িত ছিলাম না। আমি শুধু বোমা ছুড়েছি।

– বোমার কোনো নাম ছিল?

আমার জানা নেই।

– ওই অপারেশনেই ককটেল ছোড়া হয়েছিল?

হ্যাঁ। বোমা এবং ককটেল দুটোই। আওয়াজের জন্য বোমা, আগুন ধরানোর জন্য ককটেল।

– আগুন লেগেছিল?

পাকিস্তান কাউন্সিলে আগুন লেগেছিল। অনেক কিছু পুড়ে গেছে। লাইব্রেরি অনেকদিন বন্ধ ছিল।

মে দিবস, লেনিনের জন্মদিন উপলক্ষে বিভিন্ন জায়গায় লিফলেটিং করেছি। এসব লেখায় আমি জড়িত ছিলাম। স্লোগানগুলো আমি লিখেছি। লিফলেট ড্রাফটিং মেইনলি হাকিম ভাই করতেন।

– তখন কি সিরাজ সিকদারকে আপনারা হাকিম ভাই বলতেন?

হ্যাঁ। হাকিম ভাইয়ের কাছে সবাই যেতে পারত না। উনি যে মিটিংয়ে

থাকতেন, সেখানে সিলেকটিভ লোক যেতে পারত। আমার সৌভাগ্য যে আমি খুব অল্প সময়েই, এক-দেড় বছরের মধ্যেই তাঁর সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতে পেরেছি। আমি তাঁর সঙ্গে নাগরপুরেও গেছি। শুধু উনি আর আমি।

– টাঙ্গাইলের নাগরপুরে?

হ্যাঁ।

– কেন?

সেখানে একটা প্রেস ছিল। প্রেসের মালিক আমাদের সমর্থক ছিলেন। আমাদের লিফলেট বুকলেট প্রিন্ট করা ছিল খুব ডিফিকাল্ট। যদি কোনো কারণে লিক হয়—কে করেছে, কোথা থেকে করেছে—এটা একটা ভয়ের ব্যাপার। অনেক জায়গায় ছাপা হতো। ঢাকায় করেছি ঋষিকেশ দাস রোডের একটা প্রেসে, নারিন্দায়। সেখানে যেতাম। কাজী জাফর, মেনন ভাই, রনো ভাই, তাঁদের গ্রুপের লিফলেটও সেখানে ছাপা হতে দেখেছি। তাঁদের সঙ্গে তো তখন আমাদের দ্বন্দ্ব। বাইরে যদিও এক পার্টি, ভেতরে ভেতরে তো দ্বন্দ্ব। তাঁদের দেখে ভয় পেতাম—ওই প্রেসে যাব কি যাব না। তখন ঠিক করেছি, ওই লিফলেটগুলো এখানে ছাপানো যাবে না। আহমদ নজীর বলে একজন ছিলেন, পরে বিএনপি করতেন। সাংবাদিক ছিলেন। এমপি ছিলেন। উনি ওই প্রেসের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। মালিকও হতে পারেন। নাম ছিল সম্ভবত জাগৃতি প্রেস।

এটা অ্যাভয়েড করে আমরা টাঙ্গাইলে গেলাম। হাকিম ভাই আর আমি। টাঙ্গাইল থেকে এলাসিন হয়ে নাগরপুর—বাসের মধ্যে দেখা হয়ে গেল নূর মোহাম্মদের সঙ্গে। নূর মোহাম্মদ খান। পরে বিএনপির এমপি হলেন, মন্ত্রী ছিলেন। নূর মোহাম্মদ খান তখন মনে হয় ছাত্র ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট, একসময় কায়েদে আজম কলেজের ভিপি ছিলেন। সামিউল্লাহ আজমীর বন্ধু তিনি। পরে রাজনীতিতে ডিফারেন্স অব অপিনিয়ন হয়ে গেল। তাঁকে দেখে ভয় পেলাম। যেহেতু হাকিম ভাই আন্ডারগ্রাউন্ডে। নূর মোহাম্মদ ভাই তো তাঁকে চেনেন। যদি এটা লিক হয়ে যায়। নূর মোহাম্মদ ভাই অবশ্য এটা লিক করেননি। তাঁরা তো পরস্পরকে চেনেন। সিরাজ সিকদার তো ছাত্র ইউনিয়নের ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন বুয়েট থেকে। ঢাকা মেডিকেল থেকে ফিফথ ইয়ারের ফজলে এলাহি ছিলেন ভাইস প্রেসিডেন্ট। পরে রেডিওথেরাপিস্ট হয়েছেন। আবদুল্লাহ আল নোমানও ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন। পরে বিএনপির মন্ত্রী

হয়েছেন। মেনন ভাই ছিলেন প্রেসিডেন্ট। আবদুল মান্নান ভূঁইয়া ছিলেন অ্যাকটিং সেক্রেটারি।

– নাগরপুরে কেন গেলেন?

মেইনলি প্রিন্টিং করার জন্য। তখন যে আন্দোলন হচ্ছে, ইলেকশন আসছে সামনে, এসব ব্যাপারে আমাদের কী দৃষ্টিভঙ্গি—এসব ছাপা হবে।

– প্রেসের নাম বা মালিকের নাম মনে আছে?

মনে নেই। তবে মালিকের বাড়িতে অতিথি হিসেবে দুদিন ছিলাম। তারপর লিফলেট প্রিন্ট করে কিছু নিয়ে এলাম। পরে তিনি কিছু পাঠালেন। সেখানে বসে প্রুপ-ট্রুফ দেখে ছাপানো হয়েছিল। মনে আছে, সেখানে কাঁঠাল খেয়েছি। আমি কাঁঠাল পছন্দ করি না। খেতে চাইনি। হাকিম ভাই ইনসিস্ট করলেন। বললেন, এটা তো গরিব মানুষের ফল। এটা খাওয়ার অভ্যাস করো।

– এছাড়া আর কোনো কাজ করেছেন?

কৃষকদের মধ্যে স্বাধীনতার বক্তব্য ছড়িয়ে দেওয়ার কাজ করেছি। আমি গাজীপুরের বিভিন্ন গ্রামে গেছি। একদিকে মেডিকেল কলেজের অ্যাটেন্ডেন্স বজায় রাখা। আব্বার ইচ্ছা আমি ডাক্তার হই। এটা অ্যাবানডন করা যাচ্ছে না। এর সঙ্গে তাল মিলিয়ে পার্টির কাজ করা কঠিন ছিল। হয়তো সারা রাত পার্টির কাজ করেছি, সকালে এসে হাজির হয়েছি ক্লাসে। কারণ, সামনেই তো ফাইনাল পরীক্ষা।

– বন্ধুবান্ধবরা টের পায়নি?

সেভাবে টের পায়নি। ওরা বুঝতে পারত। আমি কখনো ওপেনলি তাদের সঙ্গে আলাপ করতাম না। আনিসুল হাসানকে চেনেন? আলবেরুনী হাসপাতালের রেডিওলজিস্ট। স্বাধীনতার পরপর জহির রায়হানকে খুঁজতে গিয়ে মিরপুরে যে শহীদ হলো—লেফটেন্যান্ট সেলিম, সেই সেলিমের ভাই হলো আনিসুল হাসান। আনিস ছিল আমার তিন বছর জুনিয়র। সে আমার সঙ্গে গাজীপুরে অনেক জায়গায় গেছে। সেলিম বুয়েটে পড়ত। একাত্তরে দুজনই মুক্তিযুদ্ধে যায়। দুজনই একাত্তরে কমিশন পায়। যুদ্ধের পর আনিস আর্মি ছেড়ে দিয়ে আবার ডাক্তারি পড়া শুরু করে।

– আপনি কি হোস্টেলে থাকতেন?

পার্টলি থাকতাম। মেইনলি বাড়িতেই থাকতাম, কমলাপুরে।

– সামিউল্লাহ আজমীও তো কমলাপুরে থাকতেন?

হ্যাঁ। সেভাবেই পড়াতুতো পরিচয়। যুদ্ধের সময় ওর বাবা-মা পাকিস্তানে চলে গেল। ওর ছোট ভাই রাজিউল্লাহও চলে যায়।

সামিউল্লাহ থেকে গেল। সে তো কিল্ড হয়ে গেল। ওই গানটা গেয়ে সে আমাকে খুব উদ্বুদ্ধ করত। 'মুক্তির মন্দির সোপানতলে, কত প্রাণ হলো বলিদান, লেখা আছে অশ্রুজলে।' হোস্টেলে এলেই সে এই গানটা গুনগুন করে গাইত। আমি ভাবতাম—অবাঙালি মা-বাবার একটি ছেলে, পূর্ব বাংলার স্বাধীনতার জন্য এভাবে চিন্তা করছে, আমরা কেন বসে থাকব।

– আপনি কখন জানলেন যে উনি কিল্ড হয়েছেন?

যুদ্ধ শেষে দেশে ফেরার পর। এই যে নাসির উদ্দীন ইউসুফ, আমাদের অ্যাকটিভ মেম্বার ছিল কি না জানি না। সিমপ্যাথাইজার ছিল। সে বোধ হয় জগন্নাথ কলেজে পড়ত। আমাদের জুনিয়র। নয়াপল্টনের দিকে বাসা ছিল। ইঞ্জিনিয়ার আমানউল্লাহর বাসায় তাকে দেখেছি। সেখানে আকা আসত। সুলতান নামে একজন আসত। আসল নাম মাহবুব। পার্টির মধ্যে যে মিলিটারি উইং, সে এর প্রথম দিকেই ছিল। আমরা ছিলাম থিয়োরেটিক্যাল সাইডে—লেখাটেখা নিয়ে।

ফিজিকসে পড়ত একজন। খুব ভালো লেখাপড়া। ওর নামও মাহবুব। সে একটা কবিতার বইও বের করেছিল—*ঈশ্বর কেটে কেটে আমি*। এনায়েত ছিল, খুব সিনসিয়ার কর্মী।

– তিনি তো বার্মা মিশনে গিয়েছিলেন?

হ্যাঁ। বাচ্চুও গিয়েছিল, সামিউল্লাহ আজমী। রাজিউল্লাহ গিয়েছিল। তার ডাক নাম ছিল আচ্চু। আরও কয়েকজন ছিল, আকা, আনোয়ার। তাদের ইচ্ছা ছিল ভিয়েতকংদের মতো টানেল ওয়ারফেয়ার করা। জেনারেল গিয়াপের তত্ত্ব। সবকিছু তো নতুন। বাংলাদেশ স্বাধীন করতে হবে। এটাই মেইন উদ্দেশ্য। কীভাবে করা যাবে? প্রয়োজন হলে এরকম গেরিলাযুদ্ধ করতে হবে।

ভারতে তো অন্য ধরনের গভমেন্ট। ১৯৬৭ সালে চারু মজুমদারের নেতৃত্বে কমিউনিস্ট পার্টির একটা অংশ যখন আলাদা হয়ে গেল—অসীম চাটার্জি, কানু সান্যাল, ডা. সত্যপ্রসাদ, সত্যেন্দ্রনাথ সিংহ—এরা সিপিআইএম থেকে আলাদা হয়ে বানালেন সিপিআই-এমএল। তখন

এদের সঙ্গে আমাদের একটা যোগাযোগ হয়। সেই যোগাযোগটা দৃঢ় করার জন্য কাগজপত্র আনতে আমি ইন্ডিয়া গিয়েছিলাম।

– কোন সময়?

১৯৬৯ সালের দিকেই। গণআন্দোলনের পর।

– কোথায় গেলেন?

কলকাতায়।

– একা?

মেডিকেল কলেজে আমার এক বন্ধু ছিল। ওর বাড়ি ওপারে। এ সুযোগটাকে কাজে লাগিয়ে কলকাতায় গেছি। এদের প্রেসে গিয়ে চারু মজুমদারের কিছু বুকলেট নিয়ে এসেছি। ছাত্রসংগঠন, নির্বাচন বিষয়ে তাঁর মতামত ছিল এসব কাগজে। তিনি ছাত্রসংসদ নির্বাচনও অ্যাবানডন করেছেন ওই সময়। তাঁদেরও গোপন রাজনীতি। তাঁদের প্রেস থেকে এসব নিয়ে আসি।

– আপনার তো পাসপোর্ট-ভিসা ছিল না? কোন পথে গেলেন?

চুয়াডাঙ্গা দিয়ে দামুড়হুদা হয়ে, দাড়ু নদী পার হয়ে। ভোরবেলা নদী পার হয়েছি। তখন তো এপারে ইপিআর, ওপারে বিএসএফ। তাদের চোখ এড়িয়ে যেতে হয়েছে।

– কলকাতায় কোথায় উঠলেন?

একটা হোটেলে। মির্জাপুর স্ট্রিটে। শিয়ালদা স্টেশনের উল্টোদিকে। সেখান থেকে প্রেসে গেলাম। ঠিক মনে করতে পারছি না কোন জায়গায় ছিল প্রেসটা। বেলেডাঙ্গায় না বেলগাছিয়ায়। কেউ তো পুরোপুরি ঠিকানা দেয় না। এক জায়গায় গেলে বলে অমুক জায়গায় যান। এভাবে খুঁজে খুঁজে গেছি। দু-তিন জায়গা হয়ে তারপরে ঠিক জায়গায় গেছি।

– আপনার কলেজের বন্ধু সঙ্গে ছিল?

হ্যাঁ। ওর অরিজিনাল বাড়ি ওই পারে, রানাঘাট জেলার চাপরা, সেখানে।

– আপনার বন্ধুর নাম কী?

খোয়াজ খিজির, ডাক্তার। ও ছাত্র ইউনিয়ন করত। কিন্তু এতটা জড়িত ছিল না। যখন জানলাম ও দেশের বাড়িতে যাবে, তখন এটাকে আমি কাজে লাগিয়েছি। ওর গ্রামের নাম মধুপুর। সেই গ্রামে গেছি। সেখানে দুদিন ছিলাম। সেখান থেকে চাপরা হয়ে রানাঘাট গেছি বাসে। রানাঘাট থেকে

ট্রেনে করে কলকাতায় গেছি। সে আমার মিশনে ছিল না। তবে আমার খুব ট্রাস্টেড বন্ধু। জানতাম, যা-ই হোক না কেন, সে কাউকে বলবে না। এর কিছুদিন আগে বাংলাদেশ থেকে একটা ছেলে সেখানে গিয়ে ফেরার পথে লিফলেটসহ ধরা পড়ে তিন বছর জেলে আটক ছিল।

– সিপিআই-এমএলের কোনো নেতার সঙ্গে দেখা হয়েছে?

উঁচু পর্যায়ের কোনো নেতার সঙ্গে দেখা হয়নি।

– কাগজগুলো এনে কাকে দিলেন?

সিরাজ সিকদারের কাছেই পৌঁছিয়ে দিয়েছি। তাঁর পরবর্তী লেখাগুলোতে চারু মজুমদারের লেখার ছাপ আছে। যেমন চারু মজুমদারের লেখা একটা বুকলেট ছিল—শ্রীকাকুলাম কি ভারতের ইয়েনান হতে চলেছে? চিনের বিপ্লবের সময় ইয়েনান একটা মুক্তাঞ্চল ছিল। ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি শ্রীকাকুলামকে এভাবে চিন্তা করেছেন।

– আমি পড়েছি। বরিশালের পেয়ারাবাগানকে পূর্ব বাংলার ইয়েনান বলা হয়েছে।

শ্রীকাকুলামে পঞ্চান্দি কৃষ্ণমূর্তি—আরও কয়েকজন মহিলাও ছিলেন, লিডিংয়ে। তাঁরা তখন সেখানে কৃষক আন্দোলন করছেন, যুদ্ধ করছেন।

উনসত্তর সালে যখন গেলাম—আপনি চিন্তা করতে পারবেন না। সমস্ত শিয়ালদা স্টেশন, কলেজ স্ট্রিট সব জায়গায় চিকা—চিনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান। চেয়ারম্যান মাওয়ের বিরাট বিরাট ছবি আঁকা।

– প্রেসিডেন্সি কলেজ তো তাদের একটা ঘাঁটি ছিল।

প্রেসিডেন্সি কলেজের সামনেই তো কলেজ স্ট্রিট, যেখানে কফি হাউজ। সেখানে গেছি। সব জায়গায় মাও সে তুংয়ের ছবি। প্রেসিডেন্সি কলেজ, ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির সব ইয়াং ছেলেমেয়ে, মেডিকেল কলেজের ছেলেমেয়ে এর সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছিল।

– কলকাতায় কতদিন ছিলেন?

সাত দিনের মতো।

– একই পথে ফিরেছেন?

একই পথে ফিরেছি। কিন্তু ফেরার পথে প্রবলেম হয়েছিল। এটাও পার্ট অব লাইফ। চাপরা বাসস্টেশনে এসে ধরা পড়েছি। আমার ওই বন্ধুর ভুলের জন্য। ভুল মানে কী? তার প্রাইমারি স্কুলের এক সহপাঠীর সঙ্গে বাসে দেখা।

সে তো এপারে চলে এসেছে। বন্ধু তো হিন্দু সম্প্রদায়ের, ওখানেই আছে। এত বছর পর দেখা। সে তো আর বুঝতে পারেনি—আরে, কবে এলি? এই তো কয়েকদিন হলো এসেছি। এ ধরনের কথাবার্তা, দু-একটা শব্দ বলেছে। দ্যাটস অল। যে-ই আমরা চাপরা বাসস্টেশনে নামলাম, সেখানে ছিল হোমগার্ড। আমাদের এখানে যেমন আনসার। ওকে আর আমাকে ধরল। দু-তিন ঘণ্টা থানায় ছিলাম। আমাদের দেশে যা হয়, সেখানেও একই ব্যাপার। ওর আত্মীয়স্বজনরা ছিল। একজন চেয়ারম্যানকে এনে টাকাপয়সা দিয়ে ওখানেই মিটমাট করে ফেলে। তা না হলে আমাকে হয়তো জেলের ভাত খেতে হতো। জীবনে আর ডাক্তার হতে পারতাম না। ওর দোষ নেই। ও তো বুঝতে পারেনি।

– তার মানে, বাসের মধ্যে ইনফর্মার ছিল।

হয়তো। এটা তো বর্ডার এলাকা। আমরা ওদিক দিয়েই বর্ডার পার হয়ে দামুড়হুদা হয়ে আসব। আমি অচেনা লোক। কারও সঙ্গে আমার কথা বলার কিছু নেই। আমি কেয়ারফুল ছিলাম। কিন্তু ওটা তো আমার বন্ধুর জন্মস্থান। তারও দোষ নেই। তাকে জিজ্ঞেস করেছে তার স্কুলের ফ্রেন্ড।

– আপনার কাগজপত্র চেক করেছে?

চেক করেছে। কিছু পেয়েছে। প্রথম প্রথম মিথ্যে বলেছি। জিজ্ঞেস করেছে, কোথা থেকে এসেছ। বলেছি, ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির মুসলিম হোস্টেল থেকে আসছি। কয়েকটা নাম বলেছি। কিন্তু পুলিশের জেরার মুখে কি এসব টেকে? আমার কাছ থেকে একটা ডকুমেন্ট পেল। এটা দেখে তারা বুঝল, আমরা ঢাকার লোক। এই যে গাজী ট্যাংকের গাজী, এখন এমপি, মিনিস্টার। ও কিন্তু আমার ক্লাসফ্রেন্ড। নটরডেম কলেজে একসঙ্গে ভর্তি হয়েছি। ও আর্টসে, আমি সায়েন্সে। ও সিদ্ধেশ্বরী স্কুলের ছাত্র। ওর বড় ভাই গাজী গোলাম রসুল, আমাদের বছর তিনেকের সিনিয়র। উনি প্র্যাকটিস করতেন মালিবাগের দিকে। তাঁর একটা প্রেসক্রিপশন প্যাড ছিল আমার কাছে। উনার ছোট্ট একটা ঠিকানা—অমুক ফার্মেসি, মালিবাগ, ঢাকা। আমার কাগজপত্র থেকে এটা খুঁটে খুঁটে বের করল। মিথ্যা কথা কতক্ষণ আর চালানো যায়? পুলিশের ব্যাপার তো? ওরা সবই বোঝে। টাকাপয়সা লেনদেন করেই আমরা ছাড়া পেলাম। এটাও জীবনের একটা অভিজ্ঞতা।

রানাঘাট থেকে বাসে চাপরা আসার পথেই এটা হলো। তারপর সেখান

থেকে মধুপুরে তাদের বাড়িতে গেলাম। সেখানে ফুলকলমি, এলাঙ্গি এসব গ্রাম হয়ে দাড় নদী পার হয়ে এসেছি। চুয়াডাঙ্গায় তখন এদের আত্মীয়—সেভেন্টিতে আওয়ামী লীগের এমপি হয়েছিলেন—ইউনুস উকিল সাহেব। ভারতে যাওয়ার সময় তাঁর বাড়িতে ছিলাম এক রাত। তারপর পাটবোঝাই ঘোড়ার গাড়িতে করে—দুদিকে পাটবোঝাই, মাঝখানে আমরা বসা। এভাবে ১৮ মাইল পথ পার হয়ে দামুড়হুদায় গেছি। বর্ডার এলাকায় যাচ্ছি। কেউ যেন না দেখে।

দুই পারের লোকেরা খবর রাখত, বিএসএফ-ইপিআর কখন চেঞ্জ হয়, কখন বর্ডার ক্রস করা নিরাপদ। এখন যেমন পদ্ধতি, তখনো এরকমই ছিল। গরু যে ঘাস খায়, মাড় খায়, সেটা নদীতে ভাসিয়ে ভাসিয়ে তার সঙ্গে বর্ডার পার হয়েছি। খুব বড় নদী না। তবু সাঁতরে আসতে হয়েছে। যাওয়া-আসা দুবারই।

– মারাত্মক! কী অ্যাডভেঞ্চার!

ওই সময় নদীতে নেমেছি, যখন গার্ড চেঞ্জ হয়। লোকাল লোকেরাই পার করিয়ে দিয়েছে। এসব জায়গায় ধরা পড়িনি। ধরা পড়লাম চাপরায়।

– যুদ্ধের সময় কী করলেন?

যুদ্ধের সময় পেয়ারাবাগানে যখন সর্বহারা পার্টি গঠন হয়, তখন আমি সেখানে যেতে পারিনি। যোগাযোগ করতে পারিনি। যোগাযোগ করতে পারলে হয়তো যেতাম।

– সবাই যে সেখানে জড়ো হচ্ছে, এটা জানতেন?

ঢাকায় যে বন্ধুরা ছিল, তারা যে চলে যাচ্ছে জানতে পারিনি। সম্পর্ক খুব গভীর না হলে কেউ তো কারও ঠিকানা জানত না। মিটিংয়ে পরিচয় হতো। সম্পর্ক শুধু কাজ নিয়ে। এর বাইরে কোনো কিছু জিজ্ঞেস করার কালচার ছিল না।

ক্র্যাকডাউনের সময় আমি সর্বহারা পার্টির কারও সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারলাম না। আমার এক বন্ধু ছিল এ কে এম শামসুদ্দিন। এখন ইউনিভার্সিটি অব মেরিল্যান্ডে প্যাথলজির প্রফেসর। ওর সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিল। সে আগরতলা চলে গিয়েছিল। সে খবর পাঠাল, 'আমি সোনামুড়া হয়ে বর্ডার ক্রস করেছি। তুই চলে আয়। এখানে এলে ইউ ক্যান কনট্রিবিউট বেটার।' আমি যোগাযোগে থাকলাম।

*বিচিত্রা*র শাহাদত ভাই, ক্র্যাক প্লাটুন। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিল আমাদের আরেক বন্ধু প্রকৌশলী সিকান্দার আলী খান। গত বছর মারা গেছে। শাহাদত ভাই বললেন, এবার নয়, তুমি পরেরবার যাবে।

– আপনি কোন মাসে গেলেন?

আমরা গেলাম আগস্টের শেষে। যাওয়ার পথে নবীনগরের (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) সলিমগঞ্জে একটা বাড়িতে আমরা চারদিন ছিলাম। বৈদ্যেরবাজার থেকে নৌকায় করে গেছি। আমাদের সঙ্গে গেলেন মিনু বিল্লাহ। লিনু বিল্লাহ গান গায়, তার ভাই। নাসির উদ্দীন ইউসুফের ওয়াইফ শিমুল বিল্লাহর বড় বোন। সে ছিল। তার বড় ভাই, মেওয়া ভাই ছিল। তারপর আলম বীর প্রতীক, দিলু রোডে বাসা, এপিপির জাওয়াদুল করিম, পরে বাসসের চিফ হয়েছিলেন, উনার ওয়াইফ, শাহাদত চৌধুরী নিজে, আমি, আমরা কয়েকজন একসঙ্গে গেলাম। সলিমগঞ্জেই প্রথম দেখলাম নৌকায় করে মুক্তিযোদ্ধারা হাতে ইন্ডিয়ান এসএলআর নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আপনি হয়তো আমাদের গ্রুপকে দেখেছেন। আমরা তো দেশে ঢুকেছি এন্ড অব জুলাই। আমরা বারোজন নৌকায় থাকতাম। ওই এলাকাতেই ছিলাম। সেখানে ওই সময় মুক্তিযোদ্ধাদের অন্য কোনো টিম ছিল না.

আমরা সেখানে চারদিন ছিলাম। বর্ডার ক্রস করার জন্য ক্লিয়ারেন্স পাচ্ছিলাম না। নজরুল ইসলাম সাহেব, রউফ সাহেব তাদের বাড়িতে আমাদের রাখলেন। ওঁরা ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের অর্গানাইজার।

তারপর আগরতলা পার হয়ে চলে গেলাম বিশ্রামগঞ্জ। বিশ্রামগঞ্জে সেক্টর টু-র হসপিটালটায় গেলাম। হাবুল বানার্জির বাগানে এটা শুরু হলো। আগে হসপিটাল ছিল আলাদা আলাদা। সোনামুড়ায় একটা অংশ, দারোগাবাড়িতে একটা অংশ। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। বিশ্রামগঞ্জে এগুলো এক করা হলো। বাহাত্তরের জানুয়ারির পর, যারা ছিল তাদের নিয়ে আমি চলে আসি। কয়েকজনকে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে রেখে ঢাকায় চলে আসি।

– আপনি বিশ্রামগঞ্জ হাসপাতালেই ছিলেন?

হ্যাঁ। ওটাই আমার বেইজ। পুরো সময়টা।

– এই হাসপাতালের ফাউন্ডার কে? কেউ বলে খালেদ মোশাররফ, কেউ বলে জাফরুল্লাহ চৌধুরী?

আসলে প্রত্যেকেরই ভূমিকা আছে। কাউকে ফাউন্ডার বললে অন্যদের



ত্রিপুরায় বাংলাদেশ হাসপাতালে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা দিচ্ছেন ফারুক মাহমুদ (চশমা পরিহিত), ১৯৭১

প্রতি অন্যায় করা হবে। মেজর আখতারের কথা বলতে হবে। উনার বিরাট অবদান আছে। জাফর ভাই, মুবিন ভাই, এরা এলেন পরে। হাসপাতাল হওয়ার পর উনারা এসে জয়েন করলেন। কিন্তু অর্গানাইজিংয়ে ছিলেন মেজর আখতার, মেজর খালেদ মোশাররফ। তাঁর সেক্টরে ইনজিউরি বেশি হতো। তিনি ভাবলেন, এখানে একটা হাসপাতাল হওয়া দরকার। ছেলেপেলেরা কোথায় যাবে? গ্রামের ছেলে—এখানে গুলি, ওখানে গুলি। আমরা তো এদেরই চিকিৎসা করেছি।

– আপনারা যাঁরা ওই হাসপাতালে কাজ করেছেন, আপনাদের মধ্যে কেউ এখনো এই প্রফেশনে আছেন?

শাহাদত চৌধুরীর আপন ভাই মোরশেদ চৌধুরী। সে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজে ফোর্থ ইয়ারে পড়ত। ও পরে এসে জয়েন করল। গণস্বাস্থ্যে ছিল অনেকদিন। সারা জীবন গণস্বাস্থ্যেই কাজ করেছে।

ঢাকায় আসার পর এটা প্রথম শুরু হয় ইস্কাটনে একটা ভাড়া বাড়িতে। সেখানে জাস্টিস আবু সাঈদ চৌধুরী, কর্নেল ওসমানী, খালেদ মোশাররফ সবাই এসেছেন, আমাদের সই করা সার্টিফিকেট দিলেন। মুক্তিযুদ্ধের

সার্টিফিকেট। এরপর আমি আর কোনো সার্টিফিকেটের জন্য কোথাও যাই নাই। পাইও নাই। তখন ছিল বাংলাদেশ ফোর্সেস হসপিটাল। তারপর হলো বাংলাদেশ হসপিটাল। সেখান থেকেই জাফর ভাই গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র বানালেন।

জাফর ভাই যখন সাভারে জমি দেখতে যান, আমিও গেছি তাঁর সঙ্গে। সাভারে এখন যেখানে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র, এই জমিটা দিলেন লুতফর রহমান সাহেবের ওয়াইফ। ইস্কাটনে তাঁর বাড়ি। চেস্ট স্পেশালিস্ট ছিলেন। উনার ওয়াইফ, ছেলে ডাক্তার। জাফর ভাইকে চিনতেন। উনারা ফিলানথ্রপিস্ট ছিলেন। উনারা বললেন, উনাদের জমি গিফট করবেন। জাফর ভাই একদিন বললেন—চলো যাই, জমিটা দেখে আসি।

– এটা ডোনেটেড জমি ছিল?

ডোনেটেড, প্রাথমিকভাবে। তারপর তো আরও বিস্তৃত হলো। শুরুর দিকের জমিটা দিয়েছিল ডা. লুতফর রহমানের পরিবার। উনার ছেলে মাহমুদুর রহমান জাফর ভাইয়ের সমসাময়িক। ন্যাশনাল হাসপাতালে মেডিসিনের কনসালট্যান্ট। উনার ওয়াইফ সাবেরা আলীও ডাক্তার, আমার তিন বছরের সিনিয়র, গাইনোকোলজিস্ট। চিনে কমিউনে যেমন গ্রামে গ্রামে গিয়ে চিকিৎসা দেওয়া হতো, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র তৈরির সময় এরকম একটা কনসেপ্ট হয়তো জাফর ভাইয়ের মধ্যে কাজ করেছে।

– ঢাকায় ফিরে এসে আপনি এমবিবিএস ফাইনাল পরীক্ষা দিলেন?

পরীক্ষা দিয়ে পাস করার পর প্রফেশন শুরু হয়েছে ঢাকা মেডিকেল কলেজে। এখানে ইন্টার্নশিপ করার পর পোস্টিং হলো জামালপুরের সরিষাবাড়ি। কিন্তু ওই পোস্টিংয়ে যাইনি। তারপর আমাকে পোস্টিং দিল সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে আই ডিপার্টমেন্টে। আগে এটা ছিল আইয়ুব সেন্ট্রাল হসপিটাল। সেখান থেকে পিজি হাসপাতালে গেলাম ট্রেনিং করতে। অপথালমোলজিতে ট্রেনিং করলাম মতিন সাহেবের আন্ডারে। সেখান থেকে ইরানে চলে যাই। সেখানে চার বছর চাকরি করে ফিরে এসে ভিয়েনায় ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হলাম। সেখানে ডিপ্লোমা করলাম, ফেলোশিপ করলাম। সেখান থেকে এসে তো প্র্যাকটিসের জীবন।

– ফ্রি ল্যান্সিং?

হ্যাঁ। আমার ওয়াইফ ডা. নাহার চাকরি করতেন বারডেমে। উনি ইমিউনোলজিস্ট। উনিও ভিয়েনাতে ডিপ্লোমা করেছেন। এর আগে সরকারি

চাকরি করতেন—পাবলিক হেলথে। সেখানে রিজাইন দিয়ে আমার সঙ্গে ইরানে গিয়েছিলেন।

– আপনারা কি ব্যাচমেট?

হ্যাঁ।

– আগে থেকেই জানাশোনা ছিল?

আপনি যে রকম বলছেন, সে রকম না।

– কোনো পূর্বরাগ ছিল না?

না। পরিচয় ছিল। তিনি আমার চেয়ে অনেক ভালো স্টুডেন্ট। প্যাথলজিতে অনার্স পেয়েছিলেন। আজিমপুর গার্লস স্কুলে পড়তেন। আমার শ্বশুরও ডাক্তার। এই যে এখানে আছি, এ জমিটাও উনার। ডা. এরশাদ আলী। পাবলিক হেলথের সুপারিনটেনডেন্ট ছিলেন।

– তাহলে আপনার ব্যাপারে বলা যায়, অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা!

বলতে পারেন। এটাই তো বাস্তবতা।

– বাহাত্তরে সর্বহারা পার্টির সঙ্গে আর যোগাযোগ হয়নি?

দু-একজনের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। আমি আর অ্যাকটিভ হইনি। ওরাও বলেনি। তারপর তো সেভেনটি ফাইভে সিরাজ সিকদার মারা গেলেন।

– আপনি কি তাঁর স্ত্রী জাহানারা হাকিমকে চিনতেন?

আমি তাঁকে দেখেছি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। উনি অসুস্থ হয়ে ভর্তি হয়েছিলেন। এলাহি ভাই তাঁর দায়িত্বে ছিলেন। আমাকে বলতেন, তুমি দেখাশোনা করবা।

– আপনি জানতেন যে উনি সিকদারের স্ত্রী?

হ্যাঁ।

– এটা কোন সময়?

এটা স্বাধীনতার আগেই।

– যখন শুনলেন সিরাজ সিকদার কিল্ড হয়েছে, তখন আপনার কোনো রি-অ্যাকশন হয়েছিল?

বেদনাহত হয়েছি। দৃষ্টিভঙ্গিজনিত ফারাক থাকলেও উনার যে দেশপ্রেম, উদ্বুদ্ধকরণের যে চেষ্টা—এ ব্যাপারে আমি বলব, উনার গভীর দেশপ্রেম ছিল। এ দেশ স্বাধীন হবে, মানুষ উন্নত হবে, এটা সব সময় তাঁর ধ্যানজ্ঞান ছিল। তিনি আমাদের প্রভাবিত করতে পেরেছিলেন। তখন তো একমাত্র

টার্গেট ছিল—পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা। ওই সময় অনেক তরুণের সঙ্গে দেখা হয়েছে, কথা হয়েছে। কবি হুমায়ুন কবিরের ছোট ভাই, ফিরোজ কবিরের সঙ্গেও দেখা হয়েছে এসএম হলের মাঠে। ওরা কয়েকজন এসেছিল বরিশাল থেকে। তখন কলেজে পড়ে। কী ডেডিকেটেড? তাকে নিয়ে হুমায়ুন কবির কবিতাও লিখেছেন।

– আপনার রেফারেন্স আমি পেয়েছি রাজিউল্লাহ আজমীর একটা লেখা পড়ে। তাঁর ভাই সামিউল্লাহ আজমী আপনাকে এ পার্টিতে নিয়ে এসেছিলেন। আচ্ছা ওই সময় কি আপনাদের দল স্বাধীন পূর্ব বাংলার পতাকা তৈরি করেছিল?

হ্যাঁ, শুনেছি। ভারতে যাওয়ার আগেই এই ফ্ল্যাগটা দেখে গেছি।

– কোথায় দেখলেন?

আমার বন্ধু জগদীশ হালদার ছিল মস্কোপন্থী ছাত্র ইউনিয়নে। পরে স্বাধীনতার প্রশ্নে আমার সহানুভূতিশীল হয়ে গেল। সে আমাকে একদিন জগন্নাথ হল থেকে আর্ট কলেজে নিয়ে এল হাসি চক্রবর্তীর কাছে। পরে সে চিটাগাং (চারুকলা) কলেজের প্রফেসর হয়েছিল। আমাকে সে বলল, দেখ, আমাদের পার্টি থেকে এটা ডিজাইন করেছে। বললাম, ডিজাইনটা কে করল? সে বলল, হাসি চক্রবর্তী করেছে। একটা ম্যাচবক্সের ওপর এঁকে দেখাল। সবুজ রঙের ওপর লাল রং দিয়ে একটা পতাকা। জগদীশ হালদার এটা আমাকে প্রথম দেখিয়েছে ১৯৭০ সালে।

– আমি শুনেছি, এর ডিজাইন করেছে সামিউল্লাহ আজমী আর তাঁর স্ত্রী।

এটা আমি জানি না। সুলতানের ওয়াইফ, আমার কাছে চোখ দেখাতে এসেছে অনেকবার। তার সঙ্গে সামিউল্লাহ আজমীর স্ত্রীর ভালো বন্ধুত্ব ছিল। আমাদের এক সিনিয়র আপা ছিলেন, জহুরা আপা, ডাক্তার। এখন আমেরিকায় আছেন। তাঁর ভাই হলো সুলতান ওরফে মাহবুব। পুরান ঢাকায় বাড়ি।

– জগদীশ হালদার আপনাকে ম্যাচবক্সে আঁকা পতাকা দেখাল?

হ্যাঁ। বলল, এটা হাসি চক্রবর্তীর আঁকা। এরা হয়তো আইডিয়াটা দিয়েছে। আমি দেখেছি জগদীশের কাছে। এখন বাংলাদেশের যে পতাকা, এটাই তখন আমি দেখেছি। এটা তখন আমাদের অনেককে উদ্দীপ্ত করেছে। সবুজ জমিনের ওপর মুক্তির লাল সূর্য উঠছে—এরকম একটা চিন্তা। খুবই উদ্দীপ্ত হয়েছিলাম।

– শেষ কথা বলবেন?

আমি সামিউল্লাহ আজমীর কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। পূর্ব বাংলার স্বাধীনতার জন্য সে আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছে। চরমভাবে উদ্বুদ্ধ করেছে। যৌবনে চিন বিপ্লবের পর কমরেড মাও সে তুংও আমাদের উদ্বুদ্ধ করেছেন। আমরা তাঁকে ফলো করেছি। পূর্ব বাংলায় কীভাবে তাঁর আন্দোলনের অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো যায়, এটা ভেবেছি।

বাজ

আমি বরিশাল জিলা স্কুল থেকে ১৯৬৮ সালে এসএসসি পাস করি। স্কুলে ছাত্ররাজনীতি বা সংগঠন করার সুযোগ ছিল না। তবে রাজনীতি ও আন্দোলন সম্পর্কে সব সময় আগ্রহ ছিল।

১৯৬৮ সালের মাঝামাঝি বিএম কলেজে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হই। যোগ দিই পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন মেনন গ্রুপে। এদের কর্মিসভায় অংশ নিতে থাকি। অক্টোবরের দিকেই এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে সংগঠনে সবাই এক মতের নয়। বিরোধ প্রকাশ পেত কমিটি করা নিয়ে। তবে রাজনৈতিক বা আদর্শগত পার্থক্য তখনো স্পষ্ট হয়নি।

এদিকে রাজনৈতিক পরিস্থিতি উত্তপ্ত হতে থাকে। আমাদের কাজ জোরদার হয়। এক মাসের মাথায় শুরু হয় প্রবল আন্দোলন। এতে আমার সক্রিয় ভূমিকা ছিল।

ছাত্র ইউনিয়নের অন্যতম নেতা ছিলেন মহিউদ্দিন ভাই। মাঝারি গড়নের, চোখে বেশি পাওয়ারের চশমা। সব সময় পাজামা-পাঞ্জাবি পরে থাকেন। আমার দুবছরের সিনিয়র। এসএসসি পাস করে কোনো কলেজে ভর্তি হননি। তিনি আমাদের জানালেন, ছাত্র আন্দোলন বা গণ-আন্দোলন মূল বিষয় নয়। মূল বিষয় হচ্ছে সর্বহারা শ্রেণির পার্টি এবং পার্টির নেতৃত্বে সশস্ত্র বিপ্লব।

১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে মহিউদ্দিন ভাই আমাকে পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের কথা জানালেন। বুঝতে পারলাম, বরিশালে মেনন গ্রুপের বেশির ভাগই পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত এবং ছাত্রসংগঠনে তাদের একচেটিয়া আধিপত্য। মহিউদ্দিন ভাই ছাড়া অন্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা ছিলেন এনায়েত হোসেন মতি, মাহবুবুল আলম, মো. শাজাহান, খসরু, মাহমুদ, আবুল বাসার বাসু, রফিকুল ইসলামসহ প্রায় বিশজন। এরা সবাই

সক্রিয়। এনায়েত, মাহবুবুল এবং শাজাহান ট্রেড ইউনিয়নের কাজে যুক্ত ছিলেন। তাদের কাজ ছিল ঘাটশ্রমিক ও হোটেল রেস্তোরাঁ শ্রমিকদের মধ্যে। ঘাটশ্রমিকদের নেতা ছিলেন আরএসপির সুবীর সেন। তাদের নিয়ন্ত্রণ থেকে বের করে এনে সেখানে আমাদের ইউনিয়ন গঠন করা হয়।

সে সময় বরিশালে ছাত্র ইউনিয়নের মাহবুব উল্লাহ গ্রুপে মাত্র একজন ছিলেন। তার নাম আনোয়ার হোসেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তেন এবং বরিশালে তার পৈতৃক বাড়িতে মাঝে মাঝে আসতেন। জাফর-মেনন গ্রুপের সঙ্গে ছিলেন চারজন। হক-তোয়াহা গ্রুপে কেউ ছিল না। ভাসানী ন্যাপের অ্যাডভোকেট সিদ্দিক হোসেন তোয়াহা সাহেবের প্রতি দুর্বল ছিলেন বলে শোনা যায়। নিজে কোনো কাজ করতেন না। ভাসানী ন্যাপের কাজ করত ছাত্র ইউনিয়নের কর্মীরা।

বরিশাল শহরের বাইরে ঝালকাঠিতে ছাত্রসংগঠন ছিল আমাদের নিয়ন্ত্রণে। ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি মোস্তফা জামাল হায়দার এবং শহীদুল নীরুর কারণে পিরোজপুরে জাফর-মেনন গ্রুপের প্রভাব ছিল।

১৯৬৯ সালের মার্চে পশ্চিম পাকিস্তানের শাহীওয়াল রেলস্টেশনে জামায়াতে ইসলামীর লোকেরা মওলানা ভাসানীর ওপর হামলা করে। পরদিন পূর্ব পাকিস্তানে প্রতিবাদ হয়। প্রতিবাদ হয় বরিশালেও। সেদিন বরিশালে একটা ইসলামি দলের সমাবেশ ও মিছিল ছিল। তাদের সঙ্গে আমাদের সংঘর্ষ হয়। শাজাহান ভাই ভীষণভাবে আহত হন। তাঁর মাথায় ছুরি চালানো হয়েছিল। পরিবারের লোকেরা তাঁকে মুমূর্ষু অবস্থায় ঢাকায় নিয়ে যায়। অপারেশন করে তাঁর প্রাণ বাঁচানো হয়। প্রায় ছয় মাস পর তিনি বরিশালে ফিরে আসেন। তবে এই আঘাতের ধকল তাকে সইতে হয়েছে অনেক দিন।

– পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে আপনি কখন যুক্ত হলেন?

১৯৬৯ সালের মার্চে সামরিক শাসন জারি হলে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি এবং আত্মগোপনে চলে যাই। মাসখানেকের মধ্যেই ফিরে আসি। বুঝতে পারি, এখন থেকে মূল সংগঠন অর্থাৎ পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের কাজ করতে হবে।

প্রথমে একটা গ্রুপে অন্তর্ভুক্ত হই। সেখান থেকে তৈরি হয় একটা সেল। সেখানে আমাকে পূর্ণাঙ্গ সদস্য করা হয়। আমাকে ঘাটশ্রমিকদের মধ্যে কাজ

করতে বলা হয়। ঘাটশ্রমিকদের নিয়ে তৈরি হওয়া দুটি পাঠচক্রের দায়িত্ব পাই আমি।

এ সময় বরিশালে পার্টির দায়িত্ব নিয়ে আসেন নুরুল হাসান। তাঁর তাত্ত্বিক জ্ঞানের গভীরতা ছিল। তিনি সবাইকে তাত্ত্বিক দিক থেকে সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করতেন।

এ সময় এনায়েত হোসেন মতি ও মাহবুবুল আলমের সঙ্গে মহিউদ্দিন ও মাহমুদের দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। এনায়েত-মাহবুবরা গণসংগঠন হিসেবে ট্রেড ইউনিয়নের কাজকে প্রাধান্য দিতে চাইতেন। মহিউদ্দিন-মাহমুদরা পার্টির কাজকেই মুখ্য বিবেচনা করতেন। নুরুল হাসান এই বিরোধের মীমাংসা করতে পারলেন না।

ঠিক এ সময় কিছুদিনের জন্য বরিশালে এলেন কবি হুমায়ুন কবির। তাঁর ছোট ভাই ফিরোজ কবির তখন পার্টিতে বেশ সক্রিয়। আমি জানতাম, হুমায়ুন কবির পার্টির লোক। কিন্তু নুরুল হাসান বললেন, হুমায়ুন কবির জীবনানন্দ দাশকে নিয়ে একটি গবেষণার কাজ করছেন। পার্টির অনুমতি নিয়েই তিনি পার্টির শৃঙ্খলার বাইরে আছেন। তবে ব্যক্তিগত আলোচনায় তিনি সব জায়গায় পার্টির বক্তব্য তুলে ধরেন।

– রাশেদ খান মেননের সঙ্গে আপনার দেখা বা কথা হয়নি?

জুলাই বা আগস্টে রাশেদ খান মেনন বরিশালে আসেন। তাঁর আসার খবর আগে জানানো হয়নি। তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল না। তিনি বরিশালে যে বাড়িতে উঠেছেন, সেখানে জিজ্ঞেস করে জানতে চান এ পাড়ায় ছাত্র ইউনিয়নের কেউ আছে কি না। তারা আমার নাম বলায় তিনি আমাকে ডেকে পাঠান। আমাকে জিজ্ঞেস করেন, আর কে কে আছে। আমি নুরুল হাসান বাদে সবার নাম বললাম। তিনি জানতে চাইলেন, সবাইকে একসঙ্গে কোথায় পাওয়া যাবে। বললাম, সকাল দশটার পর একটা ঠিকানায় সবাইকে পাওয়া যাবে। ঠিকানাটা হলো বরিশাল সদর রোডে শাজাহান ভাইদের একটা পারিবারিক বাসা। টিনের ঘর। কয়েকজন মেস বানিয়ে থাকত। বাসাটি পরে আমাদের দখলে চলে আসে। আমরা ওই বাসার নাম দিয়েছিলাম লালঘর। বরিশাল শহরে মল্লিক রোডে ছাত্র ইউনিয়নের অফিস থাকলেও আমরা লালঘরই ব্যবহার করতাম।

রাশেদ খান মেননকে নিয়ে লালঘরে এলাম। নুরুল হাসান এখানেই

থাকতেন। তিনি তখন সেখানেই ছিলেন। আরও অনেকেই ছিল। সাংগঠনিক বিষয়ে আলোচনার একপর্যায়ে শুরু হয় তাত্ত্বিক কথাবার্তা। আমাদের পার্টি পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তানের উপনিবেশ হিসাবে চিহ্নিত করেছে। আমরা মনে করতাম, উপনিবেশবাদ হলো প্রধান দ্বন্দ্ব। জাফর-মেননরা জাতিগত নিপীড়নের কথা বললেও উপনিবেশ বলত না।

মার্কস, লেনিনকে উদ্বৃত করে বিরাজমান পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে নুরুল হাসান পূর্ব বাংলাকে উপনিবেশ হিসেবে প্রমাণের চেষ্টা করেন। তাঁর গভীর তাত্ত্বিক জ্ঞানের বিপরীতে মেনন সুবিধা করতে পারছিলেন না। তর্কবিতর্ক যখন চলছে, তখন হুমায়ুন কবির এসে হাজির হন। তিনি তার পাঞ্জাবির পকেট থেকে একটা ছুরি বের করে মেননকে শাসান এবং ষড়যন্ত্রকারীদের নির্মূল করা হবে বলে চিৎকার করে ওঠেন। ঘটনার আকস্মিকতায় সবাই হতবাক। কয়েকজন মিলে হুমায়ুন কবিরকে ঠান্ডা করে এবং তাঁকে বাইরে নিয়ে যায়। পরে মেননও চলে যান।

– শ্রমিক আন্দোলনের প্রধান নেতা তো সিরাজ সিকদার। তাঁর সঙ্গে প্রথম দেখা হলো কখন? তিনি কি তখন বরিশালে আসতেন?

ছাত্র ইউনিয়নের মধ্যে গণসংগঠন এবং মূল পার্টি সংগঠন ইস্যুতে দ্বন্দ্ব বাড়তে থাকে। একটা বোঝাপড়ার জন্য ১৯৬৯ সালের আগস্টে সিরাজ সিকদার বরিশালে আসেন। পার্টিতে তিনি হাকিম ভাই নামে পরিচিত। রাতে আমরা ব্রাউন কম্পাউন্ডে বাবুলের বাসায় বৈঠকে বসি। সভায় মাসুম ভাই ছিলেন। তিনি এতদিন ছিলেন অন্য জায়গায়। তার ছোট ভাই মাহবুব তো আমাদের সঙ্গেই। সারা রাত আলোচনা হয়। অনেক তর্কবিতর্ক হয়। সিদ্ধান্ত নিতে নিতে ভোর হয়ে যায়। আগের কমিটি ভেঙে দিয়ে আবদুস সালাম মাসুমের নেতৃত্বে তৈরি হয় নতুন কমিটি।

বাবুলের বাসাটি ছিল কাঠের তৈরি একটা দোতলা বাড়ি। মিটিং শেষ করে আমরা দোতলায় গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। সকালে উঠে দেখি হাকিম ভাই নেই। তিনি কখন গেলেন, কোথায় গেলেন, এ নিয়ে কেউ প্রশ্ন করল না। সবার চোখের চাহনি কেমন যেন রহস্যময়।

– বরিশালে আপনার কাজ করার অভিজ্ঞতা কেমন?

আমরা মূল পার্টি আরও শক্তিশালী করার কাজে লেগে যাই। এ কাজের নেতৃত্বে ছিলেন সেলিম শাহনেওয়াজ। ঝালকাঠিতে সংগঠনের কাজ জোরদার

করা হয়। নতুন কয়েকজনকে রিক্রুট করা হয়। তারা নিজ নিজ এলাকায় দুর্ধর্ষ ডাকাত হিসেবে পরিচিত।

আমরা বরিশাল শহরের আশপাশের গ্রামে যাই, মিটিং করি। মনে সব সময় একটা খটকা। গ্রামের মানুষের সঙ্গে যে আমাদের একটা দূরত্ব আছে এটা বুঝতে পারি। আমরা যত সহজ করে কথা বলার চেষ্টা করি না কেন, তারা আমাদের ভাষা বোঝে না। আমরা প্রখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা আবদুস শহীদের সঙ্গেও যোগাযোগ করেছি। ঢামুরার হেডমাস্টারের ছেলে গোলাম কবীর বাচ্চু পড়তেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে। খুব ভালো ছাত্র ছিলেন। পরে একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হয়েছিলেন। ছাত্রজীবনে তিনি আমাদের পার্টির কাঠামোর মধ্যে না থাকলেও সমর্থক ছিলেন। আবদুস শহীদের সঙ্গে আমাদের আলোচনা হয়েছিল তাঁর গ্রামে। আবদুস শহীদ ভারতে কমিউনিস্ট পার্টির আমল থেকে প্রায় একাকী কাজ করে আসছেন। তিনি আমাদের প্রায় সব বক্তব্যের সঙ্গে একমত হলেও সাংগঠনিকভাবে যুক্ত হতে রাজি হলেন না। এভাবেই শেষ হলো ১৯৬৯ সাল।

– কাজ উপলক্ষে ঢাকায় আপনার আসা-যাওয়া ছিল?

১৯৭০ সালের গোড়ার দিকে আমাকে ঢাকায় পাঠানো হলো। যোগাযোগ করলাম রানা ভাইয়ের সঙ্গে। বরিশালে নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি আমাকে অনেকগুলো ডকুমেন্ট এবং একটা সাইক্লোস্টাইল মেশিন দিলেন। মেশিনটি আমি লঞ্চের ডেকে এক কোনায় রেখেছিলাম। বরিশালের ঘাটে লঞ্চ ভিড়ল সকালে। সবাই নেমে যাওয়ার পর মনে হলো আর কোনো বিপদ নেই। তখন মেশিনটা তুললাম। মেশিনের ভাড়া বাবদ লঞ্চের লোকেরা টাকা চাইল। মেশিনটা কী, জানতে চায়নি। আমার কাছে তো টাকা নেই। বললাম, এটা এনায়েত হোসেন মতির মেশিন। তখন তারা ঘাটের একজন শ্রমিককে ডাকল। ওই শ্রমিক এসে আমাকে চিনতে পারল। সে মেশিনটা মাথায় তুলে লঞ্চ থেকে নেমে একটা রিকশায় তুলে দিল। মেশিনটা আমি নিয়ে এলাম লালঘরে।

আমাদের ছাত্র ইউনিয়নের অফিস ছিল মল্লিকবাড়ি রোডে। আমরা সেখানে মাঝে মাঝে মিলিত হতাম। তবে আমাদের দৈনন্দিন মিলনকেন্দ্র ছিল বিবিরপুকুরের পশ্চিম পারে লালঘরে। কমরেড নুরুল হাসান দলের সমন্বয়ের কাজ করে যাচ্ছিলেন।

১৯৭০ সালের জানুয়ারি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটেনি। সে সময় আমরা বরিশাল শহরের সর্বত্র চিকা মেরেছি। পূর্ব বাংলা যে পাকিস্তানের উপনিবেশ, এই বক্তব্য সব জায়গায় প্রচার করতাম। অন্যদিকে স্বায়ত্তশাসনের দাবি যে পাকিস্তানের সংহতি টিকিয়ে রাখার একটা চেষ্টা, এটা ব্যাখ্যা করতাম। আমরা নকশালবাড়ি আন্দোলন সমর্থন করতাম। কিন্তু 'তোমার বাড়ি আমার বাড়ি নকশালবাড়ি' বলে স্লোগান দিতাম না। 'মাও সে তুং চিন্তাধারা বিশ্বকে দিচ্ছে নাড়া' স্লোগান দিলেও 'চিনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান'—এ স্লোগান দিইনি।

পার্টিতে সবার আলাদা আলাদা নাম ছিল। নুরুল হাসান ভাইয়ের নাম ছিল জসিম। আমরা কিন্তু তাকে হাসান ভাই বলেই ডাকতাম। এ সময় প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বার দুয়েক রানা ভাই এসেছিলেন।

এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে নুরুল হাসান ভাই আমাদের জানালেন যে কয়েকদিনের মধ্যে আমাকে ঢাকা যেতে হবে একটি গোপন কাজের জন্য। কাজটি সম্ভবত একটি 'অপারেশন'। আমাকে বলা হলো, এটা যেন কাউকে না বলি। ঢাকা যাওয়ার পথে পরিচিত কারও সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে যেন বলি, একটা ব্যক্তিগত কাজে যাচ্ছি।

১৯৭০ সালের পয়লা মে আমি ঢাকা যাই। সদরঘাট থেকে সরাসরি বুয়েটের লিয়াকত হলে গিয়ে রানা ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করি। দুপুরের দিকে আরেকজন কমরেড আসেন। তিনি আমাকে অপারেশনের বিষয়টি জানান, ৫ মে কার্ল মার্কসের জন্মদিন উপলক্ষে পার্টি প্রথমবারের মতো সশস্ত্র অভিযানে যাচ্ছে। আমি ঢাকায় যে কদিন ছিলাম, অপারেশন প্রসঙ্গে এই কমরেডই আমার সঙ্গে কথা বলেছেন। আমি রানা ভাইয়ের রুমে ছিলাম। তিনি নিজে এ বিষয়ে কিছু বলেননি। এমনকি তিনি বিষয়টি জানেন কি না, সে সম্পর্কেও কোনো আভাস দেননি।

কমরেড বলেছিলেন, তার নাম সুলতান। তিনি দফায় দফায় আমাকে বিভিন্ন তথ্য দিলেন। তথ্যগুলো হচ্ছে :

১. ৫ মে তোপখানা রোডে পাকিস্তান কাউন্সিলে হামলা চালানো হবে।
২. হামলা পরিচালনায় বোমা ব্যবহার করা হবে। বিকট শব্দ হবে, ধোঁয়া হবে, আগুন ছড়াতে পারে, কিন্তু বোমায় প্রাণঘাতী স্প্লিন্টার থাকবে না।

৩. ইউসিস (ইউনাইটেড স্টেটস ইনফরমেশন সার্ভিস) লাইব্রেরির কোন স্থানে দাঁড়িয়ে কোথায় বোমা ছুড়তে হবে, তা সরেজমিনে দেখিয়ে দেওয়া হবে।

৪. হামলা শেষে সেখান থেকে বেরিয়ে নিউমার্কেটে মোনিকো রেস্তোরাঁয় যেতে হবে। সেখানে পরবর্তী নির্দেশ দেওয়া হবে।

৪ মে ছিল সোমবার। কমরেড সুলতান আমাকে নিয়ে রেকি করতে ইউসিস লাইব্রেরিতে গেলেন। ঠিক হলো প্রথমে আমি ঢুকব। পরে কমরেড সুলতান ঢুকবেন। ভেতরে ঢোকার দরজা থেকেই বোমা ছুড়তে হবে। সুলতান যে স্থানে গিয়ে দাঁড়াবেন, বোমাটি সেই স্থানে ছুড়তে হবে।

কথামতো আমি ঢুকলাম, কিছুক্ষণ পর ঢুকলেন সুলতান। তিনি এমন এক জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালেন যেখানে লাইব্রেরি ব্যবহারকারী কেউ নেই এবং সেখানে কারও যাওয়ারও সম্ভাবনা নেই। ব্যস, রেকি শেষ।

কমরেড সুলতান আমাকে আভাস দিলেন, এই অপারেশনে অন্য কমরেডরাও থাকবেন। তাদের সঙ্গে আমাদের কোনো যোগাযোগ হবে কি না, এই প্রশ্ন করায় তিনি বললেন এর দরকার হবে না।

পরদিন বেলা আড়াইটায় কমরেড সুলতান এলেন। তাঁর সঙ্গে খদ্দরের একটা ঝোলা ব্যাগ। বললেন, ব্যাগের মধ্যে 'বেল' আছে। বেল মানে বোমা। তিনি রিকশায় করে আমাকে প্রেসক্লাবে পৌঁছে দিলেন। আমাকে একটা ঘড়ি দিয়েছিলেন। বললেন, ঠিক পৌনে চারটায় বোমা ছুড়তে হবে।

আমি উত্তেজিত। আবার ভয়ও হচ্ছে। আগের দিনের রিহার্সাল অনুযায়ী রাস্তা থেকে ইউসিস লাইব্রেরির গেট পর্যন্ত যেতে কত সময় লাগতে পারে, তা হিসাব করে নিয়েছিলাম। ঠিক সময়মতো গেটে চলে গেলাম। গেটে একজন দারোয়ান। সে কিছু বুঝে ওঠার আগেই ব্যাগ থেকে বেল বের করে নির্দেশিত জায়গায় ছুড়ে মারলাম। ওই জায়গায় কোনো লোক ছিল না। বিকট শব্দে চারদিক কেঁপে উঠল। আমি সরে পড়লাম। রাস্তায় জটলা তৈরি হচ্ছে। আমি সুপ্রিম কোর্টের সামনে দিয়ে কাকরাইলের দিকে হাঁটা ধরলাম। রমনা পার্কের মোড়ে এসে একটা রিকশা নিলাম। তারপর নিউমার্কেটে গিয়ে মোনিকো রেস্তোরাঁয় ঢুকে এক কাপ চায়ের অর্ডার দিলাম। এমন সময় এক তরুণ আমার কাছে এসে নিচু স্বরে বলল, সাবাশ কমরেড। আপনি রানা ভাইয়ের কাছে চলে যেতে পারেন। আগামীকাল আপনি বরিশাল রওনা হয়ে

যাবেন। আমি তাকে চিনতে পারলাম। আগের দিন পাকিস্তান কাউন্সিলে কমরেড সুলতানকে তার সঙ্গে কথা বলতে দেখেছি।

বুয়েটের লিয়াকত হলে ফিরে এসে জানলাম, ওই দিন একই সঙ্গে পাকিস্তান কাউন্সিল ও ইউসিস লাইব্রেরিতে বোমা হামলা হয়েছে। অনেকেই বলল, টেস্টটিউব গ্রুপ এটা করেছে। শুনেছি, পাকিস্তান কাউন্সিলে বোমা ফাটার বিকট শব্দ শুনে সেখানে একজন লোকের মুখ হাঁ হয়ে গিয়েছিল। মুখ আর বন্ধ হয় না। তাকে ছয় মাস চিকিৎসা নিতে হয়েছিল। ঘটনাচক্রে সে আমার এক বন্ধুর ভাই।

– এটা তো ওই সময়ের একটা বড় ঘটনা। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এটা একটা প্রতীকী যুদ্ধের সূচনা বলা যেতে পারে। ধরা পড়ার আশঙ্কাও তো ছিল।

বরিশালে ফিরে আসার পর হাসান ভাইয়ের কাছে শুনেছিলাম, ওই হামলার সময় একটা কনটিনজেন্সি প্ল্যানও ছিল। বোমা ছোড়ার ফলে কেউ যদি আহত হয় কিংবা বোমা যদি না ফাটে, তাহলে আহত কমরেডদের ইভাকুয়েট করার জন্য বাইরে আরও কয়েকটি গ্রুপ মোতায়েন ছিল।

যা হোক, এই ঘটনা সারা দেশে হইচই ফেলে দিয়েছিল। পত্রিকায় লেখালেখিও হয়েছিল। *ইত্তেফাক* তো ছিল খুব ক্রিটিক্যাল। ঢাকা শহরের সব জায়গায় কয়েকদিনের মধ্যে পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের নামে অনেক চিকা মারা হয়েছিল। ওই সময় পাকিস্তানের কবল থেকে পূর্ব বাংলাকে স্বাধীন করার জন্য জনযুদ্ধ করার আহ্বান জানানো হয়। আমাদের বিরুদ্ধে খুব সরব ছিল *ইত্তেফাক*। হিংসাত্মক কাজের মাধ্যমে পাকিস্তানের সংহতিকে বিপন্ন করার একটি প্রচেষ্টা হিসেবে উল্লেখ করে তা দমন ও আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য দাবি জানিয়ে তারা প্রতিবেদন ছাপে। প্রথম পাতায় ছাপা হওয়া খবরে চিকার ছবিসহ ইউসিস ও পাকিস্তান কাউন্সিলে হামলার খবর ছাপা হয়।

এ সময় সরকারের আইনশৃঙ্খলা বাহিনীও তৎপর হয়ে ওঠে। 'হিংসাত্মক উপায়ে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য' সিরাজ সিকদারসহ কয়েকজনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হয়। মামলাগুলো হয় সামরিক আইনের আওতায়।

সত্তরের মে মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের ওপর শুরু হয় পুলিশের সাঁড়াশি অভিযান। দেশের নানা জায়গায় ছাত্র ইউনিয়নের

মধ্যে যারা পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের সমর্থক হিসেবে পরিচিত, তাদের খুঁজে খুঁজে গ্রেপ্তার করা শুরু হয়। পরিস্থিতি এমন হয় যে প্রকাশ্যে কাজ করার আর উপায় থাকে না।

বরিশালে প্রথম দিকেই কয়েকজন গ্রেপ্তার হন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন মহিউদ্দিন, এনায়েত হোসেন, মাহবুবুল আলম, ফিরোজ কবিরসহ আরও কয়েকজন। প্রায় বিশজনের মতো নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার হয়েছিল। মূল সংগঠনের সঙ্গে সম্পর্ক না থাকা সত্ত্বেও ছাত্র ইউনিয়ন ও ভাসানী ন্যাপের কয়েকজন গ্রেপ্তার হয়েছিল।

এ সময় কমরেড তাহের বরিশালের সমন্বয়কারীর দায়িত্ব নিয়ে আসেন। তাঁর আসল নাম সামিউল্লাহ আজমী। তিনি অবাঙালি। দুসপ্তাহ পর আসেন তার স্ত্রী। কমরেড তাহেরের স্ত্রী মাত্র কয়েক মাস আগে ভারত থেকে এসেছেন। স্বামী-স্ত্রী দুজনই ভালো রবীন্দ্রসংগীত গাইতে পারতেন। তাঁদের নিয়ে শুরুর দিকে বেশ অসুবিধায় পড়তে হয়। দুদিন এই জায়গায় থাকেন তো পরের দুদিন আরেক জায়গায়। বরিশাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ব্যাচেলার্স টিচার্স কোয়ার্টারে তাঁরা কয়েকদিন ছিলেন। এছাড়া শহরে কয়েকটা বাসা ভাড়া নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু নানা সমস্যার কারণে দুসপ্তাহের বেশি থাকা সম্ভব হয়নি। আমাদের সবার নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ছিল বলে আমরা কেউ নিজেদের বাসা অথবা পরিচিত কারও বাড়িতে থাকতে পারতাম না।

আমাদের থাকার জন্য ঢাকা-বরিশাল হাইওয়ের গড়িয়ারপার নামক জায়গায় একটা বাসা ভাড়া নেওয়া হয়েছিল। সেখানে মাটির ফ্লোরে হোগলার পাটি ও চাদর বিছিয়ে ঘুমাতাম। কমরেড তাহের থাকতেন শহরেরই একটা ভাড়া বাসায়। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করার সময় অনেক সতর্ক থাকতে হতো।

আমাদের মধ্যে তখন দারুণ অর্থসংকট। পাশেই ঝালকাঠিতে দলের কাজ তখন স্বচ্ছন্দে এগিয়ে চলেছে। এর কৃতিত্ব ছিল সেলিম শাহনেওয়াজের। তিনি ঝালকাঠি শহরের পাশে একটা গ্রামের একদল দুর্ধর্ষ ডাকাতকে দলে ভিড়িয়েছিলেন।

কেন্দ্র থেকে বলা হলো, আর্থিক সংকট স্থানীয়ভাবে সমাধান করতে হবে। চাঁদা তোলা সম্ভব ছিল না। আমরা ডাকাতি করার সিদ্ধান্ত নিই। এ কাজে একজন দক্ষ ডাকাত কমরেডসহ বরিশালে আসেন সেলিম শাহনেওয়াজ।

১৯৭০ সালের জুন মাসের শেষ সপ্তাহে আমরা প্রথম ডাকাতি অপারেশন চালাই। এ জন্য আমরা বিএম স্কুলের সামনে একটা বাসা বেছে নিই। সেই বাড়িতে এক ঠিকাদার থাকেন তাঁর ভাগনেসহ। তার নাম ওবায়দুল। তার পরিবার থাকে ভোলায়। ঠিকাদারের চারিত্রিক দুর্বলতার কিছু তথ্য আমরা সংগ্রহ করি।

অপারেশনের জন্য ছয়জনের একটা টিম তৈরি করা হয়। ঠিকাদার থাকেন দোতলা বাড়ির ওপরতলায়। সেলিম শাহনেওয়াজ, কমরেড ডাকাত, আমি এবং আরেকজন দোতলায় উঠি। দুজন বাইরে অপেক্ষায়, বিপদ হলেই বাঁশি বাজাবে। আমরা দরজায় নক করি। ভাগনে দরজা খুলে দেয়। আমরা বলি, ওবায়দুল সাহেবের সঙ্গে কিছু কথা আছে। কথা বলতে বলতে আমরা ভেতরে ঢুকি। ওবায়দুল সাহেব লুঙ্গি-গেঞ্জি পরে খাটের ওপর বসে আছেন। আমাদের দেখে অপ্রস্তুত হন। তবু হাসিমুখে জিজ্ঞেস করেন, আপনাদের পরিচয়?

সেলিম শাহনেওয়াজ বেশ চটপটে। আত্মবিশ্বাসের সঙ্গেই বলল, চিনতে পারেননি? আমি জাগৃতি সংসদের সমাজসেবা সম্পাদক। একটা নামও বললেন। তারপর হেসে বললেন, স্থানীয় লোকজন এবং আমাদের কয়েকজন প্রতিবেশী আপনার বিরুদ্ধে অসামাজিক ও অনৈতিক কাজের নালিশ করেছে। এটি নিয়ে আলোচনার জন্য এসেছি।

এটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে ওবায়দুল সাহেব নড়েচড়ে বসলেন। হাসতে হাসতে বললেন ঠিকাদারি করি, মিথ্যা নালিশ জানানোর লোকের অভাব নাই। ঠিক আছে, সব অভিযোগ শুনব। আগে চা খান। তিনি ভাগনেকে বললেন, কেটলিতে দোকান থেকে চা আর বিস্কুট নিয়ে আসতে। সেলিম শাহনেওয়াজ বললেন, যখন খাওয়াবেনই, তখন ঘরবরণ থেকে মিষ্টি এনে খাওয়ান। ওবায়দুল সাহেব ভাগনেকে সেই রকম নির্দেশ দিয়ে মানিব্যাগ থেকে টাকা বের করে দিলেন। এখান থেকে ঘরবরণ যেতে-আসতে এক ঘণ্টা লাগবে।

ভাগনে বেরিয়ে যাওয়ার পাঁচ মিনিটের মধ্যে শুরু হলো অপারেশন। সেলিম শাহনেওয়াজ একটা সেভেন ফায়ার চাকু বের করে ওবায়দুলকে বললেন, শব্দ করলেই ভুঁড়ির মধ্যে ঢুকে যাবে। তিনি ভয় পেয়ে গেলেন। কমরেড ডাকাত একটা গামছা দিয়ে তার মুখ বেঁধে ফেলল। তারপর রশি

দিয়ে তার হাত বাঁধা হলো। খাটের সঙ্গে পা-ও বাঁধা হলো। আমরা হাতের কাছে যা পেলাম, তুলে নিলাম। মশারিটাও খুলে নিলাম। কারণ আমরা যেখানে থাকি, সেখানে মশার খুব উপদ্রব। আমরা নির্বিঘ্নে বেরিয়ে এলাম। কিন্তু আফসোস, অপারেশনের আর্থিক সাফল্য ছিল যৎসামান্য।

জুন মাসে এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নিলাম পলাতক অবস্থায়। দল থেকে বলা হয়েছিল পরীক্ষা না দিতে। প্রথমে ভেবেছিলাম, পরীক্ষা দেব না। কিন্তু মোহমুক্ত হতে পারিনি। সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে লুকিয়ে পরীক্ষার হলে যেতাম। একদিন পরীক্ষার হলে যাওয়ার সময় স্যান্ডেল ছিঁড়ে যায়। আমি খালি পায়েই চলে যাই।

বিএম স্কুলের সামনের বাসায় অপারেশনটির পর্যালোচনা করে দেখলাম, অল্প কিছুর জন্য আমরা অনেক বেশি ঝুঁকি নিয়েছিলাম। সিদ্ধান্ত নিলাম, আগে সব তথ্য জোগাড় করে তারপর এ ধরনের কাজে নামব। বিশেষ করে টাকা-পয়সার ব্যাপারটা দেখতে হবে।

ঝালকাঠি থেকে খবর দেওয়া হয় ব্যাংক লুটের জন্য। প্রতি শুক্রবার রকেট স্টিমার ঢাকা থেকে বরিশাল হয়ে রাত নয়টা-সাড়ে নয়টার দিকে ঝালকাঠি যায়। ওই স্টিমারে ন্যাশনাল ব্যাংকের টাকা বড় একটা ট্রাংকে খুলনায় যায়। এটা একটা রুটিন কাজ।

আমরা ওই টাকা লুটের প্রস্তুতি নিলাম। বরিশালে আমাদের একটা পিস্তল দেওয়া হয়েছিল। কীভাবে পিস্তল চালাতে হয়, সেটা জানলেও কোনো বাস্তব অভিজ্ঞতা বা প্রশিক্ষণ ছিল না। আমাদের দক্ষতা কেবল বোমা বানানো ও ফাটানো। আমরা অনেক বোমা বানিয়েছি। বোমা বানাতে গিয়ে কখনো কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি।

বরিশাল থেকে ঝালকাঠি মাত্র এক ঘণ্টার পথ। আমাদের পরিকল্পনা হলো, ট্রাংকটি ঘাটে এনে স্টিমারে তোলার সময় আমরা একসঙ্গে চারটা বোমা ছুড়ে আতঙ্ক তৈরি করব। পুলিশের যে দল ট্রাংক নিয়ে আসে, তারা যদি বোমার শব্দে না পালায়, তাহলে তাদের দিকে পিস্তল তাক করব। প্রয়োজনে ফাঁকা গুলি ছুড়ব। তাতেও কাজ না হলে ছুরি চালাব। তারপর ট্রাংকটি অপেক্ষমাণ একটা নৌকায় তুলব। নৌকা চালাবে ডাকাত কমরেডরা। সবাই চেনে বলে ঘাটের অপারেশনে তাদের পাঠানো হবে না।

আমরা পরপর দুই সপ্তাহ ঘাটে যাই। কিন্তু সশস্ত্র পুলিশের সংখ্যা দেখে

অপারেশনের সাহস করিনি।

বরিশাল শহরে আমরা বেশ কয়েকটি ডাকাতি করেছি। সবগুলোই সফল। সবচেয়ে বড় অপারেশন হয় কবি হুমায়ুন কবিরের শ্বশুরবাড়িতে। ঘটনাচক্রে হুমায়ুন কবির তখন বরিশালে। ডাকাতি করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন হুমায়ুনের স্ত্রী সুলতানা রেবুর বড় ভাই জলিল ফারুক। তিনি আরএসপি করতেন। তাঁদের বাড়িতে কয়টা ঘর, কোন ঘরের দরজা কোন দিকে, কোন আলমারিতে টাকা-পয়সা ও গয়নাগাটি আছে সব ছবির মতো এঁকে দেওয়া হয়। জলিল ফারুক আমাকে ভালো করেই চেনেন বলে আমি ওই অপারেশনে যাইনি। অপারেশনটি সফল হয়। তবে অপারেশনে যারা গিয়েছিল, তাদের সবজান্তা আচরণ দেখে বাড়ির লোকেরা সন্দেহ করেছিল।

সর্বশেষ অপারেশনে চারজন কমরেড গ্রেপ্তার হয়েছিল। আমরা ছিলাম গড়িয়ারপারের বাসায়। রাত দশটার দিকে তারা বের হয়। সারারাত পেরিয়ে যায়। তারা আর ফিরে আসেনি। আমরা খুব উদ্বিগ্ন। সকালে সাইকেল চালিয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখি চারজনকে পুলিশের গাড়িতে করে নিয়ে যাচ্ছে। লোকজনের কাছে শুনলাম, তারা একটা বাড়ির সামনে মাঠের মধ্যে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করছিল। তাদের আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তারা বলেছে, তারা ভূতাত্ত্বিক জরিপ করছে। কথাবার্তায় সন্দেহ হওয়ায় তাদের পুলিশের হাতে দেওয়া হয়েছে। তবে কারও সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করা হয়নি।

জুলাই বা আগস্ট মাসের দিকে কমরেড তাহের সস্ত্রীক বরিশাল ছেড়ে চলে যান। ততদিনে আমাদের অধিকাংশ কর্মী গ্রেপ্তার হয়ে গেছে। যারা গ্রেপ্তার এড়াতে পেরেছে, তারা কেউ স্বাভাবিকভাবে কাজ করতে পারছে না।

সেপ্টেম্বরের দিকে এইচএসসি পরীক্ষার রেজাল্ট বের হলো। আমি দ্বিতীয় বিভাগে পাস করলাম। কাউকে কিছু না জানিয়ে একদিন চলে এলাম ঢাকায়। দলের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আমি ভর্তি হই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে। দলই আমাকে খুঁজে বের করে। পুরান ঢাকার একটা বাড়িতে নির্দিষ্ট দিন ও সময়ে আমাকে হাজির হতে বলা হয়। যথাসময়ে উপস্থিত হলাম। সেখানে হাকিম ভাই ছিলেন। কমরেড সুলতান প্রস্তাব করলেন—বর্তমান পরিস্থিতিতে আপনাকে বরিশালে থেকে কাজ করতে হবে। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার খবরটা জানালাম। বললাম,

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবে আমি দলের কাজ করতে চাই। হাকিম ভাই বললেন, সেটা কি সম্ভব? বললাম, কেন সম্ভব নয়। তিনি কোনো জবাব দিলেন না। আমার কথারও গুরুত্ব দিলেন না। এ বিষয়ে আর কোনো কথা হয়নি। একপর্যায়ে কমরেড সুলতান বললেন, তবে আপনি যান। প্রয়োজনে আমরা যোগাযোগ করব। পরে আমার সঙ্গে আর যোগাযোগ করেনি কেউ।

নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে আমি বরিশালে যাই। তখন সারা দেশে নির্বাচনী হাওয়া। ভেবেছিলাম, এ পরিস্থিতিতে আমি অ্যারেস্ট হব না। ৭ ডিসেম্বর জাতীয় পরিষদের নির্বাচন হলো। সারা দেশে নির্বাচন নিয়ে মাতামাতি। আমি হালকা চালে চলাফেরা করি। একটু খোলামেলা হয়েছিলাম। একাত্তরের জানুয়ারির ১০ তারিখ সন্ধ্যায় স্টিমার ঘাটে গেলাম। ঢাকা রওনা হব। স্টিমারে উঠলাম। সাতটার সময় স্টিমার ছাড়ার কথা। সময় পেরিয়ে যায়। স্টিমার আর ছাড়ে না। একটি বাদে সব সিঁড়ি তুলে ফেলা হয়েছে। হঠাৎ দেখি, বিশজনের মতো পুলিশ স্টিমারে উঠল। আমাকে অ্যারেস্ট করল।

আমি বরিশাল জেলে ছিলাম সাতদিন। তারপর ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে পাঠানো হয়। ঢাকায় যাওয়ার তিন-চারদিনের মধ্যে আমাকে নিয়ে যাওয়া হয় মালিবাগে হোয়াইট হাউজে। সেখানে দশদিন ধরে চলে জিজ্ঞাসাবাদ। একই সঙ্গে তথ্য ও স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য শারীরিক কসরত। আমি বরাবর একটা কথাই বলে গেছি, আমি কাউকে চিনি না, কিছু জানি না। আমার পরবর্তী একটা বছর কাটল একটা নির্জন সেলে। এর মধ্যে সংঘটিত হলো মুক্তিযুদ্ধ।

একাত্তরের ১৭ ডিসেম্বর আমি ঢাকা সেন্ট্রাল জেল থেকে ছাড়া পাই। কারও সঙ্গে আর যোগাযোগ করিনি। বাহাত্তরের মার্চে পার্টি চেষ্টা করেছে যোগাযোগের জন্য। আমি হতাশা জানিয়ে এড়িয়ে যাই।

হাফিজ

বরিশালে তখন ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন গ্রুপ) সবচেয়ে শক্তিশালী ছাত্রসংগঠন, বিশেষ করে বামপন্থী দলগুলোর ভেতরে। আমাদের ছোট গলিতে পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন সবচেয়ে শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

– আপনি কীভাবে জড়ালেন?

বরিশালের ছাত্র ইউনিয়নের (মেনন গ্রুপ) বেশির ভাগ নেতা-কর্মী পূর্ববাংলা শ্রমিক আন্দোলনে যোগ দিলে মল্লিকবাড়ি রোডে পুলিশ ক্লাবের বিপরীতে অবস্থিত পুরনো একতলা অফিসটি তাদের দখলে চলে যায়। একটা মোটামুটি বড় সাইজের হলঘর ছিল যেখানে নিয়মিত রাজনৈতিক ক্লাস চলত। হুমায়ুন কবির বেশির ভাগ ক্লাস নিতেন। মার্কসবাদের ওপর আলোচনা হলেও আমাদের মাও সে তুংয়ের লাল বই থেকে কোটেশন শেখানো হতো।

আমাকে একটি ছাত্র ও দুটি শ্রমিক গ্রুপের পাঠচক্র (একটি লঞ্চঘাট শ্রমিক, অন্যটি রেস্তোরাঁ শ্রমিকদের) পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। তখনই মাত্র বরিশালে এই পাঠচক্রপদ্ধতি চালু হয় যেখানে পাঁচ-সাতজনের এক গ্রুপকে নিয়ে সপ্তাহে দু-একবার বিকেলের দিকে রাজনীতির ক্লাস নেওয়া হতো, অনেকটা গোপনে। ১৯৭০-এর শুরুর দিকে আমি এসএসসি দিয়ে কলেজে উঠে যাই। বরিশাল বিএম কলেজে সায়েন্স গ্রুপে ভর্তি হই ১৯৭০ সালের এপ্রিল-মে মাসে।

ইতিমধ্যে তাহের ভাই (সামিউল্লাহ আজমী) বরিশালে আসেন সংগঠনের দায়িত্ব নিয়ে। সঙ্গে তার স্ত্রী কমরেড সুফিয়া (পার্টি নাম), যিনি আরেক কঠিন বিপ্লবী। যতদূর শুনেছি, তখন তাহের ভাই ছিলেন পার্টিতে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ নেতা। তিনি ছিলেন প্রখর মেধাবী ও সাহসী। তিনি ছদ্মনামে কাউনিয়ার

একদিকে বাসা ভাড়া নিয়ে গোপনে সংগঠন গড়ে তোলার উদ্যোগ নেন। তাঁর কারণে দ্রুত পার্টির প্রসার ঘটতে শুরু করে। তাহের ভাইয়ের অল্প কয়েক মাসের অবস্থানকালে বরিশালে কর্মী সংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকে, কর্মচাঞ্চল্য বেড়ে যায়। তাঁর নেতৃত্ব ও সমন্বয়কের ভূমিকা ছিল অনেক ভালো, গতিশীল। আমাদের পাড়ার মতো গোরাচাঁদ রোডেও অনেক কিশোর-যুবক দলে যোগ দেয়। অনেকের কথা বা ভূমিকা এখন আর মনে নেই। তবে দুজন মানুষ—একজন মহিউদ্দিন ভাই, খুব সাদাসিধা আর নিবেদিত, আমার সঙ্গে প্রায়ই আলাপ হতো। তিনি স্বাধীনতার পরে সিপিবিতে যোগ দিয়েছেন শুনেছি। ১৯৭২ সালের পরে আর দেখা হয়নি। আর হাসান ভাইয়ের কথা *বলা যায়, যিনি তাহের ভাই আসার আগে ঢাকা থেকে এসে জেলার নেতৃত্ব* দিয়েছেন। তবে আমার সঙ্গে বেশি যোগাযোগ হয়নি। তাহের ভাই যখন আসেন, সে সময় হুমায়ুন ভাই ঢাকায় ফিরে যান।

সংগঠন চালাতে টাকা-পয়সা কিছু লাগে। কিন্তু তেমন চাঁদা ওঠানোর মতো সমর্থক বিত্তশালী মানুষ ছিলেন না। তাই ধনীদের বাড়িতে ডাকাতির মাধ্যমে কিছু টাকা সংগ্রহের সিদ্ধান্ত হয়। একটা-দুটো চেষ্টা হয়। ঘটনাক্রমে তাহের ভাই আমাকে খুব পছন্দ করতেন। সুফিয়া আপাসহ আমাদের বাসায় এসেছেন। তাঁরা বিপ্লবী, শুনে আমার আম্মা আদর করে তাদের খাইয়েছেন, দু-তিনবার সামান্য আর্থিক সাহায্যও দিয়েছেন। তাঁদের দু-এক বেলা মনে হয় উপোস যেত। একবার টাকার অভাবে তাহের ভাই আমাকে এবং আরেকজনকে নিয়ে চললেন উজিরপুরের দিকে নৌকায়, উদ্দেশ্য কোথাও ডাকাতি করে কিছু অর্থের ব্যবস্থা করা। কিন্তু বোঝা গেল তাঁর মনও সায় দিচ্ছিল না। তিনি নৌকায় বসে ইমোশনালি এমন সব এলোমেলো কথা বলতে লাগলেন! সম্ভবত তাঁর উচ্চ রক্তচাপও ছিল। পরে আমরা সেই প্ল্যান বাদ দিয়ে ফিরে এসেছিলাম!

১৯৭০ সালের মাঝামাঝি। রাজনীতির ময়দান গরম হয়ে আসছে। আমাদের গেরিলাযুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে হবে, তেমন আভাস আসতে লাগল। তার অংশ হিসেবে তাহের ভাই ভারত থেকে শিখে আসা হাতবোমা আর মলোটভ ককটেল বানানোর ফর্মুলা শেখালেন। যেসব কেমিক্যাল দিয়ে এগুলো বানাতে হয়, সেসব তখন বাজারে পাওয়া যায়। পূজার সময় সেসব দিয়েই বাজি বানানো হয়। তো আমি পরীক্ষার জন্য বাজার থেকে সেসব

কিছু কিনে আনলাম। আমার প্রতিবেশী বন্ধু আর সমর্থক আজাদের বাসার দোতলার এক রুমে গোপনে বসে দুজন বানালাম হাতবোমা, বড় আকারের একটা স্নোর কৌটায় ভরে। সেটা বানিয়ে প্রস্তুত করার জন্য রোদে শুকালাম। তারপর এক রাতে, প্রায় ১২টার দিকে আমরা দুজন পরীক্ষা করতে গেলাম গলির মাথায়। মফস্বল শহর তখন ঘুমিয়ে। বন্ধুকে পাশে রেখে আমি প্রধান রাস্তার দিকে যতটা সম্ভব দূরে ছুড়ে মারলাম, আর সঙ্গে সঙ্গে গলির ভেতরে চলে এলাম। প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণের আওয়াজে চারদিক কেঁপে উঠল। এমন আওয়াজ বরিশালবাসী বহুদিন শোনেনি। আমরা ফাঁকা রাস্তার প্রায় ১৫০ গজ ভেতরে ওদের বাড়ির দেয়ালের ভেতরে ঢুকে গেলাম কেউ বের হওয়ার আগেই। কেউ বের হওয়ার সাহস পায়নি, আমাদেরও দেখেনি।

ঝালকাঠির দিকে আরেক হঠকারী কাজ করতে গিয়ে এক কমরেড পুলিশের হাতে অ্যারেস্ট হয়ে যান। মনে হয় অত্যাচারের মুখে তিনি কিছু কমরেডের নাম-পরিচয় বলে দেন। তাহের ভাইয়েরা ভাড়া বাসা ছেড়ে ঢাকার দিকে চলে যান। এক রাতে আমার বাসা পুলিশ ঘেরাও করে। আমি তখন সদ্য ম্যাট্রিক পাস হলেও বয়স ১৬-এর মতো, দেখতে ছোটখাটো, বাসায় হাফ প্যান্ট পরে টিনের দোচালা ঘরের ওপর মাচায় শোয়া। ওরা বলে ওপর থেকে নামতে, আমি নেমে আসি। নাম জিজ্ঞেস করলে আমি আমার পিঠাপিঠি ছোট ভাই মনু বলে পরিচয় দিই। মনু তখন স্বরূপকাঠিতে ফুফুর বাড়ি বেড়াতে গেছে। সবাই চুপ করে আছে। পুলিশ আমাকে কোনোদিন দেখেনি, নাম শুনে এসেছে। তাই আমার আকার-আকৃতি দেখে ও কথা শুনে আমায় ছেড়ে দিয়ে চলে যায়।

বরিশালেই ছিলেন সব সময়?

কিছু কাজের জন্য পার্টির কর্মীদের ওপর একের পর এক পুলিশি অভিযান শুরু হলো। দু-একজন ধরাও পড়ছিল। তখন ঢাকা থেকে সিদ্ধান্ত আসে বরিশাল থেকে আপাতত বাইরে যাওয়ার। বলা হলো, শিগগিরই পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে গেরিলাযুদ্ধ শুরু করতে হবে। আর তার জন্য ভৌগোলিক দিক থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম আদর্শ স্থান। পাহাড়, জঙ্গলে পাকবাহিনী সুবিধা করতে পারবে না। তাই আমাদের বরিশালের সক্রিয় কর্মীদের চিটাগাং হয়ে সেখানে যেতে হবে। আগে থেকেই ঢাকার একজন, বয়সে কিছুটা সিনিয়র কমরেড কাপ্তাই গিয়ে ওখানের হাইস্কুলে শিক্ষকতা

নিয়েছেন। তিনি স্থানীয়দের সঙ্গে যোগাযোগ করতে সাহায্য করবেন।

বরিশাল থেকে ১০-১২ জন যাওয়া ঠিক হলো, যতদূর মনে পড়ে ১৯৭০-এর আগস্টে বা সেপ্টেম্বরে। আর একত্রে না গিয়ে ছোট কয়েক দলে, বরিশাল-চট্টগ্রাম সরাসরি এক জাহাজ যেত, তাতে করে যাওয়া ঠিক হলো। আমি গেলাম সেই জাহাজে। সেখানে গিয়ে দেখি তাহের ভাইকে চট্টগ্রাম অঞ্চলের পুরো দায়িত্ব দিয়ে আগেই পাঠানো হয়েছে। তিনি আর সুফিয়া আপা হালিশহরে বিহারিদের কলোনির ভেতরে বাউন্ডারিসহ একটি দুই রুমের একতলা ঘর ভাড়া নিয়ে উঠেছেন। তাহের ভাই ভারতের উত্তর প্রদেশের মানুষ, তাই ওদের ভাষায় কথা বলে সবকিছু ম্যানেজ করতে সমস্যা হয়নি। দুই-তিনজন মনে হয় ঢাকার দিক থেকেও যোগ দিয়েছিল।

সবাইকে দুই গ্রুপ করে একদলকে খাগড়াছড়ির দিকে পাঠালেন, মূলত সেখানের চা-বাগানের শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করতে। আর ঢাকা থেকে যাওয়া বরিশালের এক কমরেড, যিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় বা তৃতীয় বর্ষে পড়তেন এবং এসএসসি পরীক্ষায় জিলা স্কুল থেকে তৃতীয় হয়েছিলেন, সেই শহীদ ভাইয়ের নেতৃত্বে আরেক গ্রুপকে বান্দরবানের দিকে পাঠানো হয়। তারা সেখানের গহিন অঞ্চলের সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া মুরং অধিবাসীদের মধ্যে প্রথমে কাজ শুরু করবে। কিন্তু তাহের ভাই আমাকে তাঁর নিজের কাছেই রাখলেন। আমি অবশ্য অনেক অনুনয় বিনয় করেছি, আমাকেও ওই পাহাড়ে যেতে দিতে। কারণ, অনেক স্বপ্ন নিয়ে বরিশাল থেকে গিয়েছি গেরিলাযুদ্ধ করতে, যেমনটা চেয়ারম্যান মাও সে তুং চিনে করেছেন বলে পড়েছি, শুনেছি। কিন্তু তাহের ভাই আমাকে অনেক বুঝিয়ে নিজের কাছে রাখলেন। তিনি এবং তাঁর স্ত্রী সুফিয়া আপা, যিনি একজন সাহসী বিপ্লবী এবং বরিশাল থাকা অবস্থায় কালো বোরখা পরে বা পুরুষদের মতো পাজামা-পাঞ্জাবি পরে ও মাথার চুল গোল টুপি দিয়ে ঢেকে পাঠচক্রে ক্লাস নিতে যেতেন, চট্টগ্রামে আমাকে অনেক স্নেহ-ভালোবাসা দিয়ে রেখেছিলেন।

– চট্টগ্রামে কাজের ধরন কেমন ছিল? অভিজ্ঞতা কেমন?

চট্টগ্রামের জীবন ছিল বড় কষ্টের। বিশেষ করে, আর্থিক অবস্থা ছিল খুব কঠিন, অনিশ্চিত। তিনজনের খাবারের টাকা জোগাড়ের কোনো স্থায়ী ব্যবস্থা ছিল না। তাছাড়া আমার একটা বিশেষ কাজ নিয়মিত করতে হতো। আমিন জুট মিলে গিয়ে শ্রমিকদের গ্রুপ করে পাঠচক্র বানিয়ে ক্লাস নেওয়া,

আর মেডিকেল কলেজের কাছে ছাত্রদের গ্রুপে পাঠচক্রে ক্লাস নেওয়া। দুটো জায়গাই আমাদের বাসস্থান থেকে অনেক দূর, পাঁচ-ছয় মাইল তো হবেই। কিন্তু অত দূরে যাতায়াতের জন্য বাসের ব্যবস্থা থাকলেও বাসভাড়া প্রায় সময়ই থাকত না। কখনো কখনো প্রখর রোদের মধ্যে সেসব জায়গায় হেঁটে যাতায়াত করতে হতো। আর তিন বেলা খাবার জোগাড় করতে কষ্ট হতো। এদিকে আমাদের এত কঠিন কাজে স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে হবে সে কথা সুফিয়া আপা সব সময় মনে করিয়ে দিতেন, আর কত কম খরচে স্বাস্থ্যসম্মত খাবার খাওয়া যায়, সেসব আইটেম নিয়ে রীতিমতো গবেষণা করতেন, পাইপয়সার হিসাবও রাখতেন। যেমন আমরা মাসে একবার মাছ বা মাংস খাওয়ার কথা ভাবতে পারিনি। ভাতের সঙ্গে ডাল ও একটা সস্তার সবজি হয়তো খেয়েছি, যেটার মূল্য অনুযায়ী ভিটামিন বেশি এবং তাতে তখনকার ৩৭ পয়সায় একজনের এক বেলা ম্যানেজ হয়ে যেত সেই হিসাব তিনি বের করেছেন।

কয়েকবার আমাকে দিনমজুর হিসেবে কাজ করতে হয়েছে। যেমন একদিন রেস্তোরাঁয় হাঁড়িপাতিল মাজার কাজ, একদিন শহরের রাস্তায় ঠেলাচালকের সহকারী হিসেবে ঠেলাগাড়ি চালানোর কাজ, একবার পোর্টে নিচ থেকে মাথায় নিয়ে রপ্তানির জন্য রাখা বাঁশ জাহাজে উঠিয়ে দেওয়ার কাজ। ওখানে খুব কটু ভাষায় সর্দারের গালি খেতে হতো।

পার্টির কাজের জন্য একবার আমাকে পাঠানো হলো সাতকানিয়া ছাড়িয়ে আরও দক্ষিণে এক বাজারের কাছে। সেখানে একটা সিগারেট ফ্যাক্টরি আছে। কিন্তু সেখানে যাওয়ার পর যে যোগাযোগ হওয়ার কথা, সেটা হয়নি। এদিকে হাতে এক পয়সাও নেই বাসে ফেরত আসার। তখন সেখানে একদিন মাটিকাটা মজুরের কাজ করি, সকাল-সন্ধ্যা। জায়গাটা বাজারের কাছে একটা ছোট টিলার উপরে, সঙ্গে কয়েকজন আদিবাসী শ্রমিক ছিল। কাজের পরে দুই টাকা না আড়াই টাকা পাই, মনে নাই। রাতে ঘুমানোর কোনো জায়গা ছিল না। একটা পরিত্যক্ত ছাপরাঘর পাই। বাঁশের বেড়া, ফাঁকা ফাঁকা আছে। উপরে ধানের কুটোর চালা। তখন প্রচণ্ড শীত। বিছানা, বালিশ বা কম্বল নাই। একটা বাঁশের ওপর পড়ে থাকা মাদুর গোছের বেড়া পেলাম। সেটা বিছিয়ে গায়ের সোয়েটার গায়ে দিয়ে যে পোশাকে গিয়েছি সেই পোশাকেই ঘুমিয়েছি। অনেক মশার কামড় খেলাম সারা রাত। পরের দিন ফেরত আসার পর আমার ম্যালেরিয়া হয়। আগে কখনো ট্যাবলেট

খাইনি। জ্বর-পেট খারাপে বাবার হোমিওপ্যাথি খেয়েছি। তাহের ভাই যখন কুইনাইন ট্যাবলেট আনলেন, খেতে পারছিলাম না। ভেঙে ভেঙে খেতে হয়েছিল। অবশ্য এতে আমার বিপ্লবী রোমান্টিকতা একটুও কমেনি।

– সিরাজ সিকদারের সঙ্গে দেখা হলো কখন?

মাঝে একবার সিরাজ সিকদার চিটাগাং এলেন কাজকর্ম দেখতে, খোঁজ নিতে। তাঁর পার্টি নাম তখন হাকিম। সবাই হাকিম ভাই নামে ডাকে, আমিও। স্টেশন থেকে আমি তাঁকে এই বাসায় নিয়ে এলাম। আমার সঙ্গে চিটাগাংয়ে আসা অন্য কোনো কমরেডকে এই বাসার ঠিকানা দেওয়া হতো না নিরাপত্তার স্বার্থে। কেউ জানত না। সেই প্রথম তাঁকে দেখলাম।

আমাদের বাসায় ছোট দুটি রুম, মাঝে খোলা এক চিলতে জায়গায় রান্নাঘর। বাথরুম-পায়খানা বাইরে উঠানের আরেক পাশে। এক রুমে তাহের ভাইয়েরা থাকেন। হাকিম ভাইয়ের ঠাঁই হলো আমার রুমে, আমার বিছানাতেই। কোনো খাট বা চৌকি ছিল না। নিচেই তোষক বিছিয়ে ঘুমানো। তিনি আমাকে আদর করে মনু বলে ডাকা শুরু করলেন। ছিলেন দু-তিনদিন। দীর্ঘ আলোচনা করলেন তাহের ভাইয়ের সঙ্গে। সেখানে আমার থাকা হতো না। বাইরে দু-তিন জায়গায় গিয়েও তাঁরা মিটিং করেছেন। পরে যেদিন তিনি ঢাকায় ফেরত যাবেন, আমাকে বললেন, ট্রেনে তাঁর সঙ্গে সীতাকুণ্ড পর্যন্ত এগিয়ে দিতে। আমি সীতাকুণ্ড পর্যন্ত গিয়ে ফেরত চলে এলাম। এর কিছুদিন পর পার্টির সাময়িক পত্রিকা *লালঝান্ডা* পাঠানো হয় ঢাকা থেকে। সেখানে দেখি, হাকিম ভাই আমাকে প্রশংসা করে ছোট একটি নিবন্ধ লিখেছেন।

মাঝে আমাকে একবার কাপ্তাই পাঠানো হয়েছিল, স্কুলশিক্ষক হিসেবে আগে আসা সেই কমরেডের কাছ থেকে কিছু খবরাখবর লেনদেন করার জন্য।

এদিকে বাইরে রাজনৈতিক উত্তাপ বেড়েই চলছিল, যা হালিশহরের ভেতরে থেকে অতটা টের পাওয়া যেত না। আমরা পত্রিকা রাখতাম না, তবে কোথাও পেলে চোখ বুলাতাম। ইতিমধ্যে পাহাড়ের দুই জায়গাতেই আমাদের হঠকারিতা ও কষ্টের জীবনের জন্য পশ্চাদপসরণ করতে হয়েছে। শুনেছি রামগড়ে যারা চা-বাগানের শ্রমিকদের সঙ্গে কাজ করেছে, তারা ওখানে এক অত্যাচারী ম্যানেজারকে চাকু দিয়ে হামলা করে মেরে ফেলেছে। এটা পার্টির নীতি বা আদেশ ছিল না। কিন্তু ওখানের শ্রমিকদের ওপর অত্যাচার দেখে ওরাই মনে হয় ওই সিদ্ধান্ত নিয়ে ওই কাজ করে ফেলেছে।

কিন্তু তারপর পুলিশি অভিযান শুরু হলে তারা টিকতে না পেরে ঢাকা এবং বরিশালে ফেরত চলে যায়। একজন সম্ভবত গ্রেপ্তার হয়েছিল।

বান্দরবানে ওদের খাওয়ার কষ্ট ছিল খুব বেশি। ঢাকা থেকে এদিকের কাজের জন্য কোনোদিন এক টাকাও পাঠানো হয়নি। হয়তো তাদেরও অবস্থা ভালো ছিল না। তাই কখনো কখনো স্থানীয়রা তাদের সঙ্গে তাদের বনের খাবার, ব্যাঙ বা অজগরের মাংস, যেসব তাদের অভাবের জন্য মূলত খেতে হতো, আমাদের কমরেডদের খেতে দিত। কিন্তু সেসবে অভ্যস্ত নয় বিধায়, কমিউনিস্ট মন নিয়েও শহীদ ভাই ছাড়া কেউ খেতে পারত না। শহীদ ভাই যেকোনো পরিস্থিতিতে থাকতে, আর যেকোনো খাবার খেতে পারতেন। ছিলেন খুব সহজসরল এক মানুষ। যতদূর মনে পড়ে তিনি একবার তাহের ভাইয়ের সঙ্গে আলোচনার জন্য চিটাগাং শহরে এসেছিলেন।

– স্থানীয় মানুষের সাড়া পেয়েছিলেন?

স্থানীয়দের তাঁরা রাজনৈতিকভাবে কাছে টানতে পারেননি, তাদের সেসব বোঝার মতো বাস্তবতাও ছিল না। তারা প্রায় সবাই অশিক্ষিত। কাটাত প্রায় আদিম জীবন। সরকার তাদের কীভাবে শাসন বা শোষণ করে, সেসব তাদের কাছে কোনো বিষয়ই ছিল না। তারা যুগ যুগ ধরে একই রকম জীবন যাপন করে আসছে। তাই স্থানীয়দের নিয়ে গেরিলা দল গঠন ও শক্তিশালী করা সম্ভব ছিল না। অর্থাৎ যে উদ্দেশ্যে তাঁরা গিয়েছেন, সেটা বাস্তবের সঙ্গে খাপ খাচ্ছিল না। শুধু পাহাড়-জঙ্গল থাকলে তো হবে না, আগে হলো মানুষ। মানুষের অংশগ্রহণ ছাড়া দীর্ঘ মেয়াদে কিছুই করা সম্ভব নয়।

– ১৯৭১ সালের কথা বলুন। কী করলেন?

১৯৭১-এর মার্চ মাস। ঢাকার ঘটনাবহুল আন্দোলনের কথা ততটা জেনেছি বলে মনে পড়ে না। তবে শুরুতে কোনো একদিন বাঙালি-বিহারি প্রচণ্ড দাঙ্গা লেগে গেল চট্টগ্রামে। আমরা বিহারি কলোনিতে থাকলেও বিহারিদের কাছ থেকে কোনো সমস্যা ছিল না। কারণ, তাহের ভাই অবাঙালি, চোস্ত উর্দু বলেন, সবাই জানেন। আর বাঙালিরা যখন সেই কলোনি আক্রমণ করে তখন আমরা উল্টো দিকে ছিলাম, অত ভেতরে কেউ ঢোকেনি। বাঙালি জনতা অপর প্রান্তের কিছু বাড়িঘরে আগুন দিয়েছে।

কয়েক দিন পর আমাকে নির্দেশ দেওয়া হলো ঢাকায় যাওয়ার। ঢাকা থেকেই এ আদেশ গিয়েছিল। তাহের ভাই ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাকে ছেড়ে

দেন, আর সেটাই ছিল তাঁর ও সুফিয়া আপার সঙ্গে আমার শেষ দেখা।

তারপর ঢাকায় গেলেন?

ট্রেনে চড়ে ঢাকা চলে এলাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ হলে আমার এক বেয়াই, তখন দর্শনের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র, তার রুমে উঠে গেলাম। ঢাকায় আসার পরে পার্টি থেকে আমার করণীয় ব্যাপারে কোনো সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত পাচ্ছিলাম না। বরিশালের মামুন ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হলো। তিনি তখন তার বড় ভাইয়ের মতিঝিলের সরকারি এজিবির কলোনিতে থাকেন।

এর মধ্যে আমি ঢাকার দু-এক জায়গা দেখে নিলাম। হলে নানান দলের নেতাদের কর্মকাণ্ড দেখতে লাগলাম। এর মধ্যে একদিন দেখা পেলাম ছাত্র ইউনিয়ন নেতা আমাদের পাড়ার মাসুদ ভাইয়ের। তিনিও এসএম হলে থাকেন। রাজনীতির কথা উঠলে তিনি জানালেন, তাঁরা মনে করেন পাকিস্তানব্যাপী সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন হতে হবে। আমরা আগে পূর্ব বাংলার স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। আমি তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ তর্ক করে ক্ষান্ত দিলাম।

২৫ মার্চ রাত আটটার দিকে, এসএম হলে আছি। হঠাৎ হলের এক বড় ভাই এসে আশপাশের সবাইকে জানালেন, তোমরা যে যেভাবে পারো হল ছেড়ে ভেগে যাও, রাতে আক্রমণ হতে পারে। আমিও বের হয়ে চলে গেলাম মতিঝিল এজিবি কলোনিতে। সেখানে গিয়ে দেখি মামুন ভাই ছাড়াও তার বড় ভাই মোহামেডানের গোলকিপার নুরুন্নবী এবং সেই ক্লাবের আরেক প্লেয়ার প্রতাপ হাজরা ক্লাব ছেড়ে ওখানে উঠেছেন। তাদের যে ভাইয়ের কোয়ার্টার, তিনি গণ্ডগোলের আভাস পেয়ে আগেই পরিবারকে নিরাপদে গ্রামের বাড়িতে রেখে আসতে গিয়েছেন।

রাত ১১টার দিকেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। রাত ১২টার কিছু পর হঠাৎ প্রচণ্ড গোলাগুলির শব্দে ঘুম ভেঙে গেল।

সারা দিনের জন্য কারফিউ ঘোষণা হয়েছিল। পরের দিন দুই ঘণ্টার জন্য কারফিউ শিথিল করা হয়। পুরানা পল্টনে খালার বাসা। আমি হেঁটে সেখানে চলে যাই। ২৮ তারিখ চলে যাই পুরান ঢাকায় বন্ধু আজাদের দোকানে। সেখানে সে এবং ওর সমবয়সী চাচাতো ভাই ওদুদ থাকত। আমরা প্ল্যান করি ঢাকা থেকে বের হয়ে যাওয়ার।

পরদিন সকালে আমরা তিনজন পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে বাদামতলী ঘাটের কাছে একটা নৌকা ভাড়া করে বুড়িগঙ্গার ওপারে যাই। ৮-৯ মাইল হাঁটার

পর দেখি, একটি লঞ্চ ঢাকার দিক থেকে এসে উল্টো দিকে যাচ্ছে। কাছে এসে বলল যে ওরা মুন্সিগঞ্জের কাঠপট্টি পর্যন্ত যাবে। আমরা উঠে গেলাম।

কাঠপট্টি ঘাটে নেমে টার্মিনালের ওপরেই বসে রইলাম। আমাদের নদীপথেই বরিশাল যেতে হবে। পরের দিন সকাল ১০টার দিকে ঘাটে বাঁধা একটা বড় লঞ্চ থেকে ডাক দেওয়া শুরু হলো, কে কে চাঁদপুর যাবেন? শুনেই আমরা দৌড়ে সেই লঞ্চে উঠে গেলাম। চাঁদপুর মানে আমাদের পথে আরও খানিকটা এগোনো। চাঁদপুর পৌঁছে টার্মিনালে রাত কাটালাম। পরের দিন সকালের দিকে ঘাটে বাঁধা আরেকটা লঞ্চ চিৎকার করে ডাকছে, কে কে বরিশাল যাবেন? আনন্দে আমরা লাফ দিয়ে উঠে যাই। বিকেলের দিকে পৌঁছে যাই। তিনজনে এক রিকশায় কাউনিয়ার বাড়িতে ফিরি। ছয় মাসের কিছু বেশি সময় পর পরিবারের লোকেরা আমাকে পেলে এক বড় ধরনের আবেগঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

এর মধ্যেই দেখি আমাদের অনেক কমরেড পাক বাহিনীকে প্রতিরোধের জন্য নানামুখী প্রস্তুতি নিচ্ছে। বরিশালে পার্টির কর্মী আগে থেকেই বেশি ছিল। আমাকে পেয়ে তারা খুব খুশি। আমার বোমা বানানোর অভিজ্ঞতার জন্য আমাকে তারা সেই দায়িত্ব দিল।

বরিশালে প্রতিরোধযুদ্ধ করলেন?

আমি বন্ধু আজাদকে নিয়ে কাজে লেগে গেলাম। সে আমাদের কর্মী নয়, সমর্থক। কিন্তু এই কাজে আগেও আমার সহযোগী হয়েছিল। এবারও হলো। আমরা কয়েক দিনের মধ্যেই ২০০-২৫০টি হাতবোমা আর মলোটভ ককটেল বানিয়ে ফেললাম। আর ওদিকে আওয়ামী লীগ থেকে স্থানীয় এমপি নুরুল ইসলাম মঞ্জু চেষ্টা করছেন নানামুখী প্রস্তুতির। স্থানীয় প্রশাসন বলতে গেলে তিনিই চালাচ্ছেন। অনেক জনপ্রিয় ছিলেন। মেজর জলিল তখন ছুটিতে পাকিস্তান থেকে বরিশালে। তাঁকে দেওয়া হলো ট্রেনিংয়ের মূল দায়িত্ব। সঙ্গে ছুটিতে থাকা বাঙালি সেনা, আর স্থানীয় পুলিশ সদস্যদের নিয়ে তিনি আগ্রহী ছাত্র-জনতাকে ট্রেনিং দিচ্ছেন বেলস পার্কের দিকে, হয়তো আরও কোথাও।

কয়েক দিন পর আমাকে পাঠানো হলো উজিরপুরের দিকে। সেখানে হাকিম ভাই এসেছেন ঢাকা থেকে। মেজর জলিলের কাছ থেকে আমাদের প্রস্তুতির জন্য একটা স্পিডবোট আর সাতটি রাইফেল পাওয়া গেছে, সেগুলো নিয়ে যাওয়া হবে পেয়ারাবাগানের দিকে। পথে আমরা এক রাত ঢামুরায়

এক পার্টি কমরেডের বাসায় রইলাম।

সেখান থেকে আমরা স্পিডবোটে গিয়ে পেয়ারাবাগানের লাগোয়া রুনসি গ্রামের রায়বাড়িতে উঠি। গ্রামের মধ্যে একটা দোতলা দালান। কিন্তু বাড়িতে লোকজন নেই। মনে হয় জীবনের ভয়ে আগেই ভারতমুখী হয়েছেন। ওখানে হাকিম ভাই ছাড়া আরও চারজন ছিলেন, আমার অচেনা; অন্য জায়গা থেকে এসেছেন। আমি সেখানে বসে বোমা বানাতে থাকি। আর তাঁরা প্ল্যান করতে থাকেন পেয়ারাবাগানে ঘাঁটি গড়ে তোলার।

৩-৪ দিন পর আমরা হাকিম ভাইসহ কয়েকজন গেলাম ঝালকাঠি শহরে। ওখানে একটা ধান মাড়াই কল ছিল। সেখানে আমার একটা বোমা ফাটিয়ে তার কার্যকরতা দেখাতে হবে। সবাই এক পাশে দাঁড়িয়ে। দূরে একটা বোমা ছুড়ে মারলাম। সেটা প্রকাণ্ড আওয়াজ করে ফাটে আর বোমার ভেতরে ঢোকানো একটা লোহার কাঠি আমার কানের পাশ দিয়ে চলে যায়।

আমাকে একটা খবর নিতে বরিশাল পাঠানো হলো। আমি বরিশালে যাওয়ার পরপরই ২৩ বা ২৪ এপ্রিল পাকবাহিনী তাদের জেট ফাইটার পাঠাল বরিশাল শহর আক্রমণ করতে। সে দুটো এসে এদিক-সেদিক কয়েকটি বোমা ফেলল। আর শহরের একটু দূরে হেলিকপ্টারে সেনা নামানো শুরু করল। মানুষ ভয়ে দ্রুত শহর ছেড়ে পালাতে লাগল।

পাকবাহিনী ঢোকার পর কোথা থেকে শহরের বাইরে নিরাপদে বের হওয়া যাবে, তা বোঝা যাচ্ছিল না। ২-৩ দিন পরই আমি আম্মাকে নিয়ে শহরের কাছে কাশিপুরের দিক দিয়ে করমজা গ্রামে মেজো ফুফুর বাড়ির দিকে যাই। আম্মাকে সেখানে রেখে একদিন পর আমি চাখারের দিকে হেঁটে রওনা দিই। ইচ্ছে ওদিক থেকে আটঘর-পেয়ারাবাগানে ঢুকে পড়া যাবে, পার্টির মানুষদের সঙ্গে যোগাযোগ হবে।

এর মধ্যে কেউ খবর দিল গৌরনদীর আগৈলঝাড়ার পর হোসনাবাদ গ্রামে মামুন ভাইদের বাড়ির দিকে আমাদের পার্টির এক গেরিলা দল কাজ করছে। সেখানে একাই হেঁটে গেলাম। গিয়ে পেলাম আমাদের দলের এক গেরিলা দলকে। ইতিমধ্যে সেখানে এক ঘটনা ঘটে গেছে। হাতবোমা বানাতে গিয়ে একজন কমরেড মারা গেছেন। সেখানে সেই গেরিলা দলে ১০-১২ জনের মতো ছিল। আমি মাত্র কয়েকদিন ছিলাম। তার মাঝে একদিন কাছে কোথাও পাকসেনা রাজাকারসহ আসছে শুনে সবাই দৌড়ে খাল পার হয়ে ঝোঁপের মধ্যে

ওত পেতে ছিলাম অনেকক্ষণ। সঙ্গে কয়েকটি মাত্র রাইফেল আর হাতবোমা। কিন্তু সেদিন কেউ আসেনি। তবে আমি ফেরত আসার কিছুদিন পর সেখান থেকে কাছে মাহিলা বাজারে পাকসেনা ও রাজাকাররা ১৭-১৮ জনের মতো সদস্য নিয়ে একটা ঘাঁটি করেছিল। আমাদের গেরিলারা এক রাতে অতর্কিত হামলা চালিয়ে ওদের সবাইকে মেরে সব অস্ত্র নিয়ে যায়।

– পেয়ারাবাগানের অভিজ্ঞতা বলুন। যুদ্ধ করেছেন?

পেয়ারাবাগানে যাওয়ার পরিকল্পনা করতে থাকি। ইতিমধ্যেই পাকবাহিনী অনেক সেনা জমায়েত করে পেয়ারাবাগান পুরোটা ঘিরে আক্রমণ করে। তখন বরিশাল অঞ্চলে এই একটি জায়গা ছিল, যাকে বলা যায় মুক্ত এলাকা। সেখানে পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের অনেক গেরিলাকে জমায়েত করে হাকিম ভাই শক্ত ঘাঁটি বানিয়েছেন। এখানে উল্লেখ্য, ওই এলাকাতে ৪৮ বর্গকিলোমিটারে ৩২টি গ্রাম ছিল, যাদের প্রায় সবাই হিন্দু ধর্মাবলম্বী। তাদের মূল অর্থকরি ফসল পেয়ারা। চারদিক থেকে শুধু নদী আর খালে ঘেরা, নৌকাই একমাত্র চলাচলের বাহন। খাল থেকে ভেতরে দু-তিন হাত ফাঁকে ফাঁকে ছোট ছোট ড্রেনের মতো ঢুকে গেছে। ভেতরের সেই লম্বা ফালি ফালি ভূমি কিছুটা উঁচু করে তার ভেতরে ৪-৫ হাত দূরে দূরে পেয়ারাগাছ লাগানো হয়েছে। জোয়ারভাটা হয় বলে ভাটার সময় ছোট খালে নৌকাও ঢুকতে পারে না। পেয়ারা ছাড়া ফাঁকে ফাঁকে কলাগাছ, আমড়াগাছ। বাড়িঘরের উঠানে, চালের ওপর নানা ধরনের সবজি করে তারা। সেসব বিক্রি করেই তাদের সারা বছর চলতে হয়।

পাকবাহিনী প্রথমে গানবোট নিয়ে চারদিকে টহল দিতে থাকে। এক সন্ধ্যায় হাকিম ভাইয়ের নেতৃত্বে কিছু গেরিলা একটা গানবোটে আক্রমণ করে। হঠাৎ আক্রমণ আর সাঁতার না জানা থাকায় ওরা সুবিধা করতে পারেনি। সবাই মারা যায়। গেরিলারা কিছু অস্ত্র পায়।

কয়েক দিন পর আরও সৈন্য এসে গেলে তারা আশপাশের রাজাকার, এবং ভয় দেখিয়ে পার্শ্ববর্তী গ্রামের কিছু মানুষকে বাধ্য করে দা-কুড়োল-কাঁচি নিয়ে আগে আগে গিয়ে পেয়ারাবাগান কাটতে, আর তারা পিছে পিছে অগ্রসর হয়। হাকিম ভাই বুঝতে পারেন আধুনিক অস্ত্র নিয়ে এগোনো এই বিরাট বাহিনীর সঙ্গে পারা যাবে না, সবাই মারা পড়বে। তাই স্থানীয় মানুষজন এবং ছোট ছোট গেরিলা ইউনিটকে জানালেন রাতের অন্ধকারে বেরিয়ে দূরে

নিরাপদ এলাকায় চলে যেতে। গেরিলা দলগুলোর কাজ হবে ঘাঁটি করার মতো জায়গায় গিয়ে গেরিলা কায়দায় লড়াই চালিয়ে যাওয়া। তিনিও এক রাতে তার স্ত্রীকে নিয়ে সেভাবে পালিয়ে অনেক পথ ঘুরে ঘুরে ঢাকায় আসতে পেরেছিলেন। তবে যাওয়ার সময়ে তাদের ৮-৯ মাসের ছেলেটাকে পাশের গ্রামের এক গরিব পরিবারের কাছে রেখে আসেন। অত ছোট বাচ্চাকে নিয়ে পালানো সম্ভব ছিল না। সেই ঘরের এক গরিব মা শিশুটিকে নিজের বুকের দুধ খাইয়ে রাখবে যত দিন না তাকে আনা যায়।

কয়েকদিন পরেই চাখারে ঢাকা থেকে এক কমরেড এসে হাজির। তাকে হাকিম ভাই পাঠিয়েছেন আমাকেসহ পেয়ারাবাগানে ঢুকে তাঁর রেখে আসা বাচ্চাটিকে ঢাকায় নিয়ে যাওয়ার জন্যে। সঙ্গে সঙ্গেই রওনা হয়ে গেলাম। অনেক পথ হেঁটে গ্রামের মানুষদের জিজ্ঞেস করে করে পেয়ারাবাগানে ঢুকে পড়ি। দেখি, আগুনে পোড়া একের পর এক বাড়ি, মানুষজন বলতে গেলে নেই। একেক গ্রাম পার হতে হতে আর জিজ্ঞেস করে করে সেই গ্রাম আর সেই বাড়ি খুঁজে পেলাম। সেই বাড়ির গরিব মহিলা বাচ্চাকে নিজের বুকের দুধ খাইয়ে রেখেছে। সে আমাদের কাউখালী যাওয়ার পথ বলে দেয়। সেখানে সন্ধ্যার পরে হুলারহাট থেকে ঢাকায় যাওয়ার লঞ্চ এসে থামে, তাতে উঠে ঢাকায় যাওয়া যাবে। সেই বাচ্চাকে নিয়ে আমরা সেভাবে লঞ্চে করে ঢাকায় আসি পরের দিন খুব সকালে এবং উনাদের তখনকার লালবাগের ভাড়া বাসায় পৌঁছে দিই।

এরপরই আমাকে আবার পাঠানো হয় দক্ষিণ অঞ্চলে, পিরোজপুর আর বাগেরহাটের মাঝে তুষখালীতে। সেখানে এক বাড়িতে আছে আমাদের কমরেড এবং প্রধান কমান্ডার সেলিম শাহনেওয়াজ ভাইয়ের স্ত্রী মিনু। মিনু হুমায়ুন কবির আর ফিরোজ কবিরের বোন। মিনুও আমাদের কমরেড।

সেখানে একদিন থেকে পরের দিন বিকেলের দিকে মিনুকে নিয়ে লঞ্চে উঠে গেলাম ঢাকার পথে। পরদিন সকালে ঢাকায় লঞ্চ থেকে নেমে মিনুকে ঠিকানামতো পৌঁছে দিলাম।

এরপরেই আমাকে আরেক কাজ দিয়ে পাঠানো হয় একসময় জিলা স্কুলে আমার সহপাঠী আজিজুল হকের (হিরু) জায়গা, মঠবাড়িয়ায়। সে পার্বত্য চট্টগ্রামের বান্দরবানে গিয়েছিল এবং পেয়ারাবাগানে এক গ্রুপের নেতৃত্ব দেয়। আমাদের স্কুলের এক শিক্ষকের ছেলে, দেখতে বেশ হ্যান্ডসাম,

সাহসী। সে একাই নেতৃত্ব দিয়ে একদল গেরিলাসহ পেয়ারাবাগান থেকে মঠবাড়িয়া এলাকায় চলে যায় এবং সেখানে ঘাঁটি গাড়ে এবং অল্পদিনের ভেতরেই ৬টি গেরিলা ইউনিট বানিয়ে ফেলে।

হিরুকে পরামর্শের জন্য ঢাকায় ডেকে পাঠানো হয়, আর সাময়িকভাবে তাঁর জায়গায় আমাকে দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়। আমি অল্প কয়েকদিন ছিলাম। সেখানে গিয়ে আমার ভিন্ন নাম ধারণ করতে হয়, হাফিজ। মানুষ ডাকে কমান্ডার হাফিজ নামে। ইতিমধ্যে স্থানীয় পর্যায়ে সরকারি প্রশাসনের অনুপস্থিতিতে গ্রামে লুট, ডাকাতি, ধর্ষণ ইত্যাদি অনেক বেড়ে যায়। পার্টি থেকে নির্দেশ আসে এদের কঠোরভাবে দমন করতে। আমি যাওয়ার পর আমাদের স্থানীয় এক কমরেড খবর আনে যে একটা বাড়িতে কয়েকজন ডাকাত টাইপের লোক আজ রাতে জমায়েত হয়ে খাওয়াদাওয়া করে ডাকাতিতে বেরোবে। শুনে কাছে থাকা দুটি গেরিলা ইউনিটকে পাঠালাম ওদের ধরে আনতে।

তখন রাত নয়টা। তারা গিয়ে চারজনকে পেল। পরে আরও কয়েকজনের আসার কথা ছিল, কিন্তু আমাদের উপস্থিতি টের পেয়ে আর আসেনি। চারটি মুরগি জবাই হয়েছে, রান্না শুরু হতে যাচ্ছে। সেসব খেয়েদেয়ে ওরা রাত ১২টার দিকে বেরোবে। ওই চারজনকে ধরে আনা হলো। আমরা ওদের জিজ্ঞাসাবাদ করলাম। কোনো কিছু স্বীকার করে না। আমাদের কাছে একটা পুলিশি হান্টার ছিল। সেটা দিয়ে ওদের বেদম মার শুরু হলো। এতে কাজ হলো। ওরা স্বীকার করল কোন কোন বাড়িতে ওরা ডাকাতি, লুট আর ধর্ষণ করেছে। আর কোন বাজার বা হাটে ডাকাতি করেছে। দেখা গেল, এদের দুজন অনেক দুষ্কর্মে জড়িত। আর বাকি দুজন নতুন জড়িয়েছে। আমাদের তো আর তখন জেলখানা নেই যে অল্প অপরাধে জেল দেওয়া হবে। খুব বেশি অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ড, অন্যদের পিটিয়ে ছেড়ে দেওয়া, এই দুই প্রকারের শাস্তি আমাদের হাতে ছিল। তাই রায় হিসেবে ওদের দুজন বেশি অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হলো, আর কম অপরাধী দুজনকে পিটিয়ে ছেড়ে দেওয়া হলো।

মৃত্যুদণ্ড বাস্তবায়নের জন্য সর্বশেষ যে বাজারে ওরা কারফিউ দিয়ে ডাকাতি করেছে, ওদের সেই বাজারে নেওয়া হলো। যারা দোকানে ঘুমিয়ে ছিল তাদের ডেকে তুলে দেখানো হলো, এরাই সেই ডাকাত, তাই মৃত্যুদণ্ড

দেওয়া হবে। রাত তখন প্রায় দুইটা। পাশেই খাল, সেখানে নিয়ে কুপিয়ে মেরে ফেলা হলো সবার সামনে। তারপরে তাদের মাথা কেটে বাজারের দুপাশে গাছে ঝুলিয়ে বড় পোস্টারের মতো কাগজে মাও সে তুংয়ের 'মনোযোগ দেওয়ার ৮টি ধারা', যেমন চুরি, ডাকাতি করা যাবে না, ফসল নষ্ট করা যাবে না, নারীদের সঙ্গে অশোভন আচরণ করা যাবে না ইত্যাদি লিখে লাগিয়ে দেওয়া হলো। এতে কাজ হয়েছিল ভালো। কীভাবে যেন এ কথা ঝড়ের বেগে ছড়িয়ে পড়ল, এদিকে নকশালরা এসেছে। কেউ অন্যায় করলেই মেরে ফেলা হবে। তাই ওই অঞ্চলে সব লুট, ডাকাতি, ধর্ষণ বন্ধ হয়ে গেল!

হিরু চলে এল কয়েক দিন পর। আমি ওকে দায়িত্ব বুঝিয়ে ফেরার পথেই শুনলাম ভারত থেকে আসা স্থানীয়দের নিয়ে গঠিত একদল 'মুক্তিযোদ্ধা' হিরুকে মেরে ফেলেছে। সেই লাশ পাওয়া যায়নি।

আমি চলে আসি বরিশালের পাদ্রিশিবপুরে, যেখানে মাসুম আর মাহবুব নামে দুই ভাই ঘাঁটি গেড়ে আছেন। ছোট ভাই মাহবুব আমার চেয়ে ৪-৫ বছরের বড় হবে। মাসুম ভাই তার চেয়ে বছর দুই বড় হবেন। দুজনই খুব ভালো মানুষ হিসেবে পরিচিত। শহরের এক ভালো উকিলের ছেলে তাঁরা ওখানে গিয়ে আরও কিছু তরুণ, পুলিশ, সেনাবাহিনী থেকে পালিয়ে আসা কিছু সদস্যকে নিয়ে গেরিলা দল বানিয়ে ঘাঁটি গেড়েছেন। পাদ্রিশিবপুর আসলে খ্রিষ্টান-অধ্যুষিত এলাকা। পুরো গ্রামেই তাদের সম্প্রদায়ের বাস। এখানে তাদের গির্জা, স্কুল আছে। আমরা ভাগ ভাগ করে খ্রিষ্টান বাড়িতে থাকি। ওদের খাবার খাই।

এরপর ঢাকা থেকে আমার ডাক আসে। আমি ফেরত যাওয়ার পথেই শুনলাম ভারত থেকে নতুন আগত একটা দল মাসুম ভাইকে কৌশলে ফাঁদে ফেলে আক্রমণ করে মেরে ফেলেছে। সঙ্গে আরেকজন, অনেক ভালো আর সাহসী কমরেড শেখরদাকে মারা হয়। মাহবুব ভাই ও অন্যরা বেঁচে যান, তবে গেরিলা দলসহ একটু বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন।

– ঢাকায় কী করলেন? সিরাজ সিকদারের সঙ্গে দেখা হয়েছিল?

তখন হাকিম ভাই সেখানে গোপনে থেকেই সারা দেশের গেরিলাদের কাজের সমন্বয় করতেন। তিনি অপরিচিত মুখ ছিলেন, থাকতেন লালবাগের দিকে এক আধা-বাঙালির বাসায় ভাড়া নিয়ে, স্ত্রী-বাচ্চাসহ। কেউ তাঁকে

সন্দেহ করত না। আর হাতে গোনা কয়েকজন বিশ্বস্ত নেতা-কর্মীর সে বাসার ঠিকানা জানা ছিল। তখন পর্যন্ত তিনি আমায় অনেক স্নেহ করতেন, ভালোবাসতেন। আমাকে বাসার ঠিকানা দিয়েছেন, আর বিশেষ কাজে নানা জায়গায় খবরাখবর নিতে কাজে লাগাতেন।

এরপর নতুন একটা দায়িত্ব দিলেন। এক জ্যেষ্ঠ কমরেড, মনে হয় শুরু থেকেই পার্টিতে আছেন, সেই রানা ভাইয়ের সঙ্গে ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ের দিকে কোনো এক জায়াগায় যেতে। সেখানে আগে থেকেই আমাদের কিছু কমরেড কাজ করছেন। আমার কাজ ছিল তাঁকে পৌঁছে দিয়ে আসা। আমরা ট্রেনে করে গফরগাঁওয়ের পরে সেনবাড়ি স্টেশনে নেমে যাই। হেঁটে এক বাড়িতে উঠি। সেখানে আমি রানা ভাইয়ের সঙ্গে দু-একদিন থেকে ঢাকায় চলে আসি।

ঢাকায় এসে কয়েকদিন থেকে নতুন নির্দেশনা না পেয়ে বরিশালের চাখারে যেতে মনস্থ করি, অক্টোবরের শেষ বা নভেম্বরের শুরুতে। পার্টির নেতারাও চারদিকে প্রতিপক্ষের হামলা এবং অনেক নেতা-কর্মী মারা যাওয়ায় কিছুটা বিধ্বস্ত। পাকবাহিনী চাখার গ্রামে কোনো হামলা করেনি। তখন সেটা নিরাপদ আশ্রয় ছিল। ৮ ডিসেম্বর পাকবাহিনী বরিশাল ছেড়ে ঢাকার দিকে চলে যায় নৌপথে। আমি বরিশাল গিয়ে বাসায় উঠি। আমার মা-বাবা তখন সেখানেই ছিলেন।

– যুদ্ধশেষের কাহিনি বলুন।

এর পরের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত। স্বাধীনতার পর আমি বরিশালে এসে কলেজে যাওয়া শুরু করলাম। পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। কিন্তু আমার একধরনের উপলব্ধি হতে লাগল, আমি যেখানেই গেরিলা বাহিনীতে গিয়েছি, যেমন বিশেষ করে মঠবাড়িয়া এবং পাদ্রিশিবপুর, একটা জিনিস লক্ষ করেছি, আমাদের সাথে স্থানীয় গণমানুষের বিচ্ছিন্নতা। আমরা যে গরিব শ্রমিক-কৃষকের কথা বলতাম বাস্তবে তাদের সাথে তেমন কোনো সংযোগ ছিল না, তাদের অংশগ্রহণ ছিল না। দেখা যেত আমরা কিছু শহুরে কিশোর-যুবক একেকটা এলাকায় গিয়ে গেরিলাযুদ্ধ করে দেশ স্বাধীনের চেষ্টা করেছি। কিন্তু এই অল্প কিছু কিশোর-যুবকের প্রচেষ্টায় গণমানুষের অংশগ্রহণ ছাড়া ওইসব অস্ত্র দিয়ে কি স্বাধীনতা সম্ভব হতো? স্থানীয় মানুষদের, বিশেষ করে কৃষকদের সংগঠিত করা তো দূরের কথা, তারা আমাদের কেন যেন ভয় পেত,

সন্দেহের চোখে দেখত।

সে সময় বরিশালে মনির ভাইয়ের (মনিরুল ইসলাম খান) সাথে পরিচয় হয়। তিনি ছাত্রলীগের মধ্যে সমাজতন্ত্রের সমর্থক, মার্কসবাদ পড়েন, পরে জাসদ রাজনীতিতে যোগ দেন। তাঁর পিতা ছিলেন ভাসানী ন্যাপের নেতা। অনেক সাদাসিধা চলেন তাঁরা। তাঁদের সদর রোডের বাসায় নানা দেশের স্বাধীনতা আর বিপ্লবী আন্দোলনের বই ছিল। আমি, মাহবুব ভাই আর মনির ভাই প্রতি সন্ধ্যায় অনেক আড্ডা দিই, রাজনীতি নিয়ে কথা বলি। আর মনির ভাইয়ের বাসা থেকে অনেক বই নিয়ে বাসায় ফিরে রাত জেগে পড়াশোনা করি। এসব পড়াশোনার মাধ্যমে আমার মনের মধ্যে একটা জিজ্ঞাসা তৈরি হয়, আমরা কি বাস্তববাদী, নাকি আবেগী?

পার্টি থেকে সে সময়ে কিছুটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি। মাঝে মাঝে দেখি পার্টি ক্যাডাররা দেয়াল চিকা মারছে সরকারের বিরুদ্ধে, ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের বিরুদ্ধে। তাদের ধারণা, পাকিস্তানকে হটানোর মাধ্যমে ভারত এখন আমাদের শাসন-শোষণ শুরু করেছে, পাকিস্তানের জায়গা ভারত নিয়েছে। তাই এখনই এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করতে হবে। আরও একটা স্লোগান দেওয়া হয়, সিরাজ সিকদার লাল সালাম। এটা যেভাবে এগোয়, তাতে আমার মনে হয় ব্যক্তিপূজার মতো কিছু হতে যাচ্ছে।

– আপনি কি দল ছেড়ে দিলেন?

আমি সাহস করে তখন হাকিম ভাইকে একটা চিঠি লিখি। তিনি আমাকে অনেক স্নেহ করতেন বলে আমি অনেক ছোট মাপের কর্মী হলেও সেই সাহস ছিল। আমি আমার মনের কথা সব জানালাম, প্রশ্ন করলাম, এভাবে কি সম্ভব? এমনকি ব্যক্তির নামে স্লোগানের প্রশ্নও তুললাম। কিন্তু তিনি চিঠিটি সহজভাবে নিতে পারেননি। আমি শুনেছি তিনি আমার ওপর খুব ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন।

এছাড়া পার্টিতে তাহের ভাই, মুজিব ভাই, মাসুম ভাই ছাড়াও কিছু জ্যেষ্ঠ নেতা মারা যাওয়ায় ধীরে ধীরে সব সিদ্ধান্ত যেন হাকিম ভাইয়ের একার নিতে হচ্ছিল। ফলে পার্টিতে গণতন্ত্রহীনতা এবং এক ব্যক্তির নেতৃত্ব কায়েম হয়ে গেল। শহরে আমার এক বছরের কনিষ্ঠ দুটো ছেলে যারা চিটাগাং গিয়েছিল, একজনের বাবা আবার আওয়ামী লীগের নেতা ছিলেন। ওরাও পার্টি ছেড়ে দেয়। কিন্তু ওরা নাকি সরকারি ছাত্রসংগঠনের সাথে যোগাযোগ করে এবং

পার্টির ক্ষতি করতে চায়। এসবই শোনা কথা। ওদের সাথে আমার দেখা হতো না। ওরা অন্য পাড়ার ছেলে। হঠাৎ একদিন দিনের বেলায় ওদের ওপর হামলা করে মেরে ফেলা হয়।

এর কিছুদিন পর পার্টির গেরিলা কমান্ডার সেলিম শাহনেওয়াজ ভাই এলেন। আমার সাথে দেখা করে জানালেন তাঁরা পার্টি লাইন পছন্দ করছেন না, দ্বিমত আছে। কিন্তু তাঁদের কী ভিন্নতা, তা এখন আর মনে নেই। তাঁর স্ত্রীর বড় ভাই হুমায়ুন কবির ভাই তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের লেকচারার, ভালো কবিতা লেখেন বলে পরিচিত হয়ে উঠছেন। বিয়ে করেছেন আমাদের এক সময়ের প্রতিবেশী রেবু আপাকে। হুমায়ুন ভাইও সেলিম ভাইয়ের মতো একই ভাবনা ভাবছেন। আমি শুধু শুনে যাই। খারাপ লেগেছে, পার্টির মধ্যে এই বিভাজনের সম্ভাবনা দেখে। কিন্তু তাঁকে কোনো কথা দিতে পারিনি। তিনি ঢাকা থেকে এসেছেন, পাথরঘাটা বাড়ির দিকে যাবেন। আমি বলি, ফেরার সময় আবার আলাপ হবে। কিন্তু তিনি যাওয়ার দু-তিন দিন পরই শুনি তাকে ঝালকাঠির ওখানে কোথাও আলোচনার কথা বলে ডেকে মেরে ফেলা হয়েছে।

এদিকে কয়েক দিনের মধ্যে হুমায়ুন কবির ভাইয়ের ওপর ঢাকায় হামলা করে তাঁকেও মেরে ফেলা হলো। এসব হত্যাকাণ্ড আমার একেবারেই পছন্দ হয়নি। বরং খুব খারাপ লেগেছে। মনে হয়েছে ভিন্ন মত থাকলেই কি মেরে ফেলতে হবে? এ কেমন গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা? সেসব নিয়ে আলাপ করার মতো কেউ আমার আশপাশে ছিল না, মাহবুব ভাইয়ের সাথে মাঝেসাঝে কিছু কথা বলা ছাড়া। তবে তিনিও মাসুম ভাইয়ের মতো অত সিরিয়াস রাজনৈতিক ভাবনা ভাবতেন বলে মনে হয়নি। এমন সময়ে শুনলাম আমি পার্টি ছেড়ে দেওয়ায় আমার ওপরও হামলা হতে পারে। আমি কিন্তু তখনো অন্য কোনো দলে যোগ দিইনি। শুধু বইপড়া, আর পান্না ভাই, মাহবুব ভাই, জাসদ ছাত্রলীগ করে এমন দুই নেতা, বিএম কলেজের ছাত্র সদরুল ভাই, নজরুল ভাইয়ের সঙ্গে আলোচনা। দুজনই খুব ভালো মানুষ এবং জাসদ ছাত্রলীগের একনিষ্ঠ নেতা ছিলেন। আমার সাথে রাজনৈতিক আলোচনা হতো কখনো কখনো। কিন্তু ১৯৭৩ সালের শেষের দিকে আওয়ামী লীগের কয়েকজন রক্ষীবাহিনীর সহায়তায় এক রাতে তাদের ছাত্রাবাস থেকে তুলে নিয়ে, আরেক জাসদ কর্মী সমরেশ দাসহ শহরতলির এক মন্দিরে নিয়ে

হত্যা করে লাশ ফেলে রাখে। আমার জীবনেরও শঙ্কা দেখা দেয়। একদিকে সর্বহারা ক্যাডার, অন্যদিকে এই সব মুজিববাদী ক্যাডার, দুদিক থেকেই আমার বরিশাল থাকা খুব অনিরাপদ হয়ে যায়।

ইতিমধ্যে আমি কোনোমতে প্রথম বিভাগেই এইচএসসি পাস করে ফেলি। পরিবারের ইচ্ছা আমি ঢাকায় গিয়ে বুয়েটে পড়ি, ইঞ্জিনিয়ার হই। কিন্তু আমার বরিশাল ছাড়ার ইচ্ছা ছিল না। মার্কসবাদ ভালোভাবে বুঝতে হবে, তার জন্যে অর্থনীতি বিষয়ে জানা খুব দরকার। সেসব চিন্তা করে আমি বরিশাল বিএম কলেজেই অর্থনীতিতে অনার্সে ভর্তি হয়েছিলাম। তখন বিএম কলেজে এই বিষয়ে অনার্স কোর্স মাত্র খোলা হয়েছে। যদিও রাত জেগে জেগে রাজনীতির বই বেশি পড়তাম। এক রাতে পুলিশ আসে বাড়িতে। আমাদের বাড়ি কানাগলির শেষ মাথায়, তিন দিকে দেয়াল আর পেছনের দিকে ছোট খাল। পার হলেই আমার এক দূরসম্পর্কে মামার বাসা। পুলিশ দেখেই আমার আব্বা, আম্মা, ভাই, বোনেরা বুঝতে পারে টার্গেট আমি। আব্বা দরজা না খুলে ভেতর থেকে তর্কে লেগে যান, এত রাতে এসেছেন কেন, জানেন না এটা ভদ্রলোকের বাসা? যান, সকালে আসেন। ওরাও বাইরে থেকে হুমকি দিতে থাকে।

এদিকে আমার বোনেরা আমাকে শাড়ি পরিয়ে দেয়। আমি পেছন দিকে খালের কিনারায় আমাদের বাইরের পাকা পায়খানার দিকে হাতে একটি বদনা নিয়ে যাই, উদ্দেশ্য ওরা কেউ দেখলে ভাববে মহিলা কেউ টয়লেটে যাচ্ছে। সেটি প্রায় ২০-২২ ফুট দূরে, উঠোন পেরিয়ে খালের কিনারায় গিয়েই তার ওপর এক সুপারিগাছ ফেলে সাঁকো করা ছিল; সেটি পেরিয়ে ওপারে চলে যাই। সব বাসার ভেতরে উঠোনে নানা রকম গাছপালা। তাই মাঝরাতে সবকিছু পরিষ্কার দেখাও যায় না। আমি গিয়ে মামার বাসার লোকদের আস্তে করে ডেকে তুলি। আশ্রয় পেয়ে যাই। ভোর রাতে বের হয়ে বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে বাসে চড়ে গৌরনদীর দিকে গিয়ে এক আত্মীয়ের বাড়ি, ভাষা আন্দোলনের নেতা কাজী গোলাম মাহাবুব সাহেবদের বাসায় উঠি। তিনি অবশ্য ঢাকায় থাকতেন। কিন্তু তাঁর ভাইয়ের ছেলেমেয়েরা সেখানে থাকে। সেখানে এক রাত কাটিয়ে লঞ্চে ঢাকা চলে আসি চুয়াত্তরের শুরুতে।

এদিকে আমি চলে যাওয়ার পর আমার আব্বা দরজা খুলে দেন। আমাকে তন্ন তন্ন করে খোঁজা হয়। না পেয়ে পুলিশ সন্দেহ করে, আমাকে পালিয়ে

যাওয়ার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। তাই রাগে আমার আব্বাকে অ্যারেস্ট করে থানায় নিয়ে যায়। সেখান থেকে নেয় জেলে। আমার আব্বা প্রথম জীবনে সরকারি চাকরিতে থাকলেও সে সময় শহরে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করতেন। তখন শহরে বেশ পরিচিত হয়ে উঠেছেন ভালো চিকিৎসক হিসেবে। তাঁর গ্রেপ্তার শহরে আলোচনার জন্ম দেয়। নানা মহলের চেষ্টা ও সহায়তায় ২-৩ দিন পর তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

আমি ঢাকায় এসে মোহাম্মদপুরে বড় বোনের বাসায় উঠি। ভর্তি না হয়েই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগে গিয়ে ক্লাস করতে থাকি। ভর্তি অনেক আগে শেষ হয়ে গেছে। ৩-৪ মাস আগে ক্লাস শুরু হয়েছে। তাই ভর্তির আর সুযোগ নেই। আমার পরিচিত নেতাগোছের কেউ নেই যে আমাকে সাহায্য করবে। নানা ভাবনার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের চেয়ারম্যান ড. এম এন হুদার সাথে দেখা করে সরাসরি আবেদন জানাই। আমার কথা শুনে তিনি মার্কশিট দেখতে চান। পরদিন মার্কশিট নিয়ে গেলে তা দেখে তাঁর সহানুভূতি হয়। তাঁর সহৃদয় বিবেচনায় অর্থনীতিতে ভর্তির সুযোগ হয়। তারপর সর্বহারা পার্টির সাথে আর কোনোদিন যোগাযোগ হয়নি।

আরিফ

আমি তখন মোহনগঞ্জে টিইও, থানা এডুকেশন অফিসার। তখন তো আমি যুবক।

– এটা কোন সালে?

১৯৭০ সালের দিকে। ওই সময় মোহনগঞ্জ কলেজে পার্টটাইম শিক্ষকতাও করেছি। কলেজ তখন নতুন। সেখানে শিক্ষকদের মধ্যে আরও ছিলেন মোজাম্মেল এবং গোলাম মোস্তফা। তারা পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় সদস্য। আগে ছাত্র ইউনিয়নের সাথে যুক্ত ছিল। কলেজে মাস্টারি করার সাথে সাথে বাম রাজনীতিও করে। হক-তোয়াহার গ্রুপ করত। মানে পিকিংপন্থী।

আমি ছাত্র ইউনিয়ন করেছি আনন্দমোহন কলেজে পড়ার সময়। ময়মনসিংহে ছাত্র ইউনিয়ন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আমরাই প্রথম উদ্যোগ নিয়েছিলাম। আমাদের মধ্যে ছিল বজলুল করিম আকন্দ, আবদুর রশিদ, আতায়ের আরিফ, আইয়ুব রেজা চৌধুরী। প্রথমে তো আমরা মস্কোপন্থী। ১৯৬৭ সালের দিকে আমরা পিকিংপন্থী হলাম।

মোহনগঞ্জ কলেজের ওই দুজন শিক্ষক আমাকে তাদের পার্টিতে লিংক করানোর চেষ্টা করল। ব্যক্তিগত পরিচয়ের সুবাদে লিংকও হয়ে গেল। সক্রিয়ভাবে না হলেও মোটামুটি। মোহনগঞ্জ হলো ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোনা মহকুমার একটা থানা। ছোট এলাকা। রাজনীতি করার সুযোগ এমনিতেই কম, বিশেষ করে বাম রাজনীতি। কথা বলারও লোকের অভাব। ওরা দুজন বন্ধু হয়ে গেল। কয়েক মাস তাদের সাথে কাজ করলাম।

ওই সময় পশ্চিম বাংলায় নকশাল আন্দোলন বেশ চরম পর্যায়ে। তাদের সাথে এদের লিংক। নকশালদের একটা পত্রিকা ছিল, *দেশব্রতী*। তারা এটা

নিয়মিত আনত। আমি *দেশব্রতী* পড়তাম। নিয়মিত বৈঠক-টৈঠক হতো।

এর মধ্যে নতুন একজন টিচার এল, মাহমুদুল আমিন। ইংরেজির টিচার। সে ময়মনসিংহের লোক। আনন্দমোহন কলেজের ছাত্র ছিল, আমাদের জুনিয়র। সে ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে অনার্স, মাস্টার্স পাস করে এসেছে। সিরাজ সিকদারের পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের সাথে তার লিংক ছিল। তার সাথে আমার যোগাযোগ হলো।

শ্রমিক আন্দোলন তখন কট্টর গোপন সংগঠন। এ পরিচয় আমার কাছে দেওয়া তার জন্য রিস্কি। এমনকি মোজাম্মেল বা গোলাম মোস্তফার কাছেও পরিচয় দেওয়াতে রিস্ক আছে। কারণ পিকিংপন্থী গ্রুপের মধ্যে তো দলাদলি আছে। রেষারেষি আছে। যদিও গলাকাটা তখনো শুরু হয়নি।

আমি তো রাজনীতিপিয়াসী। লাইন খুঁজছি। বিপ্লব করা দরকার। এটা জরুরি। এটা কীভাবে কোন লাইনে করা যায়? ছাত্রজীবন থেকে মার্কসবাদ চর্চা করে আসছি।

কথাবার্তা বলার সময় মাহমুদুল আমিনকে পজিটিভ মনে হলো। সাদামাটা বাস্তব কথা। আমরা পাকিস্তানের উপনিবেশ, এটা প্রধান সমস্যা। এভাবেই সে কথা বলত। আসলে পাকিস্তানি উপনিবেশবাদ তো আমাদের প্রধান সমস্যা। এই সমস্যার প্রেক্ষাপটে আমাদের সংগ্রাম তো জাতীয় সংগ্রাম, শ্রেণিসংগ্রাম না। বিষয়টা আমাকে আকর্ষণ করল। বিষয়টা তো একটু ভিন্ন রকমের। ১৯৭০ পর্যন্ত এ দেশের কোনো রাজনৈতিক সংগঠন কখনো জাতীয় বিপ্লব বা জাতীয় মুক্তির প্রসঙ্গ তোলেনি। শুধু শ্রেণিসংগ্রাম আর সমাজতন্ত্র। সমাজতন্ত্রের আরেকটা নাম দেওয়া হয়েছিল, জনগণতন্ত্র।

মাহমুদুল আমিনের কথা নতুন মনে হলো। সিরাজ সিকদারের সাথে যে তার লিংক আছে, এটা সে তখনো বলেনি। আমি যখন আগ্রহ দেখালাম, তখন সে বলল। শ্রমিক আন্দোলনের থিসিস তার কাছ থেকেই প্রথম পেলাম। ওই সময়ের জন্য এটা খুবই পজিটিভ মনে হলো। ইতিহাস তো অত পড়া নেই। সব তো ভাসা-ভাসা পড়া। উপমহাদেশের রাজনীতি নিয়ে তখনো কোনো ব্যাপক সিদ্ধান্ত নেই। এলোমেলো পড়াশোনা আরকি।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ হয়েছিল। পূর্ব বাংলা আর আসাম নিয়ে আলাদা প্রদেশ হয়েছিল। এটা আবার বাতিল হলো। তৈরি হলো টানাপোড়েন। অন্য বামপন্থীদের তুলনায় আমার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল একটু আলাদা। বঙ্গভঙ্গকে

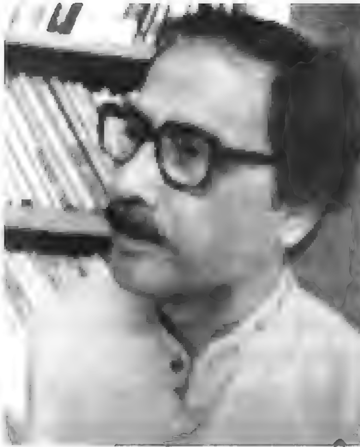
আমার পজিটিভ মনে হতো। তখন তো এটা শুধু ব্রিটিশদের নিয়ে সংকট না। আরও সংকট আছে। ব্রাহ্মণ্যবাদী সংকট আছে, এখন যেটা হিন্দুত্ববাদ। হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা একটা বড় সংকট। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মধ্যে একটা বড় অংশ হলো মুসলমান সম্প্রদায়। তাদের ওপর যে নিপীড়ন হয়, এটা জানতাম। এই প্রেক্ষাপটে বঙ্গভঙ্গ সমর্থন করতাম। এটা যেভাবেই হোক রদ হলো ১৯১১ সালে। এই যে ভূখণ্ড, পূর্ব বাংলা, আমার জন্মস্থান এবং আমাদের ধর্ম, সংস্কৃতি, বাঙালিত্ব সব মিলিয়ে ছোট হলেও এটা আলাদা একটা ইউনিট, এরকম ফিল করতাম।

সাতচল্লিশ সালের পর পাকিস্তানের সাথে যখন যুক্ত হলাম, তখনো দেখলাম, এ অঞ্চলের মানুষ তার নিজস্ব সংস্কৃতিকে গুরুত্ব দেয়। সেই সুবাদে পূর্ব বাংলা একটি জাতিসত্তা। ভাসা-ভাসা ধারণা নিয়ে ভাবলাম, এটাই সঠিক লাইন। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড যদি এই ভূখণ্ডে করতে হয়, তাহলে জাতীয় মুক্তির কথা আসবে।

এর মধ্যে চলে এল একাত্তর। মাহমুদুল আমিনের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। তখন তো লন্ডভন্ড অবস্থা। অন্যান্য পার্টির সাথে তো আমার কোনো যোগাযোগ নেই। মাহমুদুল আমিনকে খুঁজে পাওয়ার কোনো কায়দা নেই। বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম। এভাবেই গেল নয় মাস।

১৬ ডিসেম্বরের পর ময়মনসিংহ শহরে বিজয় মিছিল চলছে, মহাপ্লাবন। এর মধ্যে কিছু তিক্ত স্মৃতিও কাজ করেছে। এটা ছিল একটা বাস্তব অভিজ্ঞতা, বিহারিনিধন। ২৫ মার্চের পর ময়মনসিংহ শহর এক সপ্তাহ মুক্ত ছিল। নদীর পারে ছিল ইপিআর ক্যাম্প, এখন যেটা ক্যান্টনমেন্ট। সেখানে জনগণের আক্রমণ হলো। তখন তো স্বতঃস্ফূর্ত জনগণ। হাজার হাজার মানুষ ঘেরাও করল। আমরাও গেলাম। একটা দৃশ্য চেয়ে চেয়ে দেখলাম। তাদের হত্যা করা হলো। নারী-পুরুষ-শিশু সবাইকে। এরপর যা ঘটল, বিহারি কলোনিতে নারকীয় হত্যাযজ্ঞ। আমার ওয়াইফ, প্রথম স্ত্রী, আন্ডারগ্রাউন্ডে থাকাকালে মারা গেছে, তার এক বান্ধবী ছিল বিহারি। তারা আনন্দমোহন কলেজে এক সাথে ফার্স্ট ইয়ার অনার্সে পড়ত। সে দৌড়ে গেল তার বান্ধবীকে বাঁচাতে। সেখানে গিয়ে যে দৃশ্য দেখল, মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সে মুক্তিযুদ্ধ এবং মুক্তিযোদ্ধা ফোবিয়াতে ভুগেছে।

যুদ্ধ হলো নয় মাস। এর মধ্যে অনেক বিতর্কিত ব্যাপার আছে। যদিও বিচ্ছিন্ন



রইসউদ্দিন আরিফ

ছিলাম, তবু যতটুকু জেনেছি, নিজেই একটা অ্যানালাইসিসের চেষ্টা করেছি।

ওই সময় শহিদ মাস্টারের সাথে দেখা। আমরা আগে থেকেই পরিচিত। শহিদ মাস্টার একসময় আনন্দমোহন কলেজের ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র ছিল। ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে ইংরেজিতে মাস্টার্স করে শ্রমিক আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়েছিল। শহিদ মাস্টারের টার্গেট হলো আমাকে তাদের পার্টিতে নিয়ে আসা। সে জানে না যে, মাহমুদুল আমিনের সাথে আগেই আমার যোগাযোগ হয়েছিল। বিসমিল্লাহ রেস্টুরেন্টে চা খেতে খেতে বিহারি হত্যা সম্পর্কে সে আমাকে বলল, 'দেখলেন, কেমন কাণ্ডটা ঘটল?' বললাম, হ্যাঁ, মনে তো হচ্ছে সর্বনাশা কাণ্ড ঘটে গেছে। সে আমাকে একটা ভাঁজ করা কাগজ দিল, লিফলেট। বলল, 'এটা পকেটে রাখেন, পড়বেন। পরে আপনার সাথে যোগাযোগ করব।' তারপর সে চলে গেল।

আমি হেঁটে হেঁটে নদীর পারে গেলাম। সেখানে আমাদের আরেকজন বন্ধু থাকত, তারিক সালাহউদ্দিন। সে ভালো আবৃত্তিকার। আমরা আনন্দমোহন কলেজে একসাথে সাহিত্যচর্চা করতাম, দেয়ালপত্রিকা বের করতাম। তার বাসায় গেলাম। বাসায় পেলাম তাকে। পকেট থেকে লিফলেটটা বের করলাম।

দেখি, তার টেবিলের ওপর পড়ে আছে ওই লিফলেট, দেশপ্রেমিকের বেশে ছয় পাহাড়ের দালাল।

আমি তখন ময়মনসিংহ শহরে আমার শ্বশুরের বাসায় থাকি। তারিক সালাহউদ্দিনের মাধ্যমে সরাসরি পার্টির লাইনে গেলাম। তার মাধ্যমে রানা ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ হলো। তখন তো সব পরিচয়ই গোপন। রানা ভাই একজন কমরেড, নেতা। ব্যস এটুকুই।

– রানাকে আগে থেকে চিনতেন?

না। তার বাড়ি ফরিদপুরের দিকে। এখন তো ভায়রা। সে ঢাকা কলেজের ছাত্র ছিল। পরে বুয়েটে পড়েছে। ছাত্র ইউনিয়ন করলেও পরিচয় ছিল না। আর আমি তো থাকতাম ময়মনসিংহে।

তারিক সালাহউদ্দিন একদিন রানা ভাইকে বাসায় নিয়ে এল। তার মাধ্যমেই সর্বহারা পার্টিতে ঢুকে গেলাম। তিনি ময়মনসিংহ জেলার অঞ্চল পরিচালক। নিজে সব কাজ করেন না। কামাল হায়দার, অর্থাৎ প্রবীর নিয়োগী তখন ময়মনসিংহ শহরের পরিচালক। আমাকে তার কাছে বুঝিয়ে দেওয়া হলো। প্রবীরের নাম তখন শামীম। রানা ভাই বলল, এখন থেকে শামীম রাজনৈতিক ক্লাস নেবে।

আমার ওয়াইফ একই সাথে পার্টিতে যোগ দিল। আমরা রানা ভাইয়ের প্রতি যথেষ্ট আকৃষ্ট হয়েছিলাম।

– আপনার স্ত্রীর নাম?

রাশিদা বেগম। ডাক নাম রানু। পার্টিতে নাম ছিল মণি—কমরেড মণি। রানা ভাই বলল, আমিও যোগাযোগ রাখব। তবে রেগুলার যোগাযোগ রাখবে প্রবীর নিয়োগী।

এই তো পার্টির লাইন পেয়ে গেলাম। আমার শ্বশুরের বাসা তখন পার্টির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও বিশ্বস্ত শেল্টার হয়ে গেল। মাস দুয়েক পর সিরাজ সিকদার এল। এরপর সে অনেকবার এসেছে। ওইবারই প্রথম, বাহাত্তর সালে।

– সিরাজ সিকদারের সাথে প্রথম সাক্ষাতের একটা বর্ণনা দিন।

প্রথম সাক্ষাৎটা আনুষ্ঠানিকভাবে হয়নি। তখনো আমি পার্টির কর্মী না, সহানুভূতিশীল বা শুভাকাঙ্ক্ষী। আর তাদের কাছে আমাদের বাসা হলো একজন সহানুভূতিশীলের শেল্টার। সিকদার পার্টির গেরিলাদের সাথে বৈঠক

করত আমাদের বাসায়। ওই সুবাদে দেখাসাক্ষাৎ পরিচয় হাই-হ্যালো।

– উনি যে সিরাজ সিকদার এটা বুঝতে পেরেছিলেন?

হ্যাঁ, হ্যাঁ।

– নাম বলেছিলেন?

না। এমনিতেই বুঝতে পেরেছি। চেহারাসুরত, কথাবার্তা, ধরনধারণ এসব দেখেই বোঝা গেছে। রানা ভাই কিংবা কামাল হায়দারের আভাস-ইঙ্গিতেও বোঝা গেছে। এই বাসায় তিনি অনেকবার এসেছেন। অনেক বৈঠক হয়েছে। এরপর তো পরিচয়, কথাবার্তা হলো।

খুব স্মার্ট লোক। একটু অবাকই হলাম। তখন তো কমিউনিস্ট নেতা মানে হলো খদ্দরের তেল চিটচিটে পাঞ্জাবি, মোটা ফ্রেমের চশমা, চোখের অসুখ না থাকলেও জিরো পাওয়ারের চশমা, আর ঘন ঘন বিড়ি কিংবা বগা সিগারেট টানা। এই ছিল আমাদের কল্পনার কমিউনিস্টের চেহারা।

এই আদলের সাথে সিরাজ সিকদারের কোনো মিল নাই। ভেরি স্মার্ট, ইয়ং চ্যাপ, বয়স ছাব্বিশ-সাতাশের বেশি না, আমার চেয়ে এক দুই বছরের ছোট। এসব দেখে বিস্মিত হলাম। একটু আকর্ষণ বোধ করলাম। আরে, কমিউনিস্ট আন্দোলনে এ ধরনের লোকই তো দরকার। দেখলাম, বিড়ি সিগারেট খায় না। পানও খায় না। এটাও আকর্ষণের একটা কারণ ছিল।

থাকি শ্বশুরের বাসায়। একতলা বড় বিল্ডিং। বাড়িতে অনেক লোক। আট-নয়টা ছেলেমেয়ে। সিকদার এসে কখনো কখনো থাকত। চিলেকোঠার মতো ছোট একটা জায়গা ছিল। সেখানে ঘুমাত। বদ্ধ দমফাটা একটা কামরা। দেখতাম সেখানেই নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে। ফ্যানট্যান কিছুই ছিল না।

বাহাত্তরের শেষের দিকে পার্টিতে সার্বক্ষণিক হয়ে গেলাম। ময়মনসিংহ জেলায় অনেক কাজের সাথে যুক্ত হলাম। অনেক কর্মী রিক্রুট করলাম। সপরিবার ফুলটাইমার হলাম, বাচ্চাসহ। আমার ছেলের বয়স তখন এক বছর।

এরপর সপরিবার চলে এলাম ঢাকায়। আমাদের বিশ্বস্ততা, মান এসব যাচাই করে কেন্দ্রীয় শেল্টারে থাকার ব্যবস্থা হলো। জায়গাটি কামরাঙ্গীর চরের ওপারে, জিনজিরা। সেখানে এক বাড়িতে উঠলাম। সিরাজ সিকদারও সেখানে আসে মাঝে মাঝে। সে তো সারা দেশে চক্কর দেয়। ঢাকায় এলে এটাই তার শেল্টার।

ধীরে ধীরে কিছু সাংগঠনিক দায়িত্ব পেলাম। এলাকা পরিচালক হলাম। আমার এলাকা হলো নারায়ণগঞ্জ, ডেমরা, আদমজী। সেখানে ছয়-সাত মাস থাকার পর রিলে সেন্টারের পরিচালক হলাম। রিলে সেন্টারটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। তখন তো সমানে সামরিক অপারেশন হচ্ছে। শত্রু খতম তো আছেই। তার ওপর থানা, ফাঁড়ি, ব্যাংক লুট চলছে। দেশজুড়ে ব্যস্ততা। একেবারে যুদ্ধ পরিস্থিতি। কাজ হয় সব গোপনে। বিভিন্ন এলাকা থেকে কর্মীরা আসে। এখান থেকে অনেকে অন্য জায়গায় যায়। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত, খবরাখবর পৌছানো বা অন্য জায়গা থেকে আসা খবরাখবর সংগ্রহ চলছে দিনরাত। সোজা কথায় তথ্য মন্ত্রণালয়। এটাই হলো রিলে সেন্টার।

– এটা কোথায় ছিল?

এটা ছিল আরব আলীর এক পানের দোকান। এটাই ছিল সমস্ত কমিউনিকেশনের প্রধান কেন্দ্র। অথবা কোনো কাসেম আলীর চায়ের দোকান। একেক সময় একেক জায়গায় ছিল। আরব আলীর পানের দোকান ছিল সোয়ারিঘাটে।

সিলেটে বালাগঞ্জ থানায় অপারেশন হলো। সাকসেসফুল অপারেশন। এটা তেহাত্তর সালের মাঝামাঝি। সিদ্ধান্ত গেল আরব আলীর রিলে সেন্টারের মাধ্যমে। ভেবে দেখেন, কেরানীগঞ্জের একটা সেচ প্রকল্পের ফাইল ঢাকার মন্ত্রণালয়ে ছয় মাস পড়ে থাকে। আর আমাদের আরব আলীর থানা অপারেশনের ফাইল, সিদ্ধান্ত পাঁচ ঘন্টার মধ্যে চলে যায় বালাগঞ্জে। মনে মনে তুলনা করলাম। ভবিষ্যতে যদি বিপ্লব করতে হয়, তাহলে আমাদের আমলাদের আরব আলীর কাছ থেকে ট্রেনিং নেওয়ার দরকার আছে।

রিলে সেন্টারের সাথে কেন্দ্রীয় প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশনের দায়িত্ব পড়ল আমার ওপর। এই দুইটা সেন্টারের দায়িত্ব নেওয়ার পর সিকদারের সাথে সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হলো। খুব ক্লোজ কানেকশন। আমি কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কোনো নেতা না। কিন্তু দায়িত্বের কারণেই কেন্দ্রীয় সব বিষয়ের সাথে লিংক থাকায় সিকদারের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ হয়ে গেল।

– ওই সময় পার্টির সব লিফলেট, ডকুমেন্ট আপনার দায়িত্বে ছিল?

হ্যাঁ, এবং এ তো বিশাল কাজ।

– এসব ছাপাতেন কোথায়?

পুরান ঢাকার বিভিন্ন প্রেসে।

– এগুলো তো গোপনে করতেন?

গোপনে তো অবশ্যই। এখন শুনলে অনেকেই অবাক হবে। এক লাখের কম কোনো লিফলেট ছাপা হতো না। আমাদের সংগ্রাম এখনো শেষ হয়নি, অসমাপ্ত জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব, ট্যাবলয়েড সাইজের এই লিফলেটটা, চার না ছয় পৃষ্ঠা মনে নেই, এক লাখ কপি ছাপা হয়েছিল।

প্রিন্টিংয়ের কাজ চলছে দিনরাত, বিশাল এক কর্মযজ্ঞ। লিফলেট ছাপা হচ্ছে লাখ লাখ কপি। অন্যদিকে সিরাজ সিকদারের বই, দলিল-টলিল এসব ছাপা হচ্ছে, তার কবিতার বই ছাপা হচ্ছে। আমাদের একটা কেন্দ্রীয় গুদাম ছিল পুরান ঢাকায়, ফুলবাড়িয়ার কাছে। সেখানে কাগজপত্র একদিনের বেশি রাখা হতো না। সাথে সাথেই সারা দেশে চলে যেত।

– লেখা কম্পোজ করা, ছাপানো এসব কাজে তো অনেক লোক ইনভলভড। প্রেস ওয়ার্কাররাও আছে। কীভাবে গোপনীয়তা বজায় রাখতেন?

প্রেসে যে ছাপছে, সে আমাদের লোক। হয় কর্মী, না হয় সহানুভূতিশীল। যে কম্পোজ করছে, লেটার টাইপ করছে, সে-ও আমাদের সহানুভূতিশীল। কোনো একটা পর্যায়ে একজনও যদি আমাদের বিরোধী হতো, তাহলে এই কাজ করা সম্ভব হতো না।

– প্রেসে যোগাযোগ করত কে?

অনেক সময় আমি নিজে করতাম। আমার দুই-একজন সহকারী ছিল। কর্মীও ছিল। ওদের মাধ্যমে হতো। প্রত্যেক স্তরে আমাদের লোক ছিল।

– প্রেসে কখনো পুলিশ রেইড করেনি?

করেছে। সন্দেহবশত হয়েছে। অথবা কেউ হয়তো খবর দিয়েছে। তবে কম হয়েছে। খুবই কম। একবার বা দুবার।

– ঢাকায় তখন কোথায় থাকতেন?

প্রথমে মনেশ্বর রোড, জিগাতলা। তারপর রাজাবাজার। আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট তখন রিয়াজ, ডা. রিয়াজুর রহমান। ছদ্মনাম তাহের।

– উনি ডাক্তার?

এখন ডাক্তার। তখন তো পিচ্চি, ১৪-১৫ বছর বয়স।

– এখন তিনি কোথায় আছেন?

সিলেটে আছেন। একবার পার্টির একগাদা লিফলেট বইপত্র নিয়ে যাচ্ছিল রিকশায় করে। দুপুর বেলা বংশাল রোডে একগাদা লোকের মধ্যে একটা

গরুর গাড়ির সাথে ধাক্কা লেগে রিকশা উল্টে কাগজপত্রে রাস্তা সয়লাব। লোকজন হাঁ করে তাকিয়ে দেখছে—লিফলেট, সিরাজ সিকদার জিন্দাবাদ, সর্বহারা পার্টি জিন্দাবাদ। আশপাশের পাবলিক দেখল, আরে, বিপজ্জনক ব্যাপার তো? তারা রিয়াজকে সাহায্য করেছে। সব কাগজ যখন রিকশায় তুলে দিচ্ছে, তখন এল ট্রাফিক পুলিশ। সে-ও হাত লাগাল। কেননা রাস্তায় জ্যাম বেঁধে গেছে। ধরাধরি করে সব কাগজ রিকশায় তুলে দিয়ে রিয়াজকে বলছে, 'বাবাজি, তাড়াতাড়ি কাইটা পড়, ধরা খাবি।' তার মানে, ওই ট্রাফিক পুলিশও আমাদের সিমপ্যাথাইজার। এরকম অনেক মজার মজার ঘটনা আছে।

– কাজ করতে গেলে অনেক সময় বিপর্যয় ঘটে। এরকম কিছু হয়নি?

তেহাত্তরের শেষের দিকে আমাদের একটা বড় ধরনের সামরিক বিপর্যয় ঘটে। বরিশালের বাউফল-কালায়ায় একটা অপারেশন ছিল। একটা ফাঁড়ি, একটা থানা এবং একটা ব্যাংক। একসাথে তিনটা অপারেশন। স্পটে এটা পরিচালনা করল ইঞ্জিনিয়ার নাসির উদ্দিন। পার্টিতে তার নাম মাসুদ। বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়া। অনেকদিন জেল খেটেছে। এরপর থেকে আমার সাথে আর যোগাযোগ নেই।

ওই অপারেশনে বিপর্যয় ঘটে। নাসির উচ্চপর্যায়ের আরেকজন কেন্দ্রীয় নেতাসহ এগারোজন কর্মী অন দ্য স্পট অ্যারেস্ট হয়। তিন-চারজন গেরিলা কিল্‌ড হয়। বড় বিপর্যয়। সেখানে নেতৃত্বের সংকট দেখা দেয়। নাসির অ্যারেস্ট, কালো মুজিব অ্যারেস্ট। তখন প্রেস, প্রিন্টিং আর রিলে সেন্টারের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে আমাকে অঞ্চল পরিচালক হিসেবে পাঠাল ফরিদপুরে। নাসির ভাই ছিলেন বৃহত্তর ফরিদপুর, বরিশাল ও খুলনার ব্যুরো পরিচালক। তখন ফরিদপুর আর বরিশালে অনেক কাজ। আমি অন্য এক জগতে ঢুকে গেলাম।

– আপনি তেহাত্তর সালে ফরিদপুরে ছিলেন?

তেহাত্তর-চুয়াত্তর সালে। তারপর সেখান থেকে বরিশালে যাই অঞ্চল পরিচালক হয়ে। এই দুই জেলায় ছিলাম আড়াই বছর, পঁচাত্তরের শেষ পর্যন্ত।

– আপনি নিজে কখনো কোনো সামরিক অভিযানে গেছেন?

না। আমি রাজনৈতিক কমিসার হিসেবেই কাজ করেছি।

– আপনাদের পার্টির স্ট্রাকচারটা কেমন ছিল?

তেহাত্তর সালের কথা বলছি। তখন একটা কেন্দ্রীয় কমিটি ছিল।

– কয় সদস্যের?

এটা নিয়ে অনেক কাহিনি। পরে বলি।

– ঠিক আছে।

তখন কেন্দ্রীয় কমিটি ছিল তিন সদস্যের। সিরাজ সিকদার, নাসির আর রানা। আরও দুজন ছিল। এর পরের ধাপ—ফিল্ডের সামরিক, রাজনৈতিক, সাংগঠনিক কাজের জন্য ছিল তিনটা ব্যুরো। তিনটা কি চারটা, আমার মনে নেই। যেমন বৃহত্তর বরিশাল, খুলনা ও ফরিদপুর নিয়ে একটা ব্যুরো। আবার ঢাকা, ময়মনসিংহ, সিলেট নিয়ে একটা ব্যুরো। আরেকটা ব্যুরো হলো চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, নোয়াখালী ও কুমিল্লা নিয়ে।

ব্যুরোর অধীনে ছিল অঞ্চল। একটা বৃহত্তর জেলা নিয়ে একটা অঞ্চল। অঞ্চলের নিচে একটা এলাকা।

– ধরুন, আপনি একজন অঞ্চল পরিচালক। আপনার অধীনে অনেকগুলো এলাকা আছে। আপনি কি সব এলাকা পরিচালককে চিনতেন?

হ্যাঁ। সবচেয়ে ক্লোজ কানেকশন তো এলাকা পরিচালকদের সাথে। ব্যুরো পরিচালক আবার সব অঞ্চল পরিচালক এবং এলাকা পরিচালককে চেনে।

– এলাকা পরিচালকেরা কি একে অন্যকে চিনত?

হ্যাঁ। তাদের নিয়ে মিটিং হতো। ধরুন, ফরিদপুরে ছিল ১৪ জন এলাকা পরিচালক। সবাই হয়তো সব সময় একসাথে বৈঠক করতে পারত না, নিরাপত্তার জন্য। কখনো পাঁচ-ছয়জন, কখনো বা সবাই একসাথে মিট করত।

– এক অঞ্চলের এলাকা পরিচালক কি অন্য অঞ্চলের এলাকা পরিচালককে চিনত?

না। যোগাযোগ হতো অঞ্চল পরিচালকের মাধ্যমে বা আন্তঃআঞ্চলিক বৈঠকে বা সম্মেলনের মাধ্যমে। কোনো অঞ্চলের একজন এলাকা পরিচালক অন্য অঞ্চলে গেলে তখন যোগাযোগ হতো। কোনো দলিল বা আর্মস পাঠাতে যেতে হতো। এভাবে কিছু ইন্টারকানেকশন হতো।

– ইঞ্জিনিয়ার নাসির একজন ব্যুরো পরিচালক। অন্য দুজন ব্যুরো পরিচালক কে?

ঢাকা ময়মনসিংহ সিলেট অঞ্চলে ছিল রানা। চিটাগাং এলাকায় সিরাজ সিকদার নিজেই ছিল ব্যুরোর দায়িত্বে। চিটাগাং হিল ট্র্যাক্টস তখন খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এটা ছিল আধাআধি মুক্ত এলাকা। শান্তিবাহিনীর তৎপরতা বেশি ছিল না।

– কর্নেল জিয়াউদ্দিন আপনাদের পার্টিতে এলেন কোন সময়?

১৯৭৩ সালের মাঝামাঝি বা শেষের দিকে।

– উনি কি তখন অঞ্চল পরিচালক?

না। প্রথমে এলাকা পরিচালক। আমি যখন নারায়ণগঞ্জ-ডেমরা এলাকা ছেড়ে পুরোপুরি রিলে সেন্টারের দায়িত্ব নিই, তখন জিয়াউদ্দিনকে নারায়ণগঞ্জ-ডেমরার দায়িত্ব দেওয়া হয়। আমিই তাকে কাজ বুঝিয়ে দিই। এখনো মনে আছে, কাজ বুঝিয়ে দিয়ে আমরা মোরগ-পোলাও খেলাম। নারায়ণগঞ্জে একটা খাবার দোকান ছিল। কী কেবিন যেন?

– বোস কেবিন।

হ্যাঁ। ঐতিহাসিক বোস কেবিনে আমরা মোরগ-পোলাও খেলাম। পরে তাকে পার্বত্য চট্টগ্রামে পাঠানো হয়েছিল। সেখানে আমাদের নিয়মিত বাহিনী গড়ে উঠছিল। প্রথমে চিন্তা ছিল, সেখানে আমাদের মুক্ত এলাকা তৈরি হবে। যদিও স্ট্র্যাটেজিক্যালি এটা ছিল ভুল। তখন অবশ্য এটা ভুল মনে হয়নি। কারণ, এখানে ভিয়েতনাম পাবেন কোথায়? এটাই তো আপনার ভিয়েতনাম। ছোট হলেও এটাই তো আপনার চিন। তখন আমরা মনে করতাম, গেরিলাযুদ্ধের স্বর্গ হলো সবেধন নীলমণি চিটাগাং হিল ট্র্যাক্টস। পরে আমরা কাজের সার-সংকলন করছি, দৌড়ঝাঁপ করছি, তখন আমাদের অনন্ত ভাই—ফারুক ভাই—ফারুক ভাই ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামে গেরিলা কমান্ডার। মুন্সিগঞ্জে বাড়ি। পার্টিতে নাম ছিল অনন্ত সিং। অনেকদিন পর তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আচ্ছা ফারুক ভাই, আমরা সেখানে যে বাহিনী গড়ে তুললাম, কিন্তু টিকতে পারলাম না, ফেল করলাম, এর মূল কারণ কী? এককথায় বলেন তো?

ফারুক ভাই খুব মূল্যবান কথা বলল। তার অভিজ্ঞতা থেকে বলল যে কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। এলাকাটি এত ছোট, কোথাও যে রিট্রিট করব—দরকার পড়লে এক টিলা থেকে আরেক টিলায় যাওয়া যায়। কিন্তু এক অঞ্চল থেকে আরেক অঞ্চলে যাওয়া, এরকম জায়গা নেই। ভিয়েতনামে

যেমন শত শত মাইল, চিনে যেমন হাজার হাজার মাইল রয়ে গেছে রিট্রিট করার জন্য, এখানে তো জায়গা অল্প। লোক আছে ছয়-সাত লাখ। তখন বুঝলাম, প্রাকৃতিকভাবে ভৌগোলিকভাবে গেরিলাযুদ্ধের বাস্তব অবস্থা অনুপস্থিত।

– সেখানে আপনাদের বাহিনীতে স্থানীয় লোকেরা ছিল?

লোকাল, মানে আদিবাসীরা ছিল। অল্পসংখ্যক বাঙালি ছিল। ফারুক ভাই কমান্ডার। জিয়াউদ্দিন চিফ কমান্ডার। এরা গেছে বাইরে থেকে। অঞ্চল পরিচালক ছিল জ্যোতি। তার আসল নাম সুদত্ত বিকাশ তঞ্চঙ্গ্যা।

তেহাত্তরের শেষ পর্যন্ত সাংগঠনিক স্ট্রাকচারটা এরকমই ছিল। চুয়াত্তরে এটা একেবারে লন্ডভন্ড হয়ে যায়। তখন কেন্দ্রীয় কমিটি ছিল দুই সদস্যবিশিষ্ট, সিকদার আর রানা। সাংগঠনিক কাজে রানার অনেক লিমিটেশন ছিল। মানে, এরকম মনে করা হতো। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে কোনো সমস্যা ছিল না। সামরিক ও সাংগঠনিক কাজে অনেক সমস্যা ছিল। এ ব্যাপারে সিকদারের মূল্যায়ন ছিল যে তার যোগ্যতা কম, সাহস বা সাংগঠনিক দক্ষতা কম। পরে আমি দেখেছি যে ওই মূল্যায়নটাও ভুল ছিল।

চুয়াত্তর সালে একটা বর্ধিত সভা হলো। এটা বরিশালের ডিজাস্টারের পরে। এরকম আরও কয়েকটা ডিজাস্টার হয়েছিল। আমি তখন ফরিদপুর ছেড়ে বরিশালের অঞ্চল পরিচালক হয়ে গেছি। ঠিক ওই সময়ে নেতৃত্বের সংকট কাটানোর জন্য পার্টির একটা বর্ধিত সভা হয়। তখন তো নিরাপত্তার সংকট। পার্টির কংগ্রেস করা তো বিশাল ব্যাপার। ১৫-১৬ জন নেতাকে নিয়ে একটা বর্ধিত সভা হলো। এই সভায় সিকদার একটা এক সদস্যবিশিষ্ট কেন্দ্রীয় কমিটি বানায়। মানে সিকদার নিজেই কেন্দ্রীয় কমিটি। আর তার সাহায্যকারী হিসেবে দুটি গ্রুপ ঠিক করে। একটি রাজনৈতিক সাহায্যকারী গ্রুপ, অন্যটি সামরিক সাহায্যকারী গ্রুপ। গ্রুপগুলোর সমন্বয়ের জন্য সিকদার একজন প্রধান সমন্বয়কারী নিয়োগ দেয়। সে হলো কমরেড জামিল। তার আসল নাম মহিউদ্দিন বাহার। তার মা ছিল বিদ্যাময়ী হাইস্কুলের শিক্ষয়িত্রী। সেই সুবাদে সে ময়মনসিংহ থাকত। তার আসল বাড়ি কুমিল্লায়।

দলের স্ট্রাকচারটা এরকম হয়ে গেল। সাহায্যকারী গ্রুপের ভোটাধিকার ছিল না। মানে সবকিছু চলত সিকদারের একক সিদ্ধান্তে।

– আগে কি পার্টির মধ্যে ভোটাভুটি হতো?

আগে একটা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ছিল। এই স্ট্রাকচারের কারণে পার্টির মধ্যে গণতন্ত্র একেবারে নস্যাৎ হয়ে গেল। এটা কেউ বুঝতেই পারেনি। সবাই সামরিক কাজ নিয়ে এত ব্যস্ত, রাষ্ট্রক্ষমতা দখল হবে, হাজার হাজার কর্মী, সহানুভূতিশীল আর গেরিলা। সবাই ভাবছে, কিসের কেন্দ্রীয় কমিটি, কিসের গণতন্ত্র, আগে বিপ্লব করে নিই। এরকম ভাব।

যখন সিকদার কিল্ড হয়, তখন তো আর কেন্দ্রীয় কমিটি নেই। অমুক সাহায্যকারী তমুক সাহায্যকারী, কে কার কথা শোনে। প্রধান সমন্বয়কারী জামিল তো সিকদার কিল্ড হওয়ার আগেই গ্রেপ্তার হয়ে গেছে।

– তার মানে পার্টিতে কোনো সমন্বয় নেই।

ঠিক তাই।

– জামিল এখন কোথায়?

এখন তো ঢাকায়। ইসলাম জুট মিলের ম্যানেজার ছিল অনেকদিন। এম শামসুল ইসলাম ছিল না? বিএনপির মন্ত্রী? তিনি আমাদের সহানুভূতিশীল ছিলেন। জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর তিনি জামিলকে শেল্টার দিয়েছিলেন।

– সাধারণ মানুষের কাছে আপনাদের কি গ্রহণযোগ্যতা তৈরি হয়েছিল? অনেকেই তো আপনাদের সন্ত্রাসী মনে করত। কারা সাপোর্ট করত আপনাদের?

ফরিদপুর এবং বরিশালে লক্ষ করেছি, গ্রামে ও শহরে আমাদের বিশ্বস্ত যে শেল্টারগুলো, বিশ্বস্ত যে কর্মী বা সহানুভূতিশীল, আমার মনে হয়েছিল, তাদের শতকরা ৬০-৭০ ভাগ হিন্দু। ব্যাপারটা খেয়াল করুন। ৬০-৭০ ভাগ কর্মী, সহানুভূতিশীল ও গেরিলা হলো মাইনরিটি। এরা মূলত আওয়ামী ঘরানার লোক ছিল। তারা শিফ্‌ট হয়ে আমাদের পার্টির দিকে ঝুঁকল। ভারতবিরোধী লড়াই করতে গিয়ে আমরা যখন মুজিববিরোধী লড়াই শুরু করলাম, আওয়ামী লীগবিরোধী লড়াই শুরু করলাম, সেটা ছিল আমাদের সবচেয়ে বড় ভুল। এটা ছিল আত্মঘাতী।

একাত্তরে বরিশালের পেয়ারাবাগানে যখন আমাদের ঘাঁটি এলাকা গড়ে উঠল, তখন তো আত্মনির্ভরশীল অবস্থা। তখনো কেউ ভারতে যায়নি। তখন এলাকার আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী যারা ছিল, সবাই আমদের সাথে যোগ দিয়েছিল। কিন্তু যখন আমরা গলা কাটাকাটির রাজনীতি, জাতীয় শত্রু খতমের নামে আওয়ামী লীগের লোকদের ঢালাওভাবে খতম করা শুরু

করলাম, তখনই আমাদের বিপর্যয় শুরু হলো।

শেখ মুজিবের সাথে আমাদের ঐক্য হওয়া দরকার ছিল। আওয়ামী লীগের সাথে তো বটেই। আবদুর রব সেরনিয়াবাতের সাথে আমাদের রিলেশন, তখন পানিমন্ত্রী। শেখ মুজিবের বোনজামাই, আমাদের সহানুভূতিশীল। উনি এককালে ন্যাপ করতেন। সেই সুবাদে বামদের প্রতি দুর্বলতাও ছিল। বাহাত্তরে প্রথম পানি বৈঠক হয় দিল্লিতে, ওই বৈঠকে ছিল তার তিক্ত অভিজ্ঞতা। সেখান থেকে ফিরে এসেই সিকদারের সাথে যোগাযোগ করছে। বলেছে, আরেকটা মুক্তিযুদ্ধ করা ছাড়া আর কোনো পথ খোলা নেই।

– এই তথ্য আপনি কোথায় পেলেন?

রানার কাছে। তখন রব সেরনিয়াবাত আমাদের সহানুভূতিশীল। শেখ মুজিবের সাথে লিংক করা কঠিন ছিল না। কিন্তু সেটা না করে আমরা মুজিববিরোধী ঢালাও লড়াই শুরু করলাম। এটা হলো আমাদের সবচেয়ে বড় ভুল।

ময়মনসিংহে আমি তখনো হোলটাইমার হইনি। বাহাত্তর সালের কথা বলছি। কাজ করছি। তার মধ্যে সামরিক কাজও আছে। তখন তো একটু একটু জাতীয় শত্রু খতম শুরু হয়েছে। আমি নিজে অংশগ্রহণ না করলেও তার সাথে কমবেশি যুক্ত। হামিদুল হক হামিদ ছিল আনন্দমোহন কলেজের ভিপি, ছাত্রলীগের। সে তখন বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি। এই হামিদকে আমরা মৃত্যুদণ্ড দিলাম। মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার জন্য যে অপারেশন, তার সাথে আমিও যুক্ত। মানে রেকি করা, অনুসন্ধান করা, কীভাবে অ্যাকশনটা করা যায় এসব। তারপর নানান অসুবিধার কারণে এটা কার্যকর করা যায়নি। হামিদ বেঁচে গেল। পরে সে হয়ে গেল আমাদের পার্টির গুরুত্বপূর্ণ ক্যাডার। ভাবুন তো? আওয়ামী লীগের বা ছাত্রলীগের যে নেতারা একপর্যায়ে আমাদের নেতা হয়ে যায় বা গুরুত্বপূর্ণ কর্মী হয়ে যায়, তাদের আমরা ঢালাওভাবে খতম করার রাজনীতি করেছি। কত বড় বোকামি চিন্তা করতে পারেন?

আমরা কিন্তু বলেছি, নকশালদের মতো এখানে শুধু শ্রেণিশত্রু খতম করলে হবে না। এটা ন্যাশনাল ইউনিটির প্রশ্ন। ভারতের সাথে লড়াই করতে গেলে আওয়ামী লীগ, বাম-ডান যত আছে, মওলানা মৌলবি সব এক হতে হবে। তা না হলে এই লড়াইয়ে জয়লাভ করা সম্ভব হবে না। সেখানে

আওয়ামী লীগ একটা বিশাল বড় পার্টি। এর মধ্যে সম্ভাবনা আছে। কারণ, ১৬ ডিসেম্বরের পর তাদের অধিকাংশ লোক তাদের ওপর ক্ষুব্ধ। কারণ, ভারতে গিয়ে তাদের আচরণ দেখে তারা হতাশ। রব সেরনিয়াবাতের যে অভিজ্ঞতা, এমন অভিজ্ঞতা তো অনেক মুক্তিযোদ্ধার। তাদের তো তখন চলে আসার কথা আমাদের দিকে। আমরা তাদের হত্যা করলাম। এটা ছিল সবচেয়ে বড় ভুল।

– বেশ কয়েকজন সংসদ সদস্য তো কিল্‌ড হয়েছিল বাহাত্তর থেকে চুয়াত্তর পর্যন্ত। একটা ঘটনা জানি। এটা করেছিল জাসদের লোকেরা, কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে।

আমরা করেছিলাম। ঝালকাঠির মুকিম। নলছিটির এমপি ছিল। সে আমাদের লোকের হাতে কিল্‌ড হয়।

– সওগাতুল আলম সগীরকে কারা মারল?

এটা আমাদের হাতে ছিল না। এটা অন্য কারও কাজ। আমাদের মধ্যে অন্য রকম কাজও হয়েছে। নেপথ্যের ষড়যন্ত্রও কাজ করেছে। রব সেরনিয়াবাতের মাধ্যমে শেখ মুজিবের সাথে আমাদের যে ঐক্য হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, এটা হতে দেয়নি। আমরা যদি আরও ছাড় দিতাম, সমস্ত কিলিং বন্ধ করে আরও উদার হতাম, তা হলেও হয়তো ঐক্য করা যেত না।

১৯৭৭ সালের আগস্টে জেলে যাই। আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীতে তখন জেল ভর্তি। আমার আর রানার ডিভিশন ছিল। এটা যেকোনোভাবেই হোক হয়ে গিয়েছিল। আমার তখন কিডনিতে সমস্যা। আমি জেল হাসপাতালে ভর্তি হলাম, দোতলায়। সেখানে দেখি আওয়ামী লীগের সব নেতা, হোমরা-চোমরা মন্ত্রী-টন্ত্রীরা। সেখানে আবদুর রাজ্জাকের সাথে আমার অনেক কথা হয়েছে। সে আমাকে গোপনে বারান্দার এক কোনায় নিয়ে বলল, আরিফ ভাই, আপনার সাথে আমার অনেক কথা আছে। আমরা তো এখন সাপেনেউলে এক হয়ে গেছি। একটা তথ্য আমাকে দেন তো?

বলেন।

বঙ্গবন্ধুকে কিল করার কোনো পরিকল্পনা কি আপনাদের ছিল?

আপনার কি মনে হয়?

আমাদের কাছে তো এটা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়নি।

আমার জানামতে, শেখ মুজিবকে কিল করার কোনো পরিকল্পনা পার্টিতে

ছিল না। এ প্রশ্নটা উঠল কী জন্য? আপনারা কীভাবে জানলেন, সিরাজ সিকদার শেখ মুজিবকে কিল করবে?

আমাদের কাছে দিনে তিনবার গোয়েন্দা রিপোর্ট আসত। প্রতিটি রিপোর্টে উল্লেখ থাকত, হুঁশিয়ার। সিরাজ সিকদার তার ট্রুপস নিয়ে রেডি আছে। শেখ মুজিবকে যেকোনো মুহূর্তে হত্যা করবে।

ভাই, আমাদের কাছে তো একই রিপোর্ট ছিল।

কী রকম?

শেখ মুজিব বিশেষ অর্ডার দিয়েছে। যেখানে পারো, কোটি কোটি টাকা দিয়ে হলেও সিরাজ সিকদারকে কিল করো।

না, সিকদারকে কিল করার কোনো পরিকল্পনা আমাদের ছিল না। বঙ্গবন্ধুর ছিল না।

এখন ঘটনাটা বুঝুন। এক পক্ষ শেখ মুজিবকে বোঝাত, সিকদার আপনাকে কিল করার জন্য তৈরি। আবার সিকদারকে বোঝাত, তোমাকে হত্যা করার জন্য শেখ মুজিব প্রস্তুত।

আমরা তো শুরু থেকেই ইউনিটির চেষ্টা করেছিলাম। একাত্তরের ২ জানুয়ারি সিরাজ সিকদার ঐক্যের ডাক দিল। বামপন্থীদের মধ্যে এটা ছিল একটা ব্যতিক্রমী ঘটনা। সে শেখ মুজিবকে চিঠি দিল, পাকিস্তান যেকোনো সময় আগ্রাসন চালাতে পারে। আমাদের এখন ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। আমাদের মুক্তিফ্রন্ট গড়ে তুলতে হবে। সেটা আর হলো না। আওয়ামী লীগের মধ্যে অনেকেই ঐক্যের বিরোধী ছিল। কট্টর কমিউনিস্টবিরোধীরা ঐক্য চায়নি।

– আপনাদের মধ্যে বেশ কিছু উপদলীয় কোন্দল ছিল।

এগুলো পরে বেশি হয়েছে। আগে কম ছিল। সিকদারের জীবিত অবস্থায় একটাই বড় ঘটনা ছিল। ফজলু আর হুমায়ুন কবিরের কিল্‌ড হওয়া। ফজলু একটা ষড়যন্ত্র করেছিল। ইট ওয়াজ ফ্যাক্ট। তাকে কিল করা হয়। এটা ছিল মস্ত বড় ভুল। পার্টির কর্মীকে হত্যা করা যায় না, যত অপরাধই করুক, বহিষ্কার করা যেতে পারে। পার্টির কর্মীদের মধ্যে যদি গলা কাটাকাটি হয়, তা হলে তো ওই পার্টির অস্তিত্বই বিলীন হয়ে যাবে। কেউ ঠেকাতে পারবে না। এই জ্ঞানবুদ্ধি তখন কারও ছিল না। এর জের ধরে হুমায়ুন কবিরও পার্টির হাতে কিল্‌ড হয়।

– কিলিংয়ের সিদ্ধান্তগুলো কে নিত?

সিকদারই নিত। অন্য যারা ছিল, সবাই পেটিবুর্জোয়া চরিত্রের—হঠকারী, ভাবপ্রবণ, ইমোশনাল, তাড়াতাড়ি বিপ্লব করার স্বপ্ন, নিম্ন সাংস্কৃতিক মান। এই যে বলে না—বাঁশ যত শক্ত, তার চেয়ে বেশি শক্ত কঞ্চি! সিকদার যতটা না চিন্তা করত, তার চেয়ে বেশি লুফে নিত তার নেতৃস্থানীয় ক্যাডাররা। এটা শুধু আমাদের পার্টিতে না, উপমহাদেশের সর্বত্র। কোনো ইন্টেলেকচুয়ালিটি নেই। শুধু মারদাঙ্গা।

– এখানে তো আরও অনেক বামপন্থী দল ছিল। তাদের সাথে যোগাযোগ হতো না?

আগে লিংক ছিল। একপর্যায়ে এসে তো দা-কুমড়া সম্পর্ক। আন্ডারগ্রাউন্ডে এক কমিউনিস্ট পার্টি আরেক কমিউনিস্ট পার্টির মুখ দেখতে চায় না। মারামারি, খুনাখুনি, এরকম অবস্থা ছিল।

– আপনি অ্যারেস্ট হলেন কোন ইয়ারে?

রানাসহ অ্যারেস্ট হলাম ১৯৭৭ সালের মাঝামাঝি।

– ডিটেনশনে ছিলেন, নাকি কনভিকশন হয়েছিল?

ডিটেনশন।

– কতদিন জেলে ছিলেন?

আট মাস। আমাদের বিরুদ্ধে কোনো মামলা ছিল না। কারণ, সামরিক লাইনে ছিলাম না তো? কোনো হত্যাকাণ্ডের সাথে যুক্ত ছিলাম না। কোনো ক্লু পায়নি। তাই মামলা দিতে পারেনি। অনেকেই আছে, ডিটেনশনেই পাঁচ-ছয় বছর ছিল।

– সিরাজ সিকদার যে অ্যারেস্ট হয়ে গেল, এটা আপনি কখন জানলেন?

আমি তখন ফরিদপুর থেকে বরিশালের কাজ বুঝে নিচ্ছি। গৌরনদীতে নিখিলদার বাড়ি ছিল আমাদের শেল্টার। সব এলাকা পরিচালকরা তার বাড়িতে এসেছে। আমাকে অঞ্চল পরিচালকের কাজ বুঝিয়ে দিচ্ছে।

– কে বুঝিয়ে দিচ্ছে?

রফিক। সেখানেই রেডিওর খবরে শুনলাম। খবরটা শুনেই রফিক আর আমি দ্রুত চলে গেলাম বরিশালে। রফিককে পরে আমরা কিল করেছি।

– তাকে কেন মারা হলো?

রফিক ওরফে শাহজাহান তালুকদার তো গুরুত্বপূর্ণ নেতা, সামরিক সাহায্যকারী গ্রুপের তিন নম্বর সদস্য। ঘটনাটির সূত্র ফরিদপুরের একটা



শাহজাহান তালুকদার
ওরফে রফিক

শেল্টারে। আমি এবং আমার স্ত্রী কমরেড রানুও সেখানে থাকি। ওই বাসায় এক রাতে জনৈক কমরেডের সাথে রফিকের সমকামিতার একটা ঘটনা ঘটে। পার্টির তখন প্রধান নেতা মতিন। সে নিজের হাতে রফিকের বিরুদ্ধে অভিযোগনামা লিখে কর্মীদের কাছে বিলি করল রফিককে কী শাস্তি দেওয়া যায়, সে বিষয়ে মতামত চেয়ে। তার লেখায় গৎবাঁধা বুলি ছিল—অভিযুক্ত কমরেড পালিয়ে যেতে পারে, পালিয়ে শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণ করতে পারে, আত্মসমর্পণ করে পুলিশের সাথে হাত মেলাতে পারে, পুলিশের সাথে হাত মিলিয়ে পার্টির কর্মীদের ধরিয়ে দিতে পারে ইত্যাদি। একগাদা কাল্পনিক অপরাধের দায়ে তাকে কী শাস্তি দেওয়া উচিত তারও ইঙ্গিত ছিল। বলতে দ্বিধা নেই, সেদিন আমিও সে কাগজে সই করেছিলাম। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নামে অন্ধ উত্তেজনা থেকেই একজন কমরেডের মৃত্যু পরোয়ানায় সই দিয়েছিলাম। তাকে ময়মনসিংহে পাঠানো হয়েছিল একটা ছুতোয়। সেখানেই তাকে খতম করা হয়।

– দেখা গেছে, আপনাদের অনেক কর্মী দলের লোকের হাতেই খুন হয়েছে। দল তাদের মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে। এটাকে আন্তঃপার্টি সংগ্রাম বলে

প্রচার করা হয়েছে। এরকম ঘটনা তো অনেক ঘটেছে, তাই না?

বাহাত্তর সালে ফজলুকে হঠাৎ করেই খতম করা হয়। পার্টির স্থানীয় কর্মীরা নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজটি করেছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় কমিটি এটা অনুমোদন দিয়ে অভিনন্দন জানায়। কেন্দ্রীয় কমিটি কাজটি ভালো করেনি। কমিটির উচিত ছিল ফজলু-সুলতান চক্রের পার্টিবিরোধী তৎপরতার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত লড়াই চালানো এবং ফজলু হত্যার নিন্দা জানানো।

– একই কাজ তো হুমায়ুন কবিরের বেলায়ও প্রযোজ্য?

পার্টিতে ফজলু এবং তার কয়েকদিনের মধ্যে হুমায়ুন কবিরকে খতম করার ব্যাপারটি ছিল চরম নেতিবাচক। পার্টির ভেতরে কর্মীদের ত্রুটিবিচ্যুতি, এমনকি ছোটখাটো অপরাধের জন্য চরম দণ্ড দেওয়া একটা নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

– আপনি তো অঞ্চল পরিচালক ছিলেন, জেলার দায়িত্বে ছিলেন। আপনার সিদ্ধান্তে বা জানামতে আপনার নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চলে কি এ ধরনের হত্যাকাণ্ড ঘটেনি? আপনার মধ্যে কি এ নিয়ে কোনো গিল্টি ফিলিং হয়? কোনো অপরাধবোধ? আমি জানি, অন্যান্য দলেও এ ধরনের খতম হয়েছে। দলের লোকেরা নিজ দলের ভিন্নমতের লোকদের মেরে ফেলেছে। জাসদের মধ্যেও এ ধরনের কিছু ঘটনা আছে। জিজ্ঞেস করলে নেতারা এড়িয়ে যায়। চাপাচাপি করলে বলে স্মরণ নেই, আমি এর মধ্যে ছিলাম না, এখন এসব বলা যাবে না ইত্যাদি। এত বছর পরও তারা তথ্য গোপন করতে চায়। অথচ এসব খুনের চেইন রি-অ্যাকশন হয়। কুষ্টিয়ায় এভাবেই জাসদের লোকেরা একে অন্যকে খুন করেছে।

আমি তো তথ্য গোপন করি না। আমার বইয়ে কিছু ঘটনার উল্লেখ করেছি। ১৯৭৩ সালের শেষের দিকের একটি ঘটনার কথা বলি। আমি তখন বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার অঞ্চল পরিচালক। নতুন এসেছি। আমার আগে যিনি অঞ্চল পরিচালক ছিলেন, তার কাছ থেকে কাজ বুঝে নিচ্ছি। তখন গোপাল নামে এক কিশোরের কথা জানলাম। গোপাল পড়ত ক্লাস নাইনে। তার বিরুদ্ধে নালিশ, সে নাকি মাদারীপুর শহরের এক ধনী আওয়ামী লীগ নেতার কাছে দুই হাজার টাকা জরিমানা দিতে হুমকি দিয়ে একটি চিঠি পাঠিয়েছিল। আন্দাজের ওপর ভিত্তি করেই এ অভিযোগ। এ অভিযোগের

সত্যতা যাচাই করা হয়নি। গোপালকে ডেকে তার কাছে ব্যাখ্যা চাওয়া হয়নি। পার্টির বক্তব্য হলো, এই চিঠি গোপাল আদৌ লিখেছে কি না, অথবা লিখে থাকলে কেন লিখেছে, এটা তাকে জিজ্ঞেস করলে সে সাবধান হয়ে যাবে। এটা বুঝতে পেরে সে হয়তো শত্রুর সাথে হাত মেলাবে। সুতরাং তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা যাবে না। অতএব সমস্যার সহজ সমাধান হলো তাকে খতম করে দেওয়া।

তাকে তাড়াতাড়ি মেরে ফেলা হলো। সে জানতেও পারল না কোন অপরাধে তার মৃত্যুদণ্ড হয়েছে। যদি সত্যি সত্যিই সে পার্টির নামে দুই হাজার টাকা চাঁদা এনে নিজে খরচ করে থাকে, এ জন্য কি তার মতো একজন কিশোরকে মেরে ফেলা যায়?

– আপনি তো বরিশালেও অঞ্চল পরিচালক ছিলেন। সেখানে কি এ ধরনের কিছু ঘটেছে?

আমি বরিশাল জেলার দায়িত্ব পাই ১৯৭৪ সালের শেষ দিকে। ঢাকা থেকে মোস্তফা কামাল নামে আমার কাছে একজন কুরিয়ারকে পাঠানো হয়। পার্টিতে ওর নাম শিবু। বয়স খুবই কম, হয়তো ১০-১১ বছর হবে। তার কাছে তার বড় ভাই রতনের খতম হওয়ার কাহিনি শুনেছি। রতনের আসল নাম মোস্তফা সাদেক। সে ১৯৭৩ সাল থেকে পার্টির সার্বক্ষণিক কর্মী। সে কাজ করত ঢাকার কেরানীগঞ্জে। একটি মেয়ের সাথে তার রিলেশন গড়ে ওঠে। এ ব্যাপারে পার্টির অনুমতি ছিল না। এ অপরাধে তাকে পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হয়।

রতন সদ্য কৈশোর পেরোনো যুবক। পরিবার স্বজন ছেড়ে সে এসেছে বিপ্লব করার জন্য। তার পক্ষে তো হুট করে ঘরে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। বহিষ্কৃত হওয়ার পর সে পার্টির কোনো কোনো সহানুভূতিশীলের বাসায় যেত, থাকত। তাদের কাছ থেকে হয়তো টাকা-পয়সা নিত। খাওয়া-পরার জন্যও তো টাকা দরকার।

এখন তার বিরুদ্ধে ডাবল অভিযোগ। এক নম্বর হলো 'অবৈধ প্রেম'। দুই নম্বর হলো 'পার্টির অর্থ আত্মসাৎ'। সুতরাং তার মৃত্যুদণ্ড হলো। শিবুর কাছে শুনেছি, পার্টির গেরিলারা যখন তাকে খতম করতে যায়, সে মুহূর্তে রতন নাকি বেয়নেটের সামনে বুক পেতে দিয়ে বলেছিল, 'আমাকে মাইরা যদি বিপ্লব হয়, তা হলে মারেন।' আমার অবাক লাগে! বড় ভাইয়ের এভাবে

খতম হওয়ার পরও শিবু পার্টির প্রতি আস্থা রেখেছিল।

আমার সাথে শিবুর ঘনিষ্ঠতা ছিল। সে আমাকে অনেক কথা বলত। সে বলেছিল, 'আমার ভাই রতনকে খতম করার তিনদিন আগে পার্টির দেওয়া মৃত্যুদণ্ড ঘোষণাটি আমাকে পড়ে শোনানো হয়। পরদিন তার সাথে আমার দেখা হয়েছে। আমি খবরটি জানিয়ে তাকে সাবধান করতে পারতাম। তাহলে সে হয়তো পালিয়ে বেঁচে যেত। কিন্তু তখন তো পার্টি আর বিপ্লব ভাইয়ের চেয়েও বড়। তাই পার্টির সাথে বেইমানি করতে পারিনি।'

শিবুর এমন কী বয়স? যেদিন সে বড় হবে, সবকিছু বুঝতে শিখবে, যখন উপলব্ধি হবে যে, তার ভাই এমন কোনো অপরাধ করেনি যে জন্য তাকে খুন করতে হবে। পার্টি এ কাজ করে অন্যায় করেছে। তখন তার সামনে আমাদের মহান বিপ্লবী নেতারা মুখ দেখাবে কী করে?

– শুনেছি, আপনাদের খতম অভিযান থেকে পার্টির নারী সদস্যরাও বাদ যাননি।

তাহলে আরেকটি কাহিনি শুনুন। ঢাকার চকবাজারে আমাদের একটা শেল্টার ছিল। সেখানে একদিন নতুন একটা মেয়ে এল। নাম আলেয়া, মুন্সিগঞ্জ থেকে সদ্য এসএসসি পাস করে এসেছে। মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে। বিপ্লব নিয়ে তার মনে অনেক স্বপ্ন, অনেক রোমান্টিকতা। শেল্টারে এসে তার কল্পনায় ধস নামে। কঠোর নিয়মকানুন দেখে সে ভড়কে যায়। ঘটনাটি আরও জটিল করে তোলে সালমা নামের একটা বাচ্চা মেয়ে।

সালমার বাড়ি মুন্সিগঞ্জে। অজপাড়াগাঁয়ের গরিব ঘরের মেয়ে। বয়স বড়জোর দশ। অনটনের সংসারের বোঝা কমাতে বাবা-মা তাকে পার্টির লোকের হাতে তুলে দিয়েছিল। ভেবেছিল, অন্তত দুমুঠো খেতে পারবে।

আলেয়া খুব চাপা স্বভাবের। মনে হতো, সে বুঝি বোবা। পার্টির শেল্টারে এসে সে পেল একটা রহস্যময় পরিবেশ। সবাই অতি সাবধান, ফিসফাস করে কথা বলা। সে হাঁপিয়ে উঠল। শেল্টারে নতুন একটা মেয়ে আসায় আলেয়া যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। একদিন দেখা গেল, দুটি মেয়েই উধাও। এদিক-সেদিক খুঁজে তাদের পাওয়া গেল না। শেল্টারের অন্য সদস্যরা দুশ্চিন্তায় পড়ল। ভয় পেয়ে তারা কাগজপত্র সরিয়ে ফেলল। দুয়েকজন নারী কর্মী ছাড়া সবাই শেল্টার ছেড়ে অন্য জায়গায় চলে গেল।

শেল্টারে আসা নতুন মেয়েটিকে নিয়ে আলেয়া সদরঘাটে গেল। তাকে

তুলে দিল মুন্সিগঞ্জের লঞ্চে। তারপর সে কায়েতটুলীতে তার এক আত্মীয়ের বাসায় যায়। তাদের সবকিছু খুলে বলে। সব শুনে বাসার সবাই আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। আলেয়া আরও ঘাবড়ে যায়। সাত-পাঁচ ভেবে সে ফিরে আসে চকবাজারের শেল্টারে। তখন সেখানে একজন বয়স্ক নারী কর্মী ছিলেন। আলেয়া তাকে বলল, 'আপা, আমি ভুল করে ফেলেছি। আমাকে মাফ করে দেন।'

তার এ ভুল পার্টি মাফ করেনি। পার্টির শৃঙ্খলা ভাঙা এবং নেতা-কর্মীদের নিরাপত্তায় বিঘ্ন ঘটানোর অভিযোগে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। অথচ তার কী-ই বা বয়স! ষোলো-সতেরো হবে। তাকে খতম করে বিপ্লব এগোল কত দূর!

১৯৭৩-৭৪ সালে পার্টির ভরা জোয়ার। জোয়ারের নতুন পানির মাছের মতো ঝাঁকে ঝাঁকে কিশোর-তরুণরা পার্টিতে যোগ দিচ্ছে। এরা সবাই শহর কিংবা গ্রামের মধ্য বা নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তান। বিপ্লবের জন্য সবাই টগবগ করছে। রাতারাতি বিপ্লব করার উন্মাদনা, গুপ্তহত্যার রোমান্স, এসব প্রবণতা তাদের পেয়ে বসেছে। একজন কল্পিত শত্রুকে খতম করতে পারাটাই তাদের কাছে বিপ্লব। এ ধরনের খুনখারাবি হয়েছে অনেক। পেটিবুর্জোয়া রোমান্টিকতায় আচ্ছন্ন হয়ে ছোটখাটো ভুল করার কারণে অনেকের কপালেই জুটেছে মৃত্যুদণ্ড।

– হাতের কাছে অস্ত্র থাকলে তার ট্রিগার টেপার জন্য ওই বয়সের তরুণদের আঙুল নিশপিশ করে। ট্রিগার-হ্যাপি জেনারেশনের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র চলে যাওয়ায় অনেকেই মানসিক ভারসাম্য রাখতে পারেনি।

আসলেই এরকম হয়েছে। কথায় কথায় বিপ্লব। পান থেকে চুন খসলে মার্কসবাদ অপবিত্র হয়ে যাবে। সাধারণ মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিপ্লবী জোশে মেতে থাকা। এগুলো হচ্ছে পেটিবুর্জোয়া তরুণদের শ্রেণিগত বৈশিষ্ট্য। একসময় তারা ভাবতে থাকে, তারা জগতের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। কল্পনায় নিজেদের বানায় হিরো। এদের দৌরাত্ম্যে বিপ্লবের বারোটা বেজে গেছে।

মূল পার্টির কয়েকজন, আমি, কমরেড রানা এবং কমরেড জ্যোতি গ্রেপ্তার হওয়ার পর পার্টির নেতৃত্ব এককভাবে জিয়াউদ্দিনের হাতে চলে যায়। তখন আন্তঃপার্টি সংগ্রামের নামে হত্যার রাজনীতি আবার শুরু হয়। একই সাথে বাড়তে থাকে তত্ত্বগত বিভ্রান্তি। পার্টি আবারও ভাগ হয়। এই আত্মঘাতী

কর্মকাণ্ডের সারসংকলন আজও হয়নি।

এ দেশে আলোকপ্রাপ্ত শিক্ষিত তরুণরা অসংখ্য ছোট ছোট দল-উপদলে ভাগ হয়ে একধরনের রোমান্টিক বিপ্লবী কর্মকাণ্ড চালিয়েছে এবং সবই চলেছে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের নামে। তারা প্রত্যেকেই মনে করে তারাই একমাত্র সঠিক বিপ্লবী এবং তারাই বিপ্লব ঘটিয়ে ফেলবে। আসলে বিপ্লবের নামে তাদের কাজগুলো হয়েছে নৈরাজ্যবাদী ও হঠকারী।

– এই যে ব্যাংক, বাজার, বিভিন্ন জায়গা থেকে আপনারা টাকা সংগ্রহ করতেন, এসব কীভাবে কালেকশন হতো, জমা হতো?

তখন তো কেন্দ্র একটাই, সিরাজ সিকদার। সবই তার কাছে জমা হতো। এদিক দিয়ে পার্টি কিন্তু টোটালি পিউরিটান। একেবারে পূত-পবিত্র। মানে খোলাফায়ে রাশেদিন। সিরাজ সিকদার একেবারে পয়গম্বর। যখন হাজার হাজার লাখ লাখ টাকার ব্যাংক অপারেশন হচ্ছে, তেহাত্তর চুয়াত্তর সালে, লাখ লাখ টাকা জরিমানা আদায় করা হচ্ছে, ফরিদপুর এবং বরিশালের অর্ধেক জায়গা আমাদের দখলে—অঘোষিত মুক্তাঞ্চল, আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা সব ঢাকায়, এলাকায় থাকতে পারে না। তখন তো আমাদের বিশাল ফান্ড। ওই সময় আমরা মনেশ্বর রোডে কেন্দ্রীয় শেল্টারে থাকি। বাড়ি ভাড়া ৬০০ টাকা। হাফ দেয়াল, টিনশেড, ছোট ছোট দুই রুমের বাসা। আমি, আমার ওয়াইফ আর আমার পিচ্চি, আরেকটা পিচ্চি আর জামিল ভাই, আমরা থাকি। আবার সিকদার যদি সপরিবার চিটাগাং থেকে আসে বা অন্য কোনো জায়গা থেকে ঢাকায় আসে, তখন সে বউ আর দুই বাচ্চা নিয়া আসে। তখন আমরা দুই রুমের মধ্যে, ওই যে সদরঘাটে আট আনা, এক টাকা ভাড়ায় সিট ছিল না? ওইভাবে থাকি। মহিলাদের এক ঘরে দিয়ে দিই। আট-দশজন পুরুষ, দশ ফিট বাই সাড়ে দশ ফিট একটা রুমে সদরঘাটের বোর্ডিংয়ের মতো আমরা থাকি। ৬০০ টাকার বাসা, তখন লাখ লাখ টাকার অপারেশন হচ্ছে।

এখানে সিরাজ সিকদার একটা প্রফেট না? সে একটা প্রফেট। তার কর্মীরা একেকজন ক্ষুদে প্রফেট। কোনোভাবে একটা পয়সাও এদিক-ওদিক হতো না। কড়ায়গণ্ডায় হিসাব করে কেন্দ্রে পাঠানো হতো।

এই পয়গম্বরির কারণও আছে। সিরাজ সিকদারের পয়গম্বরি হলো তার কোয়ালিটি, তার বিপ্লবী চেতনা। সাধারণ কর্মীদের মধ্যে তো ওই প্রফেসি

নেই। সে আন্তরিকভাবে বিপ্লব চায়। আবার ভয়ও আছে। টাকা যদি এদিক-সেদিক হয়, তাহলে গলা কাটা যাবে।

– ঢাকা শহরের কাজ সমন্বয় করত কে?

জামিল যতদিন ছিল সে একাই দেখত। আমি তাকে নাম দিয়েছিলাম আণবিক রি-অ্যাক্টর। এক হাজার লোকের কাজ সে একা করতে পারে। এরকম কাউকে আমি জীবনে দেখিনি। খুবই এফিশিয়েন্ট, এনার্জেটিক। সে ঢাকা শহর চষে বেড়াত, প্রোগ্রাম করত এবং টোটালটাই সে নিয়ন্ত্রণ করত। সবকিছু ছিল তার নখদর্পণে।

– তখন দেখেছি, দেয়ালে আপনারা চক দিয়ে চিকা মারতেন। অন্য কোনো দল চক ব্যবহার করত না। এ আইডিয়া এল কীভাবে?

রং দিয়ে চিকা মারা তো রিস্কি। রং বানাতে হবে, আনতে হবে, ডিব্বা জোগাড় করতে হবে, ডিব্বা নাড়াচাড়া করতে হবে। অনেক ঝামেলা। পুলিশ ও রক্ষীবাহিনী এলে তো দৌড়ে পালাতে হবে। দৌড়ে চলে গেলে হবে না। আরেক জায়গায় চিকা মারতে হবে। ডিব্বায় যদি রং থাকে, পুলিশ তাড়া করলে ডিব্বা ফেলে দৌড়াতে হবে। তখন তো রং হারাব। চক তো আমার পকেটে। পুলিশ আমাকে তাড়া করলে অন্য গলিতে ঢুকে সেখানে চিকা মারা শুরু করব। এই সুবিধার জন্যই চক দিয়ে চিকা মারা হতো।

বুলু

আমার জন্ম হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনার শামনগরে। বাবা ছিলেন গারুলিয়া জুট মিলের ডাক্তার। সেখানে থাকতেই কোচবিহারে একটা বাড়ি তৈরি করেন। আমরা কোচবিহারে আসি বাবা রিটায়ার করার পর। আমার দাদা-দিদি আর কাকারা এই বাড়িতে থেকে শহরের স্কুল-কলেজে পড়তেন। তারা পরে পূর্ব পাকিস্তানে চলে যান।

১৯৭০ সাল। আন্দোলনের ঢেউ চারদিকে। উচ্চমাধ্যমিক পাস করে কলেজে পড়ছি। পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেখে আমায় ঢাকায় রেখে আসা হলো। মেজদা বললেন, আর্ট কলেজে ভর্তি করিয়ে দেবেন। একদিন তিনি একজনকে বাড়িতে নিয়ে এলেন। পরিচয় হলো। দেখলাম ছোটখাটো চেহারার সুদর্শন ভদ্রলোক। চোখে কালো ফ্রেমের পুরু লেন্সের চশমা। ঠোঁটের ওপর সরু গোঁফ। বড় বড় টানা চোখ।—এই হচ্ছে আজমী। তোকে এর কথা বলেছিলাম।

এরপর উনি প্রায়ই আসেন—সামিউল্লাহ আজমী। আমাকে রাজনৈতিক লাইন বোঝান। পূর্ব বাংলা কীভাবে পাকিস্তানের উপনিবেশ। সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে দেশকে মুক্ত করতে হবে। একদিন বোকার মতো একটা প্রশ্ন করলাম, আপনি কোথায় থাকেন? ভদ্রলোক কিছু বলার আগেই দ্বিতীয় প্রশ্ন, আপনার বাড়িতে কে কে আছেন? আজমী আমার মুখের দিকে চুপচাপ তাকিয়ে থাকলেন। তারপর শান্তভাবে বললেন, আমি আপনার সঙ্গে এসব আলাপ করতে আসিনি। ব্যক্তিগত বিষয় জানার কোনো দরকার আছে কি?

আজমী প্রায়ই আসছেন। সংগঠনের লাইন বোঝাচ্ছেন। আমি সংগঠনে যোগ দেওয়ার ব্যাপারে মনস্থির করে ফেলেছি। ভারতীয় বংশোদ্ভূত হওয়া সত্ত্বেও বাংলার সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ হলাম।

মেজদা আমার বিয়ে দেওয়ার তোড়জোড় করছেন। আমি এটা চাচ্ছিলাম না। একদিন আজমী বাড়ির পরিস্থিতি বুঝতে পেরে আমাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ হলের একটি ঘরের চাবি দিয়ে বললেন, কখনো পরিস্থিতি খারাপ মনে হলে ওই হলে চলে যাবেন। ওখানে অপেক্ষা করব।

একদিন ভাবলাম, যাই। কী হয় দেখি। ঢাকার রাস্তাঘাট তেমন চিনি না। রিকশা নিয়ে গেলাম সলিমুল্লাহ হলে। ভাড়া মিটিয়ে হলে ঢুকলাম। নির্দিষ্ট ঘরের সামনে গিয়ে যখন তালা খুলছি, দেখি ঘরের দরজার কাছে অনেকগুলো গোল গোল ছানাবড়া চোখ। মনে মনে হেসে ঘরে ঢুকে পড়লাম। দরজা বন্ধ করে বসলাম। দেখলাম দুটি বিছানা। একটি টেবিলের ওপর কবি সুকান্তের সেই বিখ্যাত গালে হাত দেওয়া চিরতরুণ ছবি। টেবিল থেকে লেনিনের একটি বই নিয়ে বসে পড়লাম। ওই অবস্থায় কি মন বসে? প্রায় আধঘণ্টা এক অদৃশ্য সঙ্গীর জন্য অপেক্ষা করে বইটি কাঁধের ব্যাগে চালান করে বের হলাম।

সলিমুল্লাহ হল থেকে ফিরে বৌদির প্রশ্নের মুখে পড়লাম।

কোথায় গিয়েছিলে?

একটা কাজে।

তুমি ঢাকার রাস্তাঘাট চেনো না। কার সঙ্গে গেলে?

একা।

তুমি বললেই বিশ্বাস করতে হবে? ওই আজমী নিশ্চয়ই। জানো, ও তো বিহারি। ওকে তো ভালো করে চেনো না।

এর মধ্যেই দাদা এলেন। চলল বকাবকি। বাইরে বেরোনো বন্ধ হলো। আজমীর সঙ্গেও ওদের ঝামেলা হলো একদিন। আমি সেদিনই তাকে জানিয়ে দিলাম আমার সিদ্ধান্ত। পরদিন দাদা গেছেন নিউমার্কেটে। সেই সুযোগে আজমী হাজির। আমি তো তৈরিই ছিলাম। বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এলাম। নিচে দেখলাম আরও একজন দাঁড়িয়ে। তার নাম সুলতান।

আমি আজমীর সঙ্গে রিকশায়। সুলতান সাইকেলে। আমাকে নিয়ে প্রথমে ওরা গেল আকা ভাইয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং হলে। দেখলাম বেশ আমুদে লোক। তিনি চা-নাশতা দিয়ে আপ্যায়ন করলেন। বললেন, স্বাগত নতুন কমরেড। সেখান থেকে ওরা আমাকে নিয়ে গেল বস্তির মতো একটা জায়গায়। পরে শুনেছি, জায়গাটার নাম খিলগাঁও। একটা টিনশেড বাড়ি। দরজায় কড়া

নাড়তেই একজন মহিলা খুলে দিলেন। বললেন, ভেতরে আসো।

ভেতরে একটা ঘরে গেলাম। টেবিলের ওপর হারিকেন জ্বলছে। বিছানায় বসে আছেন একজন। সাদার ওপর নীল রঙের সরু স্ট্রাইপড শার্ট আর ধূসর রঙের প্যান্ট। হেসে তাকালেন আমার দিকে। লম্বা, দোহারা চেহারা। গায়ের রঙ চাপা, চোখে চশমা। আমাকে দেখে বললেন, তাহের, এ তো বাচ্চা মেয়ে।

আজমীর ছদ্মনাম তাহের। সদর্পে বললাম, মোটেই না, উনিশ। হেসে উঠলেন তিনি। কমরেড তাহের এবার পরিচয় করিয়ে দিলেন, ইনি আমাদের ভাইয়া। আর ইনি আপা। বুঝলাম, এর বেশি পরিচয় পাব না। ভাইয়া বললেন, ওর একটা নাম দিতে হয়। আপা বললেন, সুফিয়া হলে কেমন হয়? এরপর আশপাশের কমরেডদের কাছে আমি হলাম সুফিয়া।

এই বাড়িতে শুরু হলো আমার অন্তরাল জীবন। ওদিকে দাদারা আমার খোঁজে তৎপর। তারা আজমীর বাড়িতে লোকলস্কর নিয়ে ঝামেলা করল। পরে গেল পুলিশের কাছে। আত্মীয়স্বজন আর পুলিশ আমাকে খুঁজছে। আমি ঘরে বসে নেতার লেখা আর্টিকেল সাইক্লোস্টাইল কপি করার জন্য স্টেনসিল কাটছি। আমাদের কাছে হ্যান্ডরোলার প্রিন্টার ছিল। হাতে লিখে রোলার প্রিন্টার দিয়ে যত খুশি কপি করা যেত।

যে আপার কথা বলছি, তিনি ছিলেন আফ্রো-এশিয়ান রাইটার্স ব্যুরো থেকে পুরস্কার পাওয়া লেখিকা। তার নামে হুলিয়া। তিনি একটু বিখ্যাত ছিলেন বলে জায়গাবিশেষে বোরখা পরতেন।

কমরেড তাহেরের ছোট ভাই রাজিউল্লাহও সংগঠনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তবে সার্বক্ষণিক কর্মী ছিলেন না। তিনি এ বাসায় এসে খবর দিতেন, আমার আত্মীয়রা কীভাবে ওদের বাড়িতে গিয়ে উত্ত্যক্ত করছে। তারা কেস ঠুকেছিল আজমীর বিরুদ্ধে যে, তাদের নাবালিকা মেয়েকে অপহরণ করা হয়েছে। আজমীর বাবা সংগঠনের কাছে অনুরোধ করলেন, ডাক্তারি পরীক্ষা করে আমার আসল বয়সটা যেন জেনে নেওয়া হয়।

সারা শরীর এক্স-রে হলো। রিপোর্টে প্রমাণ হলো আমি সাবালিকা। কেসে দাদারা হেরে গেলেন। এ কেস উঠে যাওয়ার পর পাকিস্তান সরকার কেস দিল 'নক্সালাইট ইনফিলট্রেশন ফ্রম ওয়েস্ট বেঙ্গল টু ইস্ট পাকিস্তান'।

১৯৭০ সালের ৫ মে একটা প্রতীকী অ্যাকশন হয়েছিল। ঢাকায় পাকিস্তান

কাউন্সিল ও ইউসিস লাইব্রেরির ওপর হামলা। সেদিনই তাহের-সুফিয়ার বিয়ে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে অনুমোদন পায়।

– আপনারা কি বরাবর ঢাকায় ছিলেন? ঢাকার বাইরে যাননি?

কয়েক দিন পর আমরা বরিশালে যাই। আমার যাওয়ার ব্যাপারে কিছু প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। একজন নেতৃস্থানীয় কর্মী উষ্মা প্রকাশ করেছিলেন। কারণ, আমি চলে গেলে ঘরের সব কাজের দায়িত্ব তার কাঁধে চাপবে। পরে বুঝেছিলাম, আদর্শের প্রতি প্রত্যেক কর্মীর নিজস্ব একটা উৎসর্গের ভাবনা তৈরি হয় উপরিস্তরের সমালোচনা ও শিক্ষার ফলে। কিন্তু তাদের নিজেদের মধ্যে ঘাটতি থেকে যায়। সমালোচনা-আত্মসমালোচনা যতটা নিষ্ঠার সঙ্গে আমরা দেখতাম, ততটা উপরিস্তরে দেখা হতো না। এর ফলে আমার অবচেতন মনে প্রশ্ন তৈরি হয়েছিল।

বরিশাল লঞ্চঘাটে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল জলিল নামের একটি ছেলে। সে আমাদের একটা বাড়িতে নিয়ে গেল। বরিশালের একটা বৈশিষ্ট্য চোখে পড়েছিল। এই শহরের মানুষের আধুনিক মন, পড়াশোনা, চিন্তা-চেতনা ছিল চোখে পড়ার মতো। মনে হতো, সমস্ত শহরটাই আমার বাড়ি।

দুজন কর্মী বোমা বানাতে গিয়ে সমস্যায় পড়ে। বোমা ফেটে যায়। একজন ধরা পড়ে। সে আমাদের আস্তানা চিনত। ফলে সে বাসা ছেড়ে অন্য জায়গায় যেতে হলো। সেখানেও টিকটিকি লাগল পেছনে। এরপর কল্যাণকাঠিতে কিছুদিন কাজ করলাম। সেখানে আপা এবং ভাইয়াও এসেছিলেন। বাসাটি কমরেড রাসেলের।

তাহেরের হার্টের সমস্যা ছিল। ভাইয়া তাহেরের ব্যাপারে খুব চিন্তিত ছিলেন। ঢাকায় ফিরে তাহেরকে ডাক্তার দেখানোর ব্যবস্থা করলেন ভাইয়া। নানান পরীক্ষার পর বলা হলো, আরেকটা পরীক্ষা করাতে হবে ঢাকা মেডিকেল কলেজে। এটা তাহেরের জন্য খুব ঝুঁকিপূর্ণ।

তাহেরকে বিশিষ্ট হার্ট স্পেশালিস্ট ডা. ফজলে রাব্বিকে দেখানো হবে বলে সাব্যস্ত হলো। আমি তাকে নিয়ে গেলাম বোরখা পরে। কোমরে গুঁজে নিলাম ছটা টাটকা কার্তুজ ভরা একটা রিভলবার। মেডিকেলে রোগীর ভিড়। যখন ডাক এল, চেম্বারে ঢুকলাম। দেখলাম, অসম্ভব সুদর্শন দীর্ঘদেহী একজন মানুষ। তাহের তার সমস্যার কথা বলল। ডাক্তার সাহেব বললেন, মেডিকেলে ভর্তি হতে হবে। তাহেরকে এবার মুখ খুলতে হলো।

আমার একটু অসুবিধে আছে ভর্তি হয়ে থাকার।

কী অসুবিধে?

আমার বিরুদ্ধে অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট আছে।

হোয়াট?

হ্যাঁ, ডাক্তার সাহেব। পাকিস্তান কাউন্সিল ও ইউসিস লাইব্রেরির ওপর অ্যাকশনের। তা ছাড়া এই সংগঠনের সব কর্মীরই এই বিপদ?

কোন সংগঠন? আপনাদের উদ্দেশ্য কী?

পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন। আমরা পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা চাই।

ওঃ গড! উনি কে?

আমার স্ত্রী। একই পথের পথিক।

ওনার নামেও?

হ্যাঁ, ডাক্তার সাহেব।

ডাক্তার সাহেব ঝটতি হাত রাখেন কলবেলের ওপর, আর ততোধিক দ্রুত আমার হাত চলে যায় বোরখার ভেতর ঠান্ডা হাতলের ওপর। বেল শুনে বেয়ারা এল। মনে মনে ভাবছি, বলবেন যে পুলিশকে খবর দাও। বললেন, এই সাহেব আর মেমসাহেবকে দেখে ভালো করে চিনে রাখো। এরপর এলে কোনো স্লিপ দেবে না। সোজা চেম্বারে ঢোকাবে। বুঝলে?

আপনারা করেছেন কী? এতক্ষণ ধরে বাইরে বসে আছেন?

হায়! একাত্তরের ১৪ ডিসেম্বর অন্য বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে ডা. ফজলে রাব্বিকেও হত্যা করেছিল ঔপনিবেশিক শক্তির দালালেরা।

– আপনারা দেশের জন্য একটা পতাকার ডিজাইন করেছিলেন?

পতাকার কথায় প্রথমেই মনে এল জাপানের পতাকার কথা। সাদা জমিতে লাল বৃত্ত। খুব সহজ, ছিমছাম। তাহেরের সঙ্গে আলাপ করলাম। তৈরি হলো সবুজ জমিতে লাল বৃত্ত। সবুজ হলো শ্যামল বাংলার প্রতীক এবং লাল বৃত্ত হলো উদীয়মান সূর্য। আবার লাল হলো কমিউনিজমের প্রতীক। পরে কোনো একটা বৈঠকে আমাদের নেতারা এই পতাকার একটা খসড়া পেশ করেন। শুনেছি, বৈঠকটি হয়েছিল অন্য কয়েকটি দলের সঙ্গে।

– এরপর কী করলেন? কোথায় গেলেন?

আমরা চট্টগ্রামে গেলাম। হালিশহরে অবাঙালি মহল্লায় একটা বাসা ভাড়া নিলাম। দুই কামরার বাসা। মাঝে একফালি বারান্দা। সেখানে রান্নার

ব্যবস্থা হলো। কলঘর আর ল্যাট্রিন একটু দূরে। জায়গাটা পাঁচিলে ঘেরা। প্রথমে ছিলাম আমি, তাহের ও শহীদ ভাই। পরে আসে দুলু ও রায়হান। দুলু ছিল তাহেরের ন্যাওটা। ওই মহল্লায় তাহেরের পরিচয় হলো অবাঙালি সাংবাদিক। উর্দুভাষী তাহেরের সঙ্গে প্রতিবেশীদের বেশ ভাব হলো।

– আপনাদের সঙ্গে হাফিজ নামের কেউ ছিল? বরিশালের?

বরিশালের একটা ছেলে এসেছিল। ও কিছুদিন ছিল আমার সঙ্গে। ওর নাম দীপু। আসল নাম তরিকুজ্জামান। আমরা ওদের বরিশালের বাসায়ও গেছি। ওর মা জাহানারা বেগম একজন সুপরিচিত সমাজসেবী। প্রগতিশীল রাজনীতি করতেন। ১৯৫৪ সালে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করেছিলেন।

– কেমন ছিল আপনাদের চট্টগ্রামের জীবন?

খুব কম পয়সায় চলতে হতো। আলুসেদ্ধ আর ভাত। কখনো ডাল আর পাপড়ভাজা। আবার কখনো আলুসেদ্ধ, পেঁয়াজ, লংকা আর একটু তেল। তাতে একটা ভাজা পাপড় গুঁড়ো করে মাখা।

আমাদের বাসাটা ছিল বিহারি কলোনির শেষ প্রান্তে। এক সন্ধ্যায় দেখি কলোনিতে সাজ সাজ রব। কোথা থেকে সব টাঙ্গি, তলোয়ার, রড, সড়কি এসে জড়ো হচ্ছে উল্টো দিকের বাসায়। শুরু হলো বাঙালি-অবাঙালি দাঙ্গা। আমরা চট্টগ্রাম ছাড়লাম।

হেঁটে রওনা হলাম রামগড়-সাবরুম সীমান্তের দিকে। একটা ছড়া পার হয়ে সাবরুমে পৌঁছলাম। আগরতলা হয়ে কোচবিহারের উদ্দেশে রওনা হলাম। বাড়িতে পৌঁছে দেখা হলো সবার সঙ্গে—মা, বড়দি, ছোড়দা। একটা আবেগঘন পরিবেশ তৈরি হলো।

প্রায় দুমাস ছিলাম। তারপর কলকাতা। বনগাঁ হয়ে ঢুকলাম কুষ্টিয়ায়। তারপর ঢাকা। লালমাটিয়ায় একটা বাসায় দেখা পেলাম সবার—ভাইয়া, আপা এবং অন্য সব সাথিদের।

তাহেরের বাবা-মা এসেছিলেন দেখা করতে। তারা করাচি চলে যাবেন। তাহেরকে অনেক করে বললেন সঙ্গে যেতে। তাহের রাজি নয়। তারা ঢাকা ছাড়লেন ভগ্নহৃদয়ে। ছেলের সঙ্গে তাদের আর দেখা হয়নি।

– একাত্তর সালটা তো অন্য রকম। কেমন অভিজ্ঞতা হলো?

ভারত থেকে ফিরে আসার পর ভাইয়া আর আপার সঙ্গে এক নং বাসায় কয়েক দিন ছিলাম। পরে অন্য বাসায় স্থান হলো আমাদের, অন্য সাথিদের

সঙ্গে। তখনো আমি ক্রনিক অ্যামিবিক ডিসেন্ট্রি থেকে সেরে উঠিনি। এদিকে তাহেরকে পাকাপাকিভাবে এক নং বাসায় চলে যেতে হলো। তাহেরের অনুমতি নেই আমার সঙ্গে কথা বলার বা দেখা করার।

একদিন সে এল। মুখে বলল বাইরে যাচ্ছি কাজে। বলে চলে গেল। সে গেছে সাভার। প্রায় দুমাস পার হয়ে গেছে। আমাকে এক নং বাসায় ফিরিয়ে আনা হয়েছে, কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অধীনে। তাহের আর তার সঙ্গীদের কোনো খবর পাওয়া যাচ্ছে না। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। আমাকে এমনই বলা হলো। তারপর একদিন শুনলাম, তাহের আর নেই।

তাহের চলে যাওয়ার পর আমার একটা আলাদা অবস্থান তৈরি হওয়ার কথা। ছিলাম কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অধীনে। বাসায় থাকলে আগের মতো ঘরের কাজই করতে হতো। এবার পাঠানো হলো ফরিদপুর, একটা রিপোর্ট সংগ্রহ করতে। কিছু জরুরি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে আমার সক্রিয়তা দেখে সেখানকার নেতৃত্ব আমাকে পলিটিক্যাল কমিসার হিসেবে চেয়ে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে আবেদন করে। তাতে আমি অভিযুক্ত হই এই বলে যে, আবেদনের জন্য আমি তাদের প্রভাবিত করেছি।

এবার অভিযোগ চেহারার বিরুদ্ধে। বুদ্ধিজীবীর ছাপ নষ্ট করতে হবে। যেতে হবে বস্তিতে। আমি মহাখুশি মোটা সাদা থান পরে বিধবার পরিচয়ে আশ্রয় পেলাম বস্তির এক কমরেডের ঘরে। এরপর তেজকুনিপাড়ার এক সহানুভূতিশীলের বাড়িতে থেকে কমলাপুর রেলস্টেশনের বস্তিতে কাজের চেষ্টা করলাম।

এরপর একটা কংগ্রেস হলো। সেই কংগ্রেসে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে বেশ রদবদল হলো। নেতার চারপাশে জড়ো করা হয়েছে একদল স্তাবক। নেতার সমালোচনা করার সাহস নেই। তিনি যা বলেন, তাতেই সায়। সমালোচনার মনোবৃত্তির অভাব অবশ্য তাহেরের মধ্যেও দেখেছি। এই কংগ্রেসের পর আমাকে পাঠানো হলো পাহাড়ে, সেখানকার নেতৃত্বের সাংগঠনিক সহকারী হিসেবে।

– ভাইয়া অর্থাৎ সিরাজ সিকদারকে কেমন দেখেছেন?

এই মানুষটাকে প্রথম দেখি ১৯৭০ সালে। তখন যে রকম দেখেছিলাম, একাত্তরের পর ড্রাস্টিক চেঞ্জ দেখেছি। প্রথম দিকে খুব সহজসরল ছিলেন। কোনো রাগ নেই। পরে অনেক বদলে গেছেন। আরাম-আয়েশে থাকার ইচ্ছা, শহরকেন্দ্রিক জীবনযাপন, বদমেজাজ, নারীর প্রতি দুর্বলতা এগুলো ছিল।

ফলে তাকে তাড়াতাড়ি চলে যেতে হলো। আত্মসমালোচনা একেবারেই ছিল না। শেষের দিকে তিনি চারপাশে কোনো সমালোচককে রাখেননি। চাটুকার পরিবেষ্টিত ছিলেন। ব্যক্তিত্বহীন মানুষেরা জড়ো হয়েছিল। আত্মসমালোচনা, ভুল স্বীকার করা, জীবনচর্চা, এসবের দরকার ছিল।

– কোনো যৌথ নেতৃত্ব ছিল না।

কোনো রাজনৈতিক উত্তরাধিকারী তৈরি হয়নি।

– আপনি তো দলকে ভেতর থেকে দেখেছেন?

পার্টির বাইরের আর ভেতরের চেহারা একেবারেই আলাদা। আমি তো নেতৃত্বকে খুব কাছে থেকে দেখেছি। এত কাছে থেকে যে, বলে বোঝানো যাবে না। আপা (জাহানারা হাকিম) ছিলেন বিশাল বড়লোকের বউ। তার ছিল ঝি-চাকর খাটানোর অভ্যাস। তাদের ওপর তিনি খবরদারি করতেন। এ ধরনের দুর্বলতা ছিল। আমার মধ্যে যেমন দুর্বলতা ছিল, তাদের মধ্যেও ছিল। সুলতানকে পরের দিকে আমি সহ্যই করতে পারতাম না।

দিনের শেষে বলব, নেতৃত্বের পলিটিক্যাল লাইন, আজও তার প্রয়োজন আছে। সবচেয়ে বড় ত্রুটি হলো, এরা নিজেদের দিকে তাকাননি। নিজেদের আলাদাভাবে গড়ে তুলতে হবে, তা তাঁদের ছিল না। চারু মজুমদার বা সিরাজ সিকদার সবাই ভুলের মাশুল দিয়েছেন।

– সিরাজ সিকদারের গ্রেপ্তার হওয়া নিয়ে নানা গল্প আছে। তাকে কি কেউ ধরিয়ে দিয়েছে? আপনার কি কাউকে সন্দেহ হয়?

কী করে বলব? তিনি ধরা পড়লেন চট্টগ্রামে। আমি তো তখন সেখানে ছিলাম না। আমি ছিলাম কুমিল্লায়। পরে সেখানে গেছি, কেউ নিশ্চয়ই বিট্রে করেছে। তা না হলে তো ধরা পড়ার কথা নয়। সন্দেহের তালিকায় আমাকেও রাখা হয়েছিল। আমি কামাল হায়দারদের হিট লিস্টে ছিলাম। পারলে তো আমাকে গুলি করে মারে! আমার বিরুদ্ধে তদন্ত হয়েছিল।

– কে তদন্ত করেছিল?

জিয়াউদ্দিন। আমাকে সাত দিন জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন।

– আপনি ভারতে চলে গেলেন কোন সময়?

চিটাগাংয়ে আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। আমার টিবি হয়েছিল। স্কিন ইনফেকশন, হার্ট এনলার্জমেন্ট, এসব ছিল। ১৯৭৬ সালে আমি কোচবিহারে ফিরে যাই।

– আপনি বোধ হয় একটা জবানবন্দি লিখে দিয়েছিলেন।

আমি ক্যাডার হিস্ট্রি মেনটেইন করতাম।

– এরকম একটা লেখা সম্ভবত জিয়াউদ্দিনের ক্যাম্পে পাওয়া গেছে। আপনার লেখা। বুলু নামে সই করা।

আমার পার্টি নাম তখন বুলু। লেখাটা কি আপনার কাছে আছে? আমাকে দেখাবেন?

– এখনো হাতে পাইনি। জোগাড়ের চেষ্টায় আছি। পেয়ে যাব হয়তো। পড়াশোনা করেছেন কতদূর?

১৯৬৯ সালে হায়ার সেকেন্ডারি পাস করি। ঢাকায় আর্ট কলেজে ভর্তি হওয়ার কথা ছিল। ছিয়াত্তরে চলে আসার পর এখানে আবার পড়ালেখা শুরু করি। ১৯৭৯-৮০ সালে প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়ে গ্র্যাজুয়েশন করি।

– আপনার পুরো নামটা কী?

মনজি খালেদা বেগম। মনজি মানে লতা আর খালেদা মানে তরবারি। বুঝুন এবার!

– ঢাকায় কি আর এসেছিলেন?

২০১৫ সালে গিয়েছিলাম। কল্যাণপুরে বড়দার বাসায় ছিলাম।

– রাজনীতির সঙ্গে যোগাযোগ আছে?

খোঁজখবর রাখি। এখানে বামপন্থী গ্রুপগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ হয়।

– কবিতা লেখেন?

লিখি তো! আজই লিখেছি একটা :

আর চিৎকার নয় বন্ধু
বুকে সংহত করো ঘৃণা
চোখে চোখে কথা বলো
ইশারায় ভাঙো সীমা।
আর ক্রন্দন নয়
করো দৃপ্ত শপথ ঘোষণা
দিকে দিকে যাক ছড়িয়ে
গোপন প্লাবন রচনা।

আমার জবানবন্দি

১৯৭০-এর মার্চে পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের সার্বক্ষণিক কর্মী হয়ে আসার পর থেকেই দেখতে পাই ঘরোয়া কাজ ছাড়া আমার করার কিছুই নেই। দীর্ঘদিন পর্যন্ত আমি কোনো কাজ পাইনি। কমরেড তাহেরের সাথে বিয়ের পর তাঁর সাথে প্রথমে বরিশাল ও পরে চট্টগ্রামে আসি। এ সময়ে পরিচালক কমরেড তাহেরের অফিসে সামান্য কাজ করি। তাও অনিয়মিত এবং সাংগঠনিকভাবে কোনো দায়িত্ব ছিল না।

একজন কর্মী পার্টিতে আসার সাথে সাথে কিছু নিয়মিত দায়িত্বের সাথে জড়িয়ে পড়ে। এ ছাড়া কোনো কর্মীর সংগঠনে আসা অপ্রয়োজনীয় বলে আমি মনে করি। এর ফলে তখন অত্যন্ত মন খারাপ লাগত এবং এজন্য মতাদর্শগত পরিবর্তনও খুব একটা সম্ভব হয়নি। বরং আরও কিছু দোষত্রুটির উদ্ভব হয়, যেমন মেজাজ খারাপ, অভিমান ইত্যাদি। অবশ্য এগুলো আমি পরে সক্রিয়তার সাথে সারাবার চেষ্টা করি এবং সফলও হই।

গোলমালের সময় আমরা যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে ভারতে চলে যাই। ফিরে আসি অসুস্থ অবস্থায়। এ সময় তাহেরকে সব সময় আমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন রাখা হতো। কেন তা আমার জানা নেই। অবশেষে তাকে ফ্রন্টে পাঠানো হয়। দুর্ঘটনা ঘটার পর আমার প্রতি কোনো সহানুভূতি প্রদর্শন দূরে থাক, উল্টো আমার ওপর দোষারোপ করা হয় যে কমরেড তাহেরের মৃত্যুর জন্য আমিই নাকি দায়ী। আমার সঙ্গ সহ্য করতে না পেরে কমরেড তাহের নাকি ভাইয়ার কাছে আবেদন জানায় তাকে ফ্রন্টে পাঠানোর জন্য (এটা কেবল ভাইয়ার ভাষ্য)। অথচ ফ্রন্টে যাওয়ার আগে কমরেড তাহের আমার সাথে একটু দেখা করার জন্য আপার কাছে আকুল আবেদন জানিয়েছিলেন কেন? দেখা করতে না পেরে উনি আমার কাছে যে চিঠি লিখেছিলেন তাতে অবশ্যই এটা মনে হয় না যে তিনি আমার সঙ্গ সহ্য করতে পারতেন না।

আমার মতে, কোনো কম গুরুত্বপূর্ণ কর্মীর কারণে গুরুত্বপূর্ণ কর্মীকে বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়াটা অদ্ভুত ব্যাপার। প্রয়োজন হলে কম গুরুত্বপূর্ণ কর্মীকে বের করে দিতে হবে।

কমরেড তাহের ফ্রন্টে যাওয়ার পর থেকে আমি সভাপতির বাসায় ঝিয়ের পদে ছিলাম। আমার সাথে সভাপতির ব্যবহার ছিল ঠিক বুর্জোয়ার বাড়ির

ঝিয়ের মতো। আমার দাঁড়ানোর ভঙ্গি, বসার ভঙ্গি, চুল আঁচড়ানোর ভঙ্গি, গায়ের রঙের জন্য সমালোচনা শুনতে হয়েছে। আমাকে অতিরিক্ত আকর্ষণীয় দেখায়, এটাই আমার দোষ। অবশেষে এই অদ্ভুত অবস্থা থেকে আমি মুক্ত হওয়ার জন্য নিজের আলাদা শেল্টার খুঁজে নিই—আমার বোনের বাসায় থাকি এবং সেখানে টাইপ, শর্টহ্যান্ড শিখতে থাকি।

কিছুদিন পর আমাকে আবার সভাপতি তাঁর বাসায় নিয়ে আসেন এবং কেন্দ্রীয় কমিটির দপ্তরে তাঁর দপ্তর সচিবের শিক্ষানবিশ পদে নিযুক্ত করেন। এ সময় তিনি আমাকে বলেন যে আমাকে তিনি বিয়ে করতে চান। তবে তার আগে তিনি পরীক্ষামূলকভাবে দৈহিক সম্পর্ক করতে চান। পরিষ্কারভাবে তাঁকে জানাই তাঁর প্রতি আমার কোনো রকম দুর্বলতা নেই এবং আমি তাঁর স্ত্রী হতে রাজি নই। তবে পার্টির স্বার্থে যেকোনো রকম আত্মত্যাগ করতে রাজি আছি। এরপর তাঁর সাথে আমাকে দৈহিক সম্পর্কে যেতে হয়। কিন্তু সে ক্ষেত্রে আমার দিক থেকে কোনো অনুকূল সাড়া না পেয়ে তিনি আমার সাথে উক্ত সম্পর্ক ত্যাগ করেন। এরপর আমি আবার বোনের বাসায় ফিরে যাই।

কিছুদিন পর পাহাড়ে কাজে নিযুক্ত হই এবং ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি হওয়াতে আবার কুমিল্লায় ফিরে আসতে হয়। এখানে আমি গান শিখতে থাকি এবং একটি স্কুলে চাকরি করতে থাকি।

১৯৭৫-এর ২ জানুয়ারি দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ৩ জানুয়ারি আমি চট্টগ্রামে চলে আসি। এখান থেকে আপাকে নিয়ে আমি কুমিল্লায় চলে যাই। সেখান থেকে আপা তাঁর ছোট ছেলেকে নিয়ে ঢাকায় তাঁর বোনের স্বামীর বন্ধুর বাড়িতে আশ্রয় নেন। আমি বহুবার চাওয়া সত্ত্বেও তাঁর বোনেরা আমাকে তাঁর ঠিকানা দেননি। আমি বরুণ, মালা, রেহানাসহ কুমিল্লায় অবস্থান করি। কয়েকদিন পর আনিস এসে জানায়, খলিল আমাকে যেতে বলেছে। কারণ, ওই আশ্রয় নিরাপদ ছিল না। ওই রাত্রেই আমি আনিসের সাথে চট্টগ্রাম চলে আসি।

এখানে এসে কমরেড খলিল কিছু কিছু সহানুভূতিশীলের সাথে আমার যোগাযোগ করিয়ে দেন। এই সময় আমি কমরেড খলিলের কাছ থেকে সর্বোচ্চ সংস্থা গঠন সম্পর্কে বিশদভাবে জানতে পারলাম। আমি সর্বোচ্চ সংস্থা গঠনকে প্রথম থেকেই সমর্থন করিনি এবং মতিনকে পার্টি প্রধানের যোগ্য বলে মেনে নিতে পারিনি। কারণ, একজন কমিউনিস্ট হিসেবে যে



খালেদা বেগম
ওরফে বুলু

রকম বিনয়ী ও নম্র হওয়া উচিত, তা আমি তার মধ্যে দেখতে পাইনি। বরং দেখেছি অতিরিক্ত উগ্রতা ও অহংকার। এটা নেতৃত্বের পক্ষে থাকা বিষের শামিল।

চট্টগ্রামে আসার পর থেকে আমি আরও নানা রকম কথা শুনতে পাই। বিশেষভাবে আনিসের কাছ থেকে জানতে পারি, কমরেড মতিন নাকি ভাইয়ার জীবদ্দশাতেই কয়েকজন কর্মীকে খতম করে (খুবই সামান্য কারণে)। কমরেড উল্কার ভাইকে খতম করার পর জানা যায় যে তার ভাই নির্দোষ। কোনো একজন কর্মী ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ফেল করে। পার্টির কাজের জন্যই সে পড়াশোনা করতে পারেনি। সে বাড়ি গেলে তার বাবা তাকে মারধর করে। তখন সে পার্টিতে সার্বক্ষণিক হওয়ার জন্য আবেদন জানায়। মতিন তাকে জানায় যে তাকে এখন সার্বক্ষণিক করা হবে না। তাকে বাড়িতেই থাকতে বলে। কিন্তু সে জানায় যে তার এখন বাড়িতে যাওয়া সম্ভব নয়। সে সার্বক্ষণিক হবেই। এরপর তাকে পার্টির জন্য সমস্যা সৃষ্টি করার অপরাধে খতম করা হয়। এসব শুনে আমি আরও বিক্ষুব্ধ হই। পরে খলিলের কাছ থেকে আমি আরও জানতে পারি যে সর্বোচ্চ সংস্থা আমাকেও দোষী সাব্যস্ত করেছে।

এ সময় কমরেড খালেদাকে (অন্য একজন খালেদা) আমার এক আত্মীয়ের বাসায় নিয়ে গিয়ে রাখি। ইতিমধ্যে কমরেড খলিল আমাদের জানান যে সর্বোচ্চ সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, চট্টগ্রামে যে সমস্ত মূল্যবান সম্পদ ও অর্থ রয়েছে, তা এবং মহিলাদের ঢাকায় পাঠিয়ে দিতে। কমরেড খলিল জিজ্ঞেস করেন আমরা যেতে রাজি কি না। আমি জানাই আমি রাজি নই। পরে কমরেড খালেদাকে আমি সরিয়ে নিয়ে যাই সহানুভূতিশীল সলিমুল্লাহ সাহেবের বাসায়। সেখানে একদিন কমরেড খলিলসহ কমরেড খালেদা, কমরেড বীনা, কমরেড তানিয়া ও আমার একটি বৈঠক হয়। সেখানে কমরেড কাদেরও উপস্থিত ছিল। এখানে সবাইকে সম্পূর্ণ অবস্থা সম্পর্কে জানানো হয়। সে সময় মহিলাদের নেওয়ার জন্য একজন কুরিয়ারকে পাঠানো হয়। বৈঠকে সবাই একত্রে একটি কাগজে কেন যেতে চাই না সেই বক্তব্য লিখে সর্বোচ্চ সংস্থার কাছে পাঠানো ঠিক করি। এতে বলা হয় যে যতক্ষণ আমরা একপক্ষ থেকে অবস্থা সম্পর্কে জানছি, অর্থাৎ যতক্ষণ না উভয় পক্ষ থেকেই অবস্থা সম্পর্কে না জানছি, ততক্ষণ আমরা অজানা অবস্থার মধ্যে পা দিতে রাজি নই। কমরেড আতিক ফিরে না আসা পর্যন্ত যেতে রাজি নই। যে কুরিয়ারকে পাঠানো হয়েছে, সে অত্যন্ত ছেলেমানুষ। এর সাথে যেতে ভরসা হয় না। সর্বোচ্চ সংস্থার চিঠিতে আমার কোনো উল্লেখ ছিল না বলে স্বাক্ষর করতে প্রথমে আমি রাজি হইনি। পরে খলিলের কথামতো আমি প্রস্তাব লিখতে সাহায্য করি ও স্বাক্ষর করি।

এর আগে খালেদা যখন আমার বোনের বাড়িতে ছিল, সে সময় খলিল আমাদের সর্বোচ্চ সংস্থার কাছে পাঠানোর জন্য একটি পত্র দেখায়, যাতে এদিকের অনেকের স্বাক্ষর ছিল। দুজনের স্বাক্ষরের জায়গা খালি রাখা হয়েছিল। বলা হয়েছিল যে, হাসান দা এবং কমরেড জ্যোতির সর্বোচ্চ সংস্থার কাছে লেখা পত্রটি এখনো পাঠানো হয়নি। যেটা আমাদের দেখানো হলো, এটা তারা দাদার (হাসান) কাছে আনবে এবং তারপরে পাঠানোর ব্যবস্থা হবে।

কোঅর্ডিনেটিং সেন্টার সম্পর্কে আমি শুনেছি। কিন্তু এটা বৈধ না অবৈধ তা আমার পক্ষে বোঝা সম্ভব হয়নি। আমি ভেবেছি, বর্তমানে বিশেষ অবস্থায় যোগাযোগ যাতে বিচ্ছিন্ন হয়ে না যায় তার জন্য এটার প্রয়োজন আছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে আসার পর কী কী ঘটেছে সে সম্পর্কে বিস্তারিত কমরেড জ্যোতি, কমরেড হাসান জানেন।

সংগঠনের প্রধান এবং সভাপতির বাসার পরিবেশ সম্পর্কে

আমি যখন ভারত থেকে ফিরে আসি, তখন থেকেই এখানে যৌনসংক্রান্ত বিষয় নিয়ে অতিরিক্ত মাত্রায় আলোচনা হতো। ছেলেমেয়েদের মধ্যে স্বাভাবিক মেলামেশার ব্যাপারে অতিমাত্রায় যৌনসম্পর্কীয় সাবধানতা টেনে এনে সম্পর্ক অস্বাভাবিক ও তিক্ত করে তোলা হতো। এর ফলে পুরুষকর্মী ও মহিলাকর্মীর মধ্যে এমন একটা জঘন্য অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল যে একে অপরের দিকে তাকাতে পর্যন্ত ভয় পেত, একে অন্যের হাত থেকে একটা জিনিস পর্যন্ত নিতে ভয় পেত। তখন সংগঠনের বাসায় এমন একটা অবস্থা চলছিল—কোনো পুরুষের সাথে কোনো মেয়ের প্রেম হয়ে যায়, কোন পুরুষকর্মীর সাথে কোন মহিলাকর্মীর খাপ খাবে, কার সাথে কার বিয়ে হবে, কোন দম্পতির ডিভোর্স হওয়া প্রয়োজন, কে সুন্দর করে শাড়ি পরে, কাকে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণীয় দেখায়, তার সাবধানে থাকা উচিত।

যতই দিন যেতে লাগল ততই এই যৌনবিষয়ক আলোচনা উলঙ্গ আকার ধারণ করতে লাগল। কমরেড সভাপতি অন্য রাজনৈতিক, সাংগঠনিক, সামরিক বিষয়ে আলাপের চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে এসব নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। যৌনতা নিয়ে এত বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করলে স্বাভাবিক ছেলেমেয়েদের সুস্থ, সুন্দর মন অস্বাভাবিক এবং বিকৃত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা খুবই বেশি। ফলে পরে এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে, আমাদের সমাজের যে স্বাভাবিক আচরণ অর্থাৎ যেকোনো মেয়েকে তাদের মা এবং বোনের মতো (বন্ধুসুলভ আচরণ দূরে থাক) দেখতে হবে, সম্মান করতে হবে এবং ত্রুটিপূর্ণ মেয়েদের সহানুভূতির সাথে শোধরাতে হবে—এই চিন্তাগুলো থেকে তারা দূরে চলে গিয়েছিল। আমার মতে, এসব নিয়ে অতিরিক্ত সাবধানতার বাড়াবাড়ি করলে ফল আরও খারাপ হয়। যা স্বাভাবিক, তাকে স্বাভাবিকভাবে দেখলেই হয়। বিশেষ অবস্থায় যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে।

অন্যদের বেলায় এত সাবধানতা সত্ত্বেও সভাপতির নিজের বেলায় ঘটেছে ঠিক এটার উল্টো। সভাপতি কমরেড রাহেলাকে বিয়ে করার কিছুদিন পর থেকে সম্পর্ক অত্যন্ত খারাপ হতে দেখা যায়। বেশ কিছুদিন পর কমরেড রাহেলার বোন রওশন আপা সংগঠনে এলে সভাপতি কমরেড রাহেলার সাথে বিবাহবিচ্ছেদ করেন (যদিও এর আগে বহুবার এ পদক্ষেপ

খালেদা ওরফে বুলুর হাতে লেখা জবানবন্দি

নেওয়ার প্রচেষ্টা চলছিল)। কিছুদিন পর থেকে কমরেড সভাপতি উভয়ের সাথেই বিশেষ সম্পর্ক রাখতে চাইলে রওশন আপা চলে যেতে চাইলেন। এ সময় রওশন আপার সাথে সভাপতি অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করেন। তারপর বাড়ি চলে যান।

রওশন আপার সাথে বিবাহ কেন্দ্রীয় কমিটি অনুমোদন করেছিল। ইনি চলে যাওয়ার পর একটি খুব ছোট মেয়েকে আনা হয় তাঁর স্ত্রী করার জন্য। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা বাস্তবায়িত হয়নি। এরপর তিনি নিয়ে আসেন আমাকে। আমার পরে আসে খালেদা। সে অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় বাড়িতে চলে গেছে দুর্ঘটনার পরে।

একজন সভাপতি হিসেবে চারিত্রিক ক্ষেত্রে এ ধরনের বেপরোয়া ব্যবহার কোনোমতেই অনুমোদনযোগ্য নয় এবং জনগণ এটাকে কীভাবে গ্রহণ করবে বোঝাই যায়।

কেন্দ্রীয় কমিটির বাসায় এবং সভাপতির নিজস্ব খরচ অতিরিক্ত হতো বলে আমি মনে করি। নিরাপত্তাজনিত কারণে শহরে একটা দামি বাসায় থাকা প্রয়োজন। বাইরে যাওয়ার জন্য সভাপতির কয়েকপ্রস্থ ভালো পোশাক এবং দামি ব্রিফকেস হলে ভালো হয়। কিন্তু সভাপতির বাসার বাজার খরচের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত বিলাসিতা নিশ্চয়ই সাজে না। সভাপতির লেখার জন্য ২০০ টাকার কলম, ৮০ টাকার লাইটারের কী প্রয়োজন। এগুলো কি অতিরিক্ত বিলাসিতা নয়? যেখানে দেখেছি, কোনো কোনো জায়গায় কর্মীরা প্রচণ্ড আর্থিক কষ্টের মধ্যে কাজ করছে। যেখানে অন্যান্য নানা ক্ষেত্রে আর্থিক কষ্টের কথা বলা হয়; যা কিছুই কেনা হোক না কেন বাজারের সেরা জিনিসটি কিনতে হবে। দামের জন্য ভাবনা নেই।

কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের ভূমিকা

কেন্দ্রীয় কমিটির অন্য সদস্যরা এগুলো জানা সত্ত্বেও কোনো সমালোচনা চালাননি। ব্যবহারে তিনি এত সামন্ততান্ত্রিক ছিলেন যে আমরাও আমাদের অভিযোগসমূহ জানাতে পারিনি। কেন্দ্রীয় কমিটি যদি তাঁর ত্রুটিবিচ্যুতিকে প্রথম থেকেই যথাযথভাবে সমালোচনা করত, তবে

এগুলো চরম আকার ধারণ করত না। আমার চোখে তাদের ভূমিকা নিষ্ক্রিয় বলে মনে হয়েছে।

সভাপতি যা বলেন বা যা মনে করেন তা-ই বিনা বাধায় বিনা সংগ্রামে বাস্তবায়িত হতো। এতে এটাই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে কেন্দ্রীয় কমিটি মানেই সভাপতি সিরাজ সিকদার। অন্যরা নামমাত্র সদস্য। চক্র গঠনের পর থেকে এককেন্দ্র বজায় রাখার ওপর জোর দিতে গিয়ে অতিকেন্দ্রিকতার উদ্ভব হয়েছে। যার ফলে অন্যদের ভূমিকা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে। দেখা গেছে কোনো কোনো কর্মী (যেমন কমরেড ঝিনুক, কমরেড কবির) নিজেদের ভিন্ন রাজনৈতিক চিন্তা বা মতামত পেশ করেছেন। হতে পারে তা ভুল। তাদের মতামতের পাল্টা জবাব যেভাবে দেওয়া হয়েছে, তা অতীতে ভিন্ন বামপন্থী সংগঠনকে যেভাবে দেওয়া হয়েছে, সেইভাবে। ঝটপট গোঁড়ামিবাদী, অমুকবাদী বলে চিহ্নিত করা হয়েছে, সাংগঠনিক ক্ষেত্রে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, কিন্তু এতখানি ধারণ করার ক্ষমতা তাদের হয়নি। ফলে তারা হতাশ হয়েছে। এতে অন্য কর্মীরা ভীত হয়েছে। কোনো ভিন্ন মতামত প্রকাশে, চিন্তার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। এতে সচেতনতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কমরেডরা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছেন। এই অতিরিক্ত কেন্দ্রিকতার ফলে আমার মনে হয় সভাপতির চতুর্দিকে শক্তিশালী নেতৃত্ব গড়ে ওঠেনি।

ছেলেদের সার্বক্ষণিক করা সম্পর্কে

ছেলেদের সার্বক্ষণিক করা সম্পর্কে আমার মতামত হচ্ছে, এতদিন একটা রীতি আমি দেখতে পেয়েছি যে সক্রিয় হলেই সেই কর্মীকে সার্বক্ষণিক করা হচ্ছে। কিন্তু সার্বক্ষণিক করার পর নানা কারণে সে নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। আমার মতে, সার্বক্ষণিক করার আগে ভালোভাবে যাচাই করে দেখতে হবে কে কী অবস্থায় বেশি অবদান রাখছে বা রাখতে পারবে। তা ছাড়া এই যে সক্রিয় কর্মী মাত্রকেই সার্বক্ষণিক করা হয়ে থাকে, এরপরই তারা পুরোপুরি গোপন সংগঠনের অধীন হয়ে যায়। এদের কাজ প্রোগ্রাম রক্ষার কাজের মধ্যে সীমিত হয়ে পড়ে। ফলে এই সমস্ত কমবয়সী ছেলে জনজীবনের প্রাণধারা

থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তারপর অনেক ক্ষেত্রে চিন্তাভাবনার দিক দিয়ে ভোঁতা হয়ে পড়ে।

সামাজিক উৎপাদন-সংগ্রামের মধ্য দিয়েই মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ হয়। আমার মতে, এদিকে একটু লক্ষ রাখা উচিত। আর একটা কথা, বেশ কিছু কর্মীকে সামাজিক পেশার মধ্যে রেখেই সার্বক্ষণিক কর্মীর মতো ব্যবহার করা উচিত। এতে তার বিপ্লবী চিন্তাধারা জনজীবনের প্রাণধারার সাথে একত্র হয়ে তাকে জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞ হয়ে উঠতে সাহায্য করবে। তাছাড়া এভাবেই গণসংগঠন গড়ে তোলা সম্ভব।

মেয়েদের সার্বক্ষণিক করা সম্পর্কে

আমরা মেয়েরা বদ্ধ জগৎ থেকে বেরিয়ে বিরাট কর্মোদ্দীপনার জগতে যাব। আমাদেরও কিছু করার সক্ষমতা আছে কি না, তা যাচাই করতে হবে। বর্তমান সমাজের বিভ্রান্তিকর কর্দমাক্ত কানাগলি থেকে বেরিয়ে মুক্ত আলোয় এবং অপেক্ষাকৃত নিরাপদ জগতে আসতে পারব এই আশা নিয়ে এসেছি। আমরা যারা কোনোদিন সঠিক পথের আলো দেখতে পাইনি, তারা আশা করেছি অগ্রগামী সংগঠনের নেতৃত্ব আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন, বিরাট কর্মব্যস্ত সংগ্রামী বহির্জগতে নিয়ে এসে, কাজে নিয়োগ করে আমাদের সমস্ত পুরোনো অবস্থার পরিবর্তন আনার, পুরোনো ক্রটিবিচ্যুতি সংশোধনের শর্ত সৃষ্টি করবেন।

কিন্তু সংগঠন যদি মনে করে বর্তমান সামাজিক অবস্থায় মেয়েদের তেমন কোনো কাজ দেওয়া সম্ভব নয়, তাহলে তাদের ঘর থেকে বের করে না আনাই ভালো। কারণ, শুধু রান্না করার জন্য আর বউ হওয়ার জন্য বিপ্লবী সংগঠনে আসার প্রয়োজন কতটুকু। মেয়েরা ঘরোয়া কাজে সারা জীবন আবদ্ধ থেকে তাদের পরিপূর্ণ কর্মক্ষমতা কেবল ক্ষয় করে। পরিবর্তে উল্লেখযোগ্য এবং সন্তোষজনক কোনো কিছু সৃষ্টি হয় না।

প্রত্যেকেই নিজের পরিশ্রমে পূর্ণ ও সন্তোষজনক ফলন দেখতে চায়। মেয়েরা তাই ঘরকন্নার কাজের একঘেয়ে ক্ষুদ্র পরিসর থেকে বেরিয়ে আসতে চায়। কর্মব্যস্ত বিরাট সৃষ্টিশীল, বৈচিত্র্যময় বহির্জগতে মিশে গিয়ে মুক্তির

আস্বাদ পেতে চায়। মেয়ে হিসেবে নয়, মানুষ হিসেবে নিজের বেঁচে থাকার সার্থকতাকে দেখতে চায়।

সংগঠনে এসে যদি তাদের বিশেষভাবে এবং বেশির ভাগ সময়ই ঘরকন্নার কাজেই আটকে থাকতে হয়, তবে কিছুদিন পর তাদের মধ্যে অসন্তোষ জাগা খুবই স্বাভাবিক। পুরুষকর্মীরা নিজেদের যদি সেই ভূমিকায় কল্পনা করেন, তাহলেই বুঝতে পারবেন। 'মেয়েদের কাজই হচ্ছে ঘরকন্না'—এটা সামন্তসুলভ বস্তাপচা চিন্তাধারা। যার যেখানে যোগ্যতা, কে কোনখানে কত বেশি ভালোভাবে কাজ করতে পারবে, তা পরীক্ষামূলকভাবে যাচাই করা উচিত নারী-পুরুষ নির্বিশেষে। আর মেয়েদের যদি সাবলীলভাবে সাংগঠনিক কাজে নিয়োগ করা না যায়, তবে তাদের বাড়িতে রাখাই ভালো। সেখানে থেকে বাস্তব অবস্থা অনুযায়ী তার যতটুকু ক্ষমতা ততটুকু সংগঠনের কাজে লাগাতে পারবে।

আর একটা কথা হচ্ছে, মেয়েদের পক্ষে সহানুভূতিশীলের বাসায় থেকে ছেলেদের মতো সার্বক্ষণিক কাজ করা বর্তমান পর্যায়ে দেখা গেছে একেবারেই অসম্ভব। তাই যারা অত্যন্ত সক্রিয় তারা বাড়িতে থেকে ভালোভাবে গণসংগঠনের কাজ করতে পারে। কারণ, তার একটা সামাজিক পরিচয় থাকে, পরিচিত মহলের ব্যাপ্তি আর অনেক। কাজেই এতে সার্বক্ষণিক হওয়ার চাইতে একটা মস্ত বড় লাভ হচ্ছে, এই অবস্থায় আমাদের গণসংগঠনের কাজ বিস্তৃত হওয়া সম্ভব। তাছাড়া প্রয়োজনে মাঝে মাঝে জিনিসপত্র আনা-নেওয়া, যোগাযোগ রক্ষা করা, গৌণভাবে এ কাজগুলোও করতে পারে। কোনো কোনো মেয়েকে বিশেষ বিশেষ লাইনে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, ভবিষ্যতের জন্য এ-ও করা যায়।

সর্বোচ্চ সংস্থা সম্পর্কে

- আমি মনে করি কোনো অবস্থাতেই সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী কংগ্রেসের অনুমোদন ছাড়া সর্বোচ্চ সংস্থা গঠিত হতে পারে না, আহ্বায়ক কমিটি গঠিত হতে পারে। যে মনোভাব নিয়েই এটা করা হয়ে থাক না কেন, সমস্ত সংগঠনে এ নিয়ে বিক্ষোভ জাগতে পারে।

- দুজন সদস্যকে বাদ দিয়ে তাড়াহুড়ো করে সর্বোচ্চ সংস্থা গঠন নেতৃত্বের সততা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ রাখে।
- অনুসন্ধান ছাড়া বিভিন্ন কর্মীর ওপর দুর্ঘটনার বিষয়ে এবং চক্র সম্পর্কে অভিযোগ এনে বহিষ্কার এমনকি খতমের সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রতিবিপ্লবী নেতৃত্বের বহিঃপ্রকাশ।
- ভিন্নমত পোষণকারী এবং নেতৃত্বের প্রতি বিক্ষুব্ধ কর্মীদের প্রথমে বোঝানোর দায়িত্ব রয়েছে। তারা যে বিষয়ে বিক্ষুব্ধ, তার কারণ দর্শাতে নেতৃত্ব বাধ্য। তা না করে, অতীতে ভালো কাজ করেছে এরকম কর্মীদের ধরে ধরে খতম করা মোটেই সৎ ও শক্তিশালী নেতৃত্বের নিদর্শন নয়।
- সার্বক্ষণিক হতে বদ্ধপরিকর এরকম কর্মীকে এবং আরও ছোটখাটো কারণে কর্মীদের খতম করাটা এটাই বোঝায় যে নেতৃত্ব অসৎ অথবা অতি সমরবাদী আমলাতান্ত্রিক এবং অহংকারী।

বুলু
১০.১২.৭৫

টীকা

বুলুর ভাষ্যে যে বিষয়টি পাওয়া যায়, তা অন্য ধরনের। এটা পড়ে অনেকেই হোঁচট খাবেন। প্রথম প্রশ্ন হলো, বুলু কে? তাঁর জবানবন্দিতেই বলা আছে, তিনি সামিউল্লাহ আমজমী ওরফে কমরেড তাহেরের স্ত্রী। তাহের ছিলেন পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন ও পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টির অন্যতম প্রধান সংগঠক এবং কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে তাঁর স্থান ছিল সিরাজ সিকদারের পরেই। তাহেরের স্ত্রীর নাম খালেদা, পরে তাঁর নাম হয় বুলু। বরিশালে থাকাকালে তাঁর নাম ছিল সুফিয়া। পার্বত্য চট্টগ্রামে তিনি রুবী নামেও পরিচিত ছিলেন।

বুলুর দেওয়া বিবরণে 'আপা' প্রসঙ্গ এসেছে। তিনি হলেন সিরাজ সিকদারের দ্বিতীয় স্ত্রী জাহানারা হাকিম। প্রথম স্ত্রী রওশন আরাকে ছেড়ে

সিকদার বিয়ে করেছিলেন জাহানারাকে। দলে তাঁর নাম ছিল রাহেলা। সিকদার ও জাহানারার একমাত্র সন্তান অরুণ। রওশন আরা ও সিকদারের দুজন সন্তানের একজন শিখা, যাকে বুলু উল্লেখ করেছেন মালা নামে। অন্যজন শুভ্র, যাকে বরুণ নামে উল্লেখ করা হয়েছে। এই ভাষ্যে উল্লেখিত কমরেড হাসান হলেন কর্নেল জিয়াউদ্দিন। বুলু প্রসঙ্গ উঠে এসেছে রাজিউল্লাহ আজমী ও জিয়াউদ্দিনের ভাষ্যে। এখানে ভাইয়া বলতে বোঝানো হয়েছে সিরাজ সিকদারকে। তিনিই কমরেড সভাপতি। এখানে খালেদা নামে যাকে উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি হলেন সিকদারের সর্বশেষ স্ত্রী শায়লা আমিন।

জিয়াউদ্দিন

ক্যাডার ইতিহাস

১. পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশ ও সেই পরিবেশের সাথে আমার সম্পর্ক

আমি ১৯৩৯ সালে হারবাং (চট্টগ্রাম জেলায়) গ্রামে জন্মগ্রহণ করি। ছোটবেলায় গ্রামে মায়ের সাথেই থাকতাম। আব্বা তখন দার্জিলিং ও দেরাদুনে কাজ করতেন। ছোটবেলায় লেখাপড়া হারবাং প্রাইমারি স্কুলেই করেছি। তবে নামাজ ও আরবি শিক্ষা মায়ের তদারকেই হয়েছে। আব্বার সাথে তেমন একটা ঘনিষ্ঠতা ছিল না। উনি মাঝে মাঝে ঘরে আসতেন আর ওনাকে কিছু কিছু ভয়ও করতাম। তখন আমি পরিবারের একমাত্র ছেলে, একাকীই লেখাপড়া করতাম। আত্মীয়স্বজনের সাথে খারাপ সম্পর্কের কারণে আমাদের ঘরে চুরি হয় এবং চোরের উপদ্রবে আমাদের গ্রামের বাড়ি ছেড়ে শহরে চলে যেতে হয়। আব্বা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে চাকরি করতেন। আমাদের কোনো রকম চলে যেত।

শহরে আমরা আমার বড় মামার বাড়িতে পাহারাদার হিসেবেই থাকি। তিনি তখন কক্সবাজারে ওকালতি করতেন। পরে আমরা নারায়ণহাটে আব্বার সাথে চলে যাই। আব্বা-আম্মা দুজনেই ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন।

নারায়ণহাটে থাকতেই চট্টগ্রামের একজন বিখ্যাত পীর আমাদের বাসায় আসেন। তাঁকে আমরা সবাই শ্রদ্ধা করতাম। আমি নারায়ণহাটের প্রাইমারি স্কুলে পড়তে শুরু করি। তারপর ভুজপুর হাইস্কুলে ভর্তি হই। এই পর্যায়ে ঘরে আব্বা ও আম্মা প্রায়ই ঝগড়া করতেন। রাতে আমরা বালিশের নিচে মাথা গুঁজে ঘুমাতে চেষ্টা করতাম। তাঁদের ঝগড়া ক্রমশই তীব্র আকার ধারণ করতে শুরু করে এবং দিনের পর দিন ঘরে অশান্তি সৃষ্টি হয়। আমরা কোনো

রকমে ভাত খেয়ে চুপচাপ সরে পড়তাম।

আমার লেখাপড়ার ক্ষতি হচ্ছে বলে আব্বা আমাদের শহরের স্কুলে ভর্তি করাতে নিয়ে যান। শহরে কলেজিয়েট হাইস্কুলে আমি ভর্তি হই এবং সেখানে বোর্ডিংয়ে থাকতে শুরু করি। লেখাপড়ায় তেমন একটা তৃপ্তি পেতাম না। নিজে নিজেই ঘুরতাম। হয় চায়ের দোকানে বসে থাকতাম বা কমলা সার্কাস দেখতে যেতাম। বন্ধুবান্ধব মোটেই জোটাইনি।

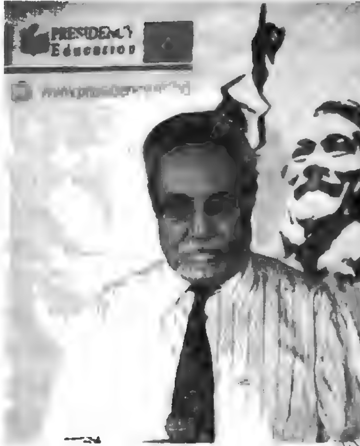
আব্বা একজন প্রাইভেট টিউটর ঠিক করেছিলেন। তবে তাতেও কোনো উপকার হলো না। পরীক্ষায় পাস করতাম, তবে ভালো করতাম না। বাংলা, অঙ্ক ও ইংরেজিতে প্রায়ই ফেল করতাম।

আব্বা তখন নারায়ণহাট থেকে বারআউলিয়ায় বদলি হন। এ সময় একদিন তিনি এসে বললেন যে সেই শ্রদ্ধেয় পীর সাহেব আম্মাকে ধর্মের ও স্বপ্নের দোহাই দিয়ে আমাদের সকল স্বর্ণালংকার নিয়ে যান। আর সেই পীরের প্রতি আমার আম্মাও নাকি বেশ দুর্বল ছিলেন।

তারপর সেই পীরের বিরুদ্ধে আব্বা মোকদ্দমা শুরু করেন। এরপর হতে আব্বা আর আম্মা তাদের আত্মীয়স্বজনকে হিংসা করতে শুরু করেন। মারধর, গালাগালি ও কোর্টে কেস শুরু হয়। এই প্রক্রিয়ায় আম্মা পাগল হয়ে যান। তিনি আজও সেই অবস্থায় আছেন।

আমাদের জীবনটা তখন একেবারে তিক্ত হয়ে ওঠে। প্রায় সময় বাড়িতে খাওয়াদাওয়া রান্না করা হতো না। আমরা খালি পেটেই রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতাম। কারও বাড়িতে বেড়াতে যেতে ইচ্ছা করত না। কারণ তারা প্রায়ই জিজ্ঞেস করতেন, তোমার আম্মা কেমন আছে? এর উত্তর দিতে আমি মোটেই ভালোবাসতাম না। তারপর তারা জিজ্ঞেস করবে আমি খেয়েছি কি না, যার উত্তরে আমি সর্বদা খেয়েছি বলেই জবাব দিতাম। আমার আত্মসম্মানবোধ এখানেই শুরু হয়। যদিও উত্তরটা মিথ্যা, তবু নিজের সম্পর্কে অন্যকে এত কিছু বলার তাগিদ বোধ করতাম না এবং সেই তিক্ত পোড়াঘর সম্পর্কে অন্যদের বলতে মোটেই ভালো লাগত না। পুরনো বই, কাগজ, বোতল ইত্যাদি বিক্রি করে কিছু পয়সা পেলে তা দিয়ে হোটেলে কিছু খেয়ে নিতাম।

এই অশুভ পরিবেশে থেকে যে লেখাপড়া হবে না, তা আব্বা টের পেয়েছিলেন। তাই তিনি একদিন আমাকে পাকিস্তান এয়ারফোর্স পাবলিক স্কুল সারগোদায় ভর্তি হওয়ার জন্য চেষ্টা করতে বললেন। আমিও কোনো



এম জিয়াউদ্দিন আহমেদ

অজুহাতে ঘর থেকে পালাতে পারলেই বাঁচি। একদিন সেই স্কুলের জন্য পাস করলাম এবং ঘর ছাড়তে একটুও দুঃখবোধ বা খারাপ লাগল না। পূর্ব পাকিস্তানের অন্য ছেলেরা বোধ হয় আমার তুলনায় অনেক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও চকমকে। তারা হাসিখুশি ও গল্পগুজব নিয়েই ব্যস্ত ছিল। আমার বন্ধুর কোনো প্রয়োজন ছিল না, ঘর ছেড়ে যাচ্ছি এতেই আমার আনন্দ।

সারগোদায় (পশ্চিম পাকিস্তানে) গিয়ে ইংরেজিই আমার প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়াল। ইংরেজির দুর্বলতার কারণে আমি অন্যদের এক ক্লাস নিচেই শুরু করেছিলোম। বেশ চেষ্টার পর এই দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হই। মাস্টাররা সব ইংরেজ ছিলেন। তারা বেশ যত্নসহকারেই ছেলেদের গড়ে তুলতে চেষ্টা করত। লেখাপড়ায় মনোযোগ দেওয়া শুরু করি। অঙ্কের দুর্বলতাও কাটিয়ে উঠি এবং ইংরেজিতে কথাবার্তা বলতে সক্ষম হলে বন্ধুবান্ধবও জুটতে শুরু করে। এই স্কুলে তিন বছর কাটানোর পর সিনিয়র কেমব্রিজ পাস করে ঘরে ফিরি।

ঘরের পরিবেশ আগের মতোই ছিল। বাবার আদেশে চট্টগ্রাম কলেজে ভর্তি হই। কলেজে মন বসল না। পড়াশোনাই বা কেন করব তারও কোনো

সন্তোষজনক উত্তর খুঁজে না পাওয়াতে এদিক-ওদিক ঘোরাফেরাই বেশি করতাম। তারপর জীবনের একটি 'শর্টকাট' তল্লাশি করতে শুরু করলাম। নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে নিজের ভাত দুবেলা নিজে জোগাড় করতে পারলেই বাঁচি। এই মানসিকতা নিয়েই আর্মিতে চলে যাই।

১৯৫৯ সালে পাকিস্তান মিলিটারি একাডেমি কাকুলে চলে যাই। সেখানে লেখাপড়া তেমন একটা করতে হতো না। একাডেমিতে একটা ভালো লাইব্রেরি ছিল। বই পড়ার ঝোঁক চাপল। উপন্যাস পড়া শুরু করলে কোনো উপন্যাসে নতুন কিছু খুঁজে পাই না। যা নিজের জীবনে ছোটবেলা থেকে দেখেছি তার চেয়ে সমৃদ্ধ নভেল বা গল্প পাইনি।

অন্যান্য বহু পুস্তকে হাত লাগিয়েছি। বইগুলোর প্রিফেস আর শেষ চ্যাপ্টারের শেষ প্যারাগ্রাফগুলো পড়লেই সব বোঝা যেত। বিভিন্ন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির জীবনী পড়া শুরু করি। এসব বইতে তেমন একট ইন্টারেস্ট না পেলেও আমার মনে একটা প্রশ্ন জাগে। তারা ভালোমন্দ এই সব কেন করে? ভালোমন্দ বাছাইয়ের মাপকাঠিই বা কী? কোনো একটা সন্তোষজনক উত্তর খুঁজে পাইনি। তারপর প্রশ্ন জাগে, মানুষ বড় হতে চায় কেন? এটারও কোনো উত্তর খুঁজে পেলাম না। অন্যদের জিজ্ঞেস করলে তেমন একটা সন্তোষজনক উত্তর পেতাম না। একাডেমিতে পাস করার জন্য ও একজন অফিসার হওয়ার জন্য যা প্রয়োজন ছিল তা আমি স্কুলেই অর্জন করি। এখানে তেমন একটা চেষ্টা চালাতে হয়নি।

একাডেমিতে সহজভাবেই আড়াই বছর কাটিয়ে অফিসার হই এবং কুমিল্লায় বদলি হই। ১৯৬২ হতে ১৯৭১-এর জুলাই পর্যন্ত পাকিস্তান আর্মিতে চাকরি করি। সামরিক বাহিনীতে প্রথম দিকে ভালো লাগলেও পরের দিকে সেখানে কিছু খুঁজে পাচ্ছিলাম না। ১৯৭১-এর 'সংগ্রামের' সময় আমি পিন্ডিতে ছিলাম। সেখান থেকে কর্নেল তাহের ও কর্নেল মনজুরের সাথে বাংলাদেশে আসি। সংগ্রামের সময় সৈন্যদের সাথেই সময় কাটিয়ে দিয়েছি। রাজনীতি আমি বুঝতাম না। তবে ইতিহাসটা যে একটা 'চলমান প্রক্রিয়া' এই সম্পর্কে নিজের মনে কিছুটা ধারণা জাগে। নিজের দেশের স্বাধীনতা সর্বদাই চেয়েছি। নিজের জাতির আত্মমর্যাদা সম্পর্কে সর্বদাই সচেতন ছিলাম, তবে এই সব কিছু সম্পর্কে সঠিক কোনো ধারণা ছিল না।

বাংলাদেশের 'স্বাধীনতার' পর নিজের জীবন সম্পর্কে গভীরভাবে ভাবতে

শুরু করি। সামরিক বাহিনীতে কেনই বা থাকব? এই সবকিছুর পরিণতি কোন দিকে? এই জীবনের অর্থটাই বা কোথায় ও কিসে? এই সব প্রশ্ন আমাকে চিন্তিত করে তোলে। এই সময় নাজমা নামক এক বিবাহিত মহিলাকে আমি ভালোবাসি। সে-ও আমাকে ভালোবাসে, শ্রদ্ধার চোখে দেখে। তবে তাকে তার স্বামী ও ছেলের থেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার সাহসও হলো না। আর বিবেকও পূর্ণ অনুমোদন দিল না। তাই সেই সম্পর্ক ছেদ করি।

এরপর আমার সাথে মুজিব সরকারের মতবিরোধ শুরু হয়। বিরোধের মূল বিষয়বস্তু ভারতের সাথে গোপন চুক্তি। যার কারণে সবকিছুই ভারত থেকে নিয়ন্ত্রিত হতো। আমি আমার মতামত *হলিডে* পত্রিকায় 'হিডেন প্রাইজ' (Hidden Prize) নামে এক আর্টিকেলে প্রকাশ করি। তারপর চাকরি থেকে আমি বরখাস্ত হই।

২. পার্টিতে যুক্ত হওয়ার সময়কার অবস্থা

সামরিক বাহিনী থেকে বরখাস্ত হওয়ার পর আমি হঠাৎ করে রাজনৈতিক মঞ্চে পরিচিত হই এবং বিভিন্ন পার্টির লোকজন আমার সাথে আলাপ-আলোচনা করেন। তারা আমাকে তাদের নিজ নিজ পার্টিতে নেওয়ার প্রচেষ্টা চালায়। তখনো আমি কী যে করব সে সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছিনি। মনে করলাম, কিছু সময় নিয়ে জীবনকে আরও গভীরভাবে তল্লাশি করে দেখি। এই বেঁচে থাকার সুযোগটাকে কীভাবে অর্থময় করা যাবে এবং আমার যে 'নিজস্ব' কিছু আছে, তার সাথে সেই অর্থের কোনো মিল খুঁজে পাব কি না? আমার নিজ স্বার্থেই কয়দিন এই সকল বিভিন্ন প্রশ্ন নিয়ে আমি চিন্তিত থাকি। তবে কোনো কূল খুঁজে পাচ্ছিলাম না।

ঘরে ফিরে গ্রামে মায়ের নিকট কিছুদিন পড়ে ছিলাম। ছেলেবেলা থেকেই আমি মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত ছিলাম। এক মাস যাবৎ উনার সামনে থাকতে বেশ ভালোই লাগছিল। তারপর এদিক-ওদিক বেশ ঘুরলাম এবং টাকা-পয়সা যা ছিল তা শেষ হওয়ার পর বাংলাদেশ শিপিং অ্যান্ড ট্রেডিং কোম্পানিতে একটা চাকরি নিলাম।

সামর্থ্য হলে মাকে আর বোনকে (বোন জন্ম হতেই বোবা) চিকিৎসা করিয়ে ভালো করে নিজের নিকট রাখার একটা প্রতিশ্রুতিও করেছিলাম। তার জন্য প্রয়োজন টাকা। নেহাত দুবেলা খাওয়ার তাগিদেই চাকরিটা

সফিউল আলম নামে নিজের এবং দলের কথা বর্ণনা করেছেন জিয়াউদ্দিন

নিয়েছিলাম। তাই সেটা ছেড়ে ছোটবেলার কাগজ আর বোতল বিক্রি করে হোটেলে ভাত খাওয়ার দিনের বন্ধুর সাথে ব্যবসায়ে পার্টনার হই। ধীরে ধীরে ব্যবসার ঝোঁকটাও চলে গেল। আত্মীয়স্বজনরা চাচ্ছিল আমি টাকা-পয়সা আয় করে বড় কিছু হই। সেই সব আমি দেখেছি। তাতে আমার স্বাদ মেটেনি। মাকে আর বোনকে নিয়ে চেঁচামেচি করার মানসিকতাও হারিয়ে ফেললাম। পাগল মা-ও যে কবে ভালো হবে আর বোবা বোনও যে কখন কথা বলবে তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই। আর তাদের নিয়ে সমাজের সামনে ভালো মানুষ সাজার মধ্যে কোনো স্বার্থ খুঁজে পাইনি। আর বিয়ে, ভালোবাসা ইত্যাদিও দেখেছি। এগুলোও নিছক প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে নয়।

মুজিব সরকারের সাথে ভারতের নিকট জাতীয় স্বাধীনতা বিক্রি করে দিয়েছে বলে জনগণের সামনে লিখিত বিবৃতি দেওয়ার পর আমাদের নিজের আত্মসম্মান রক্ষার খাতিরে হলেও স্বাধীনতাসংগ্রামে নিজেকে উৎসর্গিত করতে হয়। তা না করাটা একেবারেই কাপুরুষতা ও সুবিধাবাদিতা।

এই মানসিক অবস্থাতেই কর্নেল তাহেরের মাধ্যমে আমার পার্টির সাথে যোগাযোগ হয়। এর কিছুদিন পরেই আমি সার্বক্ষণিক হয়ে পার্টিতে চলে আসি।

৩. ব্যক্তিগত জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা

জীবনের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জিনিসের পেছনে দৌড়েছি। ছেলেবেলায় চেয়েছিলাম সুখী ঘর। তা না পেয়ে পালালাম সারগোদায়। সেখানে পাইলট হওয়ার শখ চাপছিল। তবে চোখ খারাপ হওয়াতে তা হতে পারিনি। পরে আর্মিতে অফিসার হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়ালাম। সামরিক বাহিনীতে থাকতে বাঙালি জাতির স্বাধীনতা ও আত্মমর্যাদা চেয়েছিলাম। তার জন্য আন্তরিকভাবেই চেষ্টা করেছি এবং তা এখনো চাই। জীবনে ভালোবাসা ও স্নেহ চেয়েছি। এটার তাগিদে বন্ধুবান্ধবের তালে পড়ে ও সেক্স সম্পর্কে স্বাভাবিক কৌতূহলের কারণে বেশ্যালয়েও গিয়েছি। তাতেও কোনো স্বর্গ খুঁজে পাইনি।

তারপর জীবনের এক স্তরে ভালো খেলাধুলা করতে চেয়েছি। তবে তাতে বিশেষ কোনো দক্ষতা অর্জন করতে পারিনি। আর এটা কিছু সময়ের পর অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়।

গরিব ঘরে জন্মগ্রহণ করে উচ্চ সমাজে চলাফেরা করার সময় অনেকবার অপমানিত হয়েছি। তাই গরিব জনগণের মঙ্গল কামনা করেছি। তাদের

গর্বিত করার ছোটখাটো চেষ্টাও সিপাহিদের নিয়ে করেছি।

Then I Sought Peace and knowledge. In search of peace, I suffered intensely—তবে গত ছয় মাস হতে বিপ্লব ও জীবন সম্পর্কে একটি মূল্যায়নে আসার পর হতে নিজকেও খুঁজে পেয়েছি এবং মনের শান্তিও ফিরে পেয়েছি। এটাই আমার জীবন—এখানেই আমার সবকিছু।

In search of knowledge I searched through many books, but I found no lasting interest—তা এখন পেতে শুরু করেছি। মনোযোগ সহকারে এখন কঠিন বইপুস্তক পড়তে পারি এবং তাতে আনন্দ পাই। জ্ঞান অর্জনের জন্য এটাই জায়গা।

বিগত ছয় মাস হতে আমি এই নতুন জীবনের যাত্রা শুরু করেছি।

জীবনে যে বড় হতে চাই না, তাও নয়। তারপর ঠিক মেধার পেছনে ঘুরিনি। সাধারণের চোখে যা কিছুকে বড় বলা হয়, তাতে আমি তেমন কিছু খুঁজে পাইনি।

৪. পার্টিতে আসার পর থেকে যা দায়িত্ব পালন করেছি

ক. পার্টিতে আসার পরপরই কমরেড জ্যোতির অধীনে ছিলাম। সেখানে গেরিলাদের সামরিক শিক্ষা দেওয়ার কাজে আমাকে নিয়োগ করা হয়।

খ. তারপর ময়মনসিংহ অঞ্চলের দায়িত্বে ছিলাম।

গ. বর্তমানে একটি অঞ্চলের দায়িত্বে আছি।

৫. সংশ্লিষ্টদের মতামত

ভিন্নভাবে দেওয়া হবে।

৬. আত্মমূল্যায়ন

পেটিবুর্জোয়া শ্রেণি থেকে আগত। সামরিক বাহিনীতে দীর্ঘদিন কাজ করায় সামন্ত ও বুর্জোয়া আচার-আচরণ কিছুটা নিজস্ব হয়ে গিয়েছে। রাগ ও গালাগালির প্রবণতা রয়েছে। সাহস তেমন নেই। দোদুল্যমান ও ঝোঁকের ওপর কাজ করার প্রবণতা রয়েছে। খুঁটিনাটি বিষয়ে অন্যমনস্ক, অলসতা ও অসহিষ্ণুতাও আছে। সাংস্কৃতিক, ভাষাগত, রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক কাজের মানদণ্ড বিষয়ে ব্যক্তিকেন্দ্রিক চিন্তাধারা বিদ্যমান—জেদ, একগুঁয়েমি

ও মিথ্যা আত্মসম্মানবোধের প্রবণতা রয়েছে।

ধর্মের প্রতি দুর্বলতা ছিল। তা বর্তমানে নেই। তবে কাজকর্মের পদ্ধতিগত দিকে অধিবিদ্যার ভাবধারা প্রকাশ পায়। মার্কসবাদের মৌখিক দৃষ্টিকোণ দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ এখনো সম্পূর্ণরূপে নিজস্ব হয়ে ওঠেনি।

সর্বদাই স্নেহ আদায়কারী ছিলাম। এটাও কাটিয়ে উঠেছি এবং এই দুর্বলতা থেকে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করতে পারব বলে মনে করি।

সামরিক কাজের অভিজ্ঞতা থাকলেও গোড়াতে কিছুটা কাঁচা রয়ে গিয়েছিল।

জনগণের সাথে আলাপে ও অন্যদের বুঝতে তেমন একটা ভালো নই। মাঝে মাঝে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের অভাবে অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হই। এতদিন ধরে নিছক ব্যক্তিস্বার্থের ভিত্তিতে জীবন কাটিয়ে এসেছি। তাই ক্ষুদ্রমনা থেকে পুরোপুরি মুক্ত নই। ভালোর দিকে আমি নিজের মধ্যে পাই :

ক. কষ্ট সহ্য করতে পারি।

খ. শেখার আগ্রহ রয়েছে এবং প্রচেষ্টাও চালাই।

গ. বিপ্লবকে জীবন হিসেবে গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছি।

ঘ. বৈষয়িক দ্রব্যাদির প্রতি কোনো খোঁজ নেই।

সফিউল আলম
১০.১০.৭৬

রানা

একাত্তরের মে মাসের শেষের দিকে বরিশালের পেয়ারাবাগানে পাকিস্তানিদের সঙ্গে আমাদের টেক্সটবুক গেরিলাযুদ্ধ চলছে। ওরা আমাদের ক্রমশ ক্লোজ করছে, এনসার্কেল কইরা ফেলছে।

আমাদের ওই জোন কয়েকটা সেক্টরে ভাগ করা। একটা সেক্টরের কমান্ডার হইল ফিরোজ কবির। সে হইল হুমায়ুন কবিরের আপন ভাই, যাকে পরে মেরে ফেলা হইছে। সে ছিল সাহসী, ফেরোশাস, ডেডিকেটেড, তাত্ত্বিকভাবেও খুব ক্লিয়ার। হুমায়ুন কবিরের ফ্যামিলিটাই এমন, সবাই রাজনীতি করে। মানে একজন রাজনীতি করে আরেকজন পড়াশোনা করে, এমন না। তার বোনও রাজনীতি করে। সে তখন আমাদের পার্টির হোলটাইমার।

ফিরোজ কবির ইন্টারমিডিয়েটে পড়ত। ভালো কয়েকটা যুদ্ধ করছে। পাকিস্তানিদের সঙ্গে কমব্যাটও হইছে। ক্যাজুয়ালটিও হইছে পাকিস্তানিদের। কমান্ডার হওয়ার পর তার মাথা বিগড়ায়া গেছে। তার মধ্যে সমরবাদী মনোভাব ডেভেলপ করছে। তার সেক্টরে তার কমান্ডেই সবকিছু চলতে হবে, এমন একটা ভাব।

যখন বুঝতে পারলাম, সেখান থেকে আমাদের রিট্রিট করতে হবে, সব সেক্টরে ইনস্ট্রাকশন পাঠায়া দেওয়া হইল, আমরা এখান থেকে এইভাবে রিট্রিট করব। এটা সিরাজ সিকদারের ডাইরেকটিভ। কিন্তু ফিরোজ কবিরের তো মাথা বিগড়ায়া গেছে। মানে, কী হনু রে! তার অধীনে একটা বাহিনী আছে। বেশ শক্তিশালী বাহিনী।

সবাই প্রস্তুতি নিল কীভাবে সেখান থেকে চলে যাবে। ফিরোজ কবির অস্বীকার করল—আমি এখান থেকে যাব না। সিকদারের নির্দেশ সে মানবে না। তার অধীনে যেসব ছোট কমান্ডার আছে বা ট্রুপস আছে, তারা আবার

বিরোধিতা করছে, এটা কেমন কথা! ফিরোজ কবিরের এককথা, সবকিছু আমার কথামতো চলবে।

আমাদের অত্যন্ত ডেডিকেটেড একটা ছেলেকে সে কিল করছে। ঝালকাঠির একজন শ্রমিকনেতা। নাম নুরুল ইসলাম। সবাই ডাকত পণ্ডিত। তার সঙ্গে কথায় জেতা যায় না। সুন্দর সুন্দর আরগুমেন্ট দিত। একবার তাকে মার্শাল ল কোর্টে নেওয়া হইল। কোর্টের যে চেয়ারম্যান, তাকেও সে বেকায়দায় ফালায়া দিছে। এ জন্য তাকে সবাই বলত পণ্ডিত। তো পণ্ডিতকে কিল করছে। ফারুককে কিল করছে। খুব দুঃখজনক ব্যাপার। সে সেখান থেকে রিট্রিট করল না। শেষে পাকিস্তানিরা তাকে ধইরা ফেলছে। মারা যাওয়ার সময় সে অবশ্য সিরাজ সিকদার জিন্দাবাদ, সর্বহারা পার্টি জিন্দাবাদ, এসব স্লোগান দিছে।

যা হোক, সে পার্টির নির্দেশ মানে নাই। পার্টির কয়েকজন সিনসিয়ার সদস্যকে সে খুন করছে। এই হইল ঘটনার ফার্স্ট চ্যাপ্টার।

ততদিনে মুক্তিযুদ্ধ শেষ। পার্টির কংগ্রেস হইতেছে। কংগ্রেসে এই বিষয়গুলো আলোচনায় আসতেছে।

– কংগ্রেসে তো আপনি উপস্থিত ছিলেন। এটা কোথায় হলো?

ঢাকায়।

– কোন জায়গায়?

অনেকগুলো ভাগে ভাগ হয়ে হইছে। একটা হইল মগবাজার। জায়গাটার নাম পেয়ারাবাগ। সেখানে আমাদের একজন ক্যাডার আছে, আবুল। তার বাসায় একটা গ্রুপ বসছে। সিকিউরিটি রিজনে সবাই একসঙ্গে বসে নাই। সেখানে ফিরোজ কবির সম্পর্কে নেগেটিভ মন্তব্য আসছে। সে বিদ্রোহ করছিল, কমান্ড মানে নাই, এ কারণে ক্ষতি হইছে, এ ধরনের কথাবার্তা।

হুমায়ুন কবির তো শ্রমিক আন্দোলনের সময় থেকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত। তার ভাই সম্পর্কে আমাদের যে মূল্যায়ন, সে প্রকাশ্যে তার বিরোধিতা করে নাই। হুমায়ুন আমাদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লোক ছিল। পরে দেখা গেল সে আমাদের বক্তব্যের সঙ্গে একমত না। হুমায়ুন তার ভাই সম্পর্কে আপহোল্ড করে লিখছে। এইটা আমাদের পার্টি অ্যাকসেপ্ট করতে পারে নাই। আমাদের নিজেদের মধ্যে আলাপ হইছে, এইটা আবার কী?

ফিরোজ কবিরের কাজটা ছিল অ্যান্টি পার্টি অ্যাকটিভিটি। আমাদের

ক্যাডার মাইরা ফেলছে। আমরা বিশেষ কারণে তার বিরুদ্ধে জোরালোভাবে বলি নাই। তবে এ ব্যাপারে আমাদের একটা স্টেটমেন্ট আছে। তাকে কনডেম করছি। হুমায়ুন কবিরের এই মনোভাবটা আমাদের ভালো লাগে নাই। তারপরও সে আমাদের পার্টিতে ছিল।

কিন্তু এটাকে কেন্দ্র করে হুমায়ুনের মধ্যে অ্যান্টি পার্টি বীজটা ছিল। তার বোনের সঙ্গে আমাদের পার্টির আরেকজনের, সেলিম শাহনেওয়াজ, পার্টির সেন্ট্রাল কমিটির মেম্বার, বিয়ে হয়। পার্টিতে তার নাম ফজলু।

– তার বোনের নাম কী?

পার্টিতে আমরা বলতাম মিনু।

– সে কি ফিরোজ কবিরের ছোট?

হ্যাঁ। এই বিয়েতে আমাদের আপত্তি ছিল। সিকদার স্বয়ং বিরোধিতা করছে। এই ফ্যামিলিটা সম্পর্কে সে অ্যালার্ট হইয়া গেছে। আর ফারদার জড়াইতে চায় নাই। এই হইল মূল বিষয়।

ফজলুকে বলা হইল, তুমি সেন্ট্রাল কমিটির সদস্য। এই মেয়েটার ফিউডাল ব্যাকগ্রাউন্ড। তাকে বিয়ে করতে নিষেধ করা হইছে। কিন্তু সে বিয়ে করবেই। অ্যাডামেন্ট। অল্প বয়সে যা হয় আর কী।

বিয়ে সে করল। তাকে বলা হইল, ওয়ান কন্ডিশন। এ অবস্থায় তুমি সেন্ট্রাল কমিটির মেম্বার থাকতে পারবা না। তাকে ডিমোশন কইরা দিল। মানে সেন্ট্রাল কমিটি থেকে বাদ।

বাংলাদেশের কালচারে তো ষড়যন্ত্র হয়ই। পার্টিতে আরও কয়েকজন বিক্ষুব্ধ ছিল। সেন্ট্রাল কমিটির আরেকজন মেম্বার ছিল মাহবুব। পার্টি নেম সুলতান। খুব ডেডিকেটেড। তারও নারীঘটিত ব্যাপার। নারীঘটিত বলব না, প্রেমের কারণে ... তাকেও বলা হইল তুমি যদি ওই মেয়েটাকে বিয়ে কর, সেন্ট্রাল কমিটিতে থাকতে পারবা না। তো সে-ও সেন্ট্রাল কমিটি থেকে বাদ।

সুলতান আর ফজলু, এই দুইজন পদবঞ্চিত, ভিতরে ভিতরে এক হইছে। পার্টি খেয়াল রাখছে যে এরা কিছু করতে পারে। অ্যালার্ট করা আছে। এদের সঙ্গে যুক্ত হইছে হুমায়ুন কবির। হুমায়ুন কিন্তু বুদ্ধিজীবী মহলে খুব প্রভাবশালী। আপনি দেখছেন তাকে? খুব হালকা-পাতলা।

– হ্যাঁ, দেখেছি। তাঁকে বাংলা একাডেমিতে স্বরচিত কবিতা পাঠ করতে দেখেছি।

সে কিন্তু চাকু মারার ওস্তাদ ছিল। সে কী রকম লোক ছিল, বলি। তার প্রেমিকার নাম হইল রেবু। তাদের প্রেম এত গভীর যে, রেবুকে সে একবার চ্যালেঞ্জ দিল—তোমাকে আমি কতটা ভালোবাসি, দেখবা? ধারালো একটা চাকু নিছে। নিয়া নিজের শরীরে এইভাবে কাটছে, ইংরেজিতে 'আর' লেখছে। 'আর' মানে রেবু।

– হাতের তালুতে?

না, এই জায়গায় (কোমরের দিকে ইঙ্গিত করে)। কাইটা মাংস তুইলা ফেলছে। আমরা এইটা দেখছি। এই হইল হুমায়ুন কবির।

রেবুকে সে বিয়ে করল। সে সুলতান আর ফজলুর সঙ্গে যুক্ত হইল। হুমায়ুন সম্পর্কে আমাদের একটা রিডিং ছিল, হোক তার বোনের হাজব্যান্ড, এই পর্যায়ে নামার লোক না সে। আমরা এইটা কখনো চিন্তা করতে পারি নাই। ফজলু তার বোনের হাজব্যান্ড। সে এই ধরনের একটা কনস্পিরেসি করবে, সেখানে হুমায়ুন যুক্ত হবে একটা খেলো কারণে, কোনো রাজনৈতিক কারণে না, এইটা আমরা চিন্তা করতে পারি নাই।

ফজলুর অরিজিনাল জায়গা হইল ঝালকাঠি। সেখানেই সে ছাত্র ইউনিয়ন করছে। সেখানেই তার প্রভাব। সেখানে আমাদের যত ক্যাডার আছে, অধিকাংশই তার রিক্রুট। সে তাদের বলছে, সিরাজ সিকদারের বিরুদ্ধে আরেকটা পার্টি বানাইতে। তারা তাকে কিল কইরা দিছে।

– ঝালকাঠিতে?

হ্যাঁ। তার সঙ্গে একটা ব্যাগ ছিল। ব্যাগ খুলে তারা কাগজপত্র দেখল। একটা অস্ত্রও পাইছে, পিস্তল। কাগজপত্রের মধ্যে ছিল ফজলুর কাছে লেখা হুমায়ুন কবিরের একটা চিঠি। হুমায়ুনের হাতের লেখা। তার হাতের লেখা আমরা চিনি। ছাড়া ছাড়া, বিচ্ছিন্ন হাতের লেখা।

হুমায়ুনকেও ফজলু চিঠি দিছে। সেই চিঠিতে বক্তব্য আছে। বাই দিস টাইম সে ফণীভূষণ মজুমদারের সঙ্গে দেখা করছে। অর্থাৎ দলত্যাগ কইরা সে সরকারের সঙ্গে যোগ দিছে আর কী। ফণীভূষণ মজুমদারের সঙ্গে যে যোগ দিছে, আই স ইট। এই কাগজ পরে আমিও দেখছি।

এই ঘটনা যখন ঘটে, আমি তখন ময়মনসিংহে। আরিফের বাসায় বইসা খবরটা পাইছি। আরিফ ভাইও জানে, হুমায়ুন আমাদের লোক।

ফজলুকে তো ওরা কিল করছে। তারপর কাগজপত্র নিয়া ওরা ঢাকায়

আসছে। ঢাকার দায়িত্বে যে ছিল, সে আর একমুহূর্তও দেরি করে নাই।

– কে ছিল ঢাকার দায়িত্বে?

পরে বলব।

– নামটা বলেন।

পার্টিতে তার নাম জামিল।

ঢাকায় তো স্ট্যান্ড বাই ট্রুপস থাকত। এইটা নিয়া কারও সঙ্গে আলাপ-আলোচনার দরকার হয় নাই। অপরাধ যেটা হইছে, প্লাস এই লোকটা অনেক সিকিউরিটির সঙ্গে যুক্ত। অনেক বিষয় জানে। এইটা শুধু পার্টির ভিতরে কনস্পিরেসি না। সরকারের সঙ্গে যোগসাজশ আছে। ইন্দিরা রোডে গিয়া হুমায়ুনকে খতম কইরা আসছে।

আমাদের মনে তো প্রশ্ন দাঁড়াইছে, তাকে কী কারণে কিল করা হইল? এমনকি আরিফ ভাইও ধইরা নিছে, তারে আওয়ামী লীগাররা কিল করছে। তিনি একটা স্টেটমেন্ট লেইখা ফেললেন। ময়মনসিংহে আমাকে আরশাদ ভাই নামে ডাকা হইত। আরশাদ ভাই, দেখেন তো, হুমায়ুন কবিরকে কারা কিল করল? উনি লেইখা ফেলছে, 'হুমায়ুন কবিরের মতো ব্যক্তিকেও মুজিববাদীরা, আওয়ামী ফ্যাসিস্টরা কিল করে ফেলেছে।' লেইখা সে নিজেই বলল, 'লেখলাম তো। আল্লাহ জানে, নিজেদের মধ্যে কিলিং হইছে কি না।' মানে, আশঙ্কা প্রকাশ করছে।

অ্যাকশন ওয়াজ জাস্টিফাইড। আমি বলব, সবকিছু জাস্টিফাইড। বাট আলটিমেটলি পার্টির জন্য তো কোনো বেনিফিট ডাইকা আনে নাই। হুমায়ুন কবিরের মাধ্যমেই বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে যোগাযোগটা হইছে। অথবা বুদ্ধিজীবীদের ওপর হুমায়ুনের প্রভাব ছিল। তারা তো এত ইতিহাস জানে না। জানে যে, পার্টির মধ্যে মতপার্থক্য হইছে; তাকে কিল কইরা ফেলছে। ফলে ঢাকা ইউনিভার্সিটি এবং বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের কাছ থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলাম, পার্টির বিশাল ক্ষতি হইল। এরকম ঘটনা তো ঘটতেই পারে। কিন্তু দিস ইজ নট দ্য ওয়ে টু হ্যান্ডেল।

পার্টি একটা কাজ করতে পারত। একটা লিফলেট বা সার্কুলার দিয়া সবাইকে জানায়া দিতে পারত যে, সে কী কী অপরাধ করছে। পরে আমরা সিকিউরিটি নিয়া সতর্ক হইতে পারতাম।

– তাকে কি বাসার ভেতরে, নাকি বাইরে নিয়ে মেরেছে?

বাইরে।

– কয়জন গিয়েছিল।

বলতে পারব না। একজন তো যায় নাই। এসব কাজে তো মিনিমাম তিনজন যায়।

– হুমায়ুন কবির কিল্‌ড হওয়ার পর ক্ষুব্ধ হয়ে বা প্রতিবাদ করে পার্টি ছেড়ে গেছে এরকম কেউ আছে?

না। তবে বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে লিংকটা নষ্ট হয়ে গেছে। যেমন আহমদ ছফা। বুদ্ধিজীবীদের একটা স্বভাব আছে, তারা চৌদ্দটা দলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে। আহমদ ছফা বলেন, হুমায়ূন আহমেদ বলেন, নামগুলি আর বলতে চাই না।

– ফরহাদ মজহার, আহমদ ছফা, এরা কি সর্বহারা পার্টি করতেন?

ইপিসিপির আবদুল হকের সঙ্গে ফরহাদের যোগাযোগ ছিল। সিদ্ধান্ত ছিল, যতক্ষণ পর্যন্ত এরা হোলটাইমার না হবে, ততক্ষণ তাদের পার্টি মেম্বারশিপ দেওয়া হবে না। তারা ছিল 'সহানুভূতিশীল।'

– হুমায়ুন কবিরকে হত্যা করার আদেশ কি সিরাজ সিকদারের দেওয়া?

না।

– তাহলে যারা তাকে মারল, তারা পার্টির নির্দেশের তোয়াক্কা করেনি। আপনি কি এটাই বলতে চান?

ফজলুর সঙ্গে তার সম্পর্ক ও সিকদারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ ছিল। ফজলু ঝালকাঠিতে গেলে দলের স্থানীয় লোকেরা তাকে মেরে ফেলে।

– কে মেরেছিল?

মিলু।

–যে দুজন বা তিনজন হুমায়ুনকে মারতে গিয়েছিল, তাদের নাম জানেন?

না।

– আপনি আপনার সুবিধামতো নাম স্মরণ রাখেন। যা হোক, সিকদার তো লিফলেট দিয়ে এই হত্যার দায় স্বীকার করেছিল।

পরে এটা পার্টিতে এনডোর্স করা হয়।

– হুমায়ুন কবির যদি ষড়যন্ত্র করেই থাকে, তার কাছে কি কৈফিয়ৎ চাওয়া যেত না? ব্যাখ্যা দাবি করে নোটিশ পাঠানো যেত না?

এটা ঢাকা শহর কমিটির তাৎক্ষণিক ডিসিশন ছিল।

– তখন আপনাদের সেন্ট্রাল কমিটিতে কে কে ছিলেন?

সিরাজ সিকদার, আমি, ফজলু, সুলতান, মাহবুব, নাসির। এই ছয়জন।

– আপনারা কি এটাকে সেন্ট্রাল কমিটি বলতেন?

হ্যাঁ।

– সিরাজ সিকদারের ডেজিগনেশন কী ছিল? সেক্রেটারি?

চেয়ারম্যান।

– আর আপনারা সবাই মেম্বার। রইসউদ্দিন আরিফ আমাকে বলেছেন, আপনাদের তিনটা ব্যুরো ছিল।

ব্যুরো তো পার্টি স্ট্রাকচার না। পুরা অর্গানাইজেশনকে সারা দেশে কয়েকটা ব্যুরোতে ভাগ করা হইছিল। ব্যুরোর আন্ডারে ছিল অঞ্চল। তার আন্ডারে উপ-অঞ্চল। তার নিচে এলাকা, তারপর উপ-এলাকা। আমি যে ব্যুরোর দায়িত্বে ছিলাম, ময়মনসিংহ ব্যুরো, স্ট্রেংথের দিক দিয়া এইটা ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী।

– আপনার ব্যুরো কি ময়মনসিংহ, ঢাকা আর সিলেট নিয়ে?

না। আমার ব্যুরো হইল গ্রেটার ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল আর ঢাকার কিছু এলাকা। আর সিলেটের ধরমপাশা।

পার্টিতে আমি হইলাম নেহায়েত ভদ্রলোক মানুষ। খুব ফিটফাট থাকি দূর থেকে দেখলে মনে হবে বুর্জোয়া হইয়া গেছি। আমি পার্টিতে মিলিটারি অ্যাকটিভিটিজ বাদ দিয়া প্রচারমূলক কাজকে প্রাধান্য দিছি। রাজনৈতিক কাজকে গুরুত্ব দিছি। পাবলিক বেসিক্যালি কিলিং পছন্দ করে না। এ কারণেই ময়মনসিংহে পার্টির এত বিকাশ হইছে। এমন অবস্থা দাঁড়াইছিল যে, বলতে পারতাম, ওই বাড়িটা আমাদের না। তার মানে, বাকি সব আমাদের। অন্যান্য ব্যুরোতে সামরিক অ্যাকটিভিটিজ বেশি ছিল। সে কারণে পার্টির বিকাশটা ওই রকম হয় নাই।

– আপনাদের সামরিক কাজ তো ফরিদপুর-বরিশালে বেশি ছিল?

লৌহজং মানে বিক্রমপুর, বরিশাল, ফরিদপুর। ময়মনসিংহে অল্প হইছে। ময়মনসিংহের মধ্যে গফরগাঁও, কিশোরগঞ্জের উচাখিলা, ধনিয়াখোলা এসব এলাকায় কিছু সামরিক তৎপরতা ছিল। তা-ও সেন্ট্রালের চাপে। এত বড় অঞ্চল, তুমি কেন ... সামরিক অ্যাকশন কেন হয় না, এইসব প্রশ্ন ছিল।

– আপনি নিজে কখনো সামরিক অ্যাকশন লিড করেছেন।

নাহ্।

– আপনার অঞ্চলে সামরিক কমান্ডার কে ছিল?

ওর পার্টি নাম আবুল। বাড়ি ফরিদপুরের কালকিনি। ময়মনসিংহে থাকত। ও এখানে পোস্টেড। একাত্তরের যুদ্ধের সময় তাকে ময়মনসিংহে দেওয়া হয়। সে ভালো কমান্ডার ছিল। ও পরে মারা যায়। খুব দুঃখজনকভাবে মারা যায়। গফরগাঁও থানা দখলের অ্যাকশনে সে কমান্ডার ছিল।

– এটা কোন সালে।

চুয়াত্তরে। এটা তো বিশাল থানা। বিশাল অস্ত্রভান্ডার পাইছে। সেখানে তৈয়ব নামে আরেকজন কমান্ডার ছিল। সে অস্ত্রগুলো খুলতেছে আর চেক করতেছে, লোডেড অস্ত্র আছে কি না। লোডেড থাকলে গুলি রিলিজ করবে। একটা রাইফেল ছিল লোডেড। কমান্ডার আবুল সেখানে বসা। তৈয়ব রাইফেল চেক করতে গিয়া ফায়ার হইল। আমার কাছে রিপোর্ট হইল, অ্যাকসিডেন্টে আবুল মারা গেছে।

পরে আমার সন্দেহ হয়, শালার এই কমান্ডাররা তো—এক কমান্ডার আরেক কমান্ডারকে—আমি এদের চরিত্র জানি। এক কমান্ডার আউট অব জেলাসি আরেক কমান্ডারকে মারছে কি না। আমার মনে সন্দেহটা এখনো আছে।

এ ধরনের একটা ঘটনা ঘটছিল ডাকাত কুদ্দুস মোল্লাকে নিয়া, একাত্তরের যুদ্ধের সময়, বরিশালে। কুদ্দুস মোল্লা জেলখানা থিকা ছুইটা আইসা আমাদের পার্টিতে যোগ দেয়। ওর নাম দেওয়া হইল কমরেড চিত্ত। সে তো দক্ষিণ অঞ্চলের নামকরা ডাকাত। তাকে একটা অপারেশনে পাঠানো হয়। মেহেন্দিগঞ্জ অথবা পাতারহাট থানা, দুইটার একটা হবে। ঠিক মনে করতে পারতেছি না। থানা তো দখল কইরা ফেলছে। কুদ্দুস মোল্লা ছিল বাইরে। আমাদের মূল কমান্ডার ছিল খোরশেদ আলম খসরু। সে একটা রিয়েল ফাইটার। এরা আর্মি দেখলেও পালাবে না। আগাবে। এই নেচারের ছিল।

খসরু থানা দখল করে ফেলছে। হঠাৎ দেখে যে একটা গুলি ওর মাথার ওপর দিয়া গেছে। সে চিন্তা করতে শুরু করল, গুলিটা করল কে? দেখা গেল, গুলি করছে কুদ্দুস মোল্লা। যুদ্ধের টাইম তো? কিন্তু কুদ্দুস যে এটা পারপাসফুলি করছে, এইটা বোঝা যায়। যা হোক, ক্যাজুয়ালটি হয় নাই। থানাটা টোটাল দখল করে আসতে পারে নাই। তার আগেই রিট্রিট করছে

কুদ্দুস মোল্লার ওই গুলির কারণে। কুদ্দুস মোল্লা পরে পালায়া যায়। ইন্ডিয়া চইলা যায়।

– কমিউনিস্ট পার্টিগুলো তো সব সময় বলে যে বিপ্লবী পরিস্থিতি চমৎকার, কোথাও কোনো সমস্যা নেই। বিপ্লবের চাকা তরতর করে এগিয়ে চলছে। তো আপনাদের যাত্রাপথ কি এরকম ছিল? মানে আপনাদের গেরিলা অ্যাকশনগুলো কি সফল হতো সব সময়?

পার্টির মধ্যে অনেক উল্টাপাল্টা কাজ হইছে। দুইটা ভাইটাল ডিসিশন নিছে, দুইটাই ডিজাস্টার। একটা হইল সাহেববাজার রক্ষীবাহিনীর ক্যাম্প অ্যাটাক। আরেকটা হইল বাউফল থানা দখল। এর কোনো দরকার ছিল না।

– সাহেববাজার কোথায়?

ফরিদপুরে, কালকিনির দিকে। বাউফলে আমাদের সেন্ট্রাল কমিটির সদস্য নাসির ভাই অ্যারেস্ট হইয়া গেছে। সিকদার ভিতরে ভিতরে খুব বিব্রত। আমি কিন্তু মানুষকে দেবতা মনে করি না। আমি উপস্থিত। অথচ আমাকে জিজ্ঞাসা না করে সিকদার এই ডিসিশনটা দিল। বাই দিস টাইম সেন্ট্রাল কমিটি হইয়া গেছে দুইজনের। আরেকজন নেওয়া দরকার। ইতিমধ্যে ডিসিশন হইছে, পার্টির কংগ্রেস হবে পঁচাত্তরের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারির দিকে। সিকদার ভাবল, কংগ্রেস করার কী দরকার। আপাতত কাজ চালায়া যাওয়ার জন্য সে একাই সেন্ট্রাল কমিটির মেম্বারে থাকল, চেয়ারম্যান। আর সেন্ট্রাল কমিটি ডিজল্‌ভ কইরা দুইটা সাহায্যকারী গ্রুপ বানাইল। একটা হইল রাজনৈতিক সাহায্যকারী গ্রুপ, আরেকটা হইল সামরিক সাহায্যকারী গ্রুপ। আমার পজিশন দুই নম্বরেই আছে। রাজনৈতিক সাহায্যকারী গ্রুপে আমি এক নম্বর, দুই নম্বর হইল রামকৃষ্ণ পাল, অর্থাৎ মাহতাব। তিন নম্বর হইল সুদত্ত বিকাশ তঞ্চঙ্গ্যা, অর্থাৎ জ্যোতি। সামরিক সাহায্যকারী গ্রুপে এক নম্বর মতিন, দুই নম্বর কর্নেল জিয়াউদ্দিন, তিন নম্বর রফিক।

– ওই সময় আপনার কিছু সমালোচনা হয়েছে। আপনাকে সেন্ট্রাল কমিটি থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে বলে শুনেছি। মানে আপনার ডিমোশন হয়েছিল।

আমার ব্যাপারে কিছু ক্রিটিসিজম ছিল। আমার মনে হইল, সিকদার এত তাড়াহুড়া কইরা কমিটি ভাইঙ্গা দিল কেন? কমিটিতে বরং নতুন একজনকে নিয়া নাও। একজন মানে তো জিয়াউদ্দিন আইসা যায়। সেইটা করল না। কী কারণে আমার বিরুদ্ধে একটা বিশাল সমালোচনা হইল। সিকদার জীবনেও

কোনোদিন আমার সমালোচনা তো দূরে থাক, চোখ তুইলাও কথা বলে নাই। আমার সঙ্গে এত ভালো সম্পর্ক। আমাকে প্রেইজ করত।

– আপনার উপস্থিতিতে সমালোচনা হলো?

আমরা নেতৃস্থানীয়রা কখনো সবাই একসঙ্গে বসতাম না। মনে করেন, বিশজন হইলে চারজন পাঁচজন কইরা গ্রুপে বসতাম। তখন তো চাপে ছিলাম। থার্ড গ্রুপের মিটিং যখন হয়, তখন আমি উপস্থিত। এর আগে যে দুইটা গ্রুপের মিটিং হইছে আমি জানি না।

আমি টার্গেট হইয়া গেছি। আমি তো কিছু বলতে পারতেছি না। আবার দেখলাম, সাহায্যকারী গ্রুপ করছে, জানুয়ারি মাসে কংগ্রেস হবে। আমি সেন্ট্রাল কমিটির সদস্য থাকলাম কি থাকলাম না, এইটা ইম্পর্ট্যান্ট না। মাঝখানে যে ভ্যাকুয়াম ক্রিয়েট হইয়া গেল, এইটা আমার কাছে ইম্পর্ট্যান্ট। তারপরও ভাবলাম, জানুয়ারিতে কংগ্রেস হইলে এই ভ্যাকুয়ামটা থাকবে না।

– এই যে দুইটা সাহায্যকারী গ্রুপ হলো, এর ডিসিশন মেকিংয়ে আপনি ছিলেন না?

এইটা বানায়া সিকদার মিটিংয়ে প্লেস কইরা দিছে। প্রথম দুইটা গ্রুপের মিটিংয়ে তো আমি নাই। থার্ড গ্রুপের মিটিংয়ে এইটা পাইয়া আমি মৃদু হাসলাম। তারপর সিকদার আর আমি একত্রে মিটিং থিকা বাইর হইলাম। কোনো খারাপ অর্থ কইরেন না যে, আমারে পদাবনতি করছে। তারপর চিটাগাং যাওয়ার আগ পর্যন্ত সিকদার আমার বাসায় ছিল।

– বাসা কোথায়?

রায়েরবাজার।

– কোন জায়গায়?

মন্দিরটা আছে না, ওইখানে।

– পুলপারের কাছে?

মন্দিরটার একটু পশ্চিম দিকে।

– সিকদার চিটাগাং যাওয়ার আগে সিলেটে গিয়েছিলেন না?

না।

– ঢাকা থেকে সরাসরি চিটাগাং গেছেন?

হুমায়ুন রোডের বাসা থেকে এসে আমার বাসায় উঠল। এবং আমার বাসা থেকেই সে সপরিবার চিটাগাং গেল। চিটাগাং যাইতে আমি বাধা দিছিলাম।

– চিটাগাং গেল তো জাহানারাকে সঙ্গে নিয়ে?

হ্যাঁ।

– তারা যে চিটাগাং গেছে, এটা পুলিশ জানল কীভাবে? আপনার বাসা থেকেই তো তারা গেছে। আপনার দিকে কি সন্দেহ যায় না?

না। সে অ্যারেস্ট হইছে তো আমাদের ইন্টারন্যাল বিট্রেয়ালের কারণে।

– রওশন আরা স্ত্রী থাকা অবস্থায় কি সিকদার জাহানারাকে বিয়ে করেছে?

এইটা তো শ্রমিক আন্দোলনের টাইমে। ওই সময়ই ডিভোর্স হইছে, সিক্সটি নাইনে। একটা কথা, রনো-মেননের সঙ্গে শেখ মুজিবের যে সাক্ষাৎকারটা আপনার *বেলা-অবেলা* বইয়ে দিছেন, সেখানে সিকদারকে মুজিব 'ডিবচ' বলছে না? 'ডিবচ' শব্দটা কীভাবে আসছে?

সিকদারের তিনটা বিয়া আছে। প্রথমে রওশন আরাকে বিয়া করছে। ইমম্যাচিউর মেয়ে। তখনো তার ফুল বডিগ্রোথ হয় নাই। তারপর সিক্সটি নাইনে সে জাহানারা হাকিমকে বিয়া করল। এই বিয়ার সময় আমি নাই। আমি অ্যাবসেন্ট।

– জাহানারা হাকিম কি আগে বিবাহিত ছিল?

বিবাহিত ছিল। ওই ঘরে তার বাচ্চাও আছে।

– তার হাজব্যান্ড কে?

ওয়ান মি. হাকিম। তাদের পারিবারিক জীবনে ক্যাওস ছিল। হাকিম সাহেবের সঙ্গে জাহানারার অনেক গণ্ডগোল ছিল। সিকদারের সঙ্গে বিয়ার পর জানা গেছে, ওই যে তার পারিবারিক গণ্ডগোল, এ জন্য জাহানারা দায়ী। সে আসলে মানসিক রোগী। হাকিম সাহেবের সঙ্গে থাকা অবস্থায় তার মাথা পুরাপুরি আউট হইয়া যায়। তাকে ইলেকট্রিক শক দেওয়া হইছিল। এইটা গোপন ছিল।

সিকদারের সঙ্গে বিয়ার পর এইটা আবার রিভাইভ হইছে। আনহ্যাপি লাইফ হইয়া গেছে। এমন লাইফ হইছে, একবার হুমায়ুন রোডের বাসায় জাহানারা পিস্তল বাইর কইরা সিকদারকে খুন করতে গেছে। এইটা কেউ জানে না। আজকে আপনি জানলেন। সেখানে তখন কে ছিল? আমি ছিলাম না। আকবর নামে একটা ছেলে ছিল। রশিদ নামে তার বাবুর্চিটা ছিল। আর ছিল ওয়াহিদুজ্জামান। আর সম্ভবত আবদুর রহমান খান, সাংবাদিকতা করে, পার্টি নাম লাবলু।

– লাবলু? বরিশালের দিকে বাড়ি?

বাড়ি কোথায় বলতে পারব না। যা হোক, এই বিয়াটা ব্রেক হইয়া যায়। প্রথমবার সাময়িক ব্রেক হয়। আমরা বলছি, আপনারা এখন বিচ্ছিন্ন থাকেন। দেখি, চেঞ্জ হয় কি না। একটু চেঞ্জ হইলে বলছি, এখন আপনারা একত্রে থাকতে পারেন। বিয়াটা আবার জোড়া লাগল আরকি। তারপর আবার খারাপের দিকে। ততদিনে একটা বাচ্চাও হইয়া গেছে। থাকতেও পারে না, ছাড়তেও পারে না, এই রকম অবস্থা।

তখন যেই বিয়াটা হয়। মহিলার পুরা নাম আমি বলব না। এখন এক জায়গায় স্বামীর ঘর করতেছে। নামের একটা অংশ বাদ দিয়া বলতেছি—শায়লা আমিন। পার্টিতে তাকে বলা হইত খালেদা। সিকদার যখন অ্যারেস্ট হয়, শায়লা আমিন তার বাসায় ছিল। অ্যান্ড শি ওয়াজ প্রোবাবলি প্রেগনেন্ট।

– কোন বাসায়?

চিটাগাংয়ের বাসায়। ওই বাসা থেকে বাইর হইয়া মিটিং করতে গিয়া, মিটিং কইরা ফিরা আসার সময় অ্যারেস্ট হইছে।

– চিটাগাংয়ে কার বাসায় ছিল, জানেন?

সে ভাড়া বাসায় ছিল।

– জাহানারা চিটাগাংয়ে ছিল না?

ছিল।

– শায়লাও চিটাগাংয়ে, জাহানারাও চিটাগাংয়ে?

হ্যাঁ।

– তো জাহানারা ঢাকা থেকে গেল কার সঙ্গে?

সিকদারের সঙ্গে গেছে। আমার বাসা থেকে গেছে দুইজন। প্লেনে গেছে, এইটা মনে আছে।

– সিকদারের সঙ্গে শায়লা, জাহানারা, দুজন আপনার বাসা থেকে গেছে?

হ্যাঁ। আমি যাইতে মানা করছিলাম। বলছি, আপনি গেলে ওইখানে ধরা পড়বেন। পরিষ্কার বলছি তাকে। এন্টায়ার পার্টিতে আমি ছিলাম একমাত্র ব্যক্তি, যে সিকদারকে কন্ট্রোল করতে পারত। সে এত রাশ চলাফেরা করত! ধরেন, নিউমার্কেটে গিয়া ঘুইরা আসল। বাটার দোকানে গিয়া জুতা কিনা নিয়া আসল। হঠাৎ কোনো বন্ধুর বাসায় গিয়া হাজির হইল। তাকে নিয়ন্ত্রণ

করার কেউ ছিল না। একমাত্র আমি ছিলাম। বাই দিস টাইম, তাদের ভাষায় দলে আমার 'ডিমোশন' হইয়া গেছে।

– আমাকে আবুল কাসেম সাহেব বলেছেন, আপনি তো তাকে চেনেন? চিটাগাং পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ভাইস প্রিন্সিপাল ছিলেন। বলেছেন যে, সিকদারের স্ত্রী চিটাগাংয়ে তাঁর বাসায় ছিল। প্রশ্ন হলো, তিনি কে? জাহানারা না শায়লা।

উনি জানেন না?

– উনি তো জানেন না যে সিকদার দুইজন স্ত্রী নিয়া চিটাগাং গেছে। নামটাম জিজ্ঞেস করেননি।

চেহারা কেমন?

– তিনি বলেছেন, হালকা পাতলা শরীর, দেখতে ফরসা।

তাহলে এইটা শায়লা আমিন হবে।

– সিকদার যে 'ডিবচ', এটা শেখ মুজিব জানলেন কীভাবে?

শেখ মুজিবের জন্য এই রিপোর্ট বানাইছে এসবির কায়কোবাদ আর মনির।

– কায়কোবাদ তো ইন্সপেক্টর ছিল। মনির কী ছিল?

সেটা জানি না। নামটা মনির, এইটুকু জানি।

একটা কথা বলি। সিকদারের ফার্স্ট ডিভোর্সটা আমাদের কর্মীরা অ্যাকসেপ্ট করে নাই। জাহানারার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি এবং শায়লা আমিনের সঙ্গে বিয়া, এটাও ...

– কর্মীরা অ্যাকসেপ্ট করে নাই?

একটা সাইলেন্ট ইয়া আছে।

– মানে পছন্দ করে নাই।

হ্যাঁ, পছন্দ করে নাই। এইটা সিকদারও জানত।

– তাহলে বোঝা যায়, সব বিয়ের পেছনে কোনো আদর্শ কাজ করেনি। জাস্ট পছন্দ হলো আর বিয়ে করল। তাই না ব্যাপারটা?

প্রথমটা তো রাজনৈতিক বিয়া না। দ্বিতীয়টা রাজনৈতিক। জাহানারা হাকিম তো আগে পার্টিতে যোগ দিছে। আর শায়লা আমিনও পার্টি করত।

আমি সিকদারকে বলছি, এইটা আমি অ্যাকসেপ্ট করলাম না। আমি কিন্তু বেসিক্যালি উদার। কিন্তু বাংলাদেশের জনগণের মান, কর্মীদের সাধারণ

মানের সঙ্গে এটা সংগতিপূর্ণ না। এইটা আমি তাকে বলছি। সেন্ট্রাল কমিটির মিটিংয়ে বলছি।

– জাহানারা হাকিম এখন কোথায়?

কুমিল্লায় বাড়ি। তার তো উপন্যাস আছে, কবিতাও আছে। জিয়াউর রহমানের ক্যাবিনেটে উপমন্ত্রী ছিল মাবুদ ফাতেমা কবির। জাহানারা তাঁর বোন।

– আমি খোঁজ নিয়েছি। জাহানারা বছর দশেক আগেই মারা গেছে। ডিমোশনের ব্যাপারটা তো ক্লিয়ার করলেন না?

ওই যে সেন্ট্রাল কমিটি ভাইঙ্গা দিয়া সাহায্যকারী গ্রুপ বানাইল। আমার একটা সিরিয়াস সমালোচনা করছে। রাজনৈতিক না, ব্যক্তিগত সমালোচনা। এই যে সেন্ট্রাল কমিটি ভাইঙ্গা দিয়া একক নেতৃত্বে গেল, পার্টি তখনই ডেস্ট্রয় হইয়া গেছে।

– এ ব্যাপারে সিকদারকে কেউ উসকানি দিয়েছে? নাকি সে নিজে নিজেই এটা করেছে?

সে নিজেই করেছে।

– সে কি নিজেই পার্টি ডেস্ট্রয় করতে চেয়েছিল?

সে তো বুঝতে পারে নাই। তার মধ্যে সাবজেকটিভিজম কাজ করছে।

– আমি তো এ ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে সিরাজুল আলম খানের মিল দেখতে পাচ্ছি। অনেকেই বলে, সিরাজুল আলম খান জাসদকে ডেস্ট্রয় করেছে।

পয়লা জানুয়ারি সিকদারের গ্রেপ্তারের সঙ্গে সঙ্গেই সবকিছু শেষ। একটা আন্ডারগ্রাউন্ড সশস্ত্র পার্টি, তার সেন্ট্রাল লিডারশিপ যদি না থাকে, তার অ্যাবসেন্সে কী হতে পারে? সবার পকেটে তো অস্ত্র। একেকজনের কাছে হ্যান্ড্রেডস অব ওয়েপনস। আমার হাতে অবশ্য কোনো ওয়েপন নাই।

– আপনি তো রাজনৈতিক?

সবচেয়ে বড় অঞ্চলটা ছিল আমার। ওইটা ভলান্টারিলি ছাইড়া দিয়া ঢাকায় আসছি। মানে স্পেশাল মিশনে আসছি।

– মিশনটা কী? আপনার যে বয়স এখন, এ বয়সে লুকোছাপা করে লাভ নেই। খুলে বলুন।

বাই দিস টাইম আমরা কনফার্মড হইয়া গেছি, একটা ক্যু আসতেছে। এইটা হান্ড্রেড পারসেন্ট কনফার্মড হইয়া গেছি। নেতৃস্থানীয় কর্মীদের বর্ধিত

সভায় পরিষ্কার বলা হইল—ওয়ান ক্যু ইজ কামিং। এবং ক্যুতে আমাদের রোল কী হবে? আমরা বিরোধিতা করব। বিরোধিতা করে যদি সফল না হই, তাহলে এই ক্রাইসিসের সুযোগ আমরা নেব। টেক প্রিপারেশন। এ উপলক্ষে আমাকে ঢাকায় আনা হয়।

– আপনার কাজটা কী? কী অ্যাসাইনমেন্ট ছিল?

আর্মির সঙ্গে যোগাযোগ।

– কার কার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল?

ডালিম, নূর, ইকবাল। এই যে জিয়াউদ্দিন, পরে জাসদে জয়েন করছিল. সেও আমাদের চ্যানেলে ছিল। মেজর হাফিজের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ ছিল না। ইকবালের মাধ্যমে তাকে জানতাম।

– মেজর হাফিজ আর মেজর ইকবাল তো আত্মীয়?

একজন আরেকজনের বোনকে বিয়া করছে।

– আচ্ছা।

আমরা জাফরুল্লাহ চৌধুরীকে সন্দেহ করতাম, সে মোসাদের লাইনটা মেনটেইন করে। তাকে ওয়াচ করার জন্য আমরা দুইজন সহকারীসহ রওশন আরাকে দিলাম।

–কোথায় দিলেন?

গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রে।

– রওশন আরা সেখানে কবে গেল?

চুয়াত্তর সালে। সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রামের আরও দুইজন। জাফরুল্লাহকে বলা হইল, এরা তোমার কাছে নার্সিং শিখবে। বাই দিস টাইম জাফরুল্লাহ আমাদের পার্টির সঙ্গে ইনভলভড। পার্বত্য চট্টগ্রামে আমাদের বাহিনী আছে। সেখানে ডাক্তার দরকার, নার্স দরকার। রওশন আরার কী কাজ, তারা কিন্তু জানে না। রওশন আরার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতাম আমি আর ইঞ্জিনিয়ার আমানউল্লাহ। যোগাযোগ করতে গিয়া জাফরুল্লাহর সঙ্গে কথা হইত। আমরা কেউ কোনোদিন কারও কাছে প্রশ্ন করি নাই। আলাপেই সব কথা বাইর হইয়া আসত। বুঝতে পারতাম, রিড করতে পারতাম আসলে কী হতে যাচ্ছে।

– জাফরুল্লাহ চৌধুরীর ইনভলভ্‌মেন্টটা কোন স্তরের?

সহানুভূতিশীল। আমাদের সিমপ্যাথাইজার হওয়া সত্ত্বেও তারা অন্য



সর্বহারা-দম্পতি রানা ও মুন্নি

দলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখত। এর ফলে তারা অনেক খবর আমাদের কাছে ভেন্টিলেট করত।

– জাফরুল্লাহ চৌধুরী যে আপনাদের একজন সহানুভূতিশীল, এটা তিনি জানেন?

হ্যাঁ, অবশ্যই জানে।

– আমি কিন্তু এসব ক্রস চেক করব।

হ্যাঁ হ্যাঁ, করেন। প্রবলেম হইছে কী, মোস্ট অব দ্য টাইম এরা অস্বীকার কইরা বসে। এই হলো সমস্যা।

– আমি যদ্দুর জানি, তিনি মিছা কথা বলার লোক না।

আপনি শুধু জিজ্ঞাসা করবেন, আপনার ওখানে সিরাজ সিকদার কি তিনটা বা চারটা মেয়েকে ট্রেনিং নেওয়ার জন্য পাঠাইছিল?

– সিরাজ সিকদার পাঠিয়েছে এই ইনফরমেশন তার কাছে ছিল?

ছিল।

সিকদার অসুস্থ ছিল। মানসিক স্ট্রেস, আলসার। চিকিৎসা করেছিল নাজিমুদ্দৌলা, বদরুদ্দোজা চৌধুরী আর হলি ফ্যামিলি হাসপাতালের ডাইরেক্টর এম এম হোসেন। নাজিমুদ্দৌলা ছিল মনোচিকিৎসক। সে সিকদারের আসল পরিচয় জানত না। বি চৌধুরী আর এম এম হোসেন জানত। সিকদারের ছিল ডিউডোনারাল আলসার। এছাড়া প্রচণ্ড রকমের মানসিক স্ট্রেস ছিল। সেজন্য নাজিমুদ্দৌলাকে কনসাল্ট করত।

একটা পর্যায়ে দেখা গেল, সিকদার ছোটখাটো ব্যাপারেও ইনভলভ হয়। আমি তাকে বাধা দিতে পারি নাই। কর্মীদের অনেক ছোটখাটো ত্রুটিবিচ্যুতি থাকে না? এইগুলোতেও সে ইনভলভড হইয়া যাইত। তার কাছাকাছি যারা থাকত, তাদের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি হইছিল। চুয়াত্তর সালে এগুলো সিরিয়াস আকার ধারণ করছে। আমি তারে বলছি, জাহানারা হাকিমের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক আরও খারাপ হবে, যদি আপনি ছোটখাটো সমস্যা নিয়া মাথা ঘামান।

– রওশন আরা এখন কোথায়?

ঠিক জানি না।

– রওশন আরার ঘরে তো সিকদারের এক মেয়ে, শিখা।

এক মেয়ে এক ছেলে, শিখা আর শুভ্র। শুভ্র তো ক্যানসারে মারা গেছে।

– শিখা কোথায় আছে?

আমেরিকায়।

– জাহানারা হাকিমের সন্তান আছে?

ছেলে আছে, অরুণ। আমেরিকায় থাকে।

– আর শায়লা আমিন?

জানি না।

– সিরাজ সিকদারকে নিয়ে প্রথম একটা স্টোরি ছাপা হয় সাপ্তাহিক *বিচিত্রায়*। তারপর থেকেই তার মৃত্যু নিয়ে কানাঘুষা হচ্ছে। আপনার কি মনে হয় তাকে গণভবনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল? কিংবা প্রধানমন্ত্রী তাকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

আমরা এ বিষয়টি নিয়ে ভাবিনি। আমলেই নিইনি। সিকদার তো ছিল মোস্ট ওয়ান্টেড পারসন। তাকে পেলে মেরে ফেলবে এটাই তো স্বাভাবিক। তো তাকে কিল করা হয়েছে। তাকে ধরা এবং কিল করার মাঝের সময়টুকু

নিয়ে অনেক কথাবার্তা আমার কানেও আসছে। আমি এগুলো বিবেচনায় নিই না।

– রক্ষীবাহিনীর উপপরিচালক আনোয়ার উল আলম বলেছেন, তিনি এবং তার সহকর্মী সারোয়ার মোল্লা সিকদারকে দেখতে গিয়েছিলেন। তার সঙ্গে কথা বলেছেন পরদিন সকালে।

তাকে তো পয়লা জানুয়ারি চট্টগ্রাম থেকে ধইরা ঢাকায় নিয়া আসা হইল। তারপর ওই রাতেই সে কিল্ড হয়।

– কিন্তু আনোয়ার উল আলম বলছেন, পরদিন সকালে তারা তাকে দেখতে গেছেন। তাকে নাশতা খাওয়ানো হয়েছে।

বাজে কথা। তারা রাতটা আর পার করে নাই। হতে পারে রাত বারোটার পর তাকে মারছে। সে ক্ষেত্রে এটা হবে পরের দিন।

– তিনি আরও বলেছেন, জনৈক রবিন তাকে ধরিয়ে দিয়েছে। রবিনের স্ত্রী বা প্রেমিকার ওপর নাকি সিকদারের চোখ পড়েছিল। পরে তাদের কানাডায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এই রবিনটা কে?

সিকদারের সঙ্গে যে গ্রেপ্তার হইছিল, তার নাম আকবর। তার আরেকটা নাম রবিন। আবার তাকে কামাল নামেও ডাকা হইত। কারও কারও একাধিক নাম ছিল। আকবরও তো কিল্ড হয়। এক মাস বা দুই মাস পরে বরিশালে তার বাড়ির সামনে তার ডেডবডি ঝুলায়া রাখছিল।

– আনোয়ার উল আলম বলেছেন, রবিনের কাহিনি তিনি শুনেছেন এসবির ডিআইজি ই এ চৌধুরীর কাছে।

সিকদার ই এ চৌধুরীর কাস্টডিতে ছিল। এটা বানোয়াট গল্প বলেছে। যে যার মতো গল্প বানিয়েছে। সিকদারের সঙ্গে ছিল আকবর।

– আকবরকে কে মারল?

যারা ধরেছিল, তারাই হয়তো মেরেছে। সাক্ষী রাখে নাই।

– সিকদার কিল্ড হওয়ার পর তার ছেলেমেয়েদের কী হলো?

শিখা আর শুভ্র আমার বাসায় ছিল কয়েক মাস। আমাদের সঙ্গে আজিজ মামা থাকতেন। তিনি বিএডিসির নির্বাহী প্রকৌশলী। পার্টিতে হোলটাইমার। পার্টি নাম আজম। তিনি ফার্স্ট ক্লাস কনট্রাক্টর। পার্টিকে ফাইন্যান্স করতেন। পরে কনকর্ডের চিফ হইছিলেন।

– কোথায় ছিলেন তখন?

নাখালপাড়ার একটা শেল্টারে। পরে বাচ্চাদের মিরপুরে আরেকটা শেল্টারে পাঠানো হয়। পরে খিলগাঁওয়ে সিকদারের বাবা-মার কাছে পাঠায়া দেওয়া হয়।

– জাহানারার কী হলো?

তাকে কুমিল্লায় তার ভাইয়ের কাছে পাঠায়া দেওয়া হয়। তাদের একমাত্র সন্তান অরুণকেও পরে সিকদারের বাবা-মার কাছে রেখে আসা হয়।

– আপনি কি পার্টি ছাড়ার পর বিয়ে করেছেন?

না। বিয়া করি ১৯৭৪ সালে। সিকদারের অনুমতি ছিল। বিয়া মানে কী। আমি বলি রুমমেট। সে আরিফ ভাইয়ের স্ত্রী রানুর ছোট বোন।

– নাম কী?

সেলিনা বেগম। পার্টি নাম মুন্নি। বিয়ার ঘটক ছিল সিকদার। পরে সে বলল, সামাজিক স্বীকৃতির দরকার আছে। তখন রেজিস্ট্রেশন হয়। বিয়া হয় কলাবাগানে খসরুদের বাসায়। আমার গার্জিয়ান বাবা-মা উপস্থিত ছিল। সেখান থেকে রাজাবাজার মসজিদের পিছনে আমাদের শেল্টারে চইলা যাই। মুন্নি ছিল কেন্দ্রীয় স্টাফ। কাজ ছিল দপ্তর সংরক্ষণ করা।

– বিয়ের আগে কি মুন্নিকে চিনতেন? কীভাবে সিদ্ধান্ত নিলেন।

আমি তো ময়মনসিংহের চার্জে। জামালপুর থেকে ঢাকায় যাব। ময়মনসিংহে নেমে ঢাকায় ট্রেন ধরব। ঢাকায় যাওয়ার ট্রেন ভাড়া আছে। খাব কী? কী করা যায়? আরিফ সাহেবের বাসায় গেলাম দুপুরে। দুপুর না হইলে তো খাইতে দিবে না। দরজায় খটখট করলাম। এক বালিকা দরজা খুলল। আমাকে আগে দেখে নাই।

রইসউদ্দিন সাহেব আছেন?

গফরগাঁও গেছেন।

ঠাস কইরা দরজা বন্ধ কইরা দিল। এক বেলা খাইতে পারলাম না। খুব রাগ হইল। স্বদেশী বাজারে আইসা জোড়াকলা কিনলাম। বড় সাগর কলা। জোড়া কলা হইলে একটার দাম রাখে। এইভাবে লাঞ্চ হইল। মনে খুব জেদ। খাইতে দিলা না। দাঁড়াও। তখনই মতলব আঁটলাম, তোরে বিয়া করুম। দেইখা পছন্দ হইছে। সিকদারের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় খুব পাওয়ারফুল। পরে তো পার্টির লোকদের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠতা হয় আরিফ ভাইয়ের কারণে। আরিফ ভাইয়ের শালি তো? সেখানে সিকদার গেছে, জাহানারা গেছে।

পার্টির অনেক মিটিং হইছে।

– সিকদারকে পার্টির লোক ধরিয়ে দিয়েছে বলে যে কথা উঠেছে, তার সত্যতা কী।

পঁচাত্তরের জানুয়ারিতে পার্টির কংগ্রেস হওয়ার কথা। সিদ্ধান্ত হইছে চুয়াত্তরের সেপ্টেম্বরে। পার্টির লিডিং ক্যাডাররা নইড়াচইড়া বসছে। পার্টির দ্বিতীয় সারির কোনো কোনো নেতার বিরুদ্ধে তৃতীয় সারির নেতাদের অভিযোগ ছিল। মিটিংয়ে সামনাসামনি অভিযোগ করার সাহস ছিল না। অভিযোগকারীদের একজন হইল মনসুর। সে জিয়াউদ্দিনকে একটা খোলা চিঠি লিখছে। চিঠি পাঠানোর আগেই সে এইটা হারায়া ফেলে। সে সিকদারকে কিছু কাগজ দিছিল। ভাবল, হয়তো ওই কাগজপত্রের মধ্যে ওই চিঠিটাও চইলা গেছে। সিকদার টের পাইয়া গেছে, একটা প্লট হইতেছে। চিঠি ফাঁস হইলে কী পরিণতি সে জানে। তখন ভয়ে সে পুলিশকে সব জানায়া দেয়।

চিটাগাং হয়ে তার ঢাকায় আসার কথা। সিকদার তাকে আটকায়া রাখে। চিটাগাংয়ের সবাইকে নিয়া সে মিটিং করে। মনসুরকে সে ডাইকা পাঠায়।

ইঞ্জিনিয়ার আমানউল্লাহ প্রত্যেক রাতে চিটাগাং থিকা আজিজ মামাকে ফোন কইরা খবরাখবর দিত। ১ তারিখ রাতে সে ফোন করে নাই। ১ তারিখ রাতেই সিকদারকে কিল করা হয়। সাভারের গল্প পুরাপুরি মিথ্যা। সাভার থানায় মামলা করছে পুলিশ। অপমৃত্যুর মামলা।

– সিকদারকে কি গণভবনে নিয়ে গিয়েছিল?

সিকদারকে তো অ্যারেস্ট করে ঢাকায় নিয়া গেল। এখন তাকে কী করা হবে? অধিকাংশের মত হইল তাকে জীবিত রাখা হবে। কিন্তু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মনসুর আলী সাহেব বলল, আমি তো গ্যারান্টি দিতে পারব না। ওরা আমাদের কোনো বড় নেতাকে জিম্মি করতে পারে। তখন সিদ্ধান্ত হয়, তারে মাইরা ফেল। এরকম একটা গল্প চালু আছে বাজারে। আমিও শুনছি। কিন্তু গুরুত্ব দিই নাই।

– আনোয়ার উল আলম এবং সারোয়ার মোল্লা বলেছেন, সিকদারকে দেখে মনে হয়নি যে তাঁকে টর্চার করা হয়েছে।

সারোয়ার মোল্লা তো একটা ব্রুটাল কিলার। তার সহযোগী ছিল রাজা আর মিজান। আনফরচুনেটলি এরা সিকদারের আত্মীয়, লাকার্তায় তার মামাবাড়ির লোক।

রক্ষীবাহিনীর অফিসাররা পরে আর্মিতে অ্যাবজরভ হইয়া সব ভদ্রলোক হইয়া গেছে। জিয়াউর রহমান তাদের আর্মিতে নিয়া প্রটেক্ট করছে।

– এসপি মাহবুবের ভূমিকা কী? তিনি একবার কথা প্রসঙ্গে আমাকে বলেছিলেন, সিকদারের সঙ্গে তার দেখা হয়নি। তার আগেই তাকে এসবির কাস্টডিতে নিয়ে গেছে।

সিকদার অ্যারেস্ট হবে আর মাহবুব দেখবে না, এইটা হয় নাকি? ইন্টারোগেশনের টাইমেই তাকে কিল করা হয়।

– আপনি তো বললেন, আপনারা ক্যু সমর্থন করেন না। আবার পূর্বাভাস দিলেন যে ক্যু একটা হবে। ক্যু তো হয়ে গেল ১৫ আগস্ট। এটা কীভাবে দেখেন?

একপর্যায়ে বাসা বদল করে খিলগাঁওয়ে যাই। জিয়াউদ্দিন ঢাকায় আসলে সেখানে থাকত। পঁচাত্তরের অক্টোবরের ২০-২৫ তারিখের দিকে সে আসল। কলাবাগানে খসরুর বাসায় আমরা বসলাম। পার্টিতে খসরুর নাম ছিল আতাউর। জিয়াউদ্দিন, সুফি ভাই আর আমি। সুফি ভাইয়ের আসল নাম মহসিন আলী। মিটিংয়ে ডালিম আর নূরের আসার কথা। ডালিম আসে নাই। নূর আসছে। লম্বা বৈঠক। আমরা বললাম, এইটা আমরা চাই নাই। নূর ভাইঙ্গা পড়ল। বলল, আপনারা যেটা করতে চান, আমরা সেটা করে ফেললাম। আমাকে দিয়া আর কিছু করা সম্ভব না। সে তখন মেজর ইকবাল আর স্কোয়াড্রন লিডার লিয়াকতের লিংক দিল। বলল, এদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন।

তাদের সঙ্গে আমাদের বৈঠক হয়ে গাইনোকোলজিস্ট টি এ চৌধুরীর আন্ডারকনস্ট্রাকশন হাসপাতালে। নূর বলছে, শেখ মুজিবের উৎখাতের পরিকল্পনায় এরাও ছিল। নেক্সট গভমেন্ট কী রকম হবে, এটা নিয়া তাদের সঙ্গে দ্বিমত হয়। তখন নূররা এটা কইরা ফেলে। যাদের বাদ দেয়, তারা পরে আরেকটা উৎখাতের সিদ্ধান্ত নেয়। ইকবাল আর লিয়াকত বৈঠক করে আমাদের সঙ্গে। আমরা মানে জিয়াউদ্দিন, মহসিন আর আমি ছিলাম। আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম, একটু প্রস্তুতি নিয়া রাখি। জিয়াউদ্দিন আর্মিতে তার রিলায়েবল লোকদের কনট্যাক্ট করল। জিয়াউদ্দিন কী ভাষণ দিবে, সেটাও রেকর্ড করা হইল। সে আমাদের লাইনমতো টেকওভার করবে।

পরে খবর নিলাম, সর্বনাশ! এটা কনসোলিডেট করা যাবে না। এদের সঙ্গে খালেদ মোশাররফ আছে, এইটা আগে বলে নাই। খবর নিয়া দেখলাম,

তাদের কোনো ক্লিয়ার রাজনীতি নাই, জাস্ট একটা ক্যু কইরা মুশতাককে সরাবে।

মেজর ইকবাল মহসিন আর আমাকে নিয়া গেল শাফায়াত জামিলের কাছে। পুরান এয়ারপোর্টের উল্টা দিকে হাবিব ফ্রুটসের সামনে গিয়া ইকবালকে বললাম, আপনি আর মহসিন যান। শাফায়াতকে বলেন ক্যু না করতে। আমি সেখানে দাঁড়ায়া থাকলাম। বললাম, শাফায়াত যদি কনভিন্সড হয়, তাহলে আমি যাব। তারা গেল, তাদের সঙ্গে জিয়াউদ্দিনের লেখা একটা চিরকুট ছিল। চিরকুট পাইয়া শাফায়াত অট্টহাসি দিল—না, এরকম হবে না। যান, বসকে বলেন যে, তার অরিড হওয়ার দরকার নাই। আমরা সব ট্যাকল করতে পারব।

ব্রিগেড মেজর হাফিজকেও বার্তা দেওয়া হইল, এইটা কইরো না। ডিজাস্টার হবে। তারও একই কথা, শাফায়েতের মতো টোন। তখন আমরা ইকবালকে বললাম, তোমরা পারবা না। আমরা পিছায়া গেলাম। তাদের লিংক এবং মনোভাব দেইখা বুঝলাম, এদের কোনো রাজনীতি নাই।

জিয়াউর রহমানের অ্যারেস্ট ছিল একটা পাতানো খেলা। এইটা মেজর হাফিজের কাজ। পরে জিয়ার সঙ্গে হাফিজ, ইকবালের একটা আপস হয়। তবে হাফিজের কাছে জিয়া যে কমিটমেন্ট করছিল, তা রাখে নাই।

পরে ঢাকা মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবে মেজর হাফিজের সঙ্গে আমার দেখা হইছিল। হাফিজ একটা নন-পলিটিক্যাল প্রস্তাব দেয়, জিয়াকে ফেলে দিতে পারেন কি না। হাফিজ আমাদের ভাড়াটে কিলার মনে করছে।

'র' শেখকে সতর্ক করছিল এইটা সত্য। 'র' কি এইটা মনিটরিং করে নাই? শেখ পাত্তা না দিলে কী হবে। শেখ এইটা জাইনা কোনো ব্যবস্থা নেয় নাই, খোঁজখবর নেয় নাই, এইটা ভাবার কারণ নাই। আমার বিরুদ্ধে ক্যু হবে না কি ক্যু হবে তাজউদ্দীনের বিরুদ্ধে!

– তাজউদ্দীন তো ক্ষমতাহীন।

তার তো একটা ষড়যন্ত্র ছিল। শেখ মুজিব বুঝে নাই এইটা মনে করার কারণ নাই। একাত্তরে যারা ইন্ডিয়া গেছিল তাদের কাউকে তিনি বিশ্বাস করতেন না। সে জন্য তিনি বাকশাল করছেন। সব ক্ষমতা তিনি নিজের হাতে নিয়া নিছেন। সিচুয়েশনটা একমাত্র শেখ মুজিবই বুঝতেন। অথচ এই লোকটারে কেউ বুঝল না। এইটা মনে হইলেই আমার চোখ ভিজা যায়।

– শ্রমিক আন্দোলন থেকে সর্বহারা পার্টির জন্ম। ওই সময়ের কোনো উল্লেখযোগ্য ঘটনা আছে আপনার স্মৃতিতে?

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তো হইল আমার অ্যারেস্ট হওয়া। সত্তর সালে আমি বুয়েটে ফাইনাল পরীক্ষা দিই। তারপর ভোলার দিকে রওনা দিই। পথে বরিশালে হল্ট করি। ৫ সেপ্টেম্বর সেখানে পুলিশ আমাকে অ্যারেস্ট করে। আমার বিরুদ্ধে মার্শাল ল কোর্টে ১৩টা মামলা ছিল। বরিশাল মেডিকেল কলেজে কোর্ট বসছে। জজ কর্নেল আবদুল হামিদ বাট। বিচারে প্রত্যেক মামলার জন্য পাঁচ বছরের জেল—কনকারেন্টলি। মানে একত্রে পাঁচ বছর জেল খাটতে হবে।

– বেত মারে নাই?

আমাকে মারে নাই। একই সময় ছাত্রলীগের কয়েকজনকে ভোলা থেকে ধরে আনছিল। তাদের মধ্যে মাহবুব আর শাহজাহান নামে দুইজন ছিল। তাদের সাজা হইল পাঁচটা বেতের বাড়ি আর ছয় মাসের জেল।

– কর্নেল সাহেব কিছু বলেন নাই আপনাকে?

জাজমেন্ট দিয়া আমার দিকে তাকায়া হাসছেন। বলছেন, কিছুই হবে না। নির্বাচন হলেই তোমরা জেল থিকা বাইর হইয়া যাবা।

– ছাড়া পেলেন কবে?

২৫ মার্চের ক্র্যাকডাউনের পরপর জেলে যত আওয়ামী লীগের লোকজন ছিল, সব বাইর হইয়া যায়। আওয়ামী লীগ নেতাদের আত্মীয়স্বজন, তাদের পার্টির লোক, সবাই। আলেকান্দার একজন গুন্ডা মাস্তান ছিল, সেকান্দর। একজন আওয়ামী লীগ নেতার আত্মীয় সে। সে-ও ছাড়া পায়। নুরুল ইসলাম মঞ্জু, মেজর জলিল এরা জেল থেকে এদের ছাড়ায়। কিন্তু আমাদের ছাড়ায় নাই। আমি পরে বাইর হই, ১০ এপ্রিল।

– আপনারা যাঁরা শ্রমিক আন্দোলন শুরু করেছিলেন, সবাই কি পরে সর্বহারা পার্টিতে গেছেন?

সবাই না। রাজিউল্লাহ আজমী একাত্তরের এপ্রিলে তাদের পরিবারের সবার সঙ্গে করাচি চইলা যায়। শুধু তার বড় ভাই সামিউল্লাহ আজমী ছিল। পরে সে সাভারে কিল্ড হয়। আনোয়ার আর ছিল না পার্টিতে। তবে যোগাযোগ ছিল। সে ময়মনসিংহে নদীর পারে একটা কৃষিখামার করছিল। মুরগির ফার্ম দিছিল। দেশি মুরগি। একটা শেডের মধ্যে মুরগি থাকত।

– এটা আপনি শুনেছেন, না নিজে দেখেছেন?

নিজে দেখছি। সেখানে গেছি কয়েকবার। তখন তো যুদ্ধ শেষে নতুন দেশ গড়ার স্বপ্ন। আনোয়ার তখন কৃষিবিপ্লবের চিন্তা করছে। ওদের পরিবারটা ছিল খুব অ্যান্টি আমেরিকান। ওরা একটা কুকুর পালত। নাম জনসন। আনোয়ার পার্টি না করলেও বিরোধিতা করে নাই। সাঈদ আর তাহেরের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। সিকদার কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট তার বাসায় থাকছে জাহানারাকে নিয়া। খুব ঘনিষ্ঠ এবং বিশ্বস্ত না হলে তো তার কারও বাড়িতে গিয়া থাকার কথা না। তাও আবার ক্যান্টনমেন্টে।

– আপনারাও যে ভুল করতে পারেন এরকম মনে হয়নি কখনো? কখনো কি আত্মসমালোচনা করেছেন?

ময়মনসিংহের দায়িত্ব নিল মতিন। আমি কিছুদিন ব্যুরোর দায়িত্বে ছিলাম। এই এলাকায় কাজের কোনো সামিংআপ হয় নাই। আমরা মনে করতাম, আমরা খুব পাওয়ারফুল। আসলে আওয়ামী লীগ এবং রাষ্ট্র তো অনেক শক্তিশালী। আমরা তো তাকে চ্যালেঞ্জ কইরা টিকতে পারতাম না। শেখ মুজিব কি থানা, ফাঁড়ি দখল কইরা নেতা হইছেন? গ্রাম দখল কইয়া শহর ঘেরাও—এইসব প্রোটোটাইপ কথাবার্তা! 'ভুল' শব্দটা উল্লেখ না কইরা আমরা পার্টি লাইন চেঞ্জ করার কথা ভাবছিলাম। আমরা তখন গণসংগঠন, হরতাল এইসব বলতেছি আর জাসদ যাইতেছে আমাদের পুরান পথে। সিকদার আমাকে বলছে, এইভাবে আগানো যাবে না। তখন আমরা অন্য লেফটদের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়ায়া দিলাম। মাহবুব উল্লাহ, দেবেন সিকদার, টিপু বিশ্বাস এদের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। ফ্লেক্সিবল লাইন নিলাম। একমাত্র আবদুল হক ছিল অনুশোচনাবিহীন। সে একেবারেই গোঁড়া।

– বাকশাল সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কী? এটা যদিও সিকদারের মৃত্যুর পরের ঘটনা।

বাকশাল নিয়া তো অনেক নিন্দা, সমালোচনা আছে। বাকশাল সম্পর্কে কিন্তু আমার একটা ব্যাখ্যা আছে। আমাদের উচিত ছিল এইটাকে গুরুত্ব দেওয়া। আমাদের তো শেখ মুজিবের সঙ্গে যোগাযোগের চ্যানেল ছিল। সবচেয়ে বড় চ্যানেল শামীম সিকদার। সে শেখ মুজিবের ভাস্কর্য বানাইছে। এছাড়া কয়েকজন মন্ত্রী আমাদের লোক। দুজন তো সদস্যই বলা চলে। একজন হইল সেরনিয়াবাত, আরেকজন কামারুজ্জামান।

ওই সময় ভারতের সিকিম গ্র্যাব করার প্রক্রিয়া শুরু হইয়া গেছে। সিকিম তো গ্র্যাব করছে পরে, পঁচাত্তরের এপ্রিল মাসে। আপনারা অনেকেই মনে করেন শেখ মুজিব একজন বড় নেতা। কিন্তু কী লেভেলের বড় নেতা, এইটা অনেকেই জাজ করতে পারে না। ইন্ডিয়া যখন সিকিম দখল করার স্টেপ নিল, ১৯৭৩ সালে এইটা শুরু হইছে, শেখ মুজিব ভয় পাইয়া গেছেন। আমাদের পার্লামেন্টের সব সদস্য তো ওইখানে নয় মাস থাইকা আসছে। এরা পার্লামেন্টে মেজরিটি ভোট দিয়া এই আকামটা কইরা ফেলতে পারে। মুজিব তখন টোটাল ক্ষমতা নিয়া নিছেন। এইটা আমাদের অ্যাসেসমেন্ট বা আমাদের রিপোর্ট। নট ওনলি অ্যানালাইসিস, আমাদের কাছে এই তথ্য ছিল। দুঃখজনক হইল, এইটা জানার পরে কেন আমরা এই চ্যানেলে যোগাযোগ কইরা সিকদারকে চাপ দিলাম না। আমাদের উচিত ছিল শেখ মুজিবের দিকে আগায়া যাওয়া। কিন্তু বাই দিস টাইম সম্পর্ক এতটা তিতা হইয়া গেছে, দেখা করার বা যোগাযোগ করার পরিবেশটাও নষ্ট হইয়া গেছে। আমার অপরাধ হইল, তখন যে তথ্যগুলো পাইছি, গুরুত্ব দিই নাই। গুরুত্ব দেওয়া উচিত ছিল।

– আপনাদের পার্টির সামরিক সাইডে তো তিনজন নেতা। সিকদার, জিয়াউদ্দিন আর মতিন। কে বেশি নিষ্ঠুর?

নিষ্ঠুর মানে?

– মানে, এই যে পার্টির লোকদের কিল-টিল করা। কে বেশি নির্মম ছিল?

মতিন।

– সামিউল্লাহ আজমীর স্ত্রীর নাম কী?

খালেদা।

– তাদের বিয়ে হয়েছিল কবে?

১৯৭০ সালে।

– সামিউল্লাহর পার্টি নাম তো তাহের। তাই না?

হ্যাঁ।

–সে সাভারে কিল্ড হলো। তাকে কি সিকদার বিপদের মধ্যে পাঠিয়েছিল?

মোটেও না। সিকদার তাকে নিষেধ করছিল যাইতে।

– তার মৃত্যুর জন্য তার স্ত্রী সিকদারকে দায়ী করে।

অসম্ভব। এটা হতেই পারে না।



জাহানারা হাকিম
সঙ্গে ছেলে বরুণ

– আচ্ছা পার্টিতে বুলু কার নাম?

খালেদার আরেকটা নাম।

– সে এখন কোথায়?

ইন্ডিয়া চইলা গেছে।

– কবে গেছে?

১৯৭৭ সালে।

– এখানে সে কি পার্বত্য চট্টগ্রামে ছিল?

পার্বত্য চট্টগ্রামে তাকে পাঠানোর কথা হইছিল। যায় নাই। সে চিটাগাংয়ে ছিল।

– তার ওপর কি সিকদারের নজর পড়েছিল?

প্রশ্নই ওঠে না।

– সিকদার প্রসঙ্গে যে 'ডিবচ' শব্দটা উঠেছে, এটা মনে হয় ঠিক। বুলুকে সে অ্যাবিউজ করেছে।

আপনি যদি শুইনা থাকেন, তাহলে এইটা রটনা। সিকদার এমন না। আমি তো তারে চিনি।

– বুলু এইটা বলেছে।

তারে দিয়া এইটা বলানো হইতে পারে।

–সে কি অ্যারেস্ট হয়েছিল?

না।

– তাহলে তো রিমান্ডে নিয়ে তাকে দিয়ে এসব কেউ লেখায়নি। আপনি পার্টি আর সিকদারের যত গুণকীর্তন করেন না কেন, আসল সত্যটা তো এই। মানুষ জানে না এসব। আপনি হয়তো অনেক কিছু জানেন না, অথবা তথ্য গোপন করছেন।

দেখেন, লেখার সময় নিগেটিভ জিনিসগুলো বেশি হাইলাইট কইরেন না। পজিটিভ জিনিসটা আনবেন।

– নিগেটিভ পজিটিভ দুইটাই তো আছে। ইতিহাসের খাতিরে দুটোই তো বলতে হবে। রওশন নামে জাহানারার কি কোনো বোন আছে?

তার একটা বোন আসছিল পার্টিতে।

– সিকদারের প্রথম স্ত্রী রওশন আরা কোথায় আছে?

হাজারীবাগের দিকে থাকে বোধ হয়।

– আপনার সঙ্গে যোগাযোগ আছে?

বেশ কয়েক বছর আগে দেখা হইছিল।

– জামিল অর্থাৎ মহিউদ্দিন বাহার এখন কোথায়?

চুয়াত্তর সালেই অ্যারেস্ট হইছিল। জেলে দেখা হইছে। আমাদের আগেই রিলিজ হইছে। এখন অসুস্থ। স্ট্রোক হইছিল।

– জ্যোতি ওরফে সুদত্ত বিকাশ তঞ্চঙ্গ্যা কি এখনো আছে?

আছে। আরিফ ভাই জানে। তার সঙ্গে যোগাযোগ আছে।

– সর্বহারা পার্টির সঙ্গে জাসদের একটা মিল আছে। দুটো পার্টিই ছিল ওই সময়ের তরুণ মনের ক্রেজ। দুটোই ধ্বংস হয়ে গেছে।

খুনাখুনির পলিটিকস কইরা আমরা শেষ হইলাম। সিকদার অবশ্য পরে ভুলটা বুঝতে পারছিল।

– সিকদার চট্টগ্রামে অ্যারেস্ট হলো। বেবিট্যাক্সিতে একটা লোক লিফট চাইল। তারপর তাকে প্লেনে করে ঢাকায় আনা হলো। নিয়ে গেল গণভবনে। এই পুরো স্টোরিটা আপনারা কোথায় পেলেন? প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত স্টোরিটা দাঁড় করাতে তো সূত্র লাগবে। আপনাদের পুরো বিবরণটা কে

দিল? প্রথম স্টোরিটা করল মাহফুজ উল্লাহ। ১৯৭৭ সালে ছাপা হলো *বিচিত্রায়*। তার রিপোর্টে আছে 'নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে', 'আমার মনে হয়' এইসব কথাবার্তা। সূত্র কই?

এগুলো গল্প বানাইছে।

– সিকদারের বেবিট্যাক্সিতে একজন অপরিচিত লোক লিফট চাইল। সিকদার এত সাবধানী লোক। সে লিফট দিল কেন?

এটাও স্টোরি। সে শেল্টার থিকা বাইর হওয়ার পরপরই গ্রেপ্তার হয়। ঢাকায় নিয়া আইসা ওই রাতেই তাকে কিল করা হইছে।

– গণভবনে সে নাকি শেখ মুজিবকে বলেছে, একজন রাজবন্দিকে কি আপনার বসতে বলারও ভদ্রতা নাই? এসব কথা বলে তাকে কি আপনারা হিরো বানানোর চেষ্টা করছেন?

আমরা এইসব গল্প আমলে নেই নাই।

– আমরা জানি, প্রীতিলতা সায়ানাইড খেয়ে আত্মহত্যা করে। প্রফুল্ল চাকী নিজেই নিজের পিস্তলের গুলিতে মারা গেছে। ধরা পড়ার চেয়ে আত্মহত্যার পথটাই তারা বেছে নিয়েছে। সিকদার কেন ধরা দিল। সে জানে না ধরা পড়লে তাকে টর্চার করবে কথা বের করার জন্য?

সে তো টর্চারের পরও মুখ খোলেনি।

– সেটা আপনি জানলেন কীভাবে? আপনি কি সেখানে ছিলেন? অনেকেই তো বলে এসব গল্পটল্প দিয়ে আপনারা তাকে হিরো বানাচ্ছেন, তাকে নিয়ে মিথ তৈরি করছেন।

এইটা তো ঠিক, সিরাজ সিকদারকে রাষ্ট্র এক নম্বর এনিমি মনে করত।

– মানছি, তাকে পুলিশ আর গোয়েন্দারা পাগলের মতো খুঁজেছে। কিন্তু এটাও শুনেছি যে তাকে তার কোনো এক স্ত্রী ধরিয়ে দিয়েছে।

এটা ঠিক না।

– আমিও এভিডেন্স ছাড়া এটা বলব না। আমি তো উপন্যাস লিখছি না, ইতিহাস লিখছি। ইতিহাসচর্চায় কেচ্ছা-কাহিনি বয়ানের সুযোগ নেই। আচ্ছা, আপনারা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন আবার মুজিব সরকারকে উৎখাতের জন্য আপনারা পাকিস্তানের সাহায্যও চেয়েছেন। এটা সাংঘর্ষিক না? নাকি শত্রুর শত্রু বন্ধু?

পাকিস্তানের সঙ্গে একটা যোগাযোগ হইছিল।

– ইতিহাসের স্বার্থে বিষয়টা খুলে বলবেন? এত বছর পর তথ্য গোপন করে কী লাভ? যদি জানেন, বলেন।

পাকিস্তানের সঙ্গে যোগাযোগটা হইছে চুয়াত্তরের মাঝামাঝি, আমি ময়মনসিংহ থেকে ঢাকায় আসার পর। ভোলায় আমাদের কর্মী ছিলেন মকসুদ ভাই। একটু মোল্লা টাইপের। তার মাধ্যমে মুসলিম লীগারদের সঙ্গে যোগাযোগ হয়। সে সিকদারকে একটা কানেকশন দিল। খন্দকার মাহতাব উদ্দিন, বাড়ি মাদারীপুর। বড় ব্যবসায়ী, শেখ সাহেবের বন্ধু। স্থানীয় আওয়ামী লীগকে সে ফাইন্যান্স করে। সে ছিল বিএনপি নেতা সালাম তালুকদারের শ্বশুর।

আমি আর সুফি ভাই গেলাম মতিঝিলে তার অফিসে। সুফি ভাই মানে মহসীন আলী। তিনি বললেন, আপনাদের জন্য গিফট আছে। ভুট্টো পাঠাইছে। পঞ্চাশ হাজার টাকা। টাকাটা দিছে দুই কিস্তিতে। প্রথমে ত্রিশ হাজার, পরে বিশ হাজার।

আমরা ভাবতেছি, লাইনটা কীভাবে আরও ডেভেলপ করা যায়। কথা হইল, ভুট্টোর প্রতিনিধি হিসাবে সিলেটের মাহমুদ আলী আসবে সিঙ্গাপুরে। সে তো তখন পাকিস্তানে মন্ত্রী। ঠিক হইল, ইঞ্জিনিয়ার আমানউল্লাহ আর আমি সিঙ্গাপুরে যাব। যাব বললেই তো যাওয়া যায় না। পাসপোর্ট লাগে, ডলার লাগে। পাসপোর্ট হইল। এ সময় মীজানুর রহমান শেলী আসছে ঢাকায়, পত্রিকায় দেখলাম।

– শেলীর নাগরিকত্ব তো বাতিল হয়ে গিয়েছিল বলে শুনেছি।

শেখ মুজিবের সঙ্গে তার ভালো সম্পর্ক। সে লন্ডনে পিএইচডি করছিল। সে নাগরিকত্ব ফিরা পাইয়া ঢাকায় আসছে। তার সঙ্গে যোগাযোগ হইল। সে ছিল আমার মেজো ভাইয়ের ক্লাসমেট, ঢাকা কলেজে। কর্নেল জিয়াউদ্দিনের সঙ্গেও তার যোগাযোগ ছিল।

পুরানা পল্টনের একটা বাসায় আর্মি অফিসারদের সঙ্গে একটা সিটিংয়ে বসছে জিয়াউদ্দিন। আমাকে একটা চিরকুট দিল, শেলীর সঙ্গে দেখা করেন। গেলাম গ্রীন রোডে তার বাসায়। তিনি ওয়েলকাম করলেন। তিনি খুব শার্প। তার মাধ্যমে আরও দুইটা যোগাযোগ হইল। তাদের একজন শওকত আলী, সিএসপি। পরে অ্যাডভাইজার হইছিল। তখন সে সিভিল অ্যাভিয়েশনের কর্মকর্তা।

শেলী আসছে কয়েক মাসের জন্য। পরদিন তার অ্যাপয়েন্টমেন্ট শেখ সাহেবের সঙ্গে। বুঝলাম, তাদের মধ্যে একটা ভালো সম্পর্ক আছে। তাকে বললাম, ইন্ডিয়ার সঙ্গে একাত্তর সালে যে একটা ডিল হইছে, কী আছে এর মধ্যে জানার চেষ্টা কইরেন। যাওয়ার আগে কলাবাগান স্টাফ কোয়ার্টারে আলী শহীদ খানের বাসায় সিকদারের সঙ্গে শেলীর মিটিং হয়। আমি মিটিংয়ে ছিলাম। আলী শহীদের স্ত্রী স্কুল টিচার। তার নামেই বাসাটা বরাদ্দ।

শেলী শেখ মুজিবের সঙ্গে দেখা কইরা আসার পর তার বাসায় গিয়া দেখা করলাম। বুঝলাম, সে ডিটেইল আলাপ করতে রাজি না। বলল, শেখ সাহেব আমারে একটা ফইল দেখাইছে। মনে হয়, প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নেওয়ার পর ফাইলটা তাকে দেওয়া হইছিল। হাসতে হাসতে বলল, তুই তো অনেক জানস। বল তো, সুজেরেইনটি (Suzerainty) শব্দের মানে কী?

শেলী যখন ইংল্যান্ডে ব্যাক করে, আমি তাকে কয়েক হাজার টাকা দিছি, লন্ডন থিকা সিঙ্গাপুরের জন্য আমাদের প্লেনের টিকিট পাঠাবে। আমাদের আর যাওয়া হয় নাই। পরে ঢাকায় আইসা সে আমাদের টাকাটা ফেরত দিছে, সিকদার মারা যাওয়ার পর।

– সুজেরেইনটি শব্দের অর্থ বলে নাই?

না। আমি সিকদারকে বলছিলাম এইটা। সিকদারও কিছু বলে নাই।

– আমি তো ডিকশনারিতে দেখলাম, এই শব্দের অর্থ হলো অধিরাজত্ব, অর্থাৎ ছোট শাসকের ওপর বড় শাসকের কর্তৃত্ব। সোজা কথা—করদ রাজ্য।

ইতিহাসের অ্যানাটমি

১৯৪৯ সালের পয়লা অক্টোবর কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে চিনের মুক্তিফৌজ পৃথিবীর সবচেয়ে জনবহুল দেশটিতে বিপ্লব সংঘটিত করে। এটি ছিল বিশ শতকের একটি বড় ঘটনা, যা বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে দারুণ সাড়া জাগায়। তার একুশ বছর পর আল মাহমুদ লিখলেন :

> শ্রমিক সাম্যের মন্ত্রে কিরাতেরা উঠিয়েছে হাত
> হিয়েনসাঙের দেশে শান্তি নামে দেখো প্রিয়তমা,
> এশিয়ায় যারা আনে কর্মজীবী সাম্যের দাওয়াত
> তাদের পোশাকে এসো এঁটে দিই বীরের তকোমা।
> আমাদের ধর্ম হোক ফসলের সুষম বণ্টন,
> পরম স্বস্তির মন্ত্রে গেয়ে ওঠো শ্রেণীর উচ্ছেদ,
> এমন প্রেমের বাক্য সাহসিনী করো উচ্চারণ
> যেন না ঢুকতে পারে লোকধর্মে আর ভেদাভেদ।

সিরাজ সিকদার সম্ভবত আল মাহমুদ পড়েননি। সুকান্তও তাঁর পছন্দ নয়। তিনি সর্বহারার একনায়কতন্ত্র চান, যার মন্ত্র তিনি খুঁজেছেন মাও সে তুংয়ের লেখায়। ততদিনে মাও সে তুং জেঁকে বসেছেন বাংলার গ্রামে ও নগরে। ১৯৭০ সালের ৪ জুলাই সাপ্তাহিক *দেশ* পত্রিকায় তরুণ দত্ত লিখলেন :

> বিপ্লব এসে গেল? দেয়ালে দেয়ালে ডাক বিপ্লবের, রাস্তায় লালবই হাতে বালকদের ওজস্বী মিছিল, লাল রঙে মণ্ডিত পত্রিকায় 'খতমের খতিয়ান' এবং আসল বিপ্লবের অ্যাডভান্স সুদ হিসাবেই বোধ হয়

সাংস্কৃতিক বিপ্লবও শুরু হয়ে গেল। ছেলেরা স্কুল কলেজে ঢুকে বই পোড়াচ্ছে, ছবি পোড়াচ্ছে, স্ট্যাচু ওপড়াচ্ছে, শ্রীযুক্ত মাও সে তুংয়ের পাসপোর্ট ছবি টেন্সিল করে এঁকে দিচ্ছে এবং এক মাসে সন্দেহ নেই আমাদের অথর্ব সমাজে একটা বৈপ্লবিক বারুদের গন্ধ এনে দিয়েছে। দুটো কথা খুব শোনা যাচ্ছে। এক, এই সমস্ত বিপ্লবী ভ্রান্ত কিন্তু গভীরভাবে আন্তরিক। দুই, বাঙালি যুবকদের যেটি সবচেয়ে মেধাবী অংশ তারাই এই আন্দোলনের মধ্যে নিমগ্ন। অর্থাৎ সমাজের বিকাশের পক্ষে সেই সবচেয়ে মূল্যবান শ্রেণি যারা ধীসম্পন্ন ও অনুভূতিপরায়ণ, তারাই এই বিপ্লবের হোতা। সেদিন সন্ধ্যায় পার্ক স্ট্রিটের মোড়ে দাঁড়িয়ে নকশালি বালকদের দীর্ঘ মিছিলটি প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধরে পার হয়ে যাওয়া দেখা এক অর্থে আমার এক উল্লেখযোগ্য অভিজ্ঞতা ছিল। প্রথমত মিছিলকারীদের গড়পড়তা বয়স ছিল উনিশ কি কুড়ি: শুধু অল্পবয়সীদের নিয়ে এত বড় মিছিল আমি এর আগে দেখিনি। মুহূর্তের জন্য মনে হয়েছিল, হ্যামিলিনের বাঁশির মতো মাও সে তুংয়ের তূর্য বুঝি বাংলাদেশ থেকে সব ছেলে চুরি করে নিয়ে গেল।

দেশটা বাংলাদেশ হলেও মন্ত্রটা এসেছে চিন থেকে। দিস্তায় দিস্তায় ছাপা হচ্ছে দলিল। এখানে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব করতে হবে, করতে হবে গেরিলাযুদ্ধ। মাও সে তুংয়ের রচনাবলি ঘেঁটে ঘেঁটে লেখা হচ্ছে স্লোগান, লিফলেট, দেয়ালের চিকা। কেননা, চেয়ারম্যান আমাদের শিখিয়েছেন ... মাও সে তুংয়ের চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ বিপ্লবী রাজনৈতিক চেতনার অর্থ হলো চেয়ারম্যান মাওয়ের চিন্তাধারার উপলব্ধি ... মাও সে তুং চিন্তাধারা জিন্দাবাদ। দেশের মানুষ গরিব। সকাল-সন্ধ্যা খেটে মরে। তারপরও দুবেলা ভাত জোটে না। সে তো চার ঘণ্টার হাঁটা পথের দূরত্বে শহরের নেতার নামই জানে না। তার চোখ কপালে উঠতেই পারে—মাও সে তুং কে? কবি না নবি?

কমিউনিজমের মহাজন ব্যক্তিরা অনেক আগেই বলে গেছেন, পার্টি বিপ্লব করে না, বিপ্লব করে জনগণ। সেই বিপ্লবে নেতৃত্ব দেয় সর্বহারা শ্রেণি, তার অগ্রগামী অংশের পার্টি। তো বললেই হলো? জনগণ তো নির্বোধ। তাদের তো বোঝাতে হবে। সর্বহারা শ্রেণি কোথায়? কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণরা ভাবলেন, তাঁরাই সর্বহারার অভিভাবক। তাঁরা বোঝেন কী করতে

হবে। সুতরাং তাঁদের উদ্যোগ নিতে হবে। এভাবেই সর্বহারার অগ্রণী তথা ভ্যানগার্ড তত্ত্বের উদ্ভব ও প্রসার। এটা তরুণ মনে তৈরি করল বিশাল এক জোয়ার। সেই জোয়ারে ঝাঁকের কৈ-এর মতো তরুণরা শামিল হলেন বিপ্লবের অনিশ্চিত পিচ্ছিল রোমাঞ্চকর পথে। ওই বয়সে রোমাঞ্চের হাতছানি নিশির ডাকের মতো। তাকে যে উপেক্ষা করে সে আবার কিসের তরুণ?

সিরাজ সিকদার মেধাবী তরুণ, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে গ্রাজুয়েট। ইচ্ছে হলেই বানিয়ে ফেলতে পারতেন একটা আকর্ষণীয় ক্যারিয়ার। হতে পারতেন চৌকস আমলা কিংবা অধ্যাপক। কিন্তু তিনি পা বাড়ালেন বিপদসংকুল পথে। সহযাত্রী হলো আরও অনেক তরুণ। কী এক সম্মোহনী শক্তি দিয়ে তিনি এতগুলো মেধাবী মন জড়ো করতে পারলেন, তা এক রহস্য বটে। এমনটি বাংলাদেশে আর কোনো দলের মধ্যে দেখা গেছে কিনা সন্দেহ। বাংলাদেশের কোনো রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়েছেন, এমনটি আর নেই।

এই তরুণদের প্রচণ্ড রকমের দেশপ্রেম নিয়ে প্রশ্ন তোলা অবান্তর। উর্দু ইংরেজির ভিড়ে প্রথমবারের মতো সম্পূর্ণ বাংলা শব্দ দিয়ে তাঁরা তৈরি করলেন একটি রাজনৈতিক দল—পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন। তাঁর হাত দিয়ে তৈরি হলো পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি। লেখায় ও স্লোগানে তাঁরাই প্রথম উচ্চারণ করলেন স্বাধীনতার কথা। তৈরি করলেন তাঁর রূপকল্প, একটি পতাকা। তাঁরা যে প্রক্রিয়ায় ও পদ্ধতিতে পা বাড়ালেন, এখন সবাই তাকে একবাক্যে বলেন 'সন্ত্রাসবাদ'।

বিপ্লব আর সন্ত্রাস মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। স্বজনের কাছে যিনি বিপ্লবী, প্রতিপক্ষের কাছে তিনি সন্ত্রাসী। দুটোর পেছনেই কাজ করে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে ইচ্ছাপূরণ। এই ইচ্ছার পক্ষে দাঁড় করানো হয় তাত্ত্বিক যুক্তি।

তারপরও দেখা যায়, জনমনস্তত্ত্বে 'বিপ্লব' শব্দটির পক্ষে হাওয়া বেশ অনুকূল। উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই স্বাধীনতাকামীরা কমবেশি সশস্ত্র লড়াই করেছেন। রাষ্ট্র তাঁদের কপালে এঁকে দিয়েছে সন্ত্রাসীর টিকা। কিন্তু স্বাধীনতাকামীরা 'সন্ত্রাস'কে বানিয়েছে অনিবার্য হাতিয়ার। এ প্রসঙ্গে একসময় আমি লিখেছিলেন :

সন্ত্রাস কোনো হারাম শব্দ ছিল না
এটা ছিল একটি অতি জরুরি হাতিয়ার
জবর দখলের জন্য কমব্যাট পোশাকে রক্ষী
বুটের তলায় থেঁতলে দিত মিছিলের মুখ
শ্বেত সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লাল সন্ত্রাস চাই
এই উচ্চারণে অনায়াসে শামিল হতো
টকবগে হাজারো তরুণ ককটেল হাতে
এই হলো জন্মকথা প্রজাতন্ত্র পতাকার।

রাষ্ট্র যাঁদের সন্ত্রাসী বলে, তাঁরা দাবি করেন তাঁরা বিপ্লবী। সূর্য সেন থেকে সিরাজ সিকদার—এই পরিক্রমায় আছে হাজারো তরুণ। মানুষ কীভাবে তাঁদের মূল্যায়ন করবে? এটা নির্ভর করে যিনি দেখছেন তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির ওপর। এ ক্ষেত্রে সবাই একমত হবেন না। সূর্য সেন বিপ্লবী না ডাকাত—এ তর্ক এখনো শেষ হয়নি। 'স্বদেশী ডাকাত' শব্দটি বাংলা ভাষায় ঢুকেছে বিশ শতকের গোড়ার দিকে। তবে বিপ্লবীরাও ছেড়ে কথা বলেন না। এ দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি এরকমই। মতের মিল না হলে, বুঝে কিংবা না বুঝে তারা একে অন্যকে গালি দেন। এটা সিরাজ সিকদারও দিয়েছেন। নিজেদের বিপ্লবী মনে করেন এমন অনেককেই তিনি গাল দিয়েছেন চে-বাদী, ট্রটস্কিবাদী বলে। তাদের বলেছেন দালাল, বিশ্বাসঘাতক। এসব শব্দ উঠে এসেছে দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। 'শত্রুর' প্রতি নির্মম হওয়া, তাকে অমার্জিত ভাষায় গালমন্দ করা সবই শাস্ত্রের বিধান। কাউকে ভালো লাগে, তার নামে জিন্দাবাদ দেওয়া যায়। কাউকে খারাপ লাগে, তাকে অশ্রদ্ধা ও কটুকথা বলা যায়। এর মধ্যে যুক্তি খুঁজতে যাওয়া অর্থহীন। প্রশ্ন করলেই জবাব পাওয়া যাবে, কেন? মার্কস তো প্রুধোঁকে এভাবেই গাল দিয়েছেন? লেনিন তো মেনশেভিকদের এভাবেই তুলাধুনা করেছেন? সুতরাং এসব জায়েজ।

গোপন বিপ্লবী দলের অবশ্যম্ভাবী অনুষঙ্গ হলো 'গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা'। গণতন্ত্র শব্দটি খুবই মুখরোচক। এটি তো বাদ দেওয়া যায় না। কিন্তু দলের মধ্যে শৃঙ্খলা রাখার জন্য চাই কেন্দ্রিকতা। এই মহাজন বাক্য নিয়েই দলের মধ্যে তৈরি হয় কমান্ড স্ট্রাকচার। শীর্ষে থাকেন একজন। কমিটি থাকলেও সিদ্ধান্ত এবং কাজ হয় এক ব্যক্তির নামে। এর সর্বোচ্চ প্রয়োগ দেখা যায়

পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টিতে। সিরাজ সিকদার নিজেই দলের সব প্রচারপত্র দলিল-বিবৃতি লিখতেন। একপর্যায়ে তিনি সব লেখায় একটি স্লোগান জুড়ে দিতে শুরু করেন, কমরেড সিরাজ সিকদার জিন্দাবাদ। তাঁর সহকর্মীরা এটা গ্রহণও করেন। নেতার নেতৃত্বে নিজেকে বিলীন করে দেওয়ার এই সংস্কৃতি বেশ পুরনো হলেও উপনিবেশ-উত্তর সমাজে এর চল রয়ে গেছে এখনো। এক ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে সাংগঠনিক কাঠামো দলের মধ্যে তৈরি করে শৃঙ্খলাবোধ এবং একই সঙ্গে ভীতির পরিবেশ, যা ভেতর থেকে ক্ষয় করে দলকে। যেখানে কর্তৃত্ববাদ বেশি, সেখানেই মাথাচাড়া দেয় উপদলবাদ। সর্বহারা পার্টির অনেক দলিলে মাও সে তুং রচনাবলি থেকে ধার করে এনে উপদলবাদের বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। কিন্তু তা থেমে থাকেনি, বরং দিন দিন বেড়েছে।

সিরাজ সিকদারের মৃত্যুর পর দলটি মুখ থুবড়ে পড়ে গেছে।

রাজনীতির সিরাজ সিকদার সম্পর্কে জানা বোঝা যায় তাঁর ও তাঁর দলের বক্তব্য পড়ে। তাঁরা কী চান—এ ব্যাপারে তাঁদের লেখাজোখা আছে বিস্তর। লিখিত বক্তব্যের মধ্যে একটাই সুর সরলরেখায় বয়ে গেছে। সাংঘর্ষিক বক্তব্য খুব কম। কিন্তু সর্বহারা পার্টির নেতাদের, বিশেষ করে তার শীর্ষ নেতা সিরাজ সিকদার সম্পর্কে আছে অনেক কৌতূহল, জিজ্ঞাসা ও ধোঁয়াশা। এটি এমন একটি দল, যার সম্পর্কে সবাই সবটা জানেন না। সম্ভবত সিকদারও জানতেন না। একা, একজনের পক্ষে সবটা জানা সম্ভব না। দলটি যাঁদের নিয়ে তৈরি ও বিস্তৃত, তাঁদের সত্যিকার সবার নাম-ঠিকানাও জানেন না দলের নেতারা। নিরাপত্তার কারণেই তাঁরা এই ব্যবস্থা রেখেছেন। যাতে কেউ ধরা পড়লে দলের চেইন হুমকির মধ্যে না পড়ে।

দলের সবাইকে চেনাও মুশকিল। কেউ আসল নামে পরিচিত নন। দলের সদস্য হলে দল থেকে নাম ঠিক করে দেওয়া হয়। অথবা সংশ্লিষ্ট সদস্য নিজেই একটি নাম ঠিক করেন। আসল নাম হারিয়ে যায়। দলের একজনকে এক জায়গা থেকে সরিয়ে অন্য জায়গায় পাঠালে নতুন জায়গায় আবার নতুন একটি নামে পরিচিত হন তিনি। নামটি পুরোনো জায়গার সহকর্মীরা জানেন না। এমনকি দলের অনেক কেন্দ্রীয় নেতাও জানেন না তাঁর সহকর্মী নতুন জায়গায় কী নামে পরিচিত হচ্ছেন। যেমন সিরাজ সিকদার প্রথমে নাম নিয়েছিলেন রুহুল আলম। পরে হলেন হাকিম ভাই। জিয়াউদ্দিন আহমেদ

দলে হাসান নামে পরিচিতি পেলেন। পার্বত্য চট্টগ্রামে তাঁর নাম হলো সফিউল আলম। আকা ফজলুল হক হলেন রানা। আবার কোথাও তিনি আরশাদ ভাই। এ নিয়ে আমার বেশ সমস্যা হয়েছে। কারও কারও সত্যিকার পরিচয় বের করতে হিমশিম খেয়েছি।

একটা রাজনৈতিক দল নিয়ে লিখতে বসলে রাজনীতিই মুখ্য হবে, এটাই প্রচলিত ধারণা। কিন্তু ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে তো দল হয় না। ব্যক্তির ভূমিকা দলকে অনেক দূর এগিয়ে দেয়। আবার অনেক সময় ডোবায়ও। এখানে প্রশ্ন হলো, দলের 'ভুল' যদি আলোচনা করা যায়, দলের নেতাদের ত্রুটিবিচ্যুতিগুলো কেন আমলে নেওয়া যাবে না? রাজনীতিতে সবাই তো সন্ত নন।

মনে আছে, কয়েক বছর আগে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনকে নিয়ে অনেক টানাহেঁচড়া হয়েছিল। তাঁর অফিস সহকারী মনিকা লিউনস্কিকে নিয়ে একটা কেলেঙ্কারি বেঁধে গিয়েছিল। ক্লিনটন শেষমেশ পার পেয়ে যান। এখানে মার্কিন জনমনস্তত্ত্বের একটা বড় রকমের পরিচয় মেলে। ওই দেশে 'পিউরিটান' মানসিকতা হালে খুব বেশি পানি পায় না। এ দেশে আমরা অনেকেই মনে করি, ওটা বুঝি ফ্রি সেক্সের সমাজ। কোনো রাখঢাক নেই। কিন্তু সেখানেও সাধারণ মানুষ মনে করেন, তাদের নেতা হবেন সন্ত, পূতপবিত্র। ক্লিনটন-মনিকার ব্যাপারটি থেমে গেলেও এ নিয়ে এখনো আলোচনা আছে।

আমাদের দেশের নেতাদের অনেকের রাজনৈতিক স্খলন নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা আছে। নৈতিক স্খলন নিয়ে আড়ালে-আবডালে মুখরোচক কথা চালাচালি হলেও রাজনৈতিক সাহিত্যে তার উল্লেখ নেই। এখানে একটি প্রশ্ন উঠতেই পারে, রাজনৈতিক দল নিয়ে লেখালেখি করলে রাজনৈতিক নেতার ব্যক্তিগত জীবন তাতে উঠে আসবে কিনা। এলে তা কতটুকু।

দিন যত পার হয়, সমাজ যত সামনের দিকে এগোয়, পরিবেশ যত অনুকূল হয়, লেখকরা ততই সাহসী হয়ে ওঠেন। ইতিহাসচর্চার ফর্মটাও ভাঙে, বদলে যায়। এখন কিংবদন্তি নেতাদের ব্যক্তিগত জীবন রাজনৈতিক সাহিত্যে তুলে ধরছেন কেউ কেউ। গান্ধী, জিন্নাহ, নেহরুর জীবনের নানা দিক আলোচিত হচ্ছে। আমাদের দেশেও আইয়ুব খান কিংবা ভুট্টোর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে রসালো কথাবার্তা আছে। কিন্তু বাংলাদেশের নেতাদের নিয়ে এরকম বলার

বা লেখার অনুকূল পরিবেশ কিংবা পাঠকমন গড়ে ওঠেনি বলেই মনে হয়।

এ বইয়ে সিরাজ সিকদারের ব্যক্তিগত জীবনাচরণের কিছু তথ্য পাওয়া যায়। সিকদার-ভক্তরা বলতে পারেন, এগুলো উত্থাপন করা হয়েছে তাঁর চরিত্রহননের জন্য। অথবা বলতে পারেন, রাজনৈতিক সাহিত্যে এসব থাকার দরকার নেই। আমি মনে করি, এসব ক্ষেত্রে কোনো ধরনের শুচিবাই বা ট্যাবু থাকা উচিত না। মনোজগতে একজন নেতাকে আমরা যেভাবে নির্মাণ করি, বাস্তবে তিনি তার থেকে ঢের আলাদা। আজ হোক কাল হোক, বিষয়গুলো উঠবে। আমি এর মধ্যে দোষের কিছু দেখি না। আমাদের দেশে রাজনৈতিক দলের সভায়, এমনকি পার্লামেন্টেও প্রতিপক্ষ সম্পর্কে যে রকম অশালীন খিস্তিখেউর হয়, তাতে তথ্য কম থাকে, জিঘাংসা থাকে বেশি। তথ্যনির্ভর আলোচনা হতে তো দোষ নেই। এই বইয়ে এ ধরনের কথা কিছু বলা হয়েছে। রানা, বুলু ও জিয়াউদ্দিনের জবানবন্দিতে যা এসেছে, তাকে অমূলক মনে করা বা না করা ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপার। আমি লুকোছাপার চেষ্টা করিনি।

'প্যাশন' বলে একটা কথা আছে ইংরেজিতে। আরেকটি শব্দ হলো 'অবসেশন'। যারা একসময় সর্বহারা পার্টির রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, কৈশোর যৌবনের সোনালি সময়টা তারা এই দলের জন্য উৎসর্গ করেছেন। পড়ন্ত বিকেলে নিশ্চয়ই তাঁরা স্মৃতিকাতর হন।

ডা. ফারুক যখন আমার সামনে স্মৃতির ঝাঁপি মেলে ধরলেন, মনে হলো তিনি ফিরে গেছেন ওই সময়ে, যখন তাঁর বয়স সতেরো-আঠারো। এখনো অহংকার নিয়েই তাঁর ঝুঁকিপূর্ণ মিশনগুলোর কথা বলেন, শ্রদ্ধার সঙ্গে কৃতজ্ঞতা জানান সামিউল্লাহ আজমীর প্রতি, যিনি তাঁকে এই দলে ভিড়িয়েছিলেন। এখনো তাঁর মনে হয়, একদিন আমিও ছিলাম। আমিও গান গেয়েছিলাম।

> মুক্তির মন্দির সোপানতলে
> কত প্রাণ হলো বলিদান
> লেখা আছে অশ্রুজলে।

এই বইয়ের এক উল্লেখযোগ্য চরিত্র রানা। মাঝে মাঝে তার সঙ্গে কথা হয়। তিনি আমাকে বলেছেন, আপনি তো খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তথ্য বের করে

আনেন। তখন আমি কমরেডদের কথা মনে করি, যাঁদের অকারণে বা তুচ্ছ কারণে আমরা মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলাম। ওই মুখগুলো আমার চারপাশে ভিড় করে। যেদিন আপনার ফোন পাই, সেদিন রাতে আর ঘুমাতে পারি না।

ইতিহাসের এই এক নির্মম কৌতুক। শুরু হয়েছিল জীবনের জয়গান দিয়ে। শেষ হলো মৃত্যুর মিছিলে। অল্প কয়েক বছরের এই পরিক্রমা ইতিহাসে কতটুকু জায়গা পাবে? যাঁরা একদিন গণমানুষের জন্য ঘর ছেড়েছেন, ঝুঁকি নিয়েছেন, বিপদে ঝাঁপ দিয়েছেন, মানুষ কি তাঁদের মনে রেখেছে? কীভাবে রেখেছে? মূল স্রোতে, নাকি ফুটনোটে? জীবন কি এতই অকিঞ্চিৎকর যা হেলায় বিলিয়ে দেওয়া যায়?

কীভাবে হবে ইতিহাসের অ্যানাটমি?

পরিশিষ্ট ১

নামের তালিকা

প্রকৃত নাম	দলীয় নাম
আকা মো. ফজলুল হক	রানা, আরশাদ
আজিজ	আজম
আদিত্য বিকাশ তঞ্চঙ্গ্যা	পঙ্কজ
আনোয়ার কবীর	শফিক
আবদুর রহমান খান	লিপু
আমানউল্লাহ	মাসুদ
আলমতাজ বেগম ছবি	মিনু
আলী জব্বার মাস্টার	রাশেদ
এম. জিয়াউদ্দিন আহমেদ	হাসান, সফিউল আলম
কামরুজ্জামান	পলাশ
কুদ্দুস মোল্লা	চিত্ত
খসরু	আতাউর
খালিদ হোসেন	মইদুল
জাহাঙ্গীর	ঝিনুক
জাহানারা হাকিম	রাহেলা
জিয়াউল কুদ্দুস	খলিল
জুয়েল আইচ	জাহিদ
দেলোয়ার হোসেন চঞ্চল	আতিক
নাসিরউদ্দিন	মাসুদ
নিজামউদ্দিন	কামরুল

নুরুল হাসান	জসিম
পারভিন আখতার	জীবন
প্রবীর নিয়োগী	শামীম, কামাল হায়দার
ফারুক	অনন্ত সিং
ফিরোজ কবির	তারেক
মঈন	ইকরাম
মজিদ	নাসির
মনজি খালেদা বেগম	সুফিয়া, বুলু, রুবী
মহসীন আলী	সুফি
মহিউদ্দিন বাহার	জামিল
মাহবুব	শহীদ
মুজিবুর রহমান	কালো মুজিব
মোস্তফা কামাল	বিন্দু
মোস্তফা সাদেক	রতন
রইসউদ্দিন তালুকদার	আশিক
রাজিউল্লাহ আজমী	রুহুল কুদ্দুস
রামকৃষ্ণ পাল	মাহতাব
রাশেদা বেগম	রানু
শায়লা আমিন	খালেদা
শাহজাহান তালুকদার	রফিক
সগির মাস্টার	সালাম
সামিউল্লাহ আজমী	রুহুল আমিন, তাহের
সিরাজ সিকদার	রুহুল আলম, হাকিম ভাই
সুদত্ত বিকাশ তঞ্চঙ্গ্যা	জ্যোতি
সুলতান	মাহবুব
সেলিম শাহনেওয়াজ	ফজলু, আহাদ
সেলিনা বেগম	মুন্নি

পরিশিষ্ট ২

তথ্যসূত্র

বই

আনোয়ার উল আলম (২০১৩)। *রক্ষীবাহিনীর সত্য-মিথ্যা*। প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা।

আনোয়ার কবীর (১৯৮৪)। *মাও সে তুঙ চিন্তাধারার স্বপক্ষে*। নবদিগন্ত প্রকাশনী, ঢাকা।

আমজাদ হোসেন (১৯৯৭)। *বাংলাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের রূপরেখা*। পড়ুয়া, ঢাকা।

আল মাহমুদ (১৯৭৩)। *সোনালি কাবিন*। প্রগতি প্রকাশনী, ঢাকা।

আহমদ শরীফ (২০১৪)। *স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব*। সংকলক : নেহাল করিম, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

আহমদ শরীফ (২০১৭)। *সাক্ষাৎকার সমকাল*। সংকলক : স্বদেশ চিন্তা সংঘ, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

জিয়াউদ্দিন (১৯৮৯)। *মাও সে তুঙ চিন্তাধারার বিপক্ষে*। চেতনা প্রোডাক্টস এন্ড পাবলিকেশনস, ঢাকা।

তরুণ দত্ত (১৯৮৪)। *বিপ্লব এসে গেল?* দেশ সুবর্ণজয়ন্তী প্রবন্ধ সংকলন ১৯৩৩-১৯৮৩, সম্পাদনা : সাগরময় ঘোষ, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

নির্মল সেন (২০১২)। *আমার জবানবন্দি*। ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা।

নূরল আনোয়ার (সম্পাদনা)। *আহমদ ছফার ডায়েরি*। খান ব্রাদার্স, ঢাকা।

মহিউদ্দিন আহমদ (১৯৯৯)। *লাল সালাম কমরেড*। ঈক্ষণ, ঢাকা।

মহিউদ্দিন আহমদ (২০১৪)। *জাসদের উত্থান পতন: অস্থির সময়ের রাজনীতি*। প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা।

মহিউদ্দিন আহমদ (২০১৬)। *বিএনপি : সময়-অসময়*। প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা।
মহিউদ্দিন আহমদ (২০১৭)। *আওয়ামী লীগ : যুদ্ধদিনের কথা ১৯৭১*। প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা।
মাহফুজ উল্লাহ (২০১২)। *পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন: গৌরবের দিনলিপি ১৯৫২-১৯৭২*। অ্যাডর্ন বুকস, ঢাকা।
মাহফুজ উল্লাহ (২০১৮)। *স্বাধীনতার প্রথম দশকে বাংলাদেশ*। দি ইউনিভার্সেল একাডেমি, ঢাকা।
মাহবুব তালুকদার (২০১৭)। *বঙ্গভবনে পাঁচ বছর*। ইউপিএল, ঢাকা।
মুনীর মোরশেদ (১৯৯৭)। *সিরাজ সিকদার ও পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি*। ঘাস ফুল নদী, ঢাকা।
মো. আনোয়ার হোসেন (২০১১)। *তাহেরের স্বপ্ন*। মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।
মোহন রায়হান (২০১৯)। *কালো আকাশ রক্তাক্ত মেঘ*। অয়ন প্রকাশন, ঢাকা।
রইসউদ্দিন আরিফ (২০১৩)। *আন্ডারগ্রাউন্ড জীবন সমগ্র*। পাঠক সমাবেশ, ঢাকা।
শাহিদা বেগম (২০০০)। *আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা: প্রাসঙ্গিক দলিলপত্র*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
সিরাজ সিকদার (১৯৯৭)। *জনযুদ্ধের পটভূমি*। ঘাস ফুল নদী, ঢাকা।
সিরাজ সিকদার (২০১৭)। *সিরাজ সিকদার রচনা সংগ্রহ*। শ্রাবণ প্রকাশনী, ঢাকা।
হাফিজ উদ্দিন আহমদ (২০২০)। *সৈনিক জীবন : গৌরবের একাত্তর রক্তাক্ত পঁচাত্তর*। প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা।

A K Roy (1975). *The Spring Thunder and After.* Minerva Associates, Calcutta.
Anthony Mascarenhas (1986). *Bangladesh : A Legacy of Blood.* Hodder and Stoughtar, London.
Marius Damas (1991). *Approaching Naxalbari.* Radical Impression, Calcutta.
S A Karim (2009). *Sheikh Mujib : Triumph and Tragedy.* UPL, Dhaka.
Sumanta Banarjee (1980). *In the Woke of Naxalbari.* Subarnorekha, Calcutta.

প্রবন্ধ, নিবন্ধ, প্রতিবেদন ও অন্যান্য

আজিজুল হক, 'একাত্তরের পাবনা-টাঙ্গাইল ফ্রন্ট এরিয়া', *স্ফুলিঙ্গ*, মে ১৯৯১

ফরহাদ মজহার, 'রাজকুমারী হাসিনা ও বাংলার ঘরের মেয়ে হাসিনা : একটি প্রতীকী কিংবা ঐতিহাসিক স্ববিরোধিতা', *সাপ্তাহিক খবরের কাগজ*, ২৮ মার্চ ১৯৯১।

মাহফুজ উল্লাহ, 'তিয়াত্তরের আলোচিত চরিত্র : আততায়ী', *বিচিত্রা*, ৪ জানুয়ারি ১৯৭৪।

মাহফুজ উল্লাহ, 'সিরাজ সিকদার হত্যার নেপথ্য কাহিনী', *বিচিত্রা*, ১৯ মে ১৯৭৮।

রাজু আলাউদ্দিন, 'জুয়েল আইচ : রাষ্ট্র কি কোনো জীব নাকি যে তার ধর্ম থাকবে?' bdnews24.com, ২৪ ডিসেম্বর ২০১৬।

শওকত হোসেন, 'কে ধরিয়ে দিয়েছিল সিরাজ সিকদারকে', শওকত হোসেন মাসুমের ব্লগ, ৩০ আগস্ট ২০১৯।

Razi Azmi, 'Short but Extraordinary Life of Samiullah Azmi', *New Age,* 25 November 2015.

Razi Azmi, 'Sikdar, Samiullah and Sarbahara', *New Age,* 2 April 2016.

Sanjay Sharma, 'Naxalbari Veteran Comrade Shanti Munda Remembers' cpiml.org/feature, 25 May 1967, 1 June 2017.

Shamim Sikdar, 'My Brother Badsha Alam Sikdar', *The Daily Star,* 14 December 2017.

পত্রপত্রিকা, সাময়িকী, ওয়েবসাইট

ইত্তেফাক, ৩ জানুয়ারি ১৯৭৫।

খবরের কাগজ, ২৮ মার্চ ১৯৯১।

গণকণ্ঠ, ৪ জানুয়ারি ১৯৭৫।

দৈনিক বাংলা, ৩ ও ৪ জানুয়ারি ১৯৭৫।

বাংলার বাণী, ৫ জানুয়ারি ১৯৭৫।

বিচিত্রা, ৪ জানুয়ারি ১৯৭৪, ১৯ মে ১৯৭৮।

সংবাদ, ৩১ ডিসেম্বর ১৯৬৪, ১২ জুন ১৯৬৫।
স্ফুলিঙ্গ, পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টির ২০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত বিশেষ সংখ্যা, মে ১৯৯১।
New Age, 1 April, 2016.
The Daily Star, 14 December 2017.
bdnews24.com, ২৪ ডিসেম্বর ২০১৬।
শওকত হোসেন মাসুমের ব্লগ
www.sarbaharapath.com
cpiml.org/feature

পরিশিষ্ট ৩

যাঁরা সাক্ষাৎকার দিয়েছেন

আকা মো. ফজলুল হক রানা : পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন ও পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। ১১ জানুয়ারি, ২৯ ফেব্রুয়ারি, ৭ মার্চ, ২০২০।

আনোয়ার উল আলম : অবলুপ্ত জাতীয় রক্ষীবাহিনীর উপপরিচালক (প্রশিক্ষণ)। সাবেক রাষ্ট্রদূত। ১৮ জানুয়ারি ২০২০

আবুল কাসেম : প্রকৌশলী। চট্টগ্রাম পলিটেকনিক্যাল ইন্সটিটিউটের সাবেক ভাইস প্রিন্সিপাল। অভিনেতা। ১৮ জানুয়ারি ২০২০

আবুল কাসেম ফজলুল হক : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সাবেক অধ্যাপক। বর্তমানে 'আহমদ শরীফ চেয়ার' অধ্যাপক। ২ মার্চ ২০২০

আবু সাঈদ : পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের শুরুর দিকের সংগঠক। লে. কর্নেল (অব.) আবু তাহেরের ছোট ভাই। ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২০

ফরহাদ মজহার : লেখক ও কবি। ১১ আগস্ট ২০২০

বজলুল করিম আকন্দ : আনন্দমোহন কলেজের ছাত্র ইউনিয়নের সাবেক সংগঠক, রসায়নবিদ। বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের সাবেক কর্মকর্তা। ১৬ জানুয়ারি ২০২০

বাজ : পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের শুরুর দিকের কর্মী। ১৭ জুন ২০২০

মনজি খালেদা বেগম : পূর্ব বাংলার শ্রমিক আন্দোলন ও পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টির সংগঠক। ৪ অক্টোবর ২০২০

মাহফুজ উল্লাহ : সাংবাদিক। অবলুপ্ত সাপ্তাহিক বিচিত্রার সাবেক সহকারী সম্পাদক। বাংলা ছাত্র ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি। পরিবেশবাদী আন্তর্জাতিক সংগঠন আইইউসিএন-এর বাংলাদেশ শাখার সাবেক সভাপতি। ৩ জানুয়ারি ২০১৯

মাহবুব তালুকদার : বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির সাবেক বিশেষ সহকারী। বর্তমানে নির্বাচন কমিশনার। লেখক ও কবি। ৩০ এপ্রিল ২০১৫

মাহমুদ ফারুক : পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের শুরুর দিকের সংগঠক। চক্ষু বিশেষজ্ঞ। ১৯ আগস্ট ২০২০

মেহেরুন্নেসা চৌধুরী : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হলের সাবেক প্রভোস্ট। ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২০

রইসউদ্দিন আরিফ : পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টির সাবেক অঞ্চল পরিচালক এবং পরে কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক। ১৮ জানুয়ারি ২০২০

রাজিউল্লাহ আজমী : পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের শুরুর দিকের সংগঠক। অধ্যাপক। ২৮ আগস্ট ২০২০

সারোয়ার আলী মোল্লা : অবলুপ্ত জাতীয় রক্ষীবাহিনীর উপপরিচালক (অপারেশন)। সাবেক রাষ্ট্রদূত। ১৮ জানুয়ারি ২০২০

সুলতানা বেগম রেবু : প্রয়াত কবি হুমায়ুন কবিরের স্ত্রী। ১৬ মে ২০২০

হাফিজ : পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের শুরুর দিকের কর্মী। ১০ জুন ২০২০

✣